শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী

বৈষ্ণব দাসানুদাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিজীবন হরিজন

গৌড়ীয় মিশন,

বাগবাজার, কোলকাতা হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী

বৈষ্ণব দাসানুদাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিজীবন হরিজন

গৌড়ীয় মিশন,
বাগবাজার, কোলকাতা হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তিজীবন হরিজন মহারাজ

গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কোলকাতা হইতে প্রকাশিত

চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী

ইং—১৬ই আগষ্ট, ২০০৬

বাংলা—১৪১৩ সাল, ৩১শে শ্রাবণ

প্রাপ্তিস্থান ঃ ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কোলকাতা-৩

ও

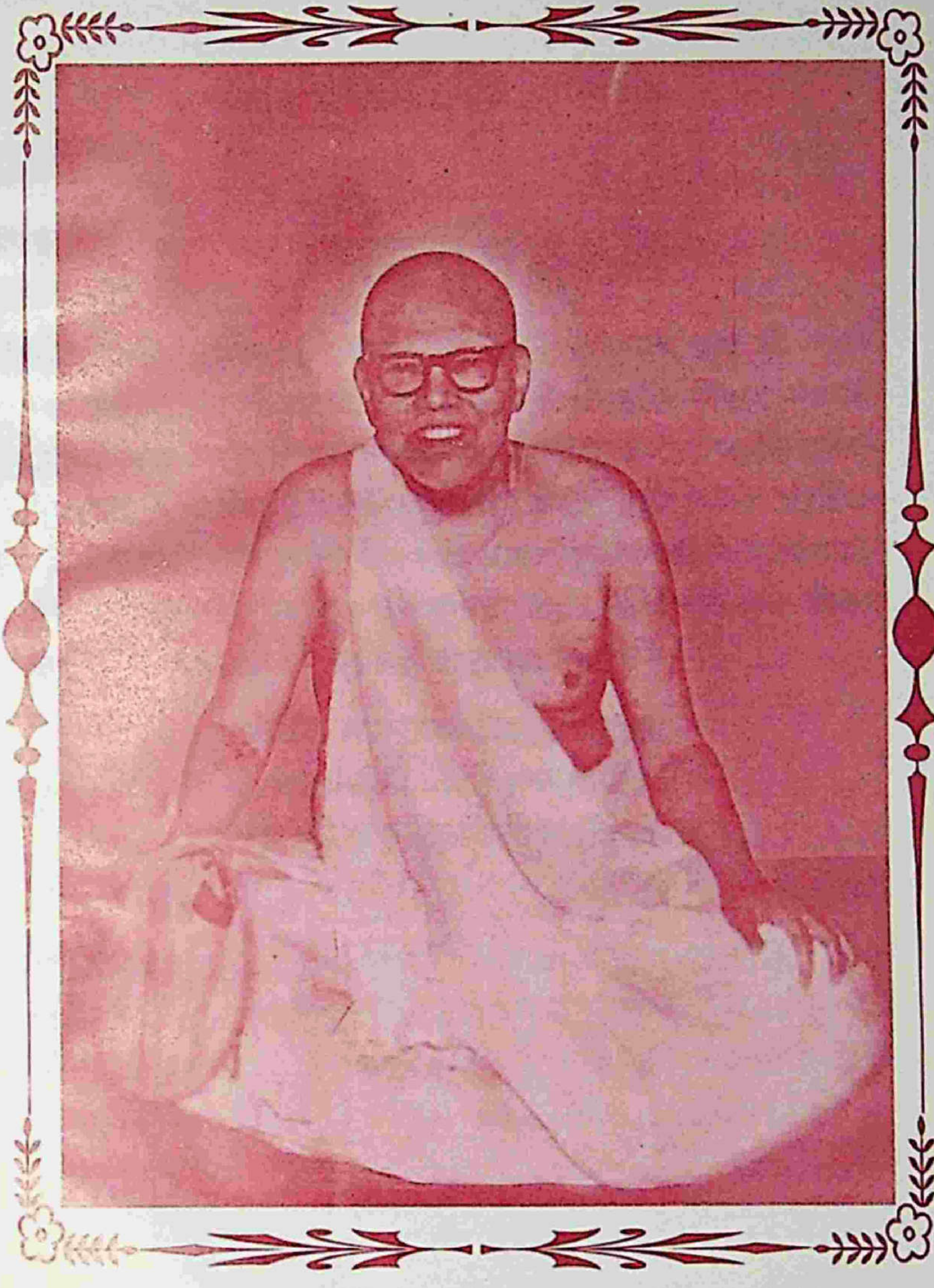
অন্যান্য শাখামঠ সমূহ।

মুদ্রাকর ঃ ঃ—

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ

শ্রীভাগবত প্রেস

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কোলকাতা—৩



ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজ (শ্রীল আচার্য্যপাদ)

সমর্পণম্

কলিপাবনাবতারী শ্রীভগবৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপানুগবরনিত্যলীলাপ্রবিষ্টাচার্য্যভাস্কর- শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদানুকম্পিত-নিত্যলীলাপ্রবিষ্টাচার্য্যবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ-পুরীগোস্বামিপাদানাং শ্রীচরণ-রেণুপ্রার্থী কোঽপি ভৃত্যবরাক স্বরচিতং "শ্রীগৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী"-নামক-গ্রন্থং প্রকাশপূর্ব্বকং বর্ত্তমান-গৌড়ীয়মঠ-মিশনাধিপত্যাচার্য্য-প্রবরাণাং ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত-মহারাজানাং শ্রীকরকমলয়োঃ সাদরং সমর্পয়তি।

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবশ্রীচরণরেণুপ্রার্থী
সমর্পয়তি (শ্রীহরিকৃপা দাসঃ)
ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু শ্রীভক্তিজীবন হরিজন

পূর্ব্বাভাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ ও বন্দনা করে 'শ্রীগৌর-পার্ষদ চরিতাবলী' গ্রন্থ রচনার প্রাক্ প্রেরণা বিষয়ক দু' একটি কথা বলছি। শ্রীগৌরসুন্দরের ও তাঁর প্রিয় পার্ষদগণের অলৌকিক লীলাবলী শ্রবণ ও পঠনের অত্যধিক আগ্রহ শিশুকাল হ'তে আমার ছিল। তাই বহু প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে যত্নবান্ হই। প্রায় বিশ বছর কাল এরূপ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত থাকার ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের লীলা চরিত অবলম্বন করে গ্রন্থ লিখবার বিশেষ ইচ্ছা হয়। ইংরাজী ১৯৬৮ সালের ফাল্গুন কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতে হৃদয়ে এক বিশেষ প্রেরণা অনুভব করি। তখন থেকে এ গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব চরণে প্রপন্ন হওয়ার সৌভাগ্য জীব যত দিন না পায় ততদিন তারা এ জগতের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে অধোক্ষজ ভগবানের ও ভক্তগণের অলৌকিক অচিন্ত্য লীলা সকল বুঝতে সক্ষম হয় না।

শ্রীভগবানের যেমন গুণের অন্ত নাই তেমন তাঁর প্রিয় ভক্তগণের সদ্গুণেরও অন্ত নাই। পার্থিব জগতের বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে যাঁরা ভক্তগণের চরিত সমালোচনা করতে যান, তাঁদের কাছে এ অলৌকিক চরিতগুলি কাল্পনিক কাহিনী বলে মনে হয়।

অচিন্ত্য, অলৌকিক ভক্তজীবনী আলোচনা করতে হলে, প্রথমতঃ তাঁদের শ্রীচরণে প্রপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নাই। তাই কৃপাময় ভক্তগণের শ্রীপাদ-পদ্মে শত শত বার বন্দনা পূর্ব্বক এ গ্রন্থ লিখতে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

ঐতিহাসিকতা ও অচিন্ত্যত্ব শ্রীভগবানের এবং ভক্তগণের জীবনীতে

প্রকাশিত হয়ে থাকে। ইতিহাস— কোন্ সময়ে, কোন্ কালে, কোন্ ব্যক্তির ও কোন্ দেশে যে ঘটনা হয়েছিল, এর প্রকৃত তথ্য, অচিন্ত্যত্ব— যেটি মানব ভাবনার অতীত এবং অলৌকিক। ভগবান্ ও ভক্তগণ মাঝে মাঝে বিশেষ লীলানুরোধে অচিন্ত্য শক্তি প্রকাশ করে থাকেন। যথা—

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন।।

—(চৈঃ চঃ মধ্য ৪ ।৩৯)

সর্ব্ব সামর্থ্যবান্ ভগবান্ মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য অপেক্ষা করছেন। এ সব ঘটনা অলৌকিক।

* * *

ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসি-কারণ।।
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায়।।

— (চৈঃ চঃ মধ্য ৪ ।১২৭, ১২৮)

শ্রীবিগ্রহ স্বপ্নে পূজারীকে বলেছেন—"আমি মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য এক ভাণ্ড ক্ষীর চুরি করে অঞ্চলের তলে ঢেকে রেখেছিলাম। আমার মায়ায় তা' তোমরা বুঝতে পার নি। এই ক্ষীর নিয়ে মাধবপুরীকে দাও।" পূজারী কপাট খুলে দেখলেন শ্রীবিগ্রহের ওড়নীর তলে এক ভাণ্ড ক্ষীর রয়েছে। "ধড়ার অঞ্চল তলে পাইল সেই ক্ষীর।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৪ ।১৩১) এ সমস্ত অলৌকিক ঘটনা সাধারণ লোকের পক্ষে অচিন্ত্য। বিগ্রহ কি করে ক্ষীর চুরি করে রাখলেন? ঐতিহাসিকগণ বলবেন, এ সব কল্পনা। তখন কে পূজারী ছিল? কে তা জেনেছিল? প্রকৃত তথ্য ঠিক ঠিক পেলে বিশ্বাস করতে পারি। নতুবা বিশ্বাস করি না।

প্রত্যেক ভক্ত জীবনীতে এরূপ অলৌকিক ঘটনা আছে। বর্ত্তমান যুগেও

ভক্তদিগের জীবনীতে এ জাতীয় ঘটনা দেখা যায়। ভক্ত জীবনের ইতিহাসে অনেক সময় অলৌকিক ঘটনা ঘটে। যথা ঃ—

জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল।।
— (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।২৮২)

"শ্রীরাঘব ভবনে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন আমি কদম্ব ফুলের মালা পরব। ভক্তগণ বললেন— গোসাঞি। এখন ত বর্ষাকাল নহে কদম্ব ফুল কোথায় পাব? নিত্যানন্দ প্রভু বললেন-বাগিচায় গিয়ে দেখ। রাঘব পণ্ডিত বাগিচায় এলেন দেখলেন, আশ্চর্য্য! জম্বীরের বৃক্ষে কদম্ব ফুল ফুটে রয়েছে।"

ঐতিহাসিক বলবেন, এ সব কাল গত বিরুদ্ধ কথা। বর্ষাকাল নয়, জম্বীর গাছে কদম্ব ফুল কিরূপে ফুটতে পারে? কিন্তু ইহা অচিন্ত্য,—অনুভবী ভক্ত বলবেন।

মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপ নগরে মহাসংকীর্ত্তন করেন, তখনকার এক বর্ণনা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর করেছেন—

"চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিকে হরি বলে।।"
—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।২১৪)

" কোটি কোটি লোক হরিধ্বনি করছেন" তখন নবদ্বীপে ক'হাজার লোক ছিল? ঐতিহাসিক বলবেন, এ সমস্ত কবির কল্পনা। তবে মহানুভবী শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কি মিথ্যা কল্পনা করে বলেছেন? ভাগবতে শ্রীমদ্ শুকদেব গোস্বামীও বর্ণন করেছেন—"শত কোটি গোপী সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রাস করলেন।" সে যুগে বৃন্দাবনে কত হাজার লোক বাস করত?

এ সব অলৌকিক কথা ; যারা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিমত্তায় বিশ্বাস করে না, তারা বুঝতে পারে না। পরবর্ত্তী সময়ের অনেক ভক্তের জীবনীতে আছে যে তাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর, শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর, শ্রীরূপ গোস্বামীর ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির দর্শন লাভ ও তাঁদের উপদেশ শ্রবণাদি করেছেন। ঐতিহাসিক বলবেন—বহু বছর আগের লোক এঁরা, এঁদের কি করে দর্শন হল। এটা স্বপ্ন বা কল্পনার কথা মাত্র। কিন্তু এঁরা নিত্য ভগবদ্ জন। নিত্যকাল লীলা পরায়ণ। যাঁর দিব্য নেত্র আছে, তিনি তাঁদের দেখতে পারেন।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে যখন দিব্য নেত্র দিলেন, তখন অর্জ্জুন ভগবানের অলৌকিক স্বরূপ দর্শন করলেন। অতএব প্রাকৃত ইতিহাস সব সময় ভক্তগণের বা ভগবানের জীবনীতে যে থাকবে এরূপ সিদ্ধান্ত হতে পারে না। ভক্ত বা ভগবানের লীলার অধীন ইতিহাস। প্রাকৃত ইতিহাস বিরুদ্ধ কথা রামায়ণে ও মহাভারতে বহু পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু তা ইতিহাস বিরুদ্ধ নয়। কারণ ইহা ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি দোষ বর্জ্জিত ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বাণী। মহানুভব ব্যক্তিগণ ছাড়া অলৌকিক চরিত্র অন্যে বর্ণনা করতে গেলে তা' কল্পনা বলা হবে। আধুনিক যুগেও ঐতিহ্যবিদ্‌গণের অনেক মহানুভবী ঋষিদের ন্যায় কোন কোন ভক্তচরিতে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন। সেটি অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। অনুকরণ করা ধৃষ্টতা মাত্র। অযোগ্য হয়ে যোগ্যের সমকক্ষতার ভান অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুকরণ আর বাস্তবতা, যাঁরা একটু সত্য ধর্মাশ্রয় করেছেন, তাঁরা বেশ বুঝতে পারেন। অনুকরণ করে ভাল ভাষা দিয়ে ঐতিহ্যবিদ্‌গণ অনেক গ্রন্থ লিখেছেন কিন্তু উহা কোন আত্মকল্যাণ ইচ্ছুক ব্যক্তি পড়েন না। আজকাল ভগবদ্ উপাসনা শূন্য কেবল ঐতিহ্যবিদ লেখকের সংখ্যা বেশী হ'বার ফলে বাস্তব ভক্তজীবনী ও ভগবানের লীলা তত্ত্বাদি জন সমাজে অপরিজ্ঞাত হতে

চলেছে। সাধারণ লোক এ সমস্ত পড়ে শুনে বাস্তব লীলাটিকে কল্পনা বলে মনে করছে।

অনুভব দু' প্রকার। বাহ্য শব্দাদি বিষয়গত অনুভব ও অধ্যাত্মপর তত্ত্বগত অনুভব। যারা কেবল বাহ্য শব্দ অনুশীলন তৎপর, তারা অক্ষজবাদী। যা'রা অধ্যাত্মতত্ত্ব অনুশীলন তৎপর তাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ। অলৌকিক তত্ত্বের অনুভব একমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের হয়। অক্ষজবাদী কেবল বাহ্য শব্দ নিয়ে সত্যবস্তু থেকে ভ্রষ্ট হয়। তারা মিথ্যাচারী ও বৃথা বাক্যালাপী। তাদের যতই ভাল লেখা, ভাল ভাষা হউক না কেন, উহা কখনও কারও হিত সাধন করতে পারে না, বরং জনসাধারণকে বিপথগামী করে।

সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য   চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।।
—(ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম দাস)

মহানুভবী শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতির বাণী এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলী এ-গ্রন্থের সর্ব্বোত্তম উপাদান। তাঁদের বাণীসমুহ সংরক্ষণ করবার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রয়াস করেছি। এ-সমস্ত মহাজনগণের অনুকরণে লেখা গ্রন্থের কোন প্রমাণ এতে স্থান দেওয়া হয়নি। এ-গ্রন্থে বিশেষভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদগণের চরিত কথা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক বিভ্রম

সাহিত্যিকগণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত বস্তুটি লেখনীতে প্রকাশ করেন। মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব ছাড়া সাহিত্যিক সুন্দর সাহিত্য রচনা করতে পারেন না। যাঁরা প্রাকৃত প্রপঞ্চগত বস্তুর সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁরা প্রাকৃত সাহিত্যিক, যাঁরা অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁরা অপ্রাকৃত

সাহিত্যিক। প্রাকৃত সাহিত্যিক প্রাকৃত লোকের মনোরঞ্জন করেন। অপ্রাকৃত সাহিত্যিক ভগবানের ও ভক্তের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। প্রাকৃত কবির প্রাকৃত প্রপঞ্চ সম্বন্ধে যে কল্পনা তা' অনিত্য অসার। ভক্ত কবির কল্পনা বাস্তব। ভগবানের লীলা নিত্য সত্য সারস্বরূপ। ভক্ত কবি সমাধি বলে ভগবদ্দর্শন পান। শ্রীবাল্মীকি মুনি, শ্রীমদ্ ব্যাসদেব, শ্রীমদ্ শুকদেব গোস্বামী প্রভৃতি কবিগণ, পরবর্ত্তীকালের আচার্য্যবৃন্দ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি সমাধিবলে সেই ভগবদ্ লীলাবলী দর্শন করে লিখেছেন। তাঁদের বর্ণনা নিত্য সত্য স্বরূপ। প্রাকৃত কবিগণ ভগবানের সম্বন্ধে লিখলেও ওটি কল্পনা। কারণ তারা সাধন ভজন শূন্য ও ভগবদ্ ভক্ত পদাশ্রয় রহিত।

কবির মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবটি বাস্তব ঐতিহাসিক হওয়া দরকার। যেখানে বিপরীত লেখা হয়, সেটি ঐতিহাসিক বিভ্রম। অপ্রাকৃত কবির কোন স্থানে ঐতিহ্য বিভ্রম দেখা গেলেও উহা ঐতিহ্য বিভ্রম নয়। কারণ ভক্তগণ ভগবানের ন্যায় অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত। তাঁরা অচিন্ত্য শক্তি বলে অসাধ্য কর্ম্মসকল করতে পারেন। এ বিষয় সম্বন্ধে ভক্তদিগের জীবনীতে অনেক আখ্যান আছে। অতঃপর যে যে প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি হতে প্রবন্ধ সংগৃহীত হয়েছে—তার নাম নিম্নে প্রদত্ত হল।

এই গ্রন্থাবলীর প্রধান প্রধান উপাদান ঃ—

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত— শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃত ।
শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত — শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত ।
শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল — শ্রীমদ্ লোচন দাস ঠাকুর কৃত।
শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক — শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর কৃত।
শ্রীভক্তিরত্নাকর —শ্রীমদ্ নরহরি চক্রবর্ত্তী কৃত।
অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য — (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের) শ্রীমদ্
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত

গৌড়ীয় ভাষ্য ও বিবৃতি — (শ্রীচৈতন্য ভাগবতের) শ্রীমদ্
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ কৃত।

অনুভাষ্য — (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের) শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
প্রভুপাদ কৃত।

পদকল্পতরু — শ্রীমদ্ বৈষ্ণব দাস সংগৃহীত।
—শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়, এম, এ, সংস্করণ।

এই সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থাবলী ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ—

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদক —শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ
বিদ্যাবিনোদ বি, এ, গৌড়ীয় মিশন।

শ্রীক্ষেত্র — শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, প্রণীত।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ — ঐ

শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপাল ভট্ট — শ্রীযুত শিশির কুমার ঘোষ।
সন ১৩২৫।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী — শ্রীমদ্ হরিদাস দাস।

অদ্বৈত প্রকাশ — লাউড়িয়া ঈশান নাগর কৃত।

শ্রীগৌর পদতরঙ্গিণী — শ্রীজগবন্ধু ভদ্র। ফরিদপুর ইং ১৯০২।

ভারতের সাধক — শ্রীশঙ্কর রায়।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ — ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ,
এম, এ, পি,এইচ , ডি (লিট্)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম—ডাঃ বেলা দাসগুপ্তা,
এম, এ, পি, এইচ , ডি

গৌরাঙ্গ পরিজন — ডাঃ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত।
এম, এ, পি, এইচ, ডি।

শ্রীগৌরাঙ্গ চম্পূ—মহাকবি শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। লাল দাসের ভক্তমাল।
গোবিন্দ দাসের কড়চা। বংশী শিক্ষা— অজ্ঞাত নাম।
বাউল চন্দ্রিকা—অজ্ঞাত নাম। নিত্যানন্দ-বংশ-বিস্তার ইত্যাদি।

পুনশ্চ আর কিছু নিবেদন জানাচ্ছি—লাল দাসের ভক্তমাল, গোবিন্দ দাসের কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, বংশী শিক্ষা, বাউল চন্দ্রিকা ও অদ্বৈত প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনের ডাঃ বেলা দাসগুপ্তা যে সমস্ত সমালোচনা করেছেন তা বিশেষ সূক্ষ্ম বিচারের সহিত। তাতে বেশ বুঝা যায়— এ সমস্ত গ্রন্থের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না, কারণ মূল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ খুব কম; বেশীর ভাগ অনুকরণ ও স্ব-কপোল কল্পনা মাত্র।

পরমপূজ্য শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বলেন—"এই গ্রন্থ সমূহ এক একটি অভিসন্ধি লইয়া পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে। এ সমস্ত পুস্তক যেরূপে যে সময় রচিত হয়েছিলি, তার প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি অদ্যাপি জগতে বিদ্যমান আছেন (গৌড়ীয় ১২শ খন্ড, ৩৭ সংখ্যা)।"

বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত বাউল-চন্দ্রিকা, অদ্বৈত-প্রকাশ, বংশী-শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবনী, চৈতন্য-পরিকর, গৌরাঙ্গ-পরিজন, ভারতের সাধক-সাধিকা প্রভৃতি যে সব গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, সে সমস্ত গ্রন্থের প্রামাণিকতা খুব সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা উচিত।

অলমতিবিস্তারেণ।
বৈষ্ণব দাসানুদাস
ত্রিদণ্ডীভিক্ষু শ্রীভক্তিজীবন হরিজন

প্রকাশকের নিবেদন

(চতুর্থ সংস্করণ)

গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের অপার করুণায় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজের শততম আবির্ভাব বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে "শ্রীশ্রী গৌরপার্ষদ চরিতাবলী' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রায় ১০ (দশ) বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানে উহা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হওয়ায় ও ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ চাহিদার জন্য গ্রন্থটি পুনঃ মুদ্রিত হইল।

এই গ্রন্থটি অতি অমূল্য এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বৃহৎ গ্রন্থটির মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন গৌরপার্ষদগণের জীবন চরিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়ভক্তগণের জীবন চরিত শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা সাধক জীবন পবিত্র ও ধন্য হয়। তাই এই গ্রন্থটি বৈষ্ণব সমাজে পরম আদরণীয়।

উক্ত গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে পুনঃ মুদ্রনার্থে যৎপরনাস্তি চেষ্টা করা হইয়াছে।

তথাপি মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে। সহৃদয় পাঠকগণের কাছে আমাদের নিবেদন তাহারা কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া সারগ্রহীতার আদর্শ অবলম্বন করিয়া পাঠ করিবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, বর্তমানে কাগজের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য পূর্বাপেক্ষা কিছু বর্দ্ধিত হইল।

গ্রন্থ মুদ্রণের কার্য্যে শ্রীদুঃখহরণ দাস, শ্রীদেবানন্দ দাস এবং প্রুফ সংশোধন কার্য্যে শ্রীসদানন্দ দাস বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাহাদের নিত্য মঙ্গল প্রার্থনা করি।

ইতি—

শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব পাদপদ্মরেণু প্রার্থী

শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী

(সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তীবাসর

ইং—১৬ই আগষ্ট, ২০০৬

বাংলা—৩১শে শ্রাবণ, ১৪১৩।

শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী

সূচী-পত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট

— ৪৪ ৪৪ —



শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী

শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরী

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরু তেঁহো প্রথম অঙ্কুর।।
— (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৯।১০)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমাধব পুরী সম্বন্ধে এইরূপ বলেছেন—

প্রভু কহে,—নিত্যানন্দ, করহ বিচার।
পুরী-সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর।।
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবারে স্বপ্নে আসি' যাঁরে আজ্ঞা কৈল।।
যাঁর প্রেমে বশ হৈঞা প্রকট হইলা।
সেবা অঙ্গীকার করি' জগত তারিলা।।
যাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' হরি।।
— (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।১৭১-১৭৪)

পূর্বে যখন শ্রীমাধব পুরী বৃন্দাবন ধামে এলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সতত বিভোর থাক্‌তেন। দিন রাত সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকত না। কখন ক্রন্দন করছেন, কখন নর্ত্তন করছেন ও কখন প্রেমে ভূমিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করে গোবিন্দ কুন্ডে এলেন এবং স্নান করে একটি গাছের তলায় বসলেন। শ্রীপুরী গোস্বামী কখনও মেগে খেতেন না। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকের বেশ ধরে এক ভান্ড দুধ মাথায় করে পুরীর কাছে এসে বললেন—পুরী! তুমি এই দুধ পান কর। তুমি মেগে খাওনা কেন? দিবারাত্র কার ধ্যান কর? গোপবালকের সেই মধুর কথা শুনে এবং অপূর্ব্ব রূপ দেখে পুরী বড়ই সুখী হলেন। পুরীর ক্ষুধা তৃষ্ণা চলে গেল।

পুরী বললেন, তুমি কে? কোথায় থাক? তুমি কি করে জানলে যে আমি উপবাসী? গোপবালক-রূপী কৃষ্ণ আত্মগোপন করে বললেন, আমি গোপ-শিশু! এই গ্রামে থাকি। আমার গ্রামেতে কেহ উপবাসী থাকে না। কেহ অন্ন মেগে খায়, কেহ দুধ বা ফল মেগে খায়। অযাচক লোককে আমি আহার দিয়া থাকি। স্ত্রীলোকেরা এই কুন্ডে জল নিতে এসে তোমাকে দেখে গেছেন। তাঁরা আমার হাতে দুধ দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি শীঘ্রই গোদোহন করতে যাব। তুমি দুধ পান করে ভান্ডটা রেখে দিও। আমি পরে এসে নিয়ে যাব। এই কথা বলে গোপবালক চলে গেল। পুরী গোস্বামী দুধ পান করে ভান্ডটি ধুয়ে বালকটির পথ দেখতে লাগলেন। ক্রমে রাত গভীর হতে লাগল, কিন্তু বালক আর এল না। পুরী বসে নাম নিতে লাগলেন, শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা এল। তখন স্বপ্নে দেখতে লাগলেন— সেই গোপশিশু এসে পুরীর হাতে ধরে তাঁকে এককুঞ্জ-সন্নিধানে নিয়ে গেল এবং কুঞ্জ দেখিয়ে বলতে লাগল — আমি এই কুঞ্জে থাকি। শীতবর্ষাদিতে কষ্ট পাই। তুমি গ্রামের লোক নিয়ে কুঞ্জ কেটে আমায় বের কর। পর্ব্বতের উপরে এক মন্দির করে আমায় তথায় স্থাপন কর এবং বহু শীতল জল দিয়ে আমার অঙ্গ মার্জ্জনা কর।

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন।।
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার।।
—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।৩৯, ৪০)

মাধব! বহুদিন ধরে তোমার পথ চেয়ে আছি, তুমি কবে আসবে! কবে আমার সেবা করবে? তোমার প্রেমে বশীভূত হয়ে তোমার সেবা অঙ্গীকার করছি। আমি দর্শন দিয়ে সকলকে উদ্ধার করব। মাধব! আমার নাম "গোপাল"। আমি গোবর্দ্ধনধারী। আমি ব্রজের স্থাপিত বৃন্দাবনের ঈশ্বর। আমার সেবকগণ ম্লেচ্ছ ভয়ে আমায় কুঞ্জে লুকিয়ে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই দিন থেকে আমি কুঞ্জ মধ্যে আছি। তুমি কুঞ্জ থেকে বের করে আমার সেবা কর। গোপাল এই কথা বলে অন্তর্হিত হলেন। শ্রীমাধব পুরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে ভাবতে লাগলেন আমি কৃষ্ণ দর্শন পেয়েছিলাম, কিন্তু ভাগ্য দোষে তাঁকে চিনতে পারলাম না। এই কথা বলে প্রেমাবেশে ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করে মন স্থির করলেন এবং গোপালের আজ্ঞা পালন করবার জন্য তৎপর হলেন।

শ্রীমাধব পুরী প্রাতঃকালে গ্রামে গেলেন এবং ভব্য লোকদের ডেকে বললেন— তোমাদের গ্রামের ঈশ্বর গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ এক কুঞ্জ মধ্যে আছেন। কুঞ্জ কেটে তাঁকে বের করতে হবে। গ্রামবাসিগণ পুরীর কথা শুনে সকলে সুখী হলেন এবং কোদাল কুঠার নিয়ে কুঞ্জের দিকে চল্‌লেন। বৃক্ষ, লতা আচ্ছাদিত নিবিড় কুঞ্জ। কুঠারের দ্বারা কুঞ্জের বৃক্ষ লতাদি কেটে তার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন—ঠাকুর মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছেন। শ্রীমূর্ত্তিটি অতি সুন্দর এবং প্রকান্ড। সকলে আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হয়ে ঠাকুরের

শ্রীঅঙ্গের ধূলা কাদা ঝেড়ে তাঁকে বাইরে আনলেন। শ্রীপুরী গোস্বামী শ্রীমূর্ত্তি দেখে আনন্দাশ্রুসিক্ত নয়নে সাষ্টাঙ্গে দন্ডবৎ হয়ে পড়লেন। চতুর্দিকে লোক আনন্দে হরি হরি বলতে লাগল। ভারী বিগ্রহ, বহু বলিষ্ঠ লোক শ্রীবিগ্রহকে শ্রীগোবর্দ্ধনের উপর উঠাল এবং একটি মঠ তৈরী করে সেখানে স্থাপন করল। শ্রীগোপাল দেবের অভিষেক আরম্ভ হল। গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এসে অভিষেকের কার্য্য করতে লাগলেন। গোবিন্দকুন্ড থেকে সহস্র ঘট জল আনয়ন করা হল। পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি সংগ্রহ করতে কিছু ব্রাহ্মণ লেগে গেলেন। শ্রীগোপাল দেবের প্রকট সংবাদ শ্রবণ করে গ্রামের গোপগণ আনন্দে ভারে ভারে দই, দুধ, কলা, চাল, আটা, ঘি ও বিবিধ তরিতরকারী আনতে লাগল। শ্রীগোপাল দেবের ইচ্ছায় কে কোথা থেকে কি আনতে লাগল, তা অবর্ণনীয়। বাদ্যকার এসে বাজনা বাজাতে লাগল। গায়কগণ মধুর সংকীর্ত্তন করতে লাগল।

শ্রীমাধব পুরী স্বয়ং শ্রীগোপাল দেবের মহাস্নান অভিষেক কার্য্য করতে লাগলেন। দশজন ব্রাহ্মণ অন্ন, পাঁচজন তরকারী, পাঁচজন রুটি ও কিছু লোক বিবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি তৈরী করতে লাগলেন। নব বস্ত্র পেতে তদুপরি পলাশ পাতা বিছিয়ে অন্নের ও রুটির রাশি করা হল। পূর্বে শ্রীনন্দ মহারাজ যেমন অন্নকূট মহোৎসব করেছিলেন, ঠিক সেই প্রকার অন্নকূট মহোৎসব যেন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। রন্ধন সমাপ্ত হলে শ্রীমাধব পুরী শ্রীগোপাল দেবকে নিবেদন করতে বসলেন। "বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল।।"—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।৭৬) গোপাল বহুদিন ক্ষুধার্ত্ত, সব কিছু ভোজন করলেন। শ্রীমাধব পুরী সব দেখতে পেলেন। তাঁর কি আনন্দ, সুখে দেহস্মৃতি নাই, প্রেমানন্দে তিনি ভরপুর! শ্রীগোপাল দেব ভোজনান্তে বিস্তর সুগন্ধি জল পান করলেন। শ্রীমাধব পুরী স্বচক্ষে এ সব লীলা দেখতে পাচ্ছিলেন। শ্রীগোপাল সব কিছু ভোজন করলেন ও তাঁর দিব্য শ্রীহস্ত স্পর্শে সবকিছুই পূর্ণ ভাবে রইল। শ্রীমাধবপুরী গোপালকে আচমন করায়ে তাম্বুল দিলেন এবং পরে শয়ন করালেন।

অতঃপর শ্রীমাধব পুরী প্রসাদ পাওয়ার জন্য সকলকে আদেশ করলেন। আগে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের ভোজন করান হল। পরে দীন-দুঃখী সকলের ভোজন হল। শ্রীপুরী গোস্বামীর প্রভাব দেখে সকলে আশ্চর্য্য হল। শ্রীপুরী গোস্বামী সারাদিন পরিশ্রম করবার পর রাত্রে কিছু দুধ পান করলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দে শ্রীমাধব পুরীর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। পরদিন প্রাতঃকালে অন্যান্য গ্রামের লোকজন আগের দিনের ন্যায় সেবা সম্ভার নিয়ে এল। সেদিনও সেইরূপ অন্নকূট হল।

ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি।
গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজবাসি-প্রতি।।
—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।৯৫)

ব্রজবাসীগণ "শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু জানে না। কৃষ্ণও ব্রজবাসী ভিন্ন আর কিছু জানেন না। ব্রজজনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক প্রীতি।" অনন্তর দিনের পর দিন অন্নকূট হতে লাগল। গোপালকে বহু বস্ত্রালঙ্কার ভক্তগণ অর্পণ করতে লাগলেন। গোপালদেব দশ হাজার গাভী দান পেলেন, গোপালের সেবা দেখে পুরীর মনে বড়ই আনন্দ হল। গৌড়দেশ থেকে আগত দুই জন বৈরাগী ব্রাহ্মণকে শিষ্য করে শ্রীমাধব পুরী তাঁদের গোপালের সেবাভার দিলেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের সঙ্গেই লীলা করেন। একদিন শ্রীগোপাল-দেব শ্রীমাধব পুরীকে স্বপ্নে বললেন—"পুরী! আমার অঙ্গতাপ যাচ্ছে না। তুমি যদি নীলাচল থেকে মলয়জ চন্দন ও কর্পূর এনে আমার অঙ্গে প্রলেপ দিতে পার, তবে আমার অঙ্গতাপ নিবৃত্ত হবে।" পুরী বললেন—"ঠাকুর আমি বৃদ্ধ, তোমার এই সেবা করতে কি পারবো?" — গোপাল বললেন—"পুরী! তুমিই করতে পারবে। তোমাকেই করতে হবে, অন্যের দ্বারা হবে না। পুরীর স্বপ্ন ভঙ্গ হল। স্বপ্নকথা স্মরণ করে প্রেমে বিহ্বল হতে লাগলেন। গোপাল

আমাকে আদেশ করেছেন —চন্দন কর্পূর আনতে। আহা! গোপালের কত করুণা! শ্রীমাধব পুরী বৃদ্ধ। তবুও তাঁকেই মলয়জ চন্দন আনতে আদেশ করলেন। শ্রীমাধব পুরী শ্রীগোপাল দেবের আজ্ঞা শিরে ধারণ করে মলয়জ চন্দন আনবার জন্য নীলাচলের দিকে চললেন। শ্রীমাধব পুরী ক্রমে ক্রমে চলতে চলতে গৌড় দেশে এলেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে উঠলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় মহাভাগবত শিরোমণি। আচার্য্য তৎক্ষণাৎ তাঁর শ্রীচরণাদি ধৌত করে পাদমর্দন পূজাদি করলেন এবং সমাদরে তাঁকে ভোজনাদি করালেন। শ্রীমাধব পুরী অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে কয়েক দিন কৃষ্ণ-কথানন্দে অবস্থান করলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শ্রীমাধব পুরীপাদের থেকে মন্ত্র দীক্ষাদি গ্রহণ করলেন। শ্রীমাধব পুরীকে একদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র আমন্ত্রণ করে স্বীয় গৃহে আনয়ন করেন এবং পাদধৌতাদি পূর্ব্বক, পাদ-পূজাদি করে বহুবিধ তরকারী ব্যঞ্জন অন্নাদি খুব যত্নের সহিত ভোজন করান। শচী জগন্নাথের প্রগাঢ় ভক্তি দর্শনে শ্রীপুরী গোস্বামী তাঁদের প্রচুর আশীর্ব্বাদ করেন। সেই আশীর্ব্বাদের ফলেই যেন শ্রীমহাপ্রভু তাঁদের ঘরে আবির্ভূত হলেন।

শ্রীমাধব পুরী কিছুদিন নবদ্বীপ পুরে অবস্থান করবার পর উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমে এলেন রেমুনায়। তথায় শ্রীগোপীনাথকে দেখে পুরী প্রেমে ক্রন্দন ও নৃত্য-গীতাদি করলেন। শ্রীমাধব পুরীর অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমাদি দেখে পূজারিগণ আশ্চর্য্য হলেন। অতঃপর শ্রীমাধব পুরী পূজারীদের জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রীশ্রীগোপীনাথের ভোগে কি কি লাগে। পূজারীরা বললেন, সন্ধ্যায় দ্বাদশটি অমৃতকেলী (ক্ষীর) ভোগ লাগে। অন্যান্য সময়ের ভোগের বিবরণও দিলেন। শ্রীমাধব পুরী অমৃতকেলীর নাম শুনে চিন্তা করতে লাগলেন, অমৃতকেলীর স্বাদ কি রকম—তা যদি বুঝতে পারি, আমার গোপালকেও ঠিক সে রকম ভোগ দিবার চেষ্টা করতে পারি। কিছুক্ষণ পরে পুরী গোস্বামী

আবার চিন্তা করলেন—আমার অপরাধ হয়েছে! ঠাকুরকে ভোগ দিবার পূর্বেই আমি স্বাদ নিতে চেয়েছি। পুরীগোস্বামী এই সমস্ত কথা ভেবে সেখান থেকে কিছুদূরে এক শূন্য হাটে রাত্রে এসে নাম-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করতে লাগলেন। এদিকে পূজারী ঠাকুর শয়ন দিয়ে নিজের অন্যান্য কৃত্যাদি সেরে শয়ন করলেন। একটু নিদ্রিত হতেই পূজারীকে গোপীনাথ স্বপ্নে বলছেন—"পূজারী! উঠ, আমি আমার বস্ত্রাঞ্চলের আড়ালে একটি ক্ষীর ভান্ড লুকিয়ে রেখেছি। মাধব পুরী নামে এক সন্ন্যাসী শূন্য হাটে বসে নাম করছেন। তাঁকে এই ভান্ড দিয়ে এসো।" পূজারী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে তৎক্ষণাৎ শয্যা থেকে উঠলেন এবং স্নান করে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন শ্রীগোপীনাথের অঞ্চলের নীচে একটি ক্ষীর ভান্ড রয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষীর ভান্ড নিয়ে হাটে এলেন এবং "কোথায় মাধব পুরী!" "কোথায় মাধব পুরী?" বলে খোঁজ করতে লাগলেন। দেখলেন এক সন্ন্যাসী অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগবানের নাম করছেন। পূজারী দেখেই বুঝতে পারলেন, এই সেই মাধব পুরী। তথাপি বললেন—আপনি কি মাধব পুরী? গোপীনাথ আপনার জন্য ক্ষীর পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই ক্ষীর নিয়ে সুখে ভোজন করুন। পুরী গোস্বামী পূজারীর কথা শ্রবণে আশ্চর্য্য হলেন। গোপীনাথ তাঁর জন্য এত রাত্রে ক্ষীর পাঠিয়ে দিয়েছেন। গোপীনাথের কৃপা স্মরণে শ্রীপুরীপাদের নয়ন দিয়ে দর দর ধারে প্রেমাশ্রু পড়তে লাগল। অধমের প্রতি গোপীনাথের এত করুণা! এই কথা বলে বহু যত্ন সহকারে ক্ষীর ভান্ডটি হাতে নিয়ে বারংবার শিরে স্পর্শ করতে লাগলেন। তারপর পূজারী সমস্ত কথা বললেন। শুনে মাধব পুরীর অঙ্গে প্রেমবিকার ও পুলকাদি প্রকাশ পেতে লাগল। পূজারী ব্রাহ্মণটি এ সমস্ত দেখে মনে মনে বলতে লাগলেন এমন ভক্তশিরোমণি পুরুষ ত কখনও দেখিনি। কৃষ্ণ এঁর বশীভূত। পূজারী ব্রাহ্মণটি মাধব পুরীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করে গৃহে ফিরলেন। অতঃপর শ্রীমাধব পুরী শ্রীগোপীনাথের দেওয়া ক্ষীর প্রেমাশ্রু-পূর্ণ নয়নে সানন্দে ভোজন করতে

লাগলেন এবং ভান্ডটি খন্ড খন্ড করে ভেঙ্গে চাদরে বেঁধে নিলেন। প্রতিদিন এক এক টুকরা গ্রহণ করবেন এই আশায়।

শ্রীমাধব পুরী প্রসাদ পাওয়ার পর চিন্তা করলেন, ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিয়েছেন, —একথা শুনে দিনের বেলা আমার কাছে লোকের ভিড় হবে। অতএব এইক্ষণেই এখান থেকে রওনা হওয়া ভাল। পুরী গোস্বামী এই সমস্ত চিন্তা করে সেখান থেকে গোপীনাথকে দন্ডবৎ করে পুরীর দিকে রওনা হলেন। যদ্যপি শ্রীমাধবপুরী প্রতিষ্ঠার ভয়ে পালিয়ে গেলেন, প্রতিষ্ঠা তাঁর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল।

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্মিত।।
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ।।
—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।১৪৬, ১৪৭)

শ্রীমাধব পুরী নীলাচলে এলেন এবং শ্রীজগন্নাথ দর্শন করলেন। পুরীর অঙ্গে তৎকালে কত শত প্রেমবিকার প্রকাশ পেতে লাগল। তাঁর মাহাত্ম্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীমাধব পুরী গোপালের আজ্ঞা স্মরণ করে মলয়জ চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহের জন্য বিশেষ যত্ন করতে লাগলেন। বিশিষ্ট লোক পরম্পরা রাজা একথা শ্রবণ করলেন। ভক্ত রাজা তা শুনেই বড়ই সুখী হলেন। তিনি অমাত্যবর্গকে শীঘ্রই মলয়জ চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করে পুরী গোস্বামীর হাতে দিতে বললেন। পুরী-গোস্বামীর বাসনা পূর্ণ হল। চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করা হল। রাজা চিন্তা করলেন —এত চন্দন ও কর্পূর বৃদ্ধ গোস্বামী কি করে নিয়ে যাবেন? তিনি তাঁর সঙ্গে একটি বলবান সেবক দিলেন এবং রাজ্য সীমাপার হবার জন্য সরকারী কাগজ পত্রাদিও দিলেন।

শ্রীপুরীগোস্বামী পুরী থেকে রওনা হয়ে পুনঃ রেমুনায় এলেন। তথায় শ্রীগোপীনাথকে বহু প্রীতিপুরঃসর দন্ডবৎ স্তুতি প্রভৃতি করতে লাগলেন। পূজারী পুনঃ তাঁকে দেখে খুব আনন্দ সহকারে বন্দনাদি করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন—এঁর জন্যই গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছিলেন। তারপর পূজারী খুব যত্ন সহকারে শ্রীগোপীনাথের ক্ষীর প্রসাদ এনে দিলেন। শ্রীপুরীগোস্বামী অতি ভক্তি সহকারে তা নিয়ে বারংবার বন্দনা করতে করতে ভোজন করলেন এবং রাত্রে দেবালয়ে শয়ন করলেন। একটু তন্দ্রা হলে দেখতে লাগলেন—

"গোপাল আসিয়া কহে,- শুন হে মাধব।
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব।।
কর্পূর সহিত ঘসি, এসব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন।।
গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়।
ইঁহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপ ক্ষয়।।
দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি, চন্দন দেহ আমার বচনে।।"

—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।১৫৮-১৬১)

শ্রীগোপাল বলছেন—মাধব! শুন কর্পূর চন্দন আমি সব পেয়েছি। এ সমস্ত কর্পূর চন্দন ঘসে তুমি গোপীনাথের অঙ্গে লাগাও। তাতেই আমার অঙ্গতাপ নিবৃত্ত হবে। গোপীনাথ ও আমাতে কিছু ভেদ বুদ্ধি করো না। গোপীনাথের ও আমার অঙ্গ অভিন্ন। তুমি এতে দ্বিধা করো না। বিশ্বাস করে গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লাগাও। এই কথা বলে গোপাল অন্তর্হিত হলেন। মাধব পুরীও জেগে উঠলেন। স্বপ্নের কথা চিন্তা করে তিনি আনন্দে বিভোর হলেন। তারপর পূজারীগণকে ডেকে শ্রীগোপালদেবের আজ্ঞা জানিয়ে

শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন কর্পূর লেপন করতে বললেন। গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ অঙ্গে চন্দন ধারণ করবেন শুনে পূজারীগণ আনন্দে বিহ্বল হলেন। সমস্ত ব্যবস্থা হল। চারজন লোক চন্দন ঘসতে লাগলেন। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন দেওয়া হ'চ্ছে দেখে শ্রীপুরী গোস্বামীর আর আনন্দের সীমা রইল না। অনন্তর শ্রীপুরী-গোস্বামী গ্রীষ্মকাল অতীত করে তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন।

"জয় জয় শ্রীমাধব পুরী।
গোপীনাথ যাঁর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি"।।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে কৃষ্ণ-প্রেমকল্পবৃক্ষের মূল বলেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন বাল্যলীলাদি করছেন, তখন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর সাক্ষাৎ মিলনের কোন প্রসঙ্গ নাই। তবে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর মিলনের কথা বর্ণন করেছেন।

"মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ।।
নিত্যানন্দে দেখি, মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই আপনা পাসরি।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৫৯)

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আরও বলেছেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীকে গুরু বুদ্ধি করে সেবাদি করতেন।

শ্রীমাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ ৯।১৮৮)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে কিছুদিন তীর্থ ভ্রমণাদিও করেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পেয়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী কত সুখী হয়েছিলেন, তা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই ভাবে বলেছেন—

"জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি।।
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদি-ময়।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৮৩)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিছুদিন শ্রীমাধব পুরীর সঙ্গে থাকার পর বৃন্দাবনে চলে আসেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীও দক্ষিণদেশে তীর্থভ্রমণে চলে যান। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীরঙ্গপুরী ও পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ প্রায় সময় থাকতেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী অপ্রকট কালে এই শ্লোকটী উচ্চারণ করেন।—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।"
—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।১৯৭)

গৌড়ীয়গণ এই শ্লোকটিকে বিপ্রলম্ভ রসের সার স্বরূপ মনে করেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই শ্লোক স্মরণ মাত্রই প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। ইনি বাহ্যতঃ দশনামী শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষের মূল। ভগবান্ ধরাতলে অবতীর্ণ হবার পূর্ব্বেই এই সমস্ত

প্রেমিক পরিকরগণকে আবির্ভূত করিয়েছিলেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর জাগতিক কোন জাতি-বংশাদির কিছুমাত্র আলোচনা করেন নাই। তজ্জন্য সে সমস্ত বিষয় অজ্ঞাত। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী সুদীর্ঘকাল ধরাতলে অবস্থান করে প্রেম ভক্তি বিতরণ করেন। তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করতেন। তিনি বহুলোককে কৃপা করেছেন। তাঁর কৃপা-পাত্রগণের পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া না গেলেও মুখ্য মুখ্য কিছু সন্ন্যাসী ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীপুন্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীরঙ্গ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী, শ্রীরামচন্দ্র পুরী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় ও শ্রীসুখানন্দ পুরী ইত্যাদি।

অতঃপর শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরকৃত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রশস্তি কীর্তন করে এইখানে প্রবন্ধ শেষ করলাম।

"মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর।।
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার"।।

— (শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৫৫-১৫৬)

—— o ——

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ।।
— (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১।১২)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদবর আদি কবি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের মহিমা এইভাবে বর্ণন করেছেন—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
'অদ্বৈত আচার্য্য' নাম সর্ব-লোকে ধন্য।।
জ্ঞান-ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর।।
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বত্র-বাখানে, কৃষ্ণপদভক্তি সার।।
তুলসী মঞ্জরী-সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহা-কুতূহলে।।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মান্ড ভেদি, বৈকুণ্ঠেতে বাজে।।
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তিরসে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ।।
— (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ২।৭৮-৮৩)

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মহামহিমাযুক্ত অখিল ব্রহ্মান্ড-নাথ শ্রীকৃষ্ণকে

ভক্তিযোগে প্রকট করেছেন। এর থেকে বড় মহিমা আর কি হতে পারে? শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য সর্ব গুরু ঈশ্বর থেকে অভিন্ন এবং স্বয়ং কৃষ্ণ ভজন শিক্ষার আচার্য্য। যে মহাবিষ্ণু মায়ার দ্বারা এই জগতকে প্রথমে সৃষ্টি করেন, সেই মহাবিষ্ণুর অবতার এই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পিতা শ্রীকুবের মিশ্র, মাতা শ্রীমতী নাভাদেবী। এঁরা পূর্ব্বে শ্রীহট্টে বাস করতেন। শ্রীকুবের পন্ডিত বহুকাল অপুত্রক ছিলেন। প্রায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই পুত্ররত্ন লাভ করেন। শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে নবগ্রাম নামক স্থানে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের জন্ম হয়। মাঘ শুক্ল সপ্তমী তাঁর পবিত্র জন্ম দিন।

তথাহি গীত

মাঘ শুক্লাতিথি, সপ্তমীতে অতি,
উথলয়ে মহা আনন্দ সিন্ধু।
নাভাগর্ভ ধন্য করি অবতীর্ণ
হৈল শুভক্ষণে অদ্বৈত-ইন্দু।।
কুবের পন্ডিত হৈয়া হরষিত
নানা দান দ্বিজ দরিদ্রে দিয়া।
সূতিকা মন্দিরে গিয়া ধীরে ধীরে
দেখি পুত্র মুখ জুড়ায় হিয়া।।
নবগ্রামবাসী, লোক ধা'য়া আসি
পরস্পর কহে না দেখি হেন।
কিবা পুণ্যফলে, মিশ্র বৃদ্ধ কালে
পাইলেন পুত্ররতন যেন।।
পুষ্প বরিষণ, করে সুরগণ,
অলক্ষিত রীতি উপমা নহ।

জয় জয় ধ্বনি ভরল অবনী
ভনে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহু।।
—(শ্রীভক্তি রত্নাকর ১২।১৭৫৯)

অতঃপর শ্রীকুবের পন্ডিত গঙ্গাতীরে বাস করবার উদ্দেশ্যে পুত্রকে নিয়ে শান্তিপুরে চলে আসেন এবং গঙ্গাতটে বসবাস করতে থাকেন। পুত্রের নামকরণ করলেন "মঙ্গল।" আর এক নাম রাখলেন "কমলাক্ষ"। কুবের পন্ডিত অতি যত্নের সঙ্গে পুত্রকে লালন-পালন করতে লাগলেন। অল্পবয়সে যজ্ঞোপবীত দিলেন। কিছুদিন উপাধ্যায়ের নিকট পড়ালেন। পরে কুবের পন্ডিত স্বয়ং পুত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। কিছুদিন পরে কুবের পন্ডিত পত্নীর সঙ্গে পরলোক গমন করেন। পিতা-মাতার অদর্শনে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য বড়ই দুঃখিত হন। তিনি পিতা মাতার কার্য্যের জন্য গয়াতীর্থে গমন করেন এবং কিছুদিন অন্যান্য তীর্থও পর্য্যটন করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু তীর্থ ভ্রমণ করে স্বদেশে ফিরে এলে বন্ধু বান্ধবগণের একান্ত ইচ্ছা হল যে তিনি বিবাহ করেন। তাঁদের ইচ্ছানুসারে তিনি বিবাহ করতে রাজি হলেন। শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ী নামে এক পরমধর্মনিষ্ঠ ধনবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর 'শ্রী' ও 'সীতা' নামে দুই পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সেই দুই কন্যারই পাণি গ্রহণ করলেন। ভাদুড়ী মহাশয় কন্যা জামাতাকে বহু যৌতুকাদি দান করলেন। 'সীতা' ঠাকুরাণী সাক্ষাৎ যোগমায়ার অবতার এবং 'শ্রী' দেবী যোগমায়ার প্রকাশ স্বরূপিণী। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার। তাঁর মধ্যে গোলোকস্থ সদাশিবের প্রকাশ রয়েছে।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ কথারসে দিন যাপন করবার জন্য শ্রীমায়াপুরে একটি বসত বাটী নির্মাণ করলেন। শ্রীআচার্য্য প্রতিদিন ভক্তসভায় গীতা ভাগবত অধ্যয়ন করতেন। কলির জীবের দুর্গতি দেখে তাদের নিস্তারের জন্য তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করতেন।

ভক্তের আহ্বান ভগবান শুনেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের আহ্বান ভগবান শুনলেন। তিনি শীঘ্রই কলির জীবের উদ্ধারের জন্য নদীয়াপুরে শ্রীমিশ্র-গৃহে অবতীর্ণ হলেন। শান্তিপুর থেকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ভক্তিবলে তা সমস্ত বুঝতে পারলেন। তিনি প্রথমে সীতা ঠাকুরাণীকে মায়াপুরে মিশ্রগৃহে প্রেরণ করলেন এবং পরে স্বয়ং এলেন।

" দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত।।"

—(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১৩।১১৫)

সাক্ষাৎ সেই গোকুলের হরি। কেবল বর্ণটি বিপরীত— গৌরবর্ণ। আচার্য্যের আনন্দের সীমা রইল না। বুঝতে পারলেন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। অনন্তর শ্রীগৌরসুন্দর ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে আহ্বান করলেন এবং তাঁর মনোবাঞ্ছিত রূপ সকল দেখতে বললেন।

যে পূজার সময় যে দেব ধ্যান করে।
তাহা দেখে চারিদিগে চরণের তলে।।

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৬।৮৬)

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য পূজার সময় যে যে দেবতার ধ্যান করতেন সে সে দেবতা শ্রীগৌর-সুন্দরের চরণ তলে স্তুতি করছেন দেখতে পেলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য এই সমস্ত দেখে প্রেমানন্দে দুই বাহু তুলে বলতে লাগলেনঃ—

আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল হৈল যত অভিলাষ।।
আজি মোর জন্ম কর্ম সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিলু তোর চরণযুগল।।

ঘোষে মাত্র চারিবেদে যাঁরে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেকে।।

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৬।১০০)

অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীআচার্য্যকে করুণা করে বললেন— আচার্য্য। আমার পূজা কর। তখন শ্রীআচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ যুগলে পূজা করতে লাগলেন।

প্রথমে চরণ ধুই' সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্ম ঢালে।।
চন্দনে ডুবাই' দিব্য তুলসীমঞ্জরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ-উপরি।।
গন্ধ, পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ-উপাচারে।
পূজা করে প্রেমজলে বহে অশ্রুধারে।।
পঞ্চশিখা জ্বালি পুনঃ করেন বন্দনা।
শেষে 'জয় জয়' ধ্বনি করেন ঘোষণা।।

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৬।১০৯)

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শাস্ত্রবিধানে এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মযুগল পূজাদি করে শেষে স্তুতি করতে লাগলেন ঃ—

জয় জয় সর্ব্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর।।
জয় জয় ভকতবচন সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী।।
জয় জয় সিন্ধুসুতা রূপ-মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ বিভূষণ।।

জয় জয় 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজ-ভক্তি গ্রহণ বিলাস।।
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্বজীবের শরণ।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৬।১১৪-১১৮)

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর এইরূপ স্তুতি শুনে শ্রীগৌরসুন্দর সহাস্য বদনে বললেন, হে আচার্য্য! তোমার স্তুতিতে আমি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি ইচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ কর। তখন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য বললেন ঃ—

অদ্বৈত বলয়ে,—যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী,-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৬।১৬৭)

হে ঠাকুর। যদি ভক্তিধন বিতরণ কর, মূর্খ, স্ত্রী ও শূদ্রাদিকে ভক্তি ধন দিও। আমি এই বর তোমার কাছে চাই। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর এবম্বিধ বর প্রার্থনার কথা শুনে চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ হরি হরি ধ্বনি করতে লাগলেন।

করুণাময় শ্রীগৌরহরি ভক্তবাক্য সত্য করবার জন্য জগতে দীন, হীন, পাপী ও পাষণ্ডী প্রভৃতিকেও ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দান করলেন।

জয় করুণাময় শান্তিপুরপতি শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুকী জয়।

তথাহি গীত

জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য দয়াময়।
যাঁর হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়।।
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর।
যাঁর প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গসুন্দর।।

যাহারে করুণা করি, কৃপাদিঠে চায়।
প্রেমরসে সে জন চৈতন্য গুণগায়।।
তাঁহার চরণে যেবা লইল শরণ।
সে-জন পাইলা গৌর-প্রেম মহাধন।।
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলুঁ।।

(পদকল্পতরু)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নিজ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বহু নামে অভিহিত করেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত, শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র,নিত্যানন্দ প্রভু, নিত্যানন্দ মহামহেশ্বর, নিত্যানন্দ সিংহ, নিত্যানন্দ মহামল্ল, অবধূত চন্দ্র, অবধূত রায় ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ ইত্যাদি।

শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য ; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ যাঁকে আত্মসাৎ করেন নাই, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁকে কখনই কৃপা করেন না। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন।

সংসারের পার হই, ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে।।
বৈষ্ণব-চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে-জন্মে প্রভু বলরাম।।

—(চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৭৭-৭৮)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলদেবাভিন্ন বিগ্রহ। শ্রীবৃন্দাবন দাস এভাবে নিজ ইষ্ট দেবের বন্দনা করেছেন —

ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।।
সহস্রবদন বন্দো প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্র-মুখে কৃষ্ণযশোধাম।।

মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে।
যশোরত্ন ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত বদনে।।
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য কীর্ত্তন।।
সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল-উদ্দাম।।

—(চৈঃ ভাঃ আদি ১।১১-১৫)

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচরণানুস্মরণে এরূপ বর্ণনা করেছেন—

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম।।
একই স্বরূপ-দোঁহে, ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায়।।
সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।।

— (চৈঃ চঃ আদি ৫।৪-৬)

এখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এরূপ বর্ণনা করেছেন—

ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম।।
মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভদিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা-নাম গ্রামে।।

হাড়াইপণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তানে করে পিতা ব্যাজ।।
—(চৈঃ ভাঃ আদি ২।১২৮-১৩০)

রাঢ় দেশ, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। একচাকা গ্রাম রাঢ় পরগণার মধ্যে। ই, আই, আর লুপ লাইনে মল্লারপুর ষ্টেশন হ'তে প্রায় চারি ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে একচাকা গ্রাম, বর্ত্তমান ঐ গ্রামের নাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রের নামে বীরচন্দ্রপুর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু একচাকা গ্রামে অবতীর্ণ হন। পিতার নাম শ্রীহাড়াই পণ্ডিত বা শ্রীহাড়ো ওঝা। ইনি মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন, উপাধ্যায় কৌলিক উপাধির অপভ্রংশই ওঝাঁ বা ঝাঁ। মাতার নাম শ্রীপদ্মাবতী দেবী। ব্রাহ্মণ দম্পতি নিত্য ভগবদ্ আরাধনার ও বৈষ্ণব সেবার ফলে, আদি বৈষ্ণব ধাম শ্রীঅনন্ত স্বয়ং পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবে সমস্ত রাঢ় দেশে সর্ব্ব সুমঙ্গল অভ্যুদয় লক্ষিত হয়েছিল। দ্বাপর যুগে যেমন শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তেমনি কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের বড় ভ্রাতা রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যখন শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপ মায়াপুরে তের বৎসর পরে আবির্ভূত হলেন, তখন অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর আবির্ভাব জানতে পেরে আনন্দে মহা হুঙ্কার ধ্বনি করে উঠলেন। ঐ হুঙ্কার ধ্বনি শুনে দেশবাসী জনসাধারণ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করেছিলেন। কেহ বললেন বজ্রপাত হয়েছে, কেহ বললেন রাঢ় দেশে মৌড়েশ্বর নামক যে শিব আছেন তিনি হুঙ্কার করে উঠেছেন, কেহ বললেন ভগবান্ গর্জ্জন করেছেন, এরূপ অনেক লোক অনেক রূপ কথা বললেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁর ইষ্টদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম লীলা, শৈশব লীলা, পৌগণ্ড লীলা, কৈশোর লীলা ও যৌবন লীলাদি দিব্যাতি দিব্য

লোকাতীত অলৌকিক স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের যাবতীয় লীলা লৌকিক ভাবের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাবের কথা বলেছেন। এরূপে দুই প্রভুর লীলার মাধুর্য্য তিনি আস্বাদন করেছেন।

শ্রীনিত্যানন্দের শৈশব লীলা অলৌকিক দিব্য ভাবাবেশে শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধুর বাল্য লীলাদির অভিনয়ের কথা বর্ণনা করেছেন। জগৎ মধ্যবর্ত্তী শিশুগণের যে ধর্ম— ভোজনার্থে বার বার ক্রন্দন চাঞ্চলতা ভয় ভীতি স্বভাব ও বস্তুর অপচয় প্রভৃতি ধর্ম্মের কথা নিত্যানন্দ চরিতে বলেন নাই, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের চরিতে বিশেষ ভাবে বলেছেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের অলৌকিক শৈশব লীলা এরূপ বর্ণনা করেছেন—

শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে।।
দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে।।
তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী তীরে যায়।
শিশুগণ মেলি' স্তুতি করে ঊর্দ্ধ রায়।।
কোন শিশু লুকাইয়া ঊর্দ্ধ করি' বোলে।
জন্মিবাঙ্ গিয়া আমি মথুরা-গোকুলে।।
কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব দেবকীর করায়েন বিয়া।।
বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন কেহ নাহি জাগে।।
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে।।

কোন শিশু সাজায়েন পূতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি' তার বুকে।। ইত্যাদি।।

আবার রামলীলা অভিনয় করছেন —

কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে।।
ভেরেন্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মিলি জয় রঘুনাথ, বলে।।
শ্রীলক্ষ্মণ রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে।।
আরেরে বানরা মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয়।।
মাল্যবান্ পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর সুখ।।
কোনদিন ক্রুদ্ধ হৈয়া পরশুরামেরে।
মোর দোষ নাহি বিপ্র পলাহ সত্বরে।।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক।।

* * *

ইন্দ্রজিৎ বধ লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্মণ ভাবে হারে।।
বিভীষণ করিয়া আনেন রাম স্থানে।
লঙ্কেশ্বর অভিষেক করেন তাহানে।।
কোন শিশু বোলে, মুঞি আইলুঁ রাবণ।
শক্তি শেল হানি এহ সম্বর লক্ষণ।।

এত বলি পদ্ম পুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢলিয়া।।
— (চৈঃ ভাঃ আদি নবম অধ্যায়)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এভাবে যখন মূর্চ্ছা গেলেন তখন সঙ্গের শিশুগণ তাকে জাগানোর চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু যেন তিনি প্রাণ শূন্য ভাবে পড়ে রইলেন, তা দেখে শিশুগণ এবার ভীত হয়ে শীঘ্র তথায় ছুটে এলেন, দেখলেন সত্য সত্যই যেন প্রাণশূন্য নিত্যানন্দ। কেহ বললেন শিশু ভাবাবিষ্ট হয়েছে, কেহ বললেন অভিনয় করছে, হনুমান ঔষধ দিলে ভাল হবে। তখন কোন শিশু হনুমানের ভাবে শীঘ্র ঔষধ নিয়ে এলেন। এক শিশু বৈদ্য বেশে সেই আনীত বৃক্ষলতার রস নিঙ্গড়াইয়া নিত্যানন্দের নাসাতে দিলেন। তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্য লাভ করে উঠে বসলেন, সকলে অবাক হয়ে গেলেন, বললেন আমরা কখন এরূপ খেলা দেখিনি। সকলে তখন জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এরূপ খেলা কোথায় শিখলে। নিত্যানন্দ বললেন —আমার এ সকল লীলা অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ লীলা। কেহই কিন্তু নিত্যানন্দের যথার্থ স্বরূপ জানতে পারলেন না। "চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণুমায়াবশে" এরূপ ভাবে নিত্যানন্দ প্রভু শৈশব ও পৌগন্ড অতিক্রম করে কৈশোর বয়সে পদার্পণ করলেন। তখন তাঁর বয়স বার বৎসর।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীহাড়াই ও পদ্মাবতীর একমাত্র নয়নমণি ও প্রাণ ছিলেন। মাতা পিতা নিত্যানন্দকে একক্ষণ না দেখলে থাকতে পারতেন না। হাড়াই পন্ডিত সর্ব্ববিধ কার্য্যের মধ্যে থাকলেও প্রাণটি নিত্যানন্দের প্রতি পড়ে থাকত।

একদিন এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হাড়াই পন্ডিতের ঘরে অতিথি হলেন। হাড়াই পন্ডিত সন্ন্যাসীকে খুব যত্নে সেবা করতে লাগলেন। রাত্রিকালেও সন্ন্যাসী হাড়াই পন্ডিতের ঘরে অবস্থান করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসীকে

পেয়ে আনন্দে বিভোর হলেন। সমস্ত রাত্রি সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় যাপন করলেন। নিত্যানন্দের সর্বাকর্ষণ স্বভাবে সন্ন্যাসী পরমাকৃষ্ট হলেন। নিত্যানন্দের সঙ্গ ত্যাগ করতে আর ইচ্ছা করলেন না। প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী বিদায় নিতে উন্মুখ হয়ে মনের গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন ; ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কাছে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা চাইলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসীর কথা শুনে বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় যেন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন, কি নিদারুণ কথা, একমাত্র প্রাণের প্রাণস্বরূপ পুত্র নিত্যানন্দকে ভিক্ষা দিতে হবে। পরিশেষে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক বিচার করলেন, পূর্ব্বাকালে মহারাজ দশরথ যেমন বিশ্বামিত্রের হাতে রাম লক্ষ্মণকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন, সেইরূপ আজ এ সন্ন্যাসীর হাতে নিত্যানন্দকে সমর্পণ করব, নতুবা আমাদের পরম অধর্ম হবে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ক্রন্দন করতে করতে নিত্যানন্দকে অর্পণ করলেন। অতীব অনুনয়ের সংগে বললেন আমাদের একমাত্র প্রাণটিকে আপনাকে দিলাম। আপনি সর্ব্বতোভাবে এঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। সন্ন্যাসীর সংগে শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থ ভ্রমণে চললেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদি খণ্ডের নবম অধ্যায়ে নিত্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণ কথাটি বিস্তৃত ভাবে আছে।

পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ কালে নিত্যানন্দ প্রভুর সংগে অকস্মাৎ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের দর্শনে উভয়ের হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র যেন উথলে উঠল। উভয়ের অপূর্ব্ব প্রেমাবেশ দর্শনে ঈশ্বর পুরী প্রভৃতি শিষ্যগণ বিস্মিত হলেন। নিত্যানন্দপ্রভুকে পেয়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ আনন্দে এরূপ বলেছিলেন।

প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্ব তীর্থ, হেন প্রেম যথা।।
জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি।।

যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদি-ময়।।
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে।।
—(চৈঃ ভাঃ আদিঃ ৯।১৮২-১৮৫)

কিছুদিন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে পরম সুখে কৃষ্ণালাপনে অতিবাহিত করলেন। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেতুবন্ধাদি তীর্থ দর্শনে চললেন। ক্রমে তিনি ধনুস্তীর্থ, বিজয় নগর, অবন্তি দেশ ও গোদাবরী প্রভৃতি দর্শন করে পুরী ধামে এলেন। শ্রীজগন্নাথ দর্শনে অতীব প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য গীতাদি করলেন। কয়েক দিবস তথায় অবস্থানের পর তিনি গঙ্গাসাগর তীর্থে আগমন করলেন। এখান হতে শ্রীব্রজমন্ডলে আগমন করলেন। শ্রীব্রজ ধামে আগমনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এক অপূর্ব্ব প্রেমাবস্থা প্রাপ্ত হলেন।

নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা-রাতি।।
আহার নাহিক, কদাচিৎ দুগ্ধ-পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান।।
— (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।২০৫-২০৬)

যখন বৃন্দাবনে শ্রীনিত্যানন্দ এরূপ ভাবাবেশে অবস্থান করছিলেন তখন এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যা বিলাসাদি সমাপ্ত করে গয়া ধামে পিতৃ কর্ম সমাপনানন্তর শ্রীঈশ্বর পুরীকে তথায় পেয়ে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এবার ভাগবত ধর্ম প্রচারের জন্য ও জীব কুলের উদ্ধারের জন্য তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন এবং নিরন্তর ভক্তগণ সঙ্গে প্রেম রসাস্বাদন করতে

লাগলেন। শ্রীবাস পন্ডিতের ভবন হল তাঁর সংকীর্ত্তন সদন।

তিনি ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমারসাস্বাদন করছেন। কিন্তু সাধারণ অন্য কোন জীবকে দিচ্ছেন না, যেন কারও প্রতীক্ষায় তিনি আছেন। কে জানে, তাঁর সেই গূঢ় অভিপ্রায়। নিত্যানন্দ হবেন প্রেমধন বিতরণের প্রধান সহায়ক, তাই যেন গৌরসুন্দর তাঁর প্রতীক্ষা করছেন।

এদিকে বৃন্দাবনে নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে কৃষ্ণানুসন্ধান করছেন, সব মন্দিরে সিংহাসন যেন শূন্য, কৃষ্ণ নাই; কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ! বলে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করতে করতে যেন শেষে দৈব বাণীতে শুনলেন—তিনি এখন নদীয়াতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং সংকীর্ত্তন বিলাস করছেন। তুমি তথায় যাও। একথা শুনে নিত্যানন্দ চললেন ব্রজমন্ডল থেকে গৌড় মন্ডল অভিমুখে। কোনদিন অযাচিত ভাবে কোথায় একটু দুগ্ধ পান নহেত উপবাস। এভাবে শীঘ্রই গৌড়দেশে নবদ্বীপে আগমন করলেন। নবদ্বীপে মায়াপুরে শ্রীনন্দন আচার্য্য নামক এক পরম মহাভাগবত বাস করতেন গঙ্গাতটে, অকস্মাৎ শ্রীনিত্যানন্দ তাঁর গৃহে উপস্থিত হলেন। শ্রীনন্দন আচার্য্য আজানুলম্বিত সেই পুরুষ রতনকে দর্শন করে ভক্তি ভরে দন্ডবন্নতি পূর্ব্বক পূজাদি করলেন এবং ভিক্ষা করিয়ে গৃহেতে রাখলেন।

এদিকে অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তা জানতে পেরে অন্তরে অন্তরে শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সত্বর প্রাতেঃ শ্রীবাস অঙ্গনে আগমন করলেন। ক্রমে ভক্তগণ আগমন করতে লাগলেন। সকলেই প্রভুর চারিদিকে উপবেশন করলেন, এমন সময় মহাপ্রভু ভঙ্গিপূর্ব্বক বলতে লাগলেন—আমি আজ শেষ রাত্রে এক সুস্বপ্ন দেখেছি, শেষ রজনীর স্বপ্ন প্রায় মিথ্যা হয় না। সে কথা শুনে ভক্তগণ অপূর্ব্ব স্বপ্ন কথা শুনতে উৎসুক হলেন। তখন মহাপ্রভু বলতে লাগলেন —এক তালধ্বজ রথ যেন আমার গৃহ দ্বারে উপনীত হল, সে রথের মধ্যে এক বিশালকায় মহাপুরুষ

তার স্কন্ধে হল ও মূষল আছে। তিনি নীল বসন পরিহিত তার বাম হাতে বেত্র নির্মিত কমন্ডলু। তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করছেন—এ বাড়ী কি নিমাই পন্ডিতের ? এ বাড়ী কি নিমাই পন্ডিতের ? আমি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন আমি তোমার ভাই। আগামী কল্য পরস্পর পরিচয় হবে। তাঁর কথা শুনে আমার বড়ই আনন্দ হল, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, নিশা শেষ হল। এ কথা বলতে বলতে মহাপ্রভু এক দিব্য ভাবে বিভোর হলেন। কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকার পর বাহ্য দশা প্রাপ্ত হলেন এবং হরিদাস ঠাকুর শ্রীবাস পন্ডিত প্রভৃতির স্থানে বলতে লাগলেন আমার মনে হয় এ নবদ্বীপ পুরে নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ আগমন করেছেন আপনারা তাঁকে অনুসন্ধান করুন। প্রভুর এ আজ্ঞা পেয়ে ভক্তগণ স্বপ্ন দৃষ্ট পুরুষের সন্ধানে বের হলেন এবং চতুর্দিকে সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও সন্ধান পেলেন না, ফিরে এলেন প্রভুর কাছে। প্রভু বললেন স্বপ্ন কথা মিথ্যা নয় নিশ্চয়ই কোন স্থানে আছে, এবার প্রভু স্বয়ং অনুসন্ধান করতে চললেন। ভক্তগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। মহাপ্রভু সোজাসুজি ঠিক শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হলেন। দেখলেন শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহ-বারান্দায় দিব্য আসনে এক মহাপুরুষ রতন ধ্যানাবিষ্ট ভাবে উপবিষ্ট আছেন। সকলে অবাক মহাপ্রভু বহুকাল পরে প্রাণের প্রিয়তম জনকে দর্শন করে কিছুক্ষণ অপলক নয়নে দাঁড়িয়ে রইলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও প্রাণের দেবতাকে দীর্ঘকাল পরে দেখে পলকশূন্য ভাবে দেখতে লাগলেন কি আশ্চর্য্য মিলন নয়নে নয়নে যেন দুঁহে দুহুঁার রূপ পানে বিভোর। এমন সময় শ্রীবাস পন্ডিত ভাগবতের একটি শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনাত্মক শ্লোক সুস্বরে গান আরম্ভ করলেন। তা শুনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমে হুঙ্কার পূর্ব্বক ধরাতলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন ; তার নয়ন জলে ভূতল সিক্ত হতে লাগল। সেই প্রেম দর্শনে শ্রীগৌরসুন্দর আর স্থির থাকতে পারলেন না; তিনিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে প্রেমাশ্রুপাত করতে করতে নিত্যানন্দকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কোলে তুলে নিলেন। সে কি মধুর মিলন দৃশ্য, দুঁহার নয়ন

জলে দুই জন সিক্ত হচ্ছেন ; ভক্তগণ তৎকালে ঘন ঘন হরি ধ্বনি করতে লাগলেন। আজ শ্রীগৌর নিত্যানন্দের মিলন হল।

তারপর মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে নিয়ে ভক্তগণ সঙ্গে মহানন্দে শ্রীবাস অঙ্গনে আগমন করলেন এবং কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করবার পর মহাপ্রভু নির্দেশ দিলেন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস স্থানে অবস্থান করবেন।

শ্রীবাস পন্ডিত প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে লাগলেন। শ্রীবাসের মালিনী দেবীকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জননীর ন্যায় ভাবতেন। মালিনী দেবীও নিত্যানন্দ প্রভুকে পুত্র প্রায় সেবা করতেন। একদিন এক অপূর্ব্ব ঘটনা হল। মালিনী দেবী ভগবদ্ অর্চ্চনের বাসন সমূহ মার্জ্জন করছেন এমন সময় এক কাক উড়ে এসে ঠাকুরের ঘৃত বাটীটি নিয়ে গেল। মালিনী দেবী হায় হায় করে উঠলেন এবং অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। সে দুঃখ শ্রবণে নিত্যানন্দ প্রভু তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত কারণ অবগত হলেন। তখন মালিনী দেবীকে বললেন মা! তুমি দুঃখ করনা আমি এক্ষণে ঐ বাটী এনে দেব এ কথা বলে তিনি কাককে আহ্বান করে বললেন রে কাক তুই শীঘ্র করে ঠাকুরের ঘৃত বাটীটি এনে দে। নিত্যানন্দ-আদেশে কাকটি শীঘ্রই ঘৃত বাটীটি কোথা হতে এনে দিয়ে উড়ে গেল, সকলে দেখে অবাক। যে নিত্যানন্দ প্রভু ত্রিলোকের অধীশ্বর তার পক্ষে অসম্ভব কি?

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন হে শ্রীপাদ! কাল পূর্ণিমা তিথি ব্যাসপূজা দিবস। তুমি কোথায় শ্রীব্যাস পূজা করবে? তখন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের হাত ধরে বললেন, এ বামনের ঘরে। শ্রীবাস পন্ডিত ব্যাস পূজা মহোৎসবের সব আয়োজন করলেন। অধিবাস দিবসে সুসজ্জিত ব্যাস পূজা মন্ডপে প্রাতঃকাল থেকেই কীর্ত্তন আরম্ভ হল। নিয়ম করা হল ভক্ত ব্যতীত অঙ্গনে অন্য কোন লোক প্রবেশ

করতে পারবে না। আরম্ভ হল গৌর নিত্যানন্দ দুই ভাইয়ের মহানৃত্য সংকীর্ত্তন। আজ গোলোকের হরি ভূলোকে নেমেছেন যুগধর্ম নাম সংকীর্ত্তন এবং স্বীয় ভক্তিরস মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য। মধ্যাহ্ন কালে বিশ্রাম করলেন, পুনঃ সন্ধ্যাকাল হতে মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হল প্রায় মধ্য রাত্র পর্য্যন্ত নৃত্য সংকীর্ত্তন চলল। ভক্তগণ নিজ নিজ ভবনে চলে গেলেন মহাপ্রভু নিজ ভবনে এলেন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে আছেন। কিছুরাত্র পরে শ্রীনিত্যানন্দ মহাভাবাবেশে হুঙ্কার করে উঠলেন এবং নিজ দন্ডটি ভেঙ্গে ফেললেন ও কমন্ডলুটি দূরে ফেললেন। পরদিবস প্রাতেঃ সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু শীঘ্র শ্রীবাস অঙ্গনে এলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহাভাবাবেশের কথা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি সেই ভাঙ্গা দন্ডটি ও কমন্ডলু নিয়ে গঙ্গামধ্যে বিসর্জ্জন করলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের কাছে জানালেন শ্রীনিত্যানন্দ মহাভাগবত নিত্যসিদ্ধ জন তার পক্ষে ত্রিগুণাত্মক বেদের নির্মিত বর্ণাশ্রম চিহ্নাদি রক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নাই। নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু গঙ্গা স্নানাদি করে শ্রীবাস অঙ্গনে ফিরে এলেন। শ্রীবাস পন্ডিত দুই প্রভুকে নব বস্ত্রাদি পরিধান করতে দিলেন। আজ ব্যাস পূজা দিবস ভক্তগণ মহা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ মধুর বাদন হ'তে লাগল। শ্রীবাস অঙ্গনে যেন স্বয়ং আনন্দ মূর্তিমান অবতীর্ণ হয়েছেন, গগন, পবন, দ্যুলোক, ভুলোক ও গোলোক সেই আনন্দ সিন্ধুর হিল্লোলে নৃত্য করছে। সকলেই সুখসিন্ধু সাগরে ডুবে গেছেন।

এদিকে শ্রীবাস পন্ডিত প্রভুর ইঙ্গিতে একটি দিব্য সুগন্ধি মালা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হাতে দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সে মালাটি হাতে নিয়ে আনন্দে বিভোর চিত্তে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তারপর মহাপ্রভু বললেন শ্রীপাদ মালাটি ব্যাসের কণ্ঠে দিয়ে ব্যাস পূজা সুসম্পন্ন করুন। প্রভুর কথা শুনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হাস্য করতে করতে মালাটি শ্রীগৌরসুন্দরের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন, তখন চতুর্দিকে ভক্তগণ মহা হরিধ্বনি করে উঠলেন।

আকাশ থেকে দেবগণ ও দেবীগণ আনন্দে নৃত্য গীত সহ যেন পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন। এবার শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়ভুজ দর্শন করালেন। নিত্যানন্দ প্রভু সে দিব্য স্বরূপ দর্শনে আনন্দে প্রেম মূর্চ্ছা গেলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, শ্রীপাদ তুমি স্থির হও, যে সংকীর্ত্তন প্রচারের জন্য তুমি অবতীর্ণ হয়েছ তা সিদ্ধ হল। তুমি প্রেমভক্তি ধনের ভান্ডারী; তাহতে তুমি যদি লোককে কিছু দাও তবেই তারা প্রেম লাভ করতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাহ্য দশা লাভ করে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন মহাপ্রভু সকলকে বললেন— আজ ব্যাস পূজা পূর্ণ হল; তোমরা সকলে হরি কীর্ত্তন কর। একথা বলে দুই ভাই নৃত্য করতে লাগলেন, চারিদিকে ভক্তগণ কীর্ত্তন করতে লাগলেন। মালিনীদেবীর সঙ্গে শ্রীশচী মাতা নিভৃতে বসে এ সকল লীলা দর্শন করতে লাগলেন। সংকীর্ত্তন অন্তে শ্রীব্যাস পূজার প্রসাদ শ্রীবাস পন্ডিত সমস্ত ভক্তগণকে বিতরণ করলেন।

শ্রীব্যাস পূজার পর একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পন্ডিতের ভ্রাতা শ্রীরাম পন্ডিতকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট প্রেরণ করলেন। শ্রীরাম পন্ডিত অদ্বৈত আচার্য্য ভবনে এলেন এবং নিত্যানন্দের আগমন বার্ত্তা বললেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শীঘ্রই শ্রীগৌরসুন্দর ও নিত্যানন্দের শ্রীচরণ দর্শনে চললেন। শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বৈত আচার্য্যের মনোগত যেসব সঙ্কল্প তা বলতে লাগলেন। তচ্ছ্রবণে আনন্দে শ্রীগৌর-পাদপদ্ম-যুগল মহার্চ্চন করলেন। অনন্তর মহাপ্রভু ভগবদ্ মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিষ্ণু খট্টায় উপবেশন করলেন; নিত্যানন্দ প্রভু শিরে ছত্র ধারণ করলেন, অদ্বৈত প্রভু স্তুতি পাঠ করতে লাগলেন, গদাধর পন্ডিত তাম্বুল প্রদান ও শ্রীবাস চামর ব্যজন প্রভৃতি এরূপ ভাবে প্রত্যেক ভক্ত কিছু না কিছু প্রভুর সেবা করতে লাগলেন।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস পন্ডিতকে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীবাস পন্ডিত বললেন শ্রীনিত্যানন্দ তোমারই দেহ; তোমাদের

উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ আমি দেখি না বরং তোমাকে জানতে হলে নিতাইয়ের কৃপা সাপেক্ষ। গৌরসুন্দর শ্রীবাসের মুখে একথা শুনে আনন্দে বললেন শ্রীবাস নিত্যানন্দের প্রতি তোমার এতাদৃশ বিশ্বাস, আমি তোমাকে বর দান করছি তোমার গৃহে কোনদিন অন্ন বস্ত্রের অভাব হবে না। তোমার গৃহে সকলেই আমার প্রিয় হবে।

আর একদিন শ্রীশচীমাতা এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করলেন— গৌর নিতাই সাক্ষাৎ ব্রজের কানাই বলাই। নিতাই শচীমাতাকে মা বলে আহ্বান করছেন, শচী মাতা রন্ধন করে নিতাইকে ভোজন করাচ্ছেন। প্রাতে এ শুভ-স্বপ্ন কথা শচীমাতা শ্রীগৌর সুন্দরকে জানালেন, প্রভু বললেন জননী! তবে আজ নিত্যানন্দকে আমন্ত্রণ করে আমাদের ঘরে ভোজন করান হউক, শচীমাতা নিতাইকে আমন্ত্রণ করতে আদেশ দিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর নিতাইকে আমন্ত্রণ করে ঘরে আনলেন, ভৃত্য ঈশান প্রভুদ্বয়ের পাদ ধৌত করে দিলেন। তারপর শচীমাতা নিমাই নিতাইকে ভোজনে বসালেন, দুই ভাই আনন্দে ভোজন করছেন, তখন শচীমাতা দেখছেন গৌর নিতাই ব্রজের কানাই বলাই রূপে যেন ভোজন করছেন। কিন্তু এ রহস্য শচীমাতা আর কাকেও বললেন না।

অন্যদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ সমীপে নিত্যানন্দ তত্ত্ব বলতে লাগলেন—নিত্যানন্দ আমার প্রকাশ বিগ্রহ স্বরূপ আমা হতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। আমি নিত্যানন্দ দ্বারা বিশ্বে প্রেম ভক্তি দান করব। এ বলে মহাপ্রভু স্বহস্তে নিত্যানন্দের অঙ্গে গন্ধ লেপন ও কণ্ঠে মাল্য প্রদানাদি পূর্ব্বক স্তুতি করতে লাগলেন। পরিশেষে এক খন্ড কৌপীন চেয়ে নিয়ে উহা খন্ড খন্ড পূর্ব্বক ভক্তগণের হস্তে প্রদান করলেন এবং মস্তকে বন্ধন করতে আদেশ করলেন। তখনই ভক্তগণ সানন্দে হরিধ্বনি করতে করতে মস্তকে বন্ধন করলেন। তারপর প্রভুর আদেশে ভক্তগণ সকলে নিত্যানন্দের চরণামৃত পান

করলেন।

একদিন অকস্মাৎ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আহ্বান পূর্ব্বক বলতে লাগলেন— হে নিত্যানন্দ, হে হরিদাস তোমরা আমার আদেশ শ্রবণ কর। উভয়ে বললেন হে দয়াময়! কি আদেশ আমাদের প্রতি কৃপা করে বলুন। প্রভু বললেন আদেশ এই – তোমরা প্রতি ঘরে ঘরে যাও এবং এই ভিক্ষা কর – কি ভিক্ষা – বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। মুখে কৃষ্ণ নাম কর, কৃষ্ণের চরণ আরাধনা কর ও ভক্তি সদাচার পালন কর। এ সমস্ত শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষার কথা বলবে না। এটাই ভিক্ষা অন্য কোন ভিক্ষা নাই।

এস্থলে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সুন্দর বর্ণনা করেছেন—

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।'
ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা।
দিন অবসানে আসি, আমারে কহিবা।।

—(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৩।৮।১০)

প্রভুর নির্দ্দেশ মত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস নদীয়া নগরের ঘরে ঘরে এরূপ ভাবে নাম প্রচার করতে লাগলেন। অনেক লোক নানা প্রকার কটাক্ষ ও কুৎসা করতে লাগলেন। আবার অনেক সজ্জন ব্যক্তি তাঁরা এ প্রচারটি উত্তম বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। সে সময় নদীয়ার কোতয়ালের কার্য্য করত জগাই মাধাই। তারা ভয়ঙ্কর পাপী মদ্য পানে সর্বদা বিভোর থাকত ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম তাদের। একদিন গঙ্গা তটে দুই মহাপাপী মদ্যপানে

বিভোর হয়ে পড়ে আছে দয়াল ঠাকুর নিত্যানন্দ মনে মনে বিচার করলেন এ দুই জনকে অবশ্যই উদ্ধার করতে হবে। নিত্যানন্দ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং প্রভুর নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করলেন "বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা"। দুই মাতাল নিত্যানন্দের আদেশ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, আরক্ত নয়নে বলতে লাগল— তোর নাম কি? নিত্যানন্দ প্রভু জবাব দিলেন নাম অবধূত, জগাই মাধাই বলল —তুই কি বলছিস্? নিত্যানন্দ —আমি হরি নাম করতে বলছি। সেকথা শুনে মাধাই ক্ষিপ্ত ভাবে বলল—শালা, আমাদের প্রতি আবার উপদেশ; বলে ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকরা ছুড়ে মারল নিত্যানন্দের মাথায়। হাঁড়ির টুকরার আগাতে মাথা দিয়ে দর্ দর্ করে রক্ত পড়তে লাগল, তথাপি নিত্যানন্দ প্রভু অনুনয় করে বলতে লাগলেন, আমায় মেরেছিস্ ত ভালই হয়েছে তোরা একবার হরি হরি বল। হরি হরি বল। মাধাই পুনঃ মারতে উদ্যত হল, তখন জগাই মাধায়ের দুখানি হাত চেপে ধরল, বলল ভাই! বিদেশী সন্ন্যাসী মেরে লাভ নেই। এদিকে ভক্তগণ মহাপ্রভুর কাছে এ সংবাদ জানালেন। প্রভু তৎশ্রবণ মাত্রই ভক্তগণসহ তথায় উপস্থিত হলেন এবং নিত্যানন্দের ললাটে রক্তের ধারা দেখে ক্রোধাবিষ্ট হয়ে সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করলেন। মহা তেজময় সুদর্শন তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হলেন। দুই পাপী তা দেখে ভয়ে কম্পমান। নিত্যানন্দ প্রভু অমনি প্রভুর করপদ্ম ধরে বলতে লাগলেন— হে দয়াময় প্রভো! ক্রোধ সম্বরণ কর, এ অবতার অস্ত্র ধারণের অবতার নহে, নাম প্রেমে পাপী উদ্ধারের অবতার। আমি অনুনয় করছি তুমি অস্ত্র ধর না, নাম প্রেমে দুই পাপীকে উদ্ধার কর। নিত্যানন্দের এরূপ মহাদয়ালুতার কথা শ্রবণে শ্রীগৌরসুন্দর দ্রবীভূত হলেন। সুদর্শনকে চলে যেতে বললেন। তারপর তিনি যখন শুনলেন মাধাই নিত্যানন্দকে মারতে জগাই তাকে রক্ষা করেছে, তখন করুণাময় প্রভু জগাইকে ডেকে বললেন, জগাই! তুই আমার দিব্য রূপ দর্শন কর এ বলে প্রভু তাঁকে দিব্য চতুর্ভূজ নারায়ণ স্বরূপ দর্শন করালেন। জগাই সে দিব্য রূপ দর্শন করে প্রভুর চরণ তলে লুটিয়ে পড়ল এবং স্তুতি করতে

লাগল। কিন্তু মাধাই কিছুই দেখতে পেল না। জগাই বলল আমরা দুই ভাই, আমাকে যেমন দয়া করলে তেমনি মাধাইকে কর। প্রভু বললেন নিত্যানন্দ আমার প্রাণ, যে নিত্যানন্দকে দ্রোহ করে আমি তাকে কৃপা করি না। মাধাই যদি নিতাইর চরণ ধরে অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সেও প্রেম পাবে। তখন মাধাই নিত্যানন্দের শ্রীচরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন, নিত্যানন্দ তাকে বক্ষে তুলে আলিঙ্গন করলেন, তখন ভক্তগণ চারিদিকে মহা হরিধ্বনিতে মুখরিত করতে লাগলেন। এরূপ পতিতপাবন নিত্যানন্দ জগাই মাধাই দুই মহাপাপীকে উদ্ধার করে পতিত পাবন নামের সার্থকতা করলেন।

যখন মহাপ্রভু নদীয়া নগরে যুগধর্ম নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করছিলেন, তখন নদীয়ার শাসক সিরাজউদ্দীন মৌলানা ভীষণ বাধা প্রদান করল, ভক্তদের গৃহে প্রবেশ করে মৃদঙ্গ প্রভৃতি ভেঙ্গে দিতে লাগল। সমস্ত কথা ভক্তগণ প্রভুর কাছে নিবেদন করলেন। তা শুনে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বাহির করলেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অচিন্ত্য শক্তিতে কোথা হতে এত ভক্ত সমাগম হল তা কেহ বুঝিতে পারলেন না। তাঁদের দিব্য রূপে যেমন দশদিক আলোকিত হয়ে উঠল, ভক্তগণেরও তদ্রূপ রূপের সঞ্চার হল। মহা সংকীর্ত্তন রোল ত্রিলোক অতিক্রম করে যেন গোলোকে পৌঁছল। পরমানন্দময় শ্রীগৌর নিত্যানন্দ যেন সেই আনন্দ সিন্ধুকে উদ্বেলিত করে নদীয়া নগরীকে নিমজ্জমান করছেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সেই প্রেম-বন্যায় ডুবে গেল। মহাসংকীর্ত্তনের দল ক্রমে সিরাজউদ্দীন মৌলানা কাজীর গৃহের দিকে চলতে লাগল। এবার কাজী এ সমস্ত বিভূতি দর্শন করে নিস্তব্ধ ভাবে গৃহে বসে রইল। যেন তাঁর শক্তি সংকীর্ত্তনে অপহৃত হয়েছে।

অতঃপর গৌরহরি, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কাজীর গৃহেতে প্রবেশ করলেন এবং কাজীকে আহ্বান করলেন। বললেন—

আজ আপনার নগরে যে মহাসংকীর্ত্তন হচ্ছে তাতে কেন বাধা দিচ্ছেন না। কাজী উত্তর করলেন হে গৌরহরি! আমি যেই দিবস ভক্তের গৃহে প্রবেশ করে মৃদঙ্গ ভেঙ্গে ছিলাম সেই দিবসের রাত্রে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছিলাম। কোন এক ভয়ঙ্কর নৃসিংহ মূর্ত্তি হুঙ্কার করে আমার বক্ষে আরোহণ করে বলেছিলেন এ মৃদঙ্গ খন্ডে তোর বক্ষ বিদীর্ণ করব। আমি ভয়ে অনেক স্তব করতে থাকলে, তিনি বললেন তোকে আজ ক্ষমা করে যাচ্ছি। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল রাত্র শেষ হল, সে অবধি আমি আর সংকীর্ত্তনে বাধা দিই না। আমার মনে হয় তুমিই সেই ঈশ্বর।

মহাপ্রভু বললেন আমি সব দোষ ক্ষমা করব তুমি একবার হরিবোল বল, এটি যুগ ধর্ম—যুগের সকলের জন্য। কাজী সাহেব মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দের দর্শন স্পর্শনে ও বাণী শ্রবণে একেবারেই মুগ্ধ আত্মহারা হলেন। প্রভুর সঙ্গে হরিনাম গান করে চললেন। কাজীর উদ্ধার দর্শনে আনন্দে ভক্তগণ হরিধ্বনি করতে লাগলেন। কাজী মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত হলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি চাঁদ কাজী নামে খ্যাত হলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলার সহায়ক। প্রভু যখন সমগ্র জীব জগতের উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সঙ্গী হলেন। প্রভুর সঙ্গে শ্রীক্ষেত্র ধামে যাত্রা করলেন। শ্রীক্ষেত্র ধামে কিছুদিন মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ রইলেন এবং রথ যাত্রাদি দর্শন করলেন। তখন একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নিভৃতে নিত্যানন্দ প্রভুকে ডেকে বলতে লাগলেন— আমরা দুইজন যদি পুরীতে অবস্থান করি তা হলে গৌড় দেশবাসী ভক্তগণের গতি কি হবে? অতএব আপনি শীঘ্র গৌড়দেশে যাত্রা করুন, তথাকার ভক্তগণকে সুখী করুন। পাপী তাপী জীবগণকে উদ্ধার করুন।

আজ্ঞা পাই' নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড় দেশে লই' নিজগণে।।
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।২৩০)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাম দাস, শ্রীগদাধর দাস, শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য, শ্রীকৃষ্ণদাস পন্ডিত, শ্রীপরমেশ্বরী দাস ও শ্রীপুরন্দর পন্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

প্রথমে পাণিহাটী গ্রামে শ্রীরাঘব পন্ডিতের গৃহে আগমন করলেন। ক্রমে গৌড় দেশবাসী ভক্তগণ তথায় আগমন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রতিদিন সংকীর্ত্তন মহোৎসব করতে লাগলেন। একদিন রাঘব পন্ডিতকে বললেন আজ কদম্ব ফুলের মালা পরিধান করব। ভক্তগণ বললেন হে প্রভো এখন ত কদম্ব ফুলের সময় নয়, কোথায় পাব? নিত্যানন্দ প্রভু বললেন— দেখ বাগানে আছে। ভক্তগণ বাগিচায় এলেন দেখলেন জম্বীরের গাছে কদম্ব ফুল সকল ফুটে আছে।

জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল।।
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।২৮২)

এক সময় নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার পরিধান করতে ইচ্ছা হল। তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার সকল উপস্থিত হল।

তবে নিত্যানন্দ প্রভুবর কত দিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে।।
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব-অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হৈল বিদ্যমানে।।
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।৩৩৩-৩৩৪)

পাণিহাটী গ্রাম হতে কিছুদিন পরে নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহ গ্রামে পুরন্দর পন্ডিতের গৃহে আগমন করলেন। প্রভুর নিজজনগণও ক্রমে তথায় উপস্থিত হলেন, তথায় কিছুদিন কীর্ত্তন বিলাস করবার পর গঙ্গাতটে সপ্ত গ্রামে বণিক শ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধারণ দত্তের গৃহে শুভ বিজয় করলেন।

বণিক তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার।।
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।৪৫৪)

শ্রীনিত্যানন্দ কিছুদিন বণিক কুলকে উদ্ধার করে শ্রীশান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ভবনে আগমন করলেন।

দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন্ সুখ।।
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।৪৭০)

কয়েক দিন শ্রীনিত্যানন্দ শান্তিপুরে অবস্থানের পর শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশচীমাতাকে দর্শনের জন্য আগমন করলেন।

তবে অদ্বৈতের স্থানে লই' অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি।।
সেই মতে সর্ব্বাদ্যে আইলা আই-স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে।।
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন—তা'র অন্ত নাই।।
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।৪৯৬-৪৯৮)

কিছুদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপ পুরে অবস্থান করে মহা সংকীর্ত্তন বিলাস করতে লাগলেন।

একসময় চোর দস্যু দলপতি এক ব্রাহ্মণ কুমার নিত্যানন্দের অঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার দেখে তা হরণ করবার জন্য মনস্থ করল এবং সঙ্গী চোর দস্যুগণকে আহ্বান করল। চোরগণ প্রথম দিনের রজনীতে এসে দেখল নিত্যানন্দের চতুষ্পার্শে বহু ভক্তগণ বসে সংকীর্ত্তন করছেন। দ্বিতীয় দিন পুনঃ

এল, নিত্যানন্দের পার্শ্বে কাকেও না দেখে দস্যুগণ অস্ত্র নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করল, যখনই প্রবিষ্ট হল তখনই সকলে অন্ধ হয়ে গেল আর ভয়ঙ্কর ঝড় বর্ষা আরম্ভ হল, দস্যুগণ আর কোথায় যাবে সবে অন্ধ হয়ে গড় খাইয়ের মধ্যে পড়ে মহা কষ্ট দুঃখ ভোগ করতে লাগল। সারারাত্রি এরূপে কেটে গেল, প্রাতঃকাল হল, ঝড় বর্ষা থেমে গেল। তখন দস্যুগণ বুঝতে পারল এ সব নিত্যানন্দ প্রভুর প্রভাব, সকলে শ্রীনিত্যানন্দ চরণে এসে স্তব করতে লাগল—

রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল গোপাল।
রক্ষা কর' প্রভু, তুমি সর্ব্ব জীব-পাল।।

*　　　*　　　*

তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব অপরাধ।
পতিতজনেরো তুমি করহ প্রসাদ।।
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।৬২৬-৬২৯)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এভাবে দীনহীন পাপী সকলকেই প্রেম ভক্তি দান করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন পাণিহাটি গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিত গৃহে অবস্থান করছিলেন সেই সময় শ্রীহিরণ্য গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীনিত্যানন্দ চরণে শরণাপন্ন হন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসকে নিকটে টেনে এনে স্বীয় কোটি চন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণ তাঁর মস্তকে ধারণ করেন এবং বলেন তুমি আমার ভক্তগণকে চিড়াদধি ভোজন করাও। নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশে শ্রীরঘুনাথ দাস চিড়াদধি মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। অদ্যাপি চিড়াদধি মহোৎসব পাণিহাটীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় শ্রীরঘুনাথ দাসের সংসার বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন—

নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার।।
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।২২০)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেছেন—

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ-রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।।
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র,—সে কৃপা তাঁহার।।
—(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৫৬-১৫৭)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন —

নিতাই পদকমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার।।
অহঙ্কারে মত্ত হঞা নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাই চরণ দু'খানি।।

নিতাই-চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গাচরণের পাশ।।

—(প্রাচীন মহাজন কীর্ত্তনাবলী)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ যাঁরা ব্রজের সখা বলে উক্ত হয়েছেন তাঁরাই দ্বাদশ গোপাল নামে খ্যাত।

১। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগর।
২। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর শ্রীপাট যশোহর জেলার অন্তর্গত মহেশপুর।
৩। শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই শ্রীপাট মাহেশ।
৪। শ্রীগৌরীদাস পন্ডিত শ্রীপাট অম্বিকা কালনা।
৫। শ্রীপরমেশ্বরী দাস শ্রীপাট আটপুর।
৬। শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিত শ্রীপাট পাল পাড়া, চাকদহ।
৭। শ্রীমহেশ পন্ডিত শ্রীপাট কাটোয়ার নিকট শীতল গ্রাম।
৮। শ্রীপুরুষোত্তম পন্ডিত, শ্রীপাট সুখসাগর।
৯। শ্রীকালা কৃষ্ণ দাস শ্রীপাট আকাই হাট গ্রাম।
১০। শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীপাট চাঁন্দুড় গ্রাম।
১১। শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর শ্রীপাট সপ্ত গ্রাম।
১২। শ্রীধর শ্রীপাট (অজ্ঞাত)

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শেষ ভৃত্য বলে পরিচিত। এ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে নিত্যানন্দ চরিত সমাপ্ত হল।

জয় পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর সপার্ষদ শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু কি জয়।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত

শ্রীশ্রীগৌর অবতারের ব্যাসরূপী শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীবাস পণ্ডিতের মহিমা এই রূপ বর্ণন করেছেন—

সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য বিলাস।।
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণ নাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ২।৯৬-৯৭)

শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এঁরা চার ভাই। এঁরা পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জেলায় বসবাস করতেন ; পরবর্ত্তী কালে গঙ্গাতটে শ্রীনবদ্বীপে এসে বাস করতে লাগলেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয় শ্রীঅদ্বৈত সভায় এসে ভাগবত শ্রবণ ও নাম-সংকীর্ত্তনাদি করতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে তাঁদের পরম সৌহার্দ্য-ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। সকলেই এক সঙ্গে ভাগবত শ্রবণ ও নাম-সংকীর্ত্তনাদি করতেন। চার ভায়ের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণভক্তি বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নীর নাম ছিল শ্রীমালিনী দেবী। তিনি নিরন্তর শ্রীশচী দেবীর সঙ্গে সখ্য ভাবাপন্ন হয়ে তাঁর সন্তোষোৎপাদন করতেন।

কলিযুগে জীবের দুর্দ্দশা দেখে ভক্ত বড়ই দুঃখিত হলেন এবং তাদের উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন। ভক্তের

আহ্বান ভগবান্ শুনেন। ১৪০৭ শকে ফাল্গুন পূর্ণিমাতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীহরি অবতীর্ণ হলেন। তাঁর শুভ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জগতে সর্ব্ববিধ মঙ্গলের উদয় হল। জগৎ হরিনামে পূর্ণ হল। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য যেমন শান্তিপুর থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রীহরি অবতীর্ণ হচ্ছেন, তেমনি শ্রীবাসাদি ভক্তগণও বুঝতে পেরেছিলেন। শ্রীবাস পন্ডিতের পত্নী শ্রীমালিনী দেবী আগে থেকে শ্রীশচী মাতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীবাস পন্ডিতও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে এসে তাঁকে এ সম্বন্ধে আভাস দিতে লাগলেন।

শ্রীভগবান্ যতক্ষণ নিজেকে না জানান ততক্ষণ তাঁকে কেহ জানতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দর শৈশব কালে অনেক অলৌকিক লীলা ভক্তগণকে দেখালেও ভগবদ্ মায়ায় তা ভক্তগণ বুঝতে পারতেন না। বাৎসল্যভাবে তাঁদের হৃদয় ভরপুর হয়ে উঠত। শ্রীবাস পন্ডিত ও মালিনী দেবী, শচী জগন্নাথকে পুত্রের পালন বিষয়ে অনেক উপদেশ দিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পন্ডিত ও মালিনী দেবীকে জনক-জননীর ন্যায় জানতেন।

বিদ্যা বিলাসে উদ্ধত শ্রীগৌরসুন্দরকে একদিন শ্রীবাস পন্ডিত উপদেশ দিতে লাগলেন—

পড়ে কেনে লোক ?— কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে।।
এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ—না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত' এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১২।২৫১-২৫২)

লোকে পড়ে কেন? শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি জানবার জন্য। যদি সেই কৃষ্ণ-ভক্তি পড়ে শুনে লাভ না হয়, তবে বিদ্যায় কি করবে? তুমিত অনেক পড়াশুনা করলে, এখন কৃষ্ণভজন কর। মহাপ্রভু তা শুনে হাসতে হাসতে বললেন " তোমার কৃপায় সেহ হইবে নিশ্চিত।" তোমাদের কৃপায় আমার

নিশ্চয় কৃষ্ণ-ভক্তি হবে।

অনন্তর মহাপ্রভু গয়াধামে গিয়ে শ্রীঈশ্বর পুরীর নিকট মন্ত্র দীক্ষাদি গ্রহণ অভিনয় করে ক্রমে জগতে প্রেম-ভক্তি প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বরভাবে শ্রীবাস পন্ডিতের গৃহে এসে বলতে লাগলেন—

"কাহারে পূজিস্, করিস্ কার ধ্যান।
যাহারে পূজিস্ তাঁরে দেখ্ বিদ্যমান।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২।২৫৮)

শ্রীবাস কার পূজা করছিস্? যাঁর পূজা করছিস্ তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন কর। এই কথা বলে মহাপ্রভু শ্রীবাসের বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ করলেন এবং বিষ্ণুর আসনে বসে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকট করলেন। "দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর। চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।।" শ্রীবাস পন্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের সেই দিব্যরূপ দেখে স্তম্ভিত হ'লেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসকে বলতে লাগলেন—" তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে। ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সর্ব্ব পরিকরে।।" তোমার উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে এবং অদ্বৈত আচার্য্যের হুঙ্কারে আমি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে সপরিকরে মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হয়েছি। আমি দুষ্টজনের বিনাশ এবং সাধুজনের ত্রাণ করব। তোমরা নির্ভয়ে আমার সংকীর্ত্তন কর। মহাপ্রভুর এই অভয়বাণী শুনে শ্রীবাস পন্ডিত ভূতলে দন্ডবৎ হয়ে এই স্তুতি পাঠ করতে লাগলেন—

বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার।
নব-ঘন বর্ণ, পীত বসন যাঁহার।।
শচীর নন্দন পা'য়ে মোর নমস্কার।
নব গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার।।
গঙ্গাদাস-শিষ্য পা'য়ে মোর নমস্কার।
বনমালা, করে দধি-ওদন যাঁহার।।
জগন্নাথ-পুত্র-পা'য়ে মোর নমস্কার।

কোটি চন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার।।
শৃঙ্গ বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার।।
চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার।।

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২।২৭২-২৭৭)

আজি মোর জন্ম কর্ম-সকল সফল।
আজি মোর উদয়—সকল সুমঙ্গল।।
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার।।
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাঁরে দেখি—যাঁর শ্রীচরণ সেবে রমা।।

শ্রীবাস এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের বিবিধ স্তুতি পাঠাদি করলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসের প্রতি সদয় হয়ে তাঁর গৃহের যাবতীয় পরিজনকে দর্শন দিলেন। সম্মুখে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীকে দেখে প্রভু বললেন—নারায়ণী! কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদ—

"চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁন্দে নাহিক সম্বিত।।
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে।।

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২য় অধ্যায়)

বালিকা নারায়ণী কৃষ্ণ বলে কেঁদে অস্থির হল। সেই প্রেম ক্রন্দন দেখে শ্রীবাসের পত্নী, দাস-দাসী সকলে প্রেমে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীবাস অঙ্গন কৃষ্ণ প্রেমে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করল।

শ্রীবাস পন্ডিতের গৃহে দুঃখী নামে এক দাসী ছিল। সে প্রতিদিন মহাপ্রভুর স্নানের জল আনত। একদিন গৌরসুন্দর শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—জল কে আনে? শ্রীবাস পন্ডিত বললেন—দুঃখী আনে। শ্রীগৌরসুন্দর বললেন—আজ থেকে ওর নাম সুখী। যাঁরা ভগবানের ও ভক্তের সেবা করে, তাঁরা দুঃখী নহে, সুখী। শ্রীবাস পন্ডিতের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর বিবিধ লীলা করতে লাগলেন। ক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হ'লেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে সংকীর্ত্তন বিলাস আরম্ভ করলেন। এই সংকীর্ত্তন-স্থলী হল শ্রীবাস অঙ্গন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীমালিনী দেবী তাঁকে পুত্রের ন্যায় সেবা করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব। তিনি অবধূতের লীলা করতেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হ'য়ে থাকতেন। বেশ ভূষার দিকে তাঁর কোন নজরই থাকত না।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সন্ধ্যাকালে শ্রীবাস পন্ডিতের গৃহে সংকীর্ত্তন নৃত্য প্রভৃতি করছেন। এমন সময় শ্রীবাসের একমাত্র পুত্রটী কোন ব্যাধিতে পরলোক গমন করলো। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকেরা শোকে হাহাকার করে উঠলেন। শ্রীবাস পন্ডিত সব বুঝতে পেরে সত্ত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

সত্বরে আইলা গৃহে পন্ডিত শ্রীবাস।
দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক-বাস।।
পরম গম্ভীর ভক্ত মহা-তত্ত্ব-জ্ঞানী।
স্ত্রী-গণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি।।
তোমরা তো সব জান, কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর রোদন সবে চিত্তে দেহ, ক্ষমা।।
অন্তকালে সকৃৎ শুনিলে যাঁর নাম।
অতি মহা-পাতকীও যায় কৃষ্ণধাম।।

হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তাঁর ব্রহ্মাদিক ভৃত্য।।
এহেন সময় যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি যুয়ায় করিতে আর শোক।।
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
'কৃতার্থ' করিয়া আপনারে মানি তবে।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২৫।৩০)

শ্রীবাস পন্ডিত নারীগণকে এইভাবে অনেক তত্ত্বোপদেশ দিবার পর বললেন, তোমরা যদি সংসার ধর্ম সম্বরণ করতে না পার তবে এখন ক্রন্দন না করে পরে ক্রন্দন কর। সাক্ষাৎ গোকুলপতি শ্রীগৌরসুন্দর আমার গৃহে ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন করছেন। তোমাদের ক্রন্দনে যদি তাঁর নৃত্য সুখ ভঙ্গ হয়, আমি তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করব।

"কৃষ্ণ ইচ্ছামতে সব ঘটয় ঘটনা।
তাতে সুখ দুঃখ জ্ঞান অবিদ্যা কল্পনা।।
যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জান ভাল।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল।।
দেয় কৃষ্ণ নেয় কৃষ্ণ পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ মারে কৃষ্ণ ইচ্ছা করে যবে।।
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিপরীত যে করে ভাবনা।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা।।
ত্যজিয়া সকল শোক শুন কৃষ্ণ নাম।
পরম আনন্দ পাবে পূর্ণ হবে কাম।।"
—(শ্রীভক্তি বিনোদ-গীতি)

এই সমস্ত উপদেশ দিয়ে শ্রীবাস পন্ডিত বাইরে এলেন এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। স্ত্রীলোকেরাও মৃত শিশু ফেলে রেখে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন শ্রবণ করতে লাগলেন। এইরূপে মহাপ্রভু মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন করলেন। সংকীর্ত্তন ভঙ্গ হল। সকলে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এমন সময় মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

প্রভু বলে,—"আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পন্ডিতের ঘরে।।"
পন্ডিত বলেন—"প্রভু মোর কোন্ দুঃখ।
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ।।"

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ ২৫।৪৩)

শ্রীবাস! আজ কীর্ত্তনে আনন্দ পাচ্ছি না কেন? তোমার ঘরে কি কোন অমঙ্গল হয়েছে? শ্রীবাস পন্ডিত বলতে লাগলেন —হে প্রভো! তুমি সর্ব্বমঙ্গলময়। যেখানে তুমি বিরাজমান সেখানে কখন কি দুঃখ আসতে পারে? অনন্তর ভক্তগণ শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যুর কথা নিবেদন করলেন।

"শুনি গোরা রায় করে হায় হায়,
মরমে পাইনু ব্যথা।"

হায়! হায়! তোমরা এই বিপদ সংবাদ আমাকে দিলে না কেন? তখন শ্রীবাস পন্ডিত বলতে লাগলেন—

"বলি শুন নাথ তব রসভঙ্গ,
সহিতে না পারি আমি।।

একটি তনয়, মরিয়াছে নাথ,
তাহে মোর কিবা দুঃখ।

যদি সব মরে, তোমারে হেরিয়া,
তবু ত পাইব সুখ।।
তব নৃত্যভঙ্গ, হইলে আমার,
মরণ হইত হরি।
তাই কু-সংবাদ, না দিল তোমারে,
বিপদ আশঙ্কা করি।।

—(গীতিমালা)

শ্রীগৌরসুন্দর পন্ডিতের এই প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে বলতে লাগলেন—

প্রভু বলে—"হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে।
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কাঁন্দিতে।।
পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে।।
এত বলি' মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর।
ত্যাগ-বাক্য শুনি' সবে চিন্তেন অন্তর।।"

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অধ্যায়)

অতঃপর মহাপ্রভু মৃতশিশু স্থানে এলেন এবং তাকে স্পর্শ করে বলতে লাগলেন— হে বালক। তুমি শ্রীবাস পন্ডিতকে ত্যাগ করে যাচ্ছ কেন? মৃত শিশু প্রভু স্পর্শে প্রাণ লাভ করল এবং প্রভুকে নমস্কার করে বলতে লাগল— হে প্রভো তুমি হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। তোমার নির্বন্ধের অন্যথা কেহ করতে পারে না। যতদিন এখানে থাকবার নির্বন্ধ ছিল, ততদিন রইলাম। নির্বন্ধ শেষ হল তাই চললাম। হে প্রভো। অনেক বার আমার জন্ম ও অনেক বার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এবার মৃত্যু কালে তোমার শ্রীবদন দর্শন করে সুখে চলে যাচ্ছি।

"এত বলি নীরব হইলা শিশু-কায়।
এ মত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।।"
মৃত-পুত্র মুখে শুনি, অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সর্ব্ব-ভক্ত-গণ।।

শ্রীবাস পন্ডিত মহাপ্রভুর এরূপ অদ্ভুত লীলা দর্শন করে সপরিবারে তাঁর শ্রীচরণতলে পড়ে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন মহাপ্রভু বললেন—

"আমি নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অধ্যায়)

আমি ও নিত্যানন্দ তোমার দুই পুত্র; অতএব তোমার দুঃখের কি আছে? মহাপ্রভুর এই করুণাপূর্ণ বাণী শ্রবণ করে ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি করতে লাগলেন। শ্রীবাস পন্ডিতের প্রেমে ও সেবায় যেন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁর কাছে ঋণী। ভক্তের কাছে ভগবান ঋণী—এই তার প্রমাণ।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে শ্রীবাস পন্ডিত কুমারহট্ট এসে বসবাস করতেন। তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে প্রতি বৎসর নীলাচলে মহাপ্রভুর দর্শনে যেতেন। শ্রীশচীমাতাকে দেখবার জন্য তিনি প্রায় নবদ্বীপ মায়াপুরে আসতেন এবং গৃহে কিছু দিন বাস করতেন।

শ্রীশচীমাতাও গঙ্গা দর্শন করবার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আসতেন এবং নীলাচল থেকে মহাপ্রভু গৌড়দেশে আগমন করলে কুমারহট্টে শ্রীবাস পন্ডিতের গৃহেও আসতেন।

"কতদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট—শ্রীবাস-মন্দিরে।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।৫)

মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বর দিয়েছিলেন "তোমার গৃহে কদাপি দারিদ্র্য হবে না।" শ্রীবাস পণ্ডিত তিন ভাই সহ সুখে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করতেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনারদের অবতার ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলার সঙ্গী।

— ঃঃ —

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর

যিনি ছিলেন ব্রহ্মা, তিনিই এবার শ্রীহরিদাস ঠাকুর হয়ে অবতীর্ণ হলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জন্ম সম্বন্ধে ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখেছেন—

"বুঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে-ভাগ্যে সে-সব দেশে কীর্ত্তন-প্রকাশ।।
কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে।।
পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য-গোসাঞি।
হুঙ্কার করেন, আনন্দের অন্ত নাই।।
হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈত-দেব সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দরস-সমুদ্র-তরঙ্গে।।"

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬।১৮)

শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্-পার্ষদ। তিনি যশোর জেলায় বুঢ়ন গ্রামে যবন কুলে আবির্ভূত হন। ভগবান্ বা তাঁর পার্ষদগণ যে কুলেই অবতীর্ণ হন, তাঁরা নিত্য পূজ্য। যেমন গরুড় পক্ষীকুলে, হনুমান কপিকুলে তেমনি শ্রীহরিদাস যবন কুলে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীহরিদাসের জন্ম থেকে শ্রীকৃষ্ণ-নামের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কিছু দিন পরে গঙ্গাতীরবর্তী ফুলিয়ায় এসে ভজন করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গ পেয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য অতিশয়

সুখী হলেন। গোবিন্দ-প্রেমরসে দুই জন ভাসতে লাগলেন। ফুলিয়াবাসী ব্রাহ্মণগণ শ্রীহরিদাসের নাম ভজন দেখে বড়ই সুখী হলেন। তাঁর দর্শনের জন্য প্রতি দিন তাঁরা আসতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীহরিদাসের মহিমা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এসব দেখে তথাকার শাসক কাজী হিংসানলে জ্বলে উঠল এবং শ্রীহরিদাসকে শায়েস্তা করবার জন্য মুলুকের পতি যবন রাজের কাছে গিয়ে সব কিছু জানাল।

"যবন হৈয়া করে হিন্দুর আচার।।
ভালমতে তা'রে আনি' করহ বিচার।।
পাপীর বচন শুনি' সেহ পাপ মতি।
ধরি' আনাইল তা'নে অতি শীঘ্রগতি।।"

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬।৩৭)

কাজী বললেন—হরিদাস যবন হয়ে হিন্দুর আচার করছে। অতএব তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া দরকার। পাপীর বচনে পাপমতি যবনরাজ তৎক্ষণাৎ শ্রীহরিদাসকে ধরে তথায় আনালেন। যবনরাজ হরিদাসকে বললেন—তুমি হরিনাম ত্যাগ করে কলমা উচ্চারণ কর। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বললেন—"ঈশ্বর এক, নাম মাত্র ভেদ। হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণ ও মুসলমানদের শাস্ত্র কোরাণ। সেই প্রভু যাঁরে যেমন মতি দেন, তিনি তেমনি কর্ম করেন।"

"এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন।
লওয়াইছেন চিত্তে, করি আমি তেন।।"

—(শ্রী চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৮২)

অতএব সেই পরমেশ্বর আমাকে যেমন করাচ্ছেন, আমি তেমনি করছি। কেহ হিন্দু হয়ে যবন হয়, কেহ আবার যবন হয়ে ঈশ্বর ভজন করে। হে মহারাজ! তুমি এখন বিচার কর। হরিদাস ঠাকুরের এই কথা শুনে কাজী

বলতে লাগলেন একে উচিত শাস্তি দেওয়া দরকার। নতুবা সমস্ত যবন জাতি হিন্দু হয়ে যাবে। কাজীর কথা শুনে মুলুকপতি শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলতে লাগলেন—ভাই! তুমি নিজ ধর্মকথা বল। তা হলে তোমার চিন্তা নাই। অন্যথা তোমাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। তদুত্তরে শ্রীহরিদাস বললেন—

"খন্ড খন্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬।৯৪)

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের এই দৃঢ়বাক্য শুনে কাজী বলতে লাগলেন—একে বাইশ বাজারে পিটিয়ে পিটিয়ে মারতে হবে। বাইশবাজারে মারলেও যদি না মরে, তবে বুঝব জ্ঞানীরা সত্য কথা বলে। দুষ্ট কাজীর পরামর্শে পাপমতি মুলুকপতি হরিদাস ঠাকুরকে বাইশবাজারে মারতে আদেশ দিলেন। অমনি যবনগণ হরিদাস ঠাকুরকে ধরে নিয়ে বাজারে বাজারে মারতে লাগল।

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহ-দুঃখ না হয় প্রকাশ।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬।১০২)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে বধ করবার জন্য অসুরগণ অনেক চেষ্টা করেও যেমন অকৃতকার্য্য হয়েছিল ঠিক সেইরূপ যবনগণও হরিদাস ঠাকুরকে মারবার অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারল না। হরিদাস ঠাকুর নামানন্দে ডুবে আছেন। অতপরঃ যবনগণ বুঝতে পারল শ্রীহরিদাস সাধারণ ব্যক্তি নয়। তখন অনুনয় করে বলতে লাগল—হরিদাস! আমরা বুঝতে পেরেছি, তুমি যথার্থ সাধু পুরুষ। তোমাকে কেহ কিছু করতে পারবে না। কিন্তু মুলুকপতি একথা বুঝবে না। সে আমাদের প্রাণ নাশ করবে।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যবনগণের কথা শুনে তখনই ধ্যানস্থ হলেন। তখন

যবনগণ হরিদাসকে কাঁধে নিয়ে মুলুকপতির কাছে এল। মুলুকপতি মনে করলেন হরিদাস মরে গেছেন। তাই তিনি হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিতে বললেন। যবনগণ হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিল। হরিদাস ঠাকুর ভাসতে ভাসতে পুনঃ ফুলিয়া-ঘাটে এলেন এবং তটে উঠে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করতে লাগলেন। শ্রীহরিদাসের মহিমা দেখে মুলুকপতি যবনের মনে ভয় হল। যবনগণের সঙ্গে তিনি তথায় এলেন এবং তাঁর অপরাধের জন্য হরিদাস ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

'পীর' জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার।।
—(শ্রী চৈঃ ভাঃ আ ১৬।১৪৭)

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যবনগণকে কৃপা করে ফুলিয়া-নগরে এলেন। এবার ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না।

ফুলিয়ায় যে কুটিরে বসে হরিদাস ঠাকুর হরিনাম করতেন, তাঁর ভিটার গর্ত্তে এক বিষধর সর্প বাস করত। তার বিষের জ্বালায় ভক্তগণ বেশীক্ষণ তথায় বসতে পারতেন না। একদিন ভক্তগণ হরিদাস ঠাকুরকে নাগের কথা বললেন। হরিদাস ঠাকুর ভক্তগণের দুঃখ দেখে নাগকে আহ্বান করে বললেন—

"সত্য যদি ইহাতে থাকে মহাশয়।
তেঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়।।
তবে আমি কালি ছাড়ি যাইমু সর্ব্বথা।"
—(শ্রী চৈঃ ভাঃ আঃ)

নাগরাজ হরিদাস ঠাকুরের এই আদেশ শুনে তৎক্ষণাৎ গর্ত্ত থেকে বের হয়ে তাঁকে নমস্কার করে অন্যত্র চলে গেলেন। তৎ দর্শনে ভক্তগণ

অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হলেন। হরিদাস ঠাকুরের এই সমস্ত মহিমা দেখে ভক্ত ব্রাহ্মণগণের তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল।

যশোহর জেলায় হরিনদী নামে একটি গ্রামে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শুভবিজয় করলেন। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণের বসবাস বেশী। একদিন এক পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ সভামধ্যে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ডেকে বলতে লাগল—ওহে হরিদাস! তুমি হরিনাম উচ্চস্বরে কর কেন? শাস্ত্রে ত মনে মনে করতে বলা হয়েছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুর তদুত্তরে বললেন—

"পশু-পক্ষী-কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে।।
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্তনে পর-উপকার করে।।
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শত গুণ ফল হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।।"

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬।২৮০)

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের এইরূপ বাস্তব সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে সেই পাপমতি ব্রাহ্মণ অসহিষ্ণু হয়ে বলতে লাগল—কলিতে শূদ্রগণ বেদ পাঠ করবে, এখন ত' তাই দেখছি। হরিদাস দর্শন-কর্ত্তা হল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে নীরবে সভা ত্যাগ করলেন। কয়েকদিন পরে সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণটির গলিত কুষ্ঠ হল। বৈষ্ণব অপরাধের ফল হাতে হাতে পেল।

"কলিযুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে।।"

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬।৩০০)

শ্রীহরিদাস বৈষ্ণব দর্শন ইচ্ছা করে নবদ্বীপে এলেন। তাঁকে দেখে বৈষ্ণবগণ আনন্দে আপ্লুত হলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য হরিদাসকে প্রাণের সমান ভালবাসতেন। কোন সময় আচার্য্য পিতৃশ্রাদ্ধ-বাসরে সর্বাগ্রে বৈষ্ণব শ্রীহরিদাসকে ভোজন করান।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যশোহর জেলার অন্তর্গত বেনাপোল গ্রামে অবস্থান করতেন। তিনি দিবারাত্র তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করতেন। সেই জায়গার অধ্যক্ষ ছিল রামচন্দ্র খাঁন। রামচন্দ্র খাঁন বড় পাষন্ড প্রকৃতির লোক ছিল। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার কথা শুনে মাৎসর্য্যে তার চিত্ত জ্বলতে লাগল। কি করে হরিদাসের মহিমা হ্রাস করা যায় চিন্তা করতে লাগল। খানের অনেকগুলি বেশ্যা ছিল। খাঁন চিন্তা করল কোন বেশ্যাকে হরিদাসের কাছে পাঠিয়ে তাঁর পতন ঘটাতে হবে। পরমা সুন্দরী এক বেশ্যাকে নিযুক্ত করা হল। একরাত্রে বেশ্যাটি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এল এবং তুলসী ও হরিদাসকে নমস্কার করে সামনে বসে বলতে লাগল—

"ঠাকুর, তুমি—পরমসুন্দর, প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি' কোন্ নারী ধরিতে পারে মন।।
তোমার সঙ্গম লাগি' লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ।।"
—(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩।১১২-১১৩)

ঠাকুর! তোমার সুন্দর যৌবন দেখে কোন্ নারী ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে? তোমার সঙ্গ কামনা করে আমি এসেছি। একবার সঙ্গ দাও; নতুবা আমি প্রাণ ধারণ করতে পারব না।

হরিদাস কহে,—"তোমা করিমু অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার।।

তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্তি হৈলে করিমু যে তোমার মন।।
—(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩।১১৪-১১৫)

শ্রীহরিদাস ঠাকুর সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। সব কিছুই জানতে পারলেন। তিনি মহাভাগবত। ইহা যে কৃষ্ণের পরীক্ষা তা বুঝতে তাঁর বাকী রইল না। তিনি বেশ্যাকে সুমধুর বাক্যে বললেন—তোমার বাসনা আমি পূর্ণ করব। আমার সংখ্যা নাম পূর্ণ হতে দাও। ততক্ষণ তুমি বসে নাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ কর। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বেশ্যাকে পাপী জ্ঞানে অনাদর করলেন না। কৃষ্ণের প্রেরণায় সে এসেছে, এই জ্ঞানে তিনি তাকে সমাদর করলেন। ভক্তগণ কখনও কোন জীবকে অনাদর করেন না।

"কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা।।"
(গীতাবলী)

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথা অনুযায়ী বেশ্যা বসে বসে নাম কীর্ত্তন শুনতে লাগল। কীর্ত্তনে রাত শেষ হল। ভোর হয়েছে দেখে বেশ্যা ঘরে চলে এল। রামচন্দ্র খাঁনকে সব কথা বলল।

পরদিন রাত্রে বেশ্যা শ্রীহরিদাসের কুটিরে এসে তাঁকে নমস্কার করে বসল, তখন হরিদাস ঠাকুর বলতে লাগলেন—

"কালি দুঃখ পাইলা, অপরাধ না লইবা মোর।
অবশ্য করিমু আমি তোমায় অঙ্গীকার।।
তাবৎ ইঁহা বসি, শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে তোমার মন।।"

—(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩।১২০-১২১)

কাল তুমি দুঃখ পেয়েছ। তজ্জন্য আমার কোন অপরাধ নিও না। আমি তোমার সঙ্গ অবশ্যই করব। যে পর্য্যন্ত আমার নাম সংখ্যা পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত বসে বসে নাম-সংকীর্ত্তন শুন। বেশ্যা নাম-কীর্ত্তন শুনতে শুনতে হৃদয়ে এক পরম আনন্দ অনুভব করতে লাগল। রাত্র শেষ হ'ল। কিন্তু ঠাকুরের নাম শেষ হ'ল না। ঠাকুর বললেন—আমি মাসে কোটি নাম গ্রহণ করবার ব্রত নিয়েছি। ব্রত শেষ হয়ে এল ভেবেছিলাম কিন্তু সমস্ত রাত্রি জপেও পূর্ণ করতে পারলাম না; মনে হয় কাল সমাপ্ত হবে। তখন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। বেশ্যা গৃহে ফিরে এল। পুনঃসন্ধ্যাকালে সে হরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এসে বসল এবং নামকীর্ত্তন শুনতে লাগল।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিনাম শুনতে শুনতে বেশ্যার মন শুদ্ধ হ'ল। সেও মাঝে মাঝে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলতে লাগল। বেশ্যা মনে মনে চিন্তা করতে লাগল—আমি কি মহাপাপ করবার জন্য এখানে এসেছি। এই মহাভাগবত সাধুর চরণে আমি মহা অপরাধ করতে বসেছি। এই অপরাধ ফলে কত কাল যে আমাকে ঘোরতর নরকে বাস করতে হবে জানি না। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। বেশ্যা অতি নির্ব্বেদযুক্ত হ'য়ে সজল নয়নে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চরণে দন্ডবৎ হয়ে পড়ল এবং বহু অনুনয় বিনয় করতে লাগল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বলতে লাগলেন—তুমি গাত্রোত্থান কর। শ্রীহরি তোমাকে কৃপা করবেন। বেশ্যা গাত্রোত্থান করে সজল নয়নে রামচন্দ্র খাঁনের কথা বলল।

"ঠাকুর কহে—খাঁনের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তা'রে দুঃখ নাহি মানি।"
—(শ্রীচৈঃ চঃ অ ৩।১৩৩)

আমি রামচন্দ্র খাঁনের কথা সব জানি; আমি সেই দিন চলে যেতাম। কেবল তোমার জন্য তিন দিন রইলাম। শ্রীহরিদাসের করুণাময় উক্তি শ্রবণে

বেশ্যার দুনয়ন দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর তারপর বললেন—ঘরের সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করে এই কুটিরে এসে বাস কর। নিরন্তর হরিনাম কর ও তুলসী সেবা কর। তুমি অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাবে।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথামত বেশ্যা নিজগৃহে জিনিস পত্র সব ব্রাহ্মণকে দান করল। মাথা মুন্ডন করে এক বস্ত্রে সেই কুটিরে বসে হরিনাম এবং তুলসী সেবা করতে লাগল।

"তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ, উপবাস।
ইন্দ্রিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ।।"
—(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩।১৪১)

শ্রীহরিদাস ঠাকুর বেশ্যাকে কৃপা করে অন্যত্র চলে গেলেন। বেশ্যার পরম শুদ্ধ চরিত্র দেখে সকলে চমৎকৃত হলেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহিমা গান করতে লাগলেন।

"প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম-মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁ'র দর্শনেতে যান্তি।।"

—(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩।১৪২)

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যেন পরশমণির ন্যায় মহাপাপী-তাপীকে সদ্যই উদ্ধার করে পরম বৈষ্ণব করেন।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর এক সময় সপ্তগ্রাম চাঁদপুরে এসে হিরণ্য গোবর্দ্ধন মজুমদারদের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্যের নিকট রইলেন। মজুমদারদের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস এই সময় শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে রোজ অধ্যয়ন করবার জন্য আসতেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দর্শন পেতেন ও তাঁর মুখে হরিকথা

শুনতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে মাঝে মজুমদারদের আমন্ত্রণে তাঁদের সভাগৃহে আসতেন এবং হরিকথা বলতেন। কোন সময় মজুমদারের জমিদারী-সেরেস্তার পত্র ও রাজকর-বাহক পেয়াদা গোপাল চক্রবর্ত্তী শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মুক্তি সম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ করে। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বললেন, নামাভাসেই মুক্তি হয়। পূর্ণ নামোদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি লাভ হয়। এ কথা শুনে গোপাল চক্রবর্ত্তী ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—কোটি জন্মে তপস্যা করেও যোগী যে মুক্তি পায় না, নামাভাসেই সেই মুক্তি হয়? এ-সমস্ত ভাবুকের সিদ্ধান্ত। পাপমতি গোপাল শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে উপহাস করতে লাগল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। মজুমদার মহাশয় গোপাল চক্রবর্ত্তীকে ধিক্কার দিয়ে সভা থেকে বের করে দিলেন। তাকে তাঁদের গৃহে আসতে নিষেধ — করলেন। মহৎ চরণে অপরাধের ফলে গোপাল চক্রবর্ত্তীর সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হল মহৎ চরণে অপরাধের ফল হাতে হাতে পেল।

শ্রীহরিদাস কখনও নবদ্বীপে কখনও শান্তিপুরে ভক্তগণের নিকট যাতায়াত করতেন। ভক্তগণ হরিদাসকে পেলে পরম আনন্দ লাভ করতেন। যেদিন শ্রীগৌরসুন্দর ফাল্গুন পূর্ণিমার চন্দ্র গ্রহণ সন্ধ্যাকালে মিশ্রগৃহে অবতীর্ণ হলেন, সেইদিন তিনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণ কথারসে অবস্থান করছিলেন। অকস্মাৎ শ্রীহরিধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত দেখে অনুমানে বুঝতে পারলেন, শ্রীভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন।

"সেই কালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে।।"

* * *

"জগৎ আনন্দময়, দেখি' মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি—কিছু কার্য্যে আছে ভাস।।"
—(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১৩।৯৯-১০১)

ভক্তের কাছে ভগবান্ কোন লীলা গোপন করতে পারেন না। অদ্বৈত আচার্য্য ও হরিদাস ঠাকুর সব কিছু বুঝতে পারলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে মাঝে নবদ্বীপ নগরে ভক্তগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্যলীলা, পৌগন্ড-লীলা কৈশোরলীলাদি দর্শন করতেন। অতঃপর যখন মহাপ্রভু যৌবন-লীলায় হরি-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন, তখন হরিদাস ঠাকুর নিয়তই নবদ্বীপ মায়াপুরে অবস্থানপূর্ব্বক প্রেমরস আস্বাদন করতে লাগলেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ-লীলা করে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আহ্বান করলেন এবং তার পূর্ব্ব চরিত সকল বলতে লাগলেন। হরিদাস! যবনগণ যখন তোমাকে নগরে নগরে প্রহার করতে আরম্ভ করেছিল, তখনই আমি তাদের সুদর্শন অস্ত্রে ধ্বংস করতাম। কিন্তু তুমি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলে, তাই কিছুই করতে পারিনি।

"তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুঞি বল।
মোর চক্র তোমা লাগি' হইল বিফল।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০।৪২)

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই সমস্ত কথা বলে' বললেন—

" তোহার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ।
এই তার চিহ্ন আছে' নাহি মিছা কঙ।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৪৪)

আমি মিথ্যা বলছি না। এই দেখ, এখনও তার চিহ্ন আছে। এই বলে মহাপ্রভু নিজ পৃষ্ঠে মারণের চিহ্ন দেখালেন। হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর এই করুণ লীলা দেখে তখনই প্রেমে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তারপর স্তুতি করে' বলতে লাগলেন।

"বাপ বিশ্বম্ভর, প্রভু, জগতের নাথ।
পাতকীরে কর কৃপা, পড়িল তোমাত।।
নির্গুণ অধম সর্বজাতি বহিষ্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৫৮-৫৯)

মহাপ্রভুর যাবতীয় নদীয়া লীলাতে শ্রীহরিদাস প্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তারপর যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা করে পুরীধামে যান, তখন শ্রীহরিদাস প্রভুর সঙ্গে তথায় যান এবং স্থায়ী ভাবে বাস করেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন শ্রীজগন্নাথ দেবের মঙ্গলারাত্রিক দর্শন করবার পর শ্রীহরিদাস সন্নিধানে আসতেন এবং তাঁকে জগন্নাথের শীতল ভোগ প্রসাদ প্রদান করতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রভু নামাচার্য্য আখ্যা দেন। বৃন্দাবনধাম হতে শ্রীরূপ-সনাতন পুরীধামে এলে, তাঁরা শ্রীহরিদাসের সঙ্গে থাকতেন। শ্রীহরিদাস দূর হতে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করে প্রণাম করতেন। মর্য্যাদা রক্ষা করে শ্রীমন্দির সন্নিধানে যেতেন না। মহামায়া-দেবী শ্রীহরিদাসের কাছ থেকে হরিনাম মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর অতি বৃদ্ধ হলেও তিন লক্ষ হরিনাম নিয়মিত প্রতিদিন করতেন।

অতঃপর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অন্তিম সময় এসেছে জানতে পেরে শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদ তাঁর সন্নিধানে উপস্থিত হলেন এবং ভক্তগণ সঙ্গে মহাসংকীর্ত্তন নৃত্য করতে লাগলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ভক্তগণকে বন্দনা

করে মহাপ্রভুকে সামনে বসালেন।

"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজ-নেত্র—দুই ভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা।।

*　　　　*　　　　*

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ বলেন বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার।।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রমণ।।

—(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য একাদশ ৫৩, ৫৫-৫৬)

শ্রীহরিদাস মহাপ্রভুর নাম নিতে নিতে অন্তর্ধান হলেন। মহাযোগেশ্বর প্রতিম শ্রীহরিদাসের অপ্রকটলীলা দেখে ভক্তগণ 'হরি কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করে প্রেমানন্দে মহানৃত্যগীত করতে লাগলেন। তারপর মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অপ্রাকৃত দেহ কোলে নিয়ে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং ভক্তগণের কাছে তাঁর মহিমা বর্ণন করতে লাগলেন। অতঃপর সমুদ্রতটে নিয়ে মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁর সমাধি দিলেন। অবশেষে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে এসে প্রসাদ ভিক্ষা করে তাঁর নির্য্যাণ-মহোৎসব সম্পাদন করলেন। ভগবান্ স্বয়ং এইরূপে ভক্তের মর্য্যাদা জগতে স্থাপন করলেন।

হরিদাস আছিল পৃথিবীর 'শিরোমণি'।
তাহা বিনা রত্ন-শূন্যা হইল মেদিনী।।
'জয় জয় হরিদাস' বলি' কর হরিধ্বনি।
এত বলি' মহাপ্রভু নাচেন আপনি।।

সবে গায়, —"জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেঁহ করিলা প্রকাশ।।"
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা।।
এই ত কহিলুঁ, হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হয়।।
—(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা একাদশ পরিচ্ছেদ ৯৭-১০১)

শ্রীসীতাঠাকুরাণী

শ্রীসীতা ঠাকুরাণী শ্রীশচীদেবীর ন্যায় নিত্য পূজ্যা জগন্মাতা। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি বাৎসল্য প্রেমে তিনি সর্ব্বদা বিহ্বল থাকতেন এবং শ্রীশচী জগন্নাথ মিশ্রের সদুপদেষ্টা ছিলেন।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব প্রসঙ্গে সীতা ঠাকুরাণীর বড় মধুর বর্ণনা দিয়েছেন।

অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগৎ পুজিতা আর্য্যা
নাম তাঁর 'সীতা ঠাকুরাণী'।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা গেল উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি।।
—(শ্রীচৈঃ চঃ আদি- ১৩।১১১)

পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহোদয় শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট লোক প্রেরণ করলেন। সে লোকমুখে অপূর্ব্ব পুত্র জন্ম-বার্ত্তা পেয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে গঙ্গাস্নান এবং বহু নৃত্য গীত করবার পর সহধর্ম্মিণী সীতা ঠাকুরাণীকে তাড়াতাড়ি নবদ্বীপ মায়াপুরে প্রেরণ করলেন।

শ্রীসীতা ঠাকুরাণী যোগমায়া ভগবতী পৌর্ণমাসীর অবতার। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসবের সময় নন্দগৃহে উপস্থিত থেকে ইনি নন্দ যশোদাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

পতিদেবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শ্রীসীতা ঠাকুরাণী দোলায় চড়ে ভৃত্যগণসহ মায়াপুরে মিশ্রগৃহে শুভাগমন করলেন। বহু সম্মানের সহিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার সঙ্গে লইল বহু ভার
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠাম সাক্ষাৎ গোকুল-কান
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত।।

শ্রীসীতা ঠাকুরাণী জগন্নাথ মিশ্র গৃহে নবজাত শিশু দর্শন করতে লাগলেন। দেখলেন সাক্ষাৎ গোকুলের সেই কৃষ্ণ, বর্ণটি কেবল ভিন্ন। তাঁর বর্ণ ইন্দ্র নীলমণির ন্যায়। এঁর বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়।

সর্ব্ব অঙ্গ—সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য জ্যোতি দেখি, পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যতে দ্রবিল হৃদয়।।

শ্রীসীতা ঠাকুরাণীর হৃদয় শিশুটিকে দর্শন করে বাৎসল্য প্রেমে গলে গেল। বাম হাতে বালকের শিরে ধান্য দুর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বললেন দুই ভাই চিরজীবী হও।

দুর্ব্বা, ধান্য, দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে
চিরজীবি হও দুই ভাই।
ডাকিণী শাঁখিণী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'।।

—(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।১১৭)

এরূপ বাৎসল্য রসাবেশে ধান্য দুর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবার পর শ্রীসীতা ঠাকুরাণী নাম করণ করবেন ভাবলেন। কিন্তু যেন বাৎসল্য রস সাগরে একেবারে ডুবে ডাকিণী শাঁখিণী প্রভৃতির ভয়ে নামটি রাখলেন 'শ্রীনিমাই'। শুদ্ধ বাৎসল্য প্রীতির কাছে অমিত ঐশ্বর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি হার মানে। এ প্রীতিতে ভগবান্ বড় তুষ্ট হন।

কয়েকদিন মায়াপুরে থেকে, শ্রীসীতা ঠাকুরাণী শচী দেবীকে পুত্র পালন সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। পরে শান্তিপুরে নিজ গৃহে ফিরে এলেন। পুত্র জন্মোৎসবে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী পরম পুজ্যা শ্রীসীতা ঠাকুরাণীকে মূল্যবান্ নব বস্ত্রাদি দিয়ে বহু সৎকার করেছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর মায়াপুরেও একটী বাসভবন ছিল। তথায়ও তিনি মাঝে মাঝে বাস করতেন এবং শ্রীবাসাদি ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথা আলাপে সুখে কাল কাটাতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে পর ভক্তগণের ও জগন্নাথ মিশ্রের বিশেষ অনুরোধে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সীতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় মায়াপুরে বাস করতে লাগলেন।

শ্রীশচী দেবীর অতিশয় পূজ্যপাত্রী ছিলেন শ্রীসীতাঠাকুরাণী। শচী ও সীতা ঠাকুরাণী যেন এক প্রাণ ছিলেন। সীতা ঠাকুরাণী রোজ তাঁদের গৃহে আসতেন এবং শিশু গৌরসুন্দরকে লালন পালন বিষয়ে উপদেশ দান করতেন। মিশ্র গৃহে দিব্য শিশু ভক্তগণের নয়ন মনের আনন্দ বর্দ্ধন করতে করতে চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে লাগলেন।

কয়েক বছর পরে জগন্নাথ মিশ্রের বড় পুত্র—'শ্রীবিশ্বরূপ' হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করলেন। শচী ও জগন্নাথ মিশ্র শোকে বড় কাতর হয়ে পড়লেন এবং শিশু গৌরসুন্দরও ভ্রাতৃবিয়োগ ব্যথা অনুভব করেন। সে সময় অদ্বৈত আচার্য্য ও সীতা ঠাকুরাণী তাঁদের বিশেষ ভাবে প্রবোধ দান করতেন

এবং শিশুকে রক্ষা করতেন। শ্রীবাস পন্ডিতের পত্নী মালিনী দেবীও সব সময় বালককে স্নেহে লালন পালন করতেন। তিনি ও শচীদেবী একাত্মা বিশিষ্টা ছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শৈশব লীলার পরক্রমে কৈশোর লীলা এবং যৌবন লীলা করলেন। পরে গয়া ধামে গমন করলেন এবং স্বরূপ প্রকট করলেন। সেখান থেকে ফিরে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণকে নিয়ে কীর্ত্তন আরম্ভ করবার সময় অদ্বৈত আচার্য্য সীতা ঠাকুরাণীকে নিয়ে শান্তিপুর থেকে মায়াপুরে আগমন করলেন এবং সর্ব্ব প্রথমে গৌরসুন্দরের পাদপদ্ম-যুগল পূজা করলেন।

অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপের কীর্তন-বিলাস লীলা সমাপ্ত করে জীবোদ্ধার ইচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। তা শুনে সীতা ঠাকুরাণী চারদিন শচীদেবীর ন্যায় নিদারুণ বিরহ বেদনায় পীড়িত হয়ে মৃতপ্রায় ভূতলে পড়ে রইলেন। ভক্তবৎসল গৌরসুন্দর এঁদের প্রীতিবন্ধনে বন্দী হয়ে আর বৃন্দাবনে যেতে পারলেন না। শান্তিপুরে ফিরে এলেন। সীতা ঠাকুরাণীর ও অদ্বৈত আচার্য্যের প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল। চারদিন উপবাসের পর গৌরসুন্দর সীতা-ঠাকুরাণীর হাতে রান্না-করা দ্রব্য ভোজন করলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেও মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মাঝে মাঝে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আগমন করে অষ্টপ্রহর শ্রীকৃষ্ণ-নাম-লীলা সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠান করতেন। তার এক সুন্দর বর্ণন দিয়েছেন পদকর্ত্তা শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর।

একদিন পহুঁ হাসি, অদ্বৈত মন্দিরে আসি,
বসিলেন শচীর কুমার।

নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে,
মহোৎসবের করিলা বিচার।।
শুনিয়া আনন্দে আসি, সীতাঠাকুরাণী হাসি,
কহিলেন মধুর বচন।
তা' শুনি আনন্দ মনে, মহোৎসবের বিধানে,
কহে কিছু শচীর-নন্দন।।
শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া এথা,
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যেবা বায়, আমন্ত্রণ করি তায়,
পৃথক পৃথক্ জনে জনে।।
এত বলি গোরা রায়, আজ্ঞা দিল সবাকায়,
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণে।
খোল করতাল লৈয়া, অগুরু চন্দন দিয়া,
পূর্ণ ঘট করহ স্থাপনে।।
আরোপণ কর কলা, তাহে বান্ধ ফুল মালা,
কীর্ত্তনমন্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া,
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে।।
শুনি মহাপ্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল যথা,
নানা উপহার গন্ধ বাসে।
সবে হরি হরি বলে, খোল মঙ্গল করে,
পরমেশ্বর দাস রসে ভাসে।।

—(শ্রীপদকল্পতরু)

নদীয়ার প্রাণধন সন্ন্যাস গ্রহণ করে যখন পুরীধামে অবস্থান করতে লাগলেন, অদ্বৈত আচার্য্য সীতাঠাকুরাণী ও পুত্র অচ্যুতানন্দ বছর বছর তথায় যেতেন। যাবার সময় সীতা ঠাকুরাণী গৌরসুন্দরের প্রিয় খাদ্য দ্রব্য সকল তৈরী করে নিতেন এবং গৌরসুন্দরকে গৃহে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতেন।

মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করেন নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন।।

—(শ্রীচৈঃ চঃ অন্তঃ ১০।১৩৪)

তাঁদের প্রেমে বাঁধা মহাপ্রভু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এসে ভোজন করতেন। সীতাঠাকুরাণী চিরকাল বাৎসল্য রসে তাঁকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। শ্রীগৌরসুন্দরও শচীমাতা থেকে অভিন্ন মনে করে সীতাঠাকুরাণীকে ভক্তি করতেন। শ্রীসীতাঠাকুরাণীর গর্ভে অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল মিশ্র নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরাও গৌরসুন্দরের অনুগত ছিলেন।

শ্রীসীতাঠাকুরাণীর পিতা শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ী। সীতাঠাকুরাণীর "শ্রী" নামে একটী ভগিনী ছিলেন।

নৃসিংহ ভাদুড়ী অতি উল্লাস অন্তরে।
দুই কন্যা সম্প্রদান কৈলা অদ্বৈতেরে।।

* * *

আচার্য্যের ভার্য্যা দুই জগত পূজিতা।
সর্ব্বত্র বিদিত নাম 'শ্রী' আর সীতা।।

—(শ্রীভঃ রঃ ১২।১৭৮৫)

তথাহি গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় —

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতং।
সীতারূপেণাবতীর্ণা 'শ্রী' নাম্নী তৎপ্রকাশতঃ।।

ভগবতী যোগমায়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পত্নী সীতাদেবী এবং তৎপ্রকাশ 'শ্রী'রূপে সম্প্রতি অবতীর্ণ হলেন।

জয় শ্রীসীতাঠাকুরাণী কি জয়।
জয় শান্তিপুর নাথ অদ্বৈত আচার্য্য কি জয়।।

— — ঃ০ঃ — —

শ্রীশ্রীসীতানাথের করুণা

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যাঁ'র হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়।।
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা সাগর।
যাঁ'র প্রেমরসে আইলা গৌরসুন্দর।।
যাহারে করুণা করি কৃপাদিঠে চায়।
প্রেমাবেশে সে-জন চৈতন্য গুণ গায়।।
তাঁহার চরণে যেবা লইলা শরণ।
সে-জন পাইলা গৌর-প্রেম মহাধন।।
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলুঁ।।

— — ঃ০ঃ — —

শ্রীশ্রীঈশ্বর পুরী

শ্রীমদ্ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন —

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর।।
শ্রীঈশ্বর পুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল।।
—(চৈঃ চঃ আদি ৯ম পরিঃ ১০-১১ শ্লোঃ)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার নবম পরিচ্ছেদের একাদশ শ্লোকের অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর লিখেছেন— "শ্রীঈশ্বরপুরী কুমারহট্টে (ই,বি, আর লাইনে হালিশহর ষ্টেশন) বিপ্রকুলে উদ্ভূত ও শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয়তম শিষ্য।" জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রীঈশ্বর পুরীর আবির্ভাব।

শ্রীমদ্ ঈশ্বর পুরীপাদ স্বয়ং কিরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করতেন, তদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এরূপ লিখেছেন—

"ঈশ্বরপুরী গোসাঞি করে শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন।।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ।।
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'।।

সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হইল সর্ব নিন্দাকর।।"
—(চৈঃ চঃ অন্তঃ ৮ম ২৮-৩১)

পূর্ব্বে এক সময় শ্রীঈশ্বরপুরী তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে নবদ্বীপ পুরে আগমন করেন এবং শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন।

তখন শ্রীগৌরসুন্দর অধ্যয়ন সুখে অবস্থান পূর্ব্বক জননী শ্রীশচীদেবীর আনন্দ বর্দ্ধন করছেন। শ্রীঈশ্বর পুরী ছদ্মবেশে নদীয়া পুরে এলেন।

কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়।।
তান বেশে তানে কেহ চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে।।
—(চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১১শ অধ্যায়)

যেখানে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ সেবা করছেন সেখানে সাবধানে গিয়ে বসলেন। বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবের কাছে লুকান সম্ভব নয়। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য বারবার তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন; শেষে জিজ্ঞাসা করলেন—বাপ! তুমি কে?

"বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মনে।"

শ্রীঈশ্বরপুরী অতিশয় দৈন্য ভরে উত্তর প্রদান করলেন—

* * আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ।।

বিপ্র শিরোমণি সন্ন্যাসী প্রবর শ্রীঈশ্বরপুরী কত দৈন্য ভরে উত্তর প্রদান করলেন। দৈন্যই সাধুর ভূষণ।

শ্রীমুকুন্দ দত্ত তাঁকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন ইনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। তখন শ্রীমুকুন্দ অতি সুস্বরে একটী শ্রীকৃষ্ণ-লীলা কীর্ত্তন ধরলেন। শ্রীমুকুন্দের মধুর কণ্ঠধ্বনির কাছে কে স্থির থাকতে পারেন?

যেই মাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে।
পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি পৃথিবীতে।।

শ্রীঈশ্বরপুরী প্রেমে ঢলে পড়লেন ভূমির উপর। নয়নের জলে ধরাতল সিক্ত হ'তে লাগল। বৈষ্ণবগণ দেখে অবাক হলেন। পরে বলতে লাগলেন—এমন কৃষ্ণভক্ত ত' কখনও দেখিনি। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য অমনি তাঁকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। তারপর সকলে চিনতে পারলেন ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রের প্রিয় শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী। সকলে আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।

শ্রীঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ নগরে অবস্থান করছেন। একদিন দৈবক্রমে পথে শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। মহাপ্রভু পাঠশালা থেকে গৃহে ফিরছেন।

চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধ পুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর।।

শ্রীঈশ্বরপুরী একদৃষ্টে শ্রীগৌরসুন্দরের দিকে তাকিয়ে পরে জিজ্ঞাসা করলেন বিপ্রবর! তোমার নাম কি? ঘর কোথায়? ও কি পুঁথি পড়াও?

মহাপ্রভু দৈন্য ভরে শ্রীঈশ্বরপুরীকে নমস্কার করলেন। শিষ্যগণ বলতে লাগলেন—এঁর নাম শ্রীনিমাই পন্ডিত। ঈশ্বর পুরী বললেন—তুমি সেই নিমাই পন্ডিত! পুরী বড় হরষিত হলেন। মহাপ্রভু বিনীত ভাবে শির নীচু করে বললেন—শ্রীপাদ, কৃপা করে অদ্য আমার ঘরে চলুন। মধ্যাহ্নে তথায় প্রসাদ গ্রহণ করবেন। কত বিনয় ভাবে মধুর বাক্যে আমন্ত্রণ। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রীঈশ্বরপুরী তাঁর গৃহে এলেন। মহাপ্রভু প্রণয় ভরে স্বহস্তে পুরীর চরণ ধৌত করে দিলেন। শ্রীশচীমাতা তাড়াতাড়ি বিবিধ নৈবেদ্য প্রস্তুত করে

ভগবানকে নিবেদন করলেন। তারপর সে প্রসাদ শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে ভোজন করতে দিলেন। প্রসাদ অবশেষ মহাপ্রভু গ্রহণ করলেন।

বিষ্ণু গৃহে বসে উভয়ে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা বললেন। উভয়ের মন প্রেমে ভরপুর হয়ে উঠল।

শ্রীঈশ্বরপুরী কয়েক মাস এইরূপে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে রইলেন। মহাপ্রভু নিত্য একবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করতে আসতেন। মাঝে মাঝে তাঁকে স্বীয় গৃহে আমন্ত্রণ করে নিতেন।

তখন শ্রীগদাধর অতি শিশু। শ্রীঈশ্বরপুরী তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। পুরীপাদ তাঁকে নিজকৃত 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ অধ্যয়ন করাতেন।

মহাপ্রভু রোজ সন্ধ্যাকালে শ্রীঈশ্বরপুরীকে প্রণাম করতে আসেন। একদিন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন—

* * তুমি পরম পণ্ডিত।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত।।
সকল বলিবা;— কোথা থাকে কোন দোষ।
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ।।

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের এ কথা শুনে মহাপ্রভু হাস্য করতে করতে বলতে লাগলেন—

* * ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপী জন।।
ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়।।

ভক্ত যে ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করুন না কেন, তাতেই শ্রীহরি প্রীত

হন। ভক্তের বাক্যে যে দোষ দেখে শ্রীহরি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। ভগবান কেবল ভাব গ্রহণ করেন।

মহাপ্রভুর এ কথা শ্রবণে শ্রীঈশ্বরপুরীর ইন্দ্রিয় সমুহে যেন অমৃত সিঞ্চিত হল।

শ্রীঈশ্বরপুরী বুঝতে পারলেন শ্রীনিমাই পন্ডিত অসাধারণ মহাপুরুষ।

শ্রীঈশ্বর পুরী কিছুদিন নবদ্বীপ পুরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করে তীর্থ পর্য্যটনে বের হলেন।

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যার বিলাস সমাপ্ত করে আত্মপ্রকাশ যুগধর্ম নাম প্রেম বিতরণ করবার ইচ্ছা করলেন। প্রথমে পিতৃ পিন্ড দানের ছলনা করে গয়া ধামে এলেন। সে সময় শ্রীঈশ্বর পুরী গয়া ধামে ছিলেন। মহাপ্রভু সর্ব্বত্র পিন্ড দানাদি শেষ করে যখন শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে পিন্ড দানের জন্য এলেন, তখন শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে এবং তাঁর মাহাত্ম্য শ্রবণ করে প্রেমাবেশে ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। দৈবযোগে হঠাৎ শ্রীঈশ্বরপুরী সেখানে এলেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখে তিনি অবাক হলেন এবং শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের নিকট সমস্ত কথা অবগত হ'লেন।

কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু চৈতন্য হ'লে সামনে ঈশ্বরপুরীপাদকে দেখলেন। অমনি উঠে তাঁকে দন্ডবৎ করলেন।

শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরসুন্দরকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। দুজনার প্রেমাশ্রুতে দুজনে ভাসতে লাগলেন।

মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

প্রভু বলে, গয়া যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার।।

তীর্থে পিন্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ
সেহ—যারে পিন্ড দেয়, তরে সেইজন।।
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন।।
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরও পরম তুমি মঙ্গল প্রধান।।

—(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫০-৫৩)

মহাপ্রভু দৈন্যভরে বলতে লাগলেন—আমার সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ আপনার দর্শন মাত্রই সিদ্ধ হয়েছে। আপনি তীর্থ সমূহের পরম তীর্থ স্বরূপ। আপনার চরণরজঃ তীর্থসমূহ প্রার্থনা করে। হে পুরীপাদ, আমি তাই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি আপনি আমাকে সংসার সিন্ধু থেকে পার করুন ও শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মের অমৃত রস পান করান।

সংসার সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে।।
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি,—এই চাহি দান।।

—(চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৫৪-৫৫)

মহাপ্রভুর এই উক্তি শ্রবণ করে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ বলতে লাগলেন—

বলেন ঈশ্বরপুরী,— শুনহ পন্ডিত।
তুমি যে ঈশ্বর অংশ জানিনু নিশ্চিত।।

আমি তোমার পান্ডিত্য ও চরিত্র দেখেই বুঝতে পেরেছি তুমি ঈশ্বরের অংশে অবতীর্ণ। আমি আজ শুভ স্বপ্ন দেখেছিলাম — তার ফল হাতে হাতে

পেলাম। পণ্ডিত! সত্য করে বলছি তোমাকে দর্শন করে আমি পরম আনন্দ লাভ করেছি। আমি যখন তোমাকে নবদ্বীপ পুরে দেখেছি তখন থেকে আমার চিত্ত কেবল তোমার চিন্তা ছাড়া যেন অন্য চিন্তা করতে চায় না। আমি সত্য করে বলছি, তোমার দর্শনে আমি কৃষ্ণ দর্শন সুখ পাচ্ছি।

মহাপ্রভু এসব কথা শুনে নম্র শিরে বন্দনা করলেন এবং হাস্য করতে করতে বললেন—আমার পরম সৌভাগ্য।

অন্য একদিন মহাপ্রভু বিনীত ভাবে শ্রীপুরীপাদের নিকট বললেন আমাকে কৃপা করে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করুন। মন্ত্র দীক্ষার অভাবে আমার চিত্ত বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পুরীপাদ মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করে অতিশয় আনন্দিত হয়ে বলতে লাগলেন—

পুরী বলে,— মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা?
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা।।

—(চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৭ অঃ ১০৬ শ্লোক)

শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরসুন্দরকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন।

একদিন শ্রীঈশ্বরপুরী দ্বিপ্রহরে মহাপ্রভুর বাসস্থলে এলেন। মহাপ্রভু তাঁকে দর্শন করে আনন্দে ভাসতে লাগলেন। দণ্ডবৎ প্রভৃতি করে মধ্যাহ্ন করবার জন্য প্রার্থনা জানালেন। পুরী বললেন— তোমার হস্তের অন্ন ভোজন করা পরম সৌভাগ্যের কথা।

মহাপ্রভু স্বহস্তে রন্ধন করে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে বহু যত্ন করে ভোজন করালেন। ভোজনানন্তর পুরীপাদের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করলেন এবং

পুষ্প মাল্যাদি প্রদান করলেন।

স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর জগতে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা পরিচর্য্যা ধর্ম শিক্ষা প্রদান করলেন। মহতের পরিচর্য্যা ছাড়া কখনও কৃষ্ণপ্রেমভক্তি পাওয়া যায় না। শ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম সেবাই ভক্তির দ্বার।

শ্রীগৌরসুন্দর গয়া থেকে ফিরবার পথে কুমারহট্টে শ্রীঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানে এসে প্রেম ভরে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। মহাপ্রভুর নয়নজলে ভূমি সিক্ত হল। পরিশেষে গুরু-পাদপদ্মের জন্মস্থানের ধূলা উড়নীতে বেঁধে নিয়ে নবদ্বীপ অভিমুখে চললেন। বললেন এ ধূলা আমার প্রাণ স্বরূপ।

অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন ও জননীর আদেশে শ্রীপুরী ধামে অবস্থান করতে লাগলেন। এ সময় শ্রীঈশ্বর পুরীও অন্তর্ধান লীলা করলেন। অপ্রকট কালে শ্রীঈশ্বর পুরী নিজ সেবক শ্রীগোবিন্দ ও কাশীশ্বর পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর নিকট যাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন।

মাধবেন্দ্র পুরীবর শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য করিলেন শ্রীচৈতন্য
জগদ্‌গুরু শ্রীগৌর মহাপ্রভু।

শ্রীশ্রীপুন্ডরীক বিদ্যানিধি

শ্রীগৌরসুন্দর পুন্ডরীককে বাপ বলে ডাকতেন। বিদ্যানিধি মহাশয় প্রেমনিধি বা আচার্য্যনিধি নামেও পরিচিত ছিলেন। শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর তাঁকে বৃষভানু রাজা বলতেন। "বৃষভানু তয়াখ্যাতঃ পুরা যে ব্রজমন্ডলে। অধুনা পুন্ডরীকাক্ষো বিদ্যানিধি মহাশয়ঃ।। (গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ৫৪ সংখ্যা) পূর্ব্বে ব্রজমন্ডলে যিনি বৃষভানু রাজা ছিলেন অধুনা তিনি শ্রীপুন্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়। তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য ছিলেন। শ্রীগদাধর পন্ডিত তাঁকে গুরু পদে বরণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম বানেশ্বর (মতান্তরে শুক্লাম্বর) ব্রহ্মচারী ও মাতার নাম—গঙ্গাদেবী। তাঁর পত্নীর নাম রত্নাবতী। তাঁর পিতা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের ছয়ক্রোশ উত্তরে হাট হাজারি থানার একক্রোশ পূর্ব্বে মেখলা গ্রামে তাঁর শ্রীপাট ছিল। বিদ্যানিধি মহাশয়ের ভজন মন্দিরটি অধুনা নিতান্ত জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীপুন্ডরীক বিদ্যানিধির বিশেষ বিবরণ দিয়েছেন—

চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পন্ডিত।
পরম-স্বধর্ম সর্ব্ব-লোক-অপেক্ষিত।।
কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর।।
গঙ্গাস্নান না করেন পদস্পর্শভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে।।

গঙ্গায় যে-সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার।।
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্বথা।।
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তা'ন।
দেবার্চ্চন-পূর্বে করে গঙ্গাজল-পান।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৭।২৩-২৮)

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে মহাভাব প্রকাশ ক'রে বিদ্যানিধি নাম নিয়ে ক্রন্দন করেছিলেন—

নৃত্য করি, উঠিয়া বসিলা গৌর-রায়।
'পুন্ডরীক বাপ বলি' কান্দে উভরায়।।
পুন্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে।।
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিলা গৌরনিধি।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৭।১২-১৪)

শ্রীবিদ্যানিধি মহাশয় বিষয়ীর মত অবস্থান করতেন। শ্রীনবদ্বীপ নগরেও তাঁর এক বসত বাটী ছিল। শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তাঁর দেশের লোক ছিলেন। তিনি নবদ্বীপ মায়াপুরে এলে শ্রীমুকুন্দ তাঁকে কীর্ত্তন শুনাতেন। একবার শ্রীমুকুন্দ গদাধর পন্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে পুন্ডরীক বিদ্যানিধির বাটীতে এসেছিলেন। গদাধর পন্ডিত বিদ্যানিধিকে প্রণাম করলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁকে বসতে বললেন। বিদ্যানিধি মহাশয় মুকুন্দের নিকট গদাধর পন্ডিতের পরিচয় পেলেন। শ্রীগদাধর পন্ডিত দেখতে পেলেন বিদ্যানিধি মহাশয় বাহ্যতঃ রাজপুত্রের ন্যায়। তাঁর মূল্যবান্ খাট। তাতে দিব্য শয্যা ও পট্ট নেতের বালিশ,

উপরে দিব্যচন্দ্রাতপ। পাশে জলের ঝাঁরি ও তাম্বুলসজ্জিত পিতলের বাটা। আলবাটীর সম্মুখে বিশাল আয়না। দুই পাশে দুইজন ভৃত্য ময়ূরের পাখা নিয়ে ব্যজন করছে। ললাটে চন্দনের উর্দ্ধ পুন্ড্র তার মধ্যে ফাগুবিন্দু শোভা পাচ্ছে। এসব দেখে গদাধর পন্ডিতের সংশয় হল। তিনি মনে মনে বললেন—

"ভাল ত' বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্যভোগ, দিব্যবাস, দিব্যগন্ধ কেশ।।
শুনিয়া ত' ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি, সেহ গেল দরশনে।।

—(চৈঃ ভাঃ ৭।৬৯-৭০)

গদাধর পন্ডিত শিশুকাল থেকেই বৈরাগ্যশীল। শ্রীমুকুন্দ বুঝতে পারলেন গদাধরের মনে কোন সংশয় হয়েছে। তখন মুকুন্দ ভাগবতের এক শ্লোক সুস্বরে গাইতে লাগলেন যাতে বিদ্যানিধির স্বরূপ প্রকাশ পায়।

অহোবকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যাং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।।

—(ভাঃ ৩।২।২৩)

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্।।

—(ভাঃ ১০।৬।৩৫)

ভক্তিযোগের এই বর্ণন শ্রবণ করে বিদ্যানিধি মহাশয় প্রেমে পাগলপ্রায় হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার।।
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
এককালে হৈল সবার অবতার।।
'বোল, বোল' বলি' মহা লাগিল গর্জ্জিতে।
স্থির হইতে না পারিলা পড়িলা ভূমিতে।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ ৭।৭৯-৮১)

ভূতলে প'ড়ে বিদ্যানিধি মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে করতে বললেন— মোর প্রাণের ঠাকুর কোথায় গেল? কোথায় কৃষ্ণ? হায়! হায়! আমি বঞ্চিত হ'লাম। তাঁর নয়নের জলে ধরণী সিক্ত হতে লাগল। কি মহাকম্প এক এক বার হচ্ছিল। দশজন সেবকও ধ'রে রাখতে পারছিলেন না। বিদ্যানিধির অত্যদ্ভুত কৃষ্ণ-ভক্তি প্রেম-বিকার সকল দর্শন ক'রে শ্রীগদাধর পণ্ডিত বিস্ময়ান্বিত হলেন। তিনি বললেন—

"হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিলুঁ।
কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ।।"

গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দকে বলতে লাগলেন—

"মুকুন্দ, আমার তুমি কৈলে বন্ধুকার্য্য।
দেখাইলে ভক্ত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য।।
এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে।
ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি-দরশনে।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৭।৯৭-৯৮)

গদাধর পণ্ডিত বললেন, —মুকুন্দ! আমি যখন এঁর কাছে অপরাধ করেছি তখন এঁর থেকে মন্ত্র দীক্ষা নেব। মুকুন্দ বললেন— বেশ ত, ভাল

কথা। অতঃপর মুকুন্দ বিদ্যানিধির কাছে গদাধর পণ্ডিত সম্বন্ধে সমস্ত কথা বললেন। গদাধরের কথা শুনে বিদ্যানিধি পরম সুখী হলেন। তারপর শুক্ল-পক্ষের দ্বাদশীর দিন বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিতকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন।

একদিন শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয় রাত্রে অলক্ষিতে শ্রীগৌরসুন্দরের কাছে এলেন এবং আনন্দে প্রভুর চরণ তলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে ক্রন্দন করে বলতে লাগলেন— হে কৃষ্ণ! হে বাপ! আমি অপরাধী। আমায় আর কত দুঃখ দিবে? তুমি সমস্ত জগতকে উদ্ধার করলে, কেবল আমায় বাদ দিলে। গৌরসুন্দর তৎক্ষণাৎ বিদ্যানিধিকে কোলে তুলে নিলেন। এবার ভক্তগণ বিদ্যানিধিকে চিন্‌তে পারলেন। গৌরসুন্দর বিদ্যানিধিকে বলতে লাগলেন—

"আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা-সিদ্ধি করিলা আমার।
আজ পাইলাঙ সর্ব-মনোরথ-পার।।

* * *

নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধঃ৭।১৩৮, ১৪৩)

ভক্তগণ আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। অতঃপর বিদ্যানিধি মহাশয় অদ্বৈতাদি ভক্তগণের চরণ বন্দনা করলেন। বিদ্যানিধির সঙ্গে সমস্ত ভক্তের মিলন হল।

মহাপাপী জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করে মহাপ্রভু যখন ভক্ত সঙ্গে গঙ্গাতে জলকেলি করছিলেন তখন তথায় বিদ্যানিধিও ছিলেন। প্রভুর নদীয়া সংকীর্ত্তন বিলাসের সময় বিদ্যানিধি প্রধান সহচর ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন পুরীধামে অবস্থান করতেন, প্রতি বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ও পুরীধামে যেতেন। পুরীধামে মহাপ্রভুর

চন্দন যাত্রার সময় নরেন্দ্র সরোবরে ভক্তসঙ্গে জলকেলি কালে বিদ্যানিধি মহাশয় স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে জলকেলি করতেন।

"দুই সখা—বিদ্যানিধি, স্বরূপদামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর।।"

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৮।১২৪)

একদিন পুরীধামে শ্রীগদাধর পন্ডিত মহাপ্রভুকে বললেন, আমার ইষ্টমন্ত্র সুষ্ঠুভাবে উচ্চারিত হচ্ছে না। মনে হয় মন্ত্রটি কারও কাছে প্রকাশ করেছি। মহাপ্রভু বললেন— তোমার গুরু বিদ্যানিধি তিনি অল্পকালের মধ্যে এখানে আসবেন। এ সম্বন্ধে তখন তুমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে। ঠিক এমন সময় বিদ্যানিধি মহাশয় পুরী ধামে এসে হাজির। তাঁকে পেয়ে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীগদাধর পন্ডিতের ইচ্ছা পূর্ণ হল। বিদ্যানিধি মহাশয়ের থাকবার স্থান হল সমুদ্রতীরে যমেশ্বর। তিনি স্বরূপ-দামোদর প্রভুর বড় প্রিয় মিত্র ছিলেন। দুইজনে সর্বদা ইষ্টগোষ্ঠী করতেন এবং জগন্নাথ দর্শন করতেন।

এমন সময় শ্রীক্ষেত্রে ওড়ন ষষ্ঠী পর্ব্ব-যাত্রা আরম্ভ হল। জগন্নাথ নববস্ত্রাদি ধারণ করছিলেন। ভগবানের নববস্ত্র হল—মাড়ুয়া বস্ত্র। মাড়ুয়া বস্ত্র অশুচি হলেও ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সেবকগণ তাঁকে এ বস্ত্র পরিয়ে থাকেন। এইদিন নব মাড়ুয়া বস্ত্র ধারণ লীলা উৎসবটি খুব জাঁকজমকের সঙ্গে হচ্ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণসহ বস্ত্রধারণ লীলা দর্শন করছিলেন, জগন্নাথদেব শুক্ল-পীত-নীল রঙের বিবিধ পট্টবস্ত্র ধারণ করে পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হচ্ছিলেন। কত রকমের বাজনা যাত্রাকালে বাদিত হচ্ছিল। কিছু রাত পর্য্যন্ত মহাপ্রভু এ যাত্রা কৌতুক আনন্দ-চিত্তে দর্শন করলেন। তারপর ভক্তসঙ্গে নিজ স্থানে বিজয় করলেন। এমন সময় দুই বন্ধু স্বরূপ

দামোদর প্রভু ও বিদ্যানিধি মহাশয় বিবিধ নর্মালাপ কর্‌তে কর্‌তে মাড়ুয়া বস্ত্রের কথা তুললেন। মাড়ুয়া বস্ত্র ঈশ্বর পরেন, এতে সন্দেহ যুক্ত হয়ে বিদ্যানিধি মহাশয় স্বরূপদামোদর প্রভুকে বল্‌তে লাগলেন—এদেশে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রভূত বিচার আছে। তথাপি ঈশ্বর অপবিত্র মাড়ুয়া বস্ত্র ধারণ করেন কেন?

স্বরূপদামোদর প্রভু বললেন—ইহাই বোধ হয় এ দেশের আচার। দেশাচার যদি হয়, ইথে দোষ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে রাজা নিষেধ করতেন। বিদ্যানিধি বললেন—ঈশ্বর স্বতন্ত্র। যা ইচ্ছা তিনি করতে পারেন। কিন্তু সেবক পাণ্ডাগণ সে অপবিত্র মাড়ুয়া বস্ত্র ধারণ করে কেন? মাড়ুয়া বস্ত্র এত অপবিত্র যে স্পর্শ করলেও হাত ধুতে হয়। রাজপাত্রগণ অবুধ, এর বিচার করেন না। রাজাও দেখি এই দিন মাড়ুয়া বস্ত্র শিরে ধারণ করেন। স্বরূপদামোদর প্রভু বললেন—ভাই! বোধ হয় ওড়নষষ্ঠীর দিন এ বস্ত্র সম্বন্ধে কোন দোষ নাই। কারণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম জগন্নাথরূপে অবতীর্ণ। তজ্জন্য এখানে বিধি নিষেধের কোন বিচার নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় বললেন— জগন্নাথ ঈশ্বর—সব কিছু ধারণ করতে পারেন। তাই ব'লে কি এগুলাও ব্রহ্ম হ'ল? এরাও কি বিধি নিষেধের অতীত হল? এই সব কথা বলে হাস্য করতে করতে দুই মিত্র নিজ নিজ বাসস্থানে এলেন এবং শয়ন করলেন। অনন্তর বিদ্যানিধি মহাশয় স্বপ্ন দেখলেন যে শ্রীজগন্নাথ ও বলরাম দুইজনে ক্রোধে অধীর হয়ে বিদ্যানিধির দুই গালে দুই চড় লাগিয়ে বলতে লাগলেন—

মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি।
সকল জানিলা তুমি রহি' এই ঠাঞি।।
তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে।
জাতি রাখি' চল তুমি আপন-ভবনে।।

আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১০।১৩২-১৩৪)

শ্রীপুন্ডরীক বিদ্যানিধি ক্রন্দন করতে করতে শ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণে মাথা রেখে বলতে লাগলেন— হে নাথ। যেমন অপরাধ করেছিলাম, তেমনি শাস্তি পেলাম। আজ আমার পরম শুভদিন। তোমার শ্রীহস্ত আমার কপোলে লাগল। জানি না কোন্ জন্মে কি সুকৃতি করেছিলাম। তাই তোমার হস্ত স্পর্শ অনুভব করলাম। ভগবান শ্রীবিদ্যানিধির প্রতি স্বপ্নে এইরূপ কৃপা করে অন্তর্দ্ধান করলেন। বিদ্যানিধি প্রভাতে গাত্রোত্থান করে দেখলেন শ্রীজগন্নাথ ও বলরামের চপেটাঘাতে তাঁর দুই গাল ফুলে গেছে। স্বপ্ন-বিবরণ স্মরণ করে তিনি লজ্জিত হলেন। প্রতিদিন স্বরূপ-দামোদর প্রভু প্রাতে তাঁর নিকট আগমন করতেন এবং উভয়ে জগন্নাথ মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে যেতেন। অন্যান্য দিনের মত এদিনও স্বরূপ দামোদর প্রভু বিদ্যানিধির বাসস্থানে এলেন। দেখলেন বিদ্যানিধি তখনও শায়িত আছেন। সেদিন এতক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যায় থাকবার কারণ জানতে চাইলে বিদ্যানিধি মহাশয় স্বরূপ দামোদর প্রভুকে নিকটে ডেকে রাত্রের অলৌকিক স্বপ্ন বিবরণ দিলেন। বিদ্যানিধির মুখে সবকিছু শ্রবণ করে এবং তাঁর দুই গাল ফোলা দেখে স্বরূপদামোদর প্রভু আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। তিনি বললেন—স্বপ্নে এসে ভগবান কাহাকেও শাস্তি প্রদান করেন এইকথা কখনও শুনি নাই। কিন্তু আজ তা প্রত্যক্ষ করলাম। আপনার সমান ভাগ্যবান্ ত্রিলোকে কে আছে? সাক্ষাৎ ভগবানের করস্পর্শ লাভ করেছেন। স্বরূপদামোদর আনন্দভরে শ্রীবিদ্যানিধি প্রভুর প্রশংসা করলেন। সখার সম্পদ দেখে যেমন সখার আনন্দ হয় সেরূপ পুন্ডরীক বিদ্যানিধির সৌভাগ্য দেখে দামোদর প্রভু নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করতে লাগলেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন বিদ্যানিধি মহাশয়। গৌরসুন্দর তাঁকে বাপ ডাকতেন।

বিদ্যানিধি প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-সহচর ছিলেন।

অতঃপর শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তি উল্লেখ করে এবং শ্রীবিদ্যানিধি প্রভুর চরণ বন্দনা করে প্রবন্ধ শেষ করছি।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাঁহারে কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে।।

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১০।১৮১)

— — ঃঃ — —

শ্রীশ্রীভূগর্ভ গোস্বামী

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর চরিত সম্বন্ধে যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তেমন তাঁর সুহৃৎ শ্রীল ভুগর্ভ গোস্বামীর চরিত সম্বন্ধেও না।

শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ দুইজনে অভিন্ন হৃদয় ছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে তাঁরা ব্রজধামে বাস করতেন।

শ্রীভুগর্ভ গোস্বামী শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন শ্রীগোবিন্দদেবের পূজারী শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীমুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস প্রভৃতি।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল ভাগবত দাস প্রভু একসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস করতেন।

ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস।
যেই দুই আসি' কৈল বৃন্দাবনে বাস।।
—(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ১২।৮২)

শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী লিখেছেন—

"ভূগর্ভ ঠক্কুরস্যাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী।"

—(শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা)

যিনি ব্রজে প্রেমমঞ্জরী ছিলেন গৌর-লীলায় তিনি ভূগর্ভ ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী কার্ত্তিক শুক্লা চতুর্দ্দশীর দিন ব্রজধামে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী অভিন্নাত্মরূপে ব্রজে বাস করতেন। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বর্ণন করেছেন—

ভূগর্ভেতে স্নেহ যৈছে জগতে প্রচার।
লোকনাথ সহ দেহ ভিন্ন মাত্র তাঁর।।
—(ভক্তি রত্নাকর ১ম তরঙ্গ ৩১৬)

বৃন্দাবন ধামে সর্বপ্রথমে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী।

রূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গোস্বামিপাদের সঙ্গে শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর এ ভাবে স্মরণ করেছেন—

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ না ভজিনু তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ।
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
ইঁহা সবার পাদপদ্ম না সেবিনু তিল আধ
আর কিসে পূরিবেক সাধ।।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ,
যেহোঁ কৈল চৈতন্য চরিত।

গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত।।
সে সব ভকত সঙ্গ যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।।

— — ঃঃ — —

শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামী

শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকসেবাসম্পৎসমন্বিতম্।
পদ্মনাভাত্মজং শ্রীমল্লোকনাথ প্রভুং ভজে।।

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের ঐকান্তিক সেবাসম্পত্তি বিশিষ্ট শ্রীপদ্মনাভ তনয় শ্রীল লোকনাথ প্রভুকে আমি ভজনা করি।

যশোহরের অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে, তার পূর্বে কাচনাপাড়ায় শ্রীপদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য পত্নী শ্রীসীতা দেবীর সঙ্গে বাস করতেন। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে যশোহর ষ্টেশন থেকে মোটরে সোনাখালি হ'য়ে খেজুরা এবং খেজুরা থেকে তালখড়ি যাওয়া যায়।

শ্রীপদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বড় প্রিয় ও অনুগত ছিলেন। শ্রীপদ্মনাভ ও শ্রীসীতা দেবীর গৃহে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী আবির্ভূত হন। শ্রীলোকনাথের ছোট ভাইয়ের নাম শ্রীপ্রগল্ভ ভট্টাচার্য্য। শ্রীপ্রগল্ভ ভট্টাচার্য্যের বংশধর অদ্যাপি তালখড়ি গ্রামে বসবাস করছেন।

শৈশবকাল থেকে শ্রীলোকনাথ সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। পিতা-মাতা ও গৃহত্যাগ করে তিনি নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শনের জন্য উপস্থিত হন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীলোকনাথকে প্রণয়ভরে আলিঙ্গন করে শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবনধামে যেতে আদেশ করেন। কিন্তু শ্রীলোকনাথ অনুমানে বুঝতে পারলেন মহাপ্রভু দুই তিন দিনের মধ্যে গৃহ ত্যাগ করবেন। তাই তিনি বড় কাতর হ'য়ে পড়লেন।

মহাপ্রভু শ্রীলোকনাথের মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে অনেক প্রবোধ দিলেন এবং বললেন—শ্রীবৃন্দাবন ধামেই তাঁদের পুনর্মিলন হ'বে।

এ সম্বন্ধে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভক্তি-রত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে লিখেছেন—

"কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুপদে প্রণমিল।।
অন্তর্য্যামী প্রভু লোকনাথে আলিঙ্গিয়া।
করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া।।
লোকনাথ প্রভুপদে আত্ম-সমর্পিল।
প্রভুগণে প্রণমিয়া গমন করিল।।"

— (শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রথম ৩০৫-৩০৭)

শ্রীল লোকনাথ আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন না। বিরহবিধুর হয়ে তীর্থ-ভ্রমণ করতে লাগলেন।

দুঃখী হৈয়া কৈল বহু তীর্থ-পর্য্যটন।
কতদিন পরেতে গেলেন বৃন্দাবন।।

—(শ্রী শ্রী ভঃ রঃ প্রথম ৩০৮)

কিছুদিন তীর্থ-পর্য্যটন করে লোকনাথ বৃন্দাবনে গেলেন।

এদিকে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীনীলাচলে এলেন। কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করে জীবোদ্ধার মানসে দক্ষিণে তীর্থ ভ্রমণ করতে লাগলেন। মহাপ্রভুর দক্ষিণে যাত্রার কথা শুনে শ্রীলোকনাথও দক্ষিণ-তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হ'লেন।

মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ করে বৃন্দাবনে এলেন। একথা শুনে শ্রীলোকনাথ প্রভুও শীঘ্র বৃন্দাবনে গেলেন। ইতিমধ্যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন হয়ে প্রয়াগ-ধামে

গেলেন। শ্রীল লোকনাথ মহাপ্রভুর দর্শন পেলেন না, তাই তিনি বড় বিষণ্ণ হলেন। ঠিক করলেন পরদিন প্রভাতে প্রয়াগ-ধাম অভিমুখে যাত্রা করবেন।

"স্বপ্নে প্রভু প্রবোধি রাখিলা বৃন্দাবনে।।
লোকনাথ প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
অজ্ঞাত রূপেতে ব্রজবনে বাস কৈল।।"
—(ভক্তি রত্নাকর ১ম তরঙ্গ ৩১৩-৩১৪)

মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে শ্রীলোকনাথ প্রভুকে প্রবোধ দিয়ে বৃন্দাবনে থাকতে আদেশ করলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অজ্ঞাত ভাবে ব্রজে বাস করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়জন—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীভূগর্ভ প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর মিলন হল।

পরস্পরের প্রতি তাঁদের কি অদ্ভুত স্নেহ। সকলে যেন অভিন্নাত্মা ছিলেন।

গোস্বামিগণের মধ্যে শ্রীমদ্ লোকনাথ গোস্বামী অতি প্রবীণ। তিনি সব সময় প্রেমে বিহ্বল থাকতেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীলোকনাথ গোস্বামীকে বন্দনা করেছেন—

বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম্।।
—(শ্রী ভক্তিরত্নাকর প্রথম ৩২৩)

শ্রীবৃন্দাবনপ্রিয় শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত শ্রীমদ্ কাশীশ্বর ও শ্রীমদ্ লোকনাথ ও শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে আমি বন্দনা করি।

বৃন্দাবনের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থলী সকল দর্শন করে লোকনাথ গোস্বামী আনন্দে ভ্রমণ করতেন। ছত্রবনের পাশে 'উমরাও' নামক গ্রামে কিশোরী-কুন্ড-তীরে কিছুদিন বাস করেন। শ্রীবিগ্রহ্ সেবা করবার তাঁর বড় ইচ্ছা হয়। অন্তর্য্যামী প্রভু তা' জানতে পেরে স্বয়ং একটি বিগ্রহ্ তাঁর করে অর্পণ করে বললেন একে তুমি পূজা কর। এ বিগ্রহের নাম 'রাধাবিনোদ'। বিগ্রহ-দাতা অকস্মাৎ কোথায় অন্তর্ধান হ'লেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। তিনি খুব চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্রীল লোকনাথকে এরূপ চিন্তা মগ্ন দেখে শ্রীরাধাবিনোদ হাস্য করে বলতে লাগলেন—আমাকে কে আনবে এখানে? আমি স্বয়ং এসেছি। আমি এ উমরাও গ্রামের বনে থাকি। এই যে কিশোরীকুন্ড দেখছ, তা আমার বাসস্থান। তুমি শীঘ্র আমায় কিছু ভোজন করতে দাও।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর আনন্দের সীমা রইল না। প্রেম-নীরে ভাসতে ভাসতে তখনই কিছু নৈবেদ্য তৈরী করে ঠাকুরের ভোগ লাগালেন। তারপর পুষ্প-শয্যা করে ঠাকুরকে শয়ন করালেন।

পল্লবে বাতাস করিলেন কতক্ষণ।
মনের আনন্দে কৈল পাদ-সম্বাহন।।
তনুমনঃ প্রাণ প্রভুপদে সমর্পিলা।
সে রূপ-মাধুর্য্যামৃত পানে মগ্ন হৈলা।।
—(ভক্তি রত্নাকর ১ম তরঙ্গ ৩৩৫-৩৩৬)

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অনিকেত ছিলেন। গ্রামবাসী গোপগণ তাঁর ভজন কুটির তৈরী করে দিতে চাহিলেও তিনি তাতে রাজি হ'তেন না। শ্রীরাধাবিনোদের থাকবার জন্য একটী ঝুলি তৈরী করেন, সেটা সব সময় কণ্ঠদেশে ঝুলিয়ে রাখতেন। শ্রীরাধাবিনোদ তাঁর কণ্ঠমণি-স্বরূপ ছিলেন।

ঝুলিটিই মন্দির স্বরূপ। তাঁর আচরণে চরম বৈরাগ্যের পরিচয় পাওয়া যেত। গোস্বামিগণ অনেক যত্ন করে তাঁকে সঙ্গে রাখতেন।

শ্রীমহাপ্রভুর পরমপ্রিয় লোকনাথের চরিত্র বিশ্লেষণ করা বড় কঠিন। যখন মহাপ্রভু ও তাঁর প্রিয় শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাদি অদর্শন-লীলা আবিষ্কার করলেন, তখন শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর বিরহ যাতনা অসহনীয় হল। তখন তিনি একমাত্র মহাপ্রভুর ইচ্ছায় যেন প্রকট ছিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী শ্রীনরোত্তম দাসকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন। তাঁর অন্য কোন শিষ্যের উল্লেখ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

শ্রীনরোত্তম দাস যেভাবে গুরু শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সেবা করতেন তা' অবর্ণনীয়। রাত্রি প্রভাতের আগে শ্রীগুরুদেবের মল-মূত্রাদি পরিষ্কার করে রাখতেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত খদির-বনে (খয়রা গ্রামে) ভজন করতে করতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। এস্থানে শ্রীযুগল-কুন্ড নামে একটি দীঘি আছে। তারই তীরে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর সমাধি।

কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করবার সংকল্প নিয়ে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিকট আশীর্ব্বাদ, অনুমতি ও উপকরণাদি প্রার্থনা করলে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী নিজ নাম বা চরিতাদি সম্বন্ধে কিছু বর্ণন করতে নিষেধ করেন। শ্রীমদ্ লোকনাথ গোস্বামিপাদের আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, এ ভয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন।

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীগুরু-পাদপদ্মে এ প্রার্থনা করেছেন—

“হা হা প্রভু লোকনাথ রাখ পদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্ট্যে চাহ যদি হইয়া আনন্দে।।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণ তৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ।।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার।।
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি, নিজ পদতলে দেহ ঠাঁঞি।।
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাঙ রাত্রি-দিনে।
নরোত্তম বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে।।”

— -ঃ*ঃ- —

শ্রীশ্রীকাশীশ্বর পন্ডিত গোস্বামী

শ্রীকাশীশ্বর পন্ডিত ছিলেন শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্য। পিতার নাম শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য। তাঁরা কাঞ্জিলাল কানুবংশোদ্ভুত বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁদের রাজ-উপাধি চৌধুরী।

শ্রীরামপুর ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরে চাতরা গ্রামে শ্রীকাশীশ্বর পন্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা ৮ম পরিচ্ছেদ ৬৬ শ্লোক অনুভাষ্য।)

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর।।
তাঁর সিদ্ধি-কালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিল আসিয়া।।
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি' সেবা দিলেন দোহারে।।
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে চলেন আগে কাশীশ্বর।।
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে।।

—(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৮-১৪২)

ব্রহ্মচারী শ্রীকাশীশ্বর পন্ডিত ও শ্রীগোবিন্দ—দু'জন শ্রীঈশ্বর পুরীর

প্রিয় শিষ্য ছিলেন। অন্তর্ধান কালে ঈশ্বরপুরী দু'জনকে শ্রী চৈতন্য-গোসাঞির সেবা করবার আদেশ দিয়ে যান। শ্রীঈশ্বর পুরী অপ্রকট হ'লে দু'জন নীলাচলে মহাপ্রভুর সন্নিধানে আগমন করেন। গুরুর প্রিয় শিষ্য ছিলেন তাঁরা; তাই সম্মানার্হ। তথাপি শ্রীগুরুর আজ্ঞা জেনে মহাপ্রভু তাঁদের সেবা গ্রহণ করলেন। শ্রীগোবিন্দের উপর পড়ল মহাপ্রভুর অঙ্গ-সেবার ভার। শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের উপর পড়ল শ্রীজগন্নাথ দর্শন-কালে লোকের ভিড় ঠেলে সাবধানে মহাপ্রভুকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার ভার।

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত খুব বলবান ছিলেন। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

পুরা বৃন্দাবনে চেটৌ স্থিতো ভৃঙ্গার ভঙ্গুরো।
শ্রীকাশীশ্বর গোবিন্দো তৌ জাতৌ প্রভু সেবকৌ।।
—(শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা)

পূর্ব্বে ব্রজে যাঁরা ভৃঙ্গার ও ভঙ্গুর নামে শ্রীকৃষ্ণের চেট সেবক (জল আনয়নকারী সেবক) ছিলেন, অধুনা তাঁরা কাশীশ্বর ও গোবিন্দ নামে মহাপ্রভুর সেবক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত পুরী ধামে মহাপ্রভুর সঙ্গে বহুকাল অবস্থান করেছিলেন। কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণের মধ্যে তিনি প্রসাদ বিতরণ করতেন।

চাতরা গ্রামে তাঁর সেবিত যে বিগ্রহগণ আছেন তাঁদের পরবর্ত্তী সেবক হন—শ্রীশিবচন্দ্র চৌধুরী। তিনি শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতৃবংশীয়। পূর্ব্বে নয় সের চালের ভোগ হ'ত। বর্ত্তমানে ভোগের কোন ভাল ব্যবস্থা নাই।

কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ গোসাঞি। তিনি শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রেষ্ঠ সেবক ছিলেন।

শ্রীরূপগোস্বামী বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা প্রবর্ত্তন করেছিলেন—শুনে সুখী হয়ে মহাপ্রভু পুরী থেকে শ্রীকাশীশ্বর পন্ডিতকে শীঘ্র বৃন্দাবন যাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু শ্রীকাশীশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরকে ত্যাগ ক'রে যেতে চাইলেন না। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তখন একটী স্ব-স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ তাঁকে দিলেন ও সে বিগ্রহের সঙ্গে ভোজন করলেন, তখন কাশীশ্বরের বিশ্বাস হল। এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বর্ণন করছেন—

কাশীশ্বর কহে, - প্রভু তোমারে ছাড়িতে।
বিদরে হৃদয়, যে উচিত কর ইথে।।
কাশীশ্বর অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি।
দিলেন নিজ স্বরূপ-বিগ্রহ যত্ন করি।।
প্রভু সে বিগ্রহসহ অন্নাদি ভুঞ্জিল।
দেখি কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল।।
গৌর-গোবিন্দ নাম প্রভু জানাইলা।
তারে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা।।
শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া।
করেন অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হইয়া।।

—(ভঃ রঃ ২য় তরঙ্গ)

মহাপ্রভু বললেন এ বিগ্রহের নাম হবে গৌর-গোবিন্দ। কাশীশ্বর পন্ডিত বিগ্রহ নিয়ে বৃন্দাবন গেলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-দেবের দক্ষিণ পাশে সে বিগ্রহ স্থাপন করে প্রেমভরে সেবা করতে লাগলেন।

শ্রীকাশীশ্বর পন্ডিত গোস্বামীর মহিমা অনন্ত ও অপার। তাঁর তিরোভাব তিথি উৎসব আশ্বিন পূর্ণিমার শ্রীরাধা গোবিন্দের মহারাস মহোৎসবের দিন।

— — ঃঃ * ঃঃ — —

শ্রীশ্রীধর ঠাকুর

জয় জয় শ্রীধরঠাকুর দয়াময়।
যাঁর কলা মূলা খায় গৌরাঙ্গরায়।।

শ্রীধরঠাকুর শ্রীমায়াপুর গ্রামের শেষ সীমায় বাস করতেন। তিনি যৎসামান্য কলা-মূলা বিক্রি করে জীবন-যাপন করতেন। রাতভোর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করতেন। ভক্তি বহির্ম্মুখ পাষন্ড হিন্দুগণ তা সইতে পারত না। অকথ্য ভাষায় তাঁকে নানাপ্রকার গালি দিত—

মহাচাষা-বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি-মরে।।
—(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯।১৪৮)

চাষা বেটার ভাতে পেট ভরে না। ক্ষুধার জ্বালায় রাত্রে চিৎকার করে পাষন্ডিগণ এরূপ অনেক কথা বলত; কিন্তু শ্রীধর কারও কথায় কর্ণপাত করতেন না। আনন্দে নিজে কাজ করে যেতেন। বামন পুকুরের বাজারে ছিল তাঁর দোকান। তিনি খুব সত্যবাদী লোক ছিলেন। এক কথায় বেচা-কেনা করতেন। নিরন্তর শ্রীনাম স্মরণ করতেন। বেশী কথা বলতে ভালবাসতেন না। খরিদ্দারেরা যথার্থ দাম রেখে কলা-মূলাদি নিয়ে যেতেন।

থোড় কলা-মূলা বিক্রি করে শ্রীধর যে পয়সা পেতেন, তার অর্দ্ধেক দিয়ে শ্রীগঙ্গাদেবীর পূজার ফুল মিষ্টি প্রভৃতি খরিদ করতেন, আর অর্দ্ধেকে

তাঁর সংসার নির্ব্বাহ হ'ত।

কোন কোন দিন জননীর আদেশে কলা-মূলা-শাক প্রভৃতি কিনতে শ্রীগৌরসুন্দর বাজারে যেতেন। তিনি শ্রীধরের দোকান থেকে জিনিস কিনতেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর কোন কোন দিন বড় রহস্য করতেন।

শ্রীধর এক দরে বিক্রি করতেন। শ্রীগৌরসুন্দর তার অর্দ্ধেক দাম বলতেন। শ্রীধর উঠে শ্রীগৌরসুন্দরের হাত থেকে কলাটি মূলাটি কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেন। গৌরসুন্দর ছেড়ে দিতেন না। পরিশেষে দুইজনের মধ্যে জিনিসটা নিয়ে টানাটানি হ'ত। তামাসা দেখবার জন্য অনেক লোক জড় হ'ত।

একদিন মহাপ্রভু একটা মোচা নিয়ে দর কষাকষি করছিলেন শ্রীধরের সঙ্গে। শ্রীধর মোচাটী কেড়ে নিতে চাইলে মহাপ্রভু বললেন—

প্রভু বলে,—"কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বী।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি।।
আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া।
এতদিন কে আমি, না জানিস্ ইহা।।"

*　　　*　　　*

যে গঙ্গা পূজহ তুমি, আমি তা'র পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা।।
—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।১৬৬-১৬৭, ১৭৯)

শ্রীধর। তোমার একি ব্যবহার? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে। আমার হাত থেকে তুমি জিনিস কেড়ে নিচ্ছ? তুমি একজন তপস্বী। তোমার ত' অনেক পয়সা-কড়ি আছে। আমায় কিছু দিলে ক্ষতি কি? শ্রীধর! এতদিন তুমি কি জান না আমি কে? তুমি প্রতিদিন যে গঙ্গার পূজা কর, আমি তাঁ'র পিতা।

কর্ণে হস্ত দেই, শ্রীধর 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' বলে।
উদ্ধত দেখিয়ে তা'রে দেই পাত খোলে।।
—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।১৮০)

প্রভুর কথা শুনে শ্রীধর 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' বলে কানে আঙ্গুল দিলেন। ভাবলেন শিশু পাগল হয়েছে। শ্রীধর শ্রীগৌরসুন্দরকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন—

মদনমোহন রূপ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলক শোভে উর্দ্ধ মনোহর।।
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতি, নয়ন—দুই পরম চঞ্চল।।
শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে-হেন কলেবরে।।
অধরে তাম্বূল হাসে, শ্রীধরে চাহিয়া।
আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া।।
—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।১৬৯-১৭২)

কি অপূর্ব্ব মদনমোহন রূপ। ললাটে উর্দ্ধ পুন্ড্র তিলক, পরিধানে ত্রিকচ্ছ বসন, শিরে কুঞ্চিত কেশদাম, গলদেশে শুভ্র যজ্ঞোপবীত ও নয়ন যুগলের সুষমা বর্ণন করা যায় না। অধর তাম্বুল রাগে রঞ্জিত।

এভাবে দুইজনের মধ্যে যখন কথোপকথন হচ্ছিল তখন শ্রীগৌরসুন্দর মোচাটি ভূমিতে রেখে দিয়েছিলেন। হাস্য করতে করতে তিনি আবার মোচাটি হাতে নিলেন।

শ্রীধর বললেন—শুন ঠাকুর! আমি তোমার কুক্কুর, তুমি আমায় ক্ষমা কর, মূল্য দিতে হ'বে না। তুমি এমনি নিয়ে যাও।

মহাপ্রভু বললেন—শ্রীধর! তুমি বড় চতুর লোক। তোমার কলা বেচা অনেক অর্থ আছে।

ঠাকুর এ বাজারে আর কি দোকান নাই?

অনেক দোকান আছে, তাতে আমার কি? তুমি আমার যোগানদার, তোমাকে ছাড়ব কেন?

ঠাকুর, বেশ কথা, তোমার পায়ে পড়ি। তোমার কাছে আমি পরাজিত। আজ থেকে বিনা কড়িতে তোমায় জিনিস দিব।

যত খারাপ জিনিস তাই দিবে ত?

ব্রাহ্মণ ঠাকুর! খারাপ জিনিস দিব কেন?

আচ্ছা ভাল, ভাল, তাই হউক।

কিছুক্ষণ এভাবে কলহ করে মহাপ্রভু চল্‌লেন। শ্রীধর তাকিয়ে রইলেন। এ শিশু একদিন কোন অতিমুক্ত পুরুষ হ'বেন। কি মধুময় ভাষা! কিরূপ চাহনি। এত চঞ্চলতা করলেও মনে কোন দুঃখ হয় না। বাজারে আর কোথাও যায় না। শুধু আমার কাছে আসে। আমার কত ভাগ্য।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিদিন শ্রীধরের থোড় মোচার তরকারী তাঁর কলার খোলায় ভোজন করতেন।

ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটি হৈলেও অভক্তের উলটি' না চায়।।

—(চৈঃ ভাঃ ৯।১৮৫)

ভগবান ভক্তের দ্রব্য কেড়ে কেড়ে খান, অভক্তের কোটি দ্রব্যের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন না।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিদিন শিষ্যগণসহ নগর ভ্রমণ করতেন। একদিন ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে শ্রীধরের ঘরে এলেন। শ্রীধর তাঁকে ভালভাবে চিনতেন। তাঁর সঙ্গে প্রভু দু'চার দন্ড পরিহাসাদি না করে ছাড়লেন না।

শ্রীধর শ্রীগৌরসুন্দরকে বসবার আসন দিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বসে বলতে লাগলেন—

শ্রীধর! তুমি সারাদিন 'হরি' 'হরি' কর ও লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা কর, কিন্তু তোমার অন্ন-বস্ত্রের এত দুঃখ কেন?

ঠাকুর! উপবাস ত' করি না। ছোট হউক, বড় হউক কাপড় ত' পরি।

শ্রীধর! বস্ত্র ত' পরিধান কর, কিন্তু দেখছি দশ জায়গায় সেলাই রয়েছে। ঘরে আছ, কিন্তু ঘরের ছাউনিতে ত' খড় নাই। দেখ, এ নবদ্বীপে চন্ডী-দূর্গার পূজা করে লোক কত সুখে আছে।

ঠাকুর! তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু দিন সকলের সমান যাচ্ছে।

রত্ন ঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষিগণ থাকে, দেখ, বৃক্ষের উপরে।।
কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়।
সবে নিজ-কর্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়।।

—(চৈঃ ভাঃ আদি ১২।১৮৯-১৯০)

শ্রীধর! তোমার অনেক ধন আছে। তুমি লুকিয়ে রেখেছ। আমি জগতে প্রচার করব। দেখি তুমি কেমন লোককে বঞ্চনা কর।

ঠাকুর! তুমি এখন ঘরে যাও। তোমার সঙ্গে আমি দ্বন্দ্ব করতে চাই না।

শ্রীধর। তুমি আমায় কি দিবে দাও। তোমার থেকে কিছু না নিয়ে কেমনে যাই?

পণ্ডিত। আমি গরীব মানুষ। থোড় কলা বেচে খাই। ইথে তোমায় দেওয়ার মত কিছু ত' দেখছি না।

শ্রীধর। তোমার যে পোতা ধন আছে, এখন তা থাকুক। বর্ত্তমানে বিনা দামে থোড়, কলা ও মোচা ত' দাও।

শ্রীধর চিন্তা করতে লাগলেন—এ-বিপ্রশিশু ত' পাগল মনে হয়। বেশী কিছু বললে মারতেও পারে। ব্রাহ্মণের ছেলে মারলেও কিছু করতে পারব না। আবার রোজ বিনা পয়সায় দিতেও পারি না। তবে সে যে ছলে-বলে নেয় না, সেও আমার ভাগ্য।

ঠাকুর। তোমাকে পয়সা-কড়ি দিতে হবে না, এ থোড় কলা মোচা নিয়ে যাও। আমার সঙ্গে আর ঝগড়া কর না।

শ্রীধর। ভালয় ভালয় দিলে কেইবা ঝগড়া করে? তবে ভাল জিনিস দিও। বামনকে কানা গরু দান কর না।

কতক্ষণ শ্রীধরের সঙ্গে এরূপ বাক্যালাপ করে শ্রীগৌরসুন্দর শিষ্যগণসহ গৃহাভিমুখে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রীধর, তুমি আমায় কি মনে কর তা' বললেই আমি চলে যাব।

তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে। বিষ্ণুর অংশ।

শ্রীধর। তুমি আমায় জানতে পারলে না। আমি গোপ। তোমার যে গঙ্গার মহিমা, তাও আমার কারণে।

পণ্ডিত। তোমার গঙ্গারও ভয় হয় না। লোকের যত বয়স হয়, তত

শান্ত দান্ত হয়। তোমার যত বয়স হচ্ছে ততই চঞ্চলতা বাড়ছে। এখন ঘরে যাও। আমার সঙ্গে আর কলহ্ কর না।

শ্রীধরের কথা শুনে শ্রীগৌরসুন্দর হাস্য করতে করতে গৃহাভিমুখে চললেন।

ভগবান যতক্ষণ নিজের পরিচয় না দেন, ততক্ষণ কেহ্ তাঁকে জানতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দর কিছুদিন বিদ্যার বিলাস করলেন। তারপর গয়াধামে গেলেন। সেখান থেকে দিব্যভাব প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। যখন গৃহে ফিরলেন তখন তাঁর সম্পূর্ণ নতুন ভাব। নিরন্তর ভাবাবেশ। শ্রীবাস অঙ্গনই এ বিলাসের প্রধান কেন্দ্র হল। দিনের পর দিন কত দিব্য ভাব প্রকট করতে লাগলেন তা' বর্ণন করা যায় না।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস মন্দিরে বিষ্ণু-খট্টার উপর বসে মহাভাবাবেশে ভক্তগণকে আদেশ করলেন, —শ্রীধরকে নিয়ে এস, সে আমার স্বরূপ দর্শন করুক। আমাকে দেখবার জন্য সে কত সাধন করেছে, দুঃখ সহ্য করেছে। রাত্রিকালে ভক্তগণ শ্রীধরকে আনতে গেলেন। দূর থেকে ভক্তগণ শুনতে পেলেন শ্রীধর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করছেন।

ভক্তগণ শ্রীধরের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে 'শ্রীধর' 'শ্রীধর' বলে ডাকতে লাগলেন। শ্রীধর এত জোরে হরিনাম করে যাচ্ছিলেন যে ভক্তদের ডাকাডাকি প্রথম শুনতেই পেলেন না। আর কিছুক্ষণ ডাকহাঁক দিবার পর শ্রীধর বাইরে এসে চন্দ্রালোকে ভক্তদের দেখে অবাক হলেন এবং এত রাত্রে কেন এসেছেন জিজ্ঞাসা করলেন। ভক্তগণ বললেন—শ্রীধর! আর কাল বিলম্ব কর না। প্রভু তোমাকে ডেকেছেন। তোমাকে নেবার জন্য আমরা এসেছি "শুনিয়া

প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত। আনন্দে বিহ্বল হই' পড়িলা ভূমিত।।" (চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯।১৫৪) প্রভুর নাম শুনে শ্রীধর ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ ধরাধরি করে তাঁকে মহাপ্রভুর কাছে আনলেন। মহাপ্রভু আনন্দ-ভরে বলতে লাগলেন—শ্রীধর! এস এস আমাকে দেখবার জন্য তুমি বহু জন্ম সাধন করেছ! এ জন্মেও আমার অনেক সেবা করেছ। তোমার শাক, কলা ও মোচার তরকারী আমি বড় প্রীতিতে ভোজন করেছি এবং কলার খোলায় অন্ন খেয়েছি। শ্রীধর! তুমি কি এ সব ভুলে গেছ? শ্রীধর! তুমি উঠ—আমার দিব্যরূপ দর্শন কর। এ রূপ শ্রুতিগণও দর্শন করতে পারেন না। ধীরে ধীরে ভূমি থেকে উঠে শ্রীধর প্রভুর দিব্যরূপ দেখতে লাগলেন—

তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর।।
হাতে মোহন বংশী দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান।।
কমলা তাম্বুল দেই হাতের উপরে।
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে।।

—(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯।১৯০-১৯৩)

শ্রীশ্যামসুন্দররূপে গৌরসুন্দরকে দেখে শ্রীধর পুনরায় ধরাতলে প্রেম-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন। মহাপ্রভু শ্রীধরকে স্পর্শ করে তাঁর চৈতন্য ফিরালেন এবং তাঁকে স্তুতি করতে বললেন।

শ্রীধর বললেন—ঠাকুর! আমি ত কিছুই জানি না।

মহাপ্রভু বললেন—শ্রীধর! তোমার বাক্যই আমার স্তুতি।

আমি বর প্রদান করছি, তোমার জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী অধিষ্ঠান হউক।

শ্রীধর স্তব করতে লাগলেন—

জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ পুরন্দর।।
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিনাথ।
জয় জয় শচীপুণ্যবতী গর্ভজাত।।
জয় জয় বেদগোপ্য জয় দ্বিজরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম পাল করি নানা সাজ।।

—(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯।২০০-২০২)

এভাবে শ্রীধর প্রায় অর্দ্ধপ্রহর কাল কত স্তুতি করলেন। প্রভু তাতে সুখী হয়ে বল্‌লেন—শ্রীধর! তুমি বর গ্রহণ কর।

শ্রীধর বললেন—ঠাকুর! আমি কোন বর চাই না। যদি বর দাও ত এ বর দাও—

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ।।
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল।।

—(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯।২২৪-২২৫)

শ্রীধর এ বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। শ্রীধরের সে-প্রেমক্রন্দন শুনে বৈষ্ণবগণও প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু শ্রীধরকে বললেন—শ্রীধর! জন্মে জন্মে তুমি আমার দাস। আমি তোমায় অনেক পরীক্ষা করেছি। তোমার আচরণে আমি বড় তুষ্ট হয়েছি। তোমার সেবা ও প্রেমে তোমার কাছে আমি ঋণী। মহাপ্রভুর এ কথা শুনে, চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণবগণ 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠলেন।

ধন নাহি জন নাহি নাহিক পান্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য।।
কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে।।
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি কল্পে কোটীশ্বর না দেখিবা তাহা।।
—(চৈঃ ভাঃ ৯।২৩৩-২৩৫)

শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি নদীয়া নগরে ভক্তগণসহ কত বিচিত্র লীলাবিলাস করতে করতে সমগ্র জীব উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস লীলাভিনয় করতে ইচ্ছা করলেন।

সন্ন্যাসে যাবার দিন ভক্তগণকে নিয়ে মহাপ্রভু নগরে নগরে বহু নৃত্য কীর্ত্তন করলেন। সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহে বসে আছেন। ভক্তগণ তথায় সমবেত হতে লাগলেন। আজ প্রভুর কি অপূর্ব্ব দিব্য বেশ। হাসতে হাসতে ভক্তগণকে নিজ কণ্ঠের মাল্য দান করছেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ আনন্দ সাগরে ভাসছেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য এলেন, শ্রীবাস পন্ডিত এলেন, শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিত এলেন। এমন সময় শ্রীধর একটি লাউ হাতে করে এলেন এবং প্রভুকে ভেট দিলেন। মহাপ্রভু স্বহস্তে লাউটী নিয়ে হাসতে লাগলেন। মনে মনে চিন্তা করলেন—শ্রীধরের লাউ না খেয়ে সন্ন্যাসে যাব—তা হতেই পারে না—ভক্তের জিনিস উপেক্ষা করতে পারি না। শচীমাতাকে ডেকে বললেন—আই! শ্রীধর কষ্ট করে লাউ এনেছে। এ লাউ এখনি শ্রীকৃষ্ণের ভোগে লাগাও। এমন সময় আর একজন ভক্ত দুধ নিয়ে এলেন। শচীমাতা তখনি লাউ দিয়ে হালুয়া তৈরী করলেন ও ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের হাতে এনে দিলেন। সে প্রসাদ গৌরসুন্দর স্বহস্তে ভক্তগণকে খাইয়ে নিজে খেলেন। তিনি শ্রীধরকে বললেন—শ্রীধর! তোমার দ্রব্য কি আমি না খেয়ে পারি? শ্রীধর! তুমি কি

আমার কথা রাখবে ? ঠাকুর। কি কথা বল ? কেন রাখব না ? শ্রীধর। এ ভাবে তুমি রোজ আমার বাড়ী এসে দেখা দিও।

মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে কত রকমের হাস্য পরিহাস করবার পর সকলকে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন করবার আদেশ করে বিদায় করলেন। অতঃপর তিনি অন্ত-নিশায় সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য যাত্রা করলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণান্ত মহাপ্রভু যখন পুরীতে অবস্থান করতেন তখন গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর দর্শনে শ্রীধর প্রতিবর্ষ যেতেন।

জয় শ্রীধর ঠাকুর কী জয়।

শ্রীশ্রীরামানন্দ রায়

রাজা শ্রী প্রতাপরুদ্রের অধীন পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোদাবরীর বিশ্বস্ত শাসন কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন শ্রীরামানন্দ রায়। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন, শ্রীসার্ব্বভৌম পন্ডিত তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করেন তিনি যেন শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হন। "তোমার সঙ্গে যোগ্য তেঁহো একজন। পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম।।" (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৭।৬৪) হে প্রভো! পৃথিবী তলে আপনার সঙ্গ যোগ্য এক শ্রীরামানন্দ রায় ছাড়া আর কাকেও দেখছি না। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। তাঁকে বিষয়ী শূদ্র বলে যেন উপেক্ষা না করেন। পান্ডিত্য ও ভক্তিরস দু'টীরই তিনি প্রকৃত অধিকারী, তাঁকে সম্ভাষণ করলেই ইহা উপলব্ধি করতে পারবেন।

শ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ অভিমুখে যাত্রা করে নাম প্রেম বিতরণ করতে করতে এলেন পশ্চিম গোদাবরীর তীরে। পন্ডিত সার্ব্বভৌমের অনুরোধ অনুযায়ী শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা মহাপ্রভুর মনে সদা জাগছিল।

শ্রীমহাপ্রভু গোদাবরীর মনোহর তটে এক বৃক্ষমূলে বসে আছেন। তাঁর অঙ্গ কান্তিতে চতুর্দ্দিক যেন আলোকিত হচ্ছিল। এমন সময় অনতিদূরে রাজপথ দিয়ে স্নান করতে যাচ্ছেন শ্রীরামানন্দ রায়। সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও বিবিধ বাজনা। শ্রীরামানন্দ রায় দূর থেকে বৃক্ষমুলে উপবিষ্ট দিব্য কান্তিযুক্ত সন্ন্যাসীবরকে একদৃষ্টে দর্শন করতে লাগলেন। বৈদিক বিধানে গোদাবরীতে

স্নানাদি সেরে, শ্রীরামানন্দ রায় এলেন সন্ন্যাসীর শ্রীচরণ-দর্শনে। দিব্য সন্ন্যাসী দর্শনে শ্রীরামানন্দের মনে যে কত ভাবোদয় হচ্ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। মহাপ্রভুও তাঁকে অপলক নেত্রে দেখতে লাগলেন। নয়নে নয়নে হল মিলন। তারপর শ্রীরামানন্দ পালকি থেকে নেমে শ্রীমহাপ্রভুর চরণে দন্ডবৎ করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন;কিন্তু বহিরঙ্গ লোক দেখে ধৈর্য্য ধারণ করলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে ভূমি থেকে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি রাম রায়? হাঁ প্রভো! সেই শূদ্রাধম। মহাপ্রভু গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। বললেন—আমার এতদূরে আসবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল।

হাঁ প্রভো! এ অধম শূদ্রের প্রতি এত দয়া কেন?

পুরীতে পন্ডিত সার্ব্বভৌমের নিকট তোমার মহিমা শুনেছি। তোমার মত রসিক ভক্ত দ্বিতীয় নাই, সার্ব্বভৌম বলেছেন।

সার্ব্বভৌম পন্ডিত আমায় এত কৃপা করলেন কেন? বোধহয় আপনি তাঁকে কুতর্ক গর্ত্ত থেকে উদ্ধার করে প্রেমরস সুধা পান করিয়েছেন। বাহ্যতঃ তিনি আমাকে ঘৃণা করেন, কিন্তু অন্তরে স্নেহশীল। এ আপনার কৃপার নিদর্শন। রামানন্দ রায় আবার প্রভুর চরণ ধারণ করলেন, প্রভু আলিঙ্গন করলেন। দুজনার ভাবের অবধি নাই, উভয়ের অঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার সমূহ প্রকাশ পেতে লাগল। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন! শূদ্র রাজাকে স্পর্শ করে এ সন্ন্যাসী এত প্রেম যুক্ত হয়ে পড়লেন কেন? বাহ্যতঃ শ্রীরামানন্দ রায়কে কেহ চিনতে পারত না। ব্রাহ্মণগণের মন জেনে মহাপ্রভু ধৈর্য্য ধারণ করলেন। রামানন্দ রায় বললেন—হে করুণাময় প্রভো! যদি অধমকে কৃপা করবার জন্য আগমন করে থাকেন, আট দশ দিন এখানে অবস্থান করে এ দীনকে উদ্ধার করুন। মহাপ্রভু বললেন—সার্ব্বভৌম বিশেষ করে তোমার

সঙ্গ করবার জন্য বলেছিলেন। তোমাকে দেখে আমার যাবতীয় আকাঙ্খা পূর্ণ হল। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে পুনর্ব্বার মিলবার জন্য বলে ব্রাহ্মণের গৃহে এলেন।

শ্রীরামানন্দ রায় হলেন শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র। ভবানন্দ পূর্ব্বে পাণ্ডুরাজ ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র পঞ্চ পাণ্ডব। রামানন্দ, গোপীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ। ভবানন্দ রায় এ পাঁচ পুত্রকে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সমর্পণ করেছিলেন। ভবানন্দ রায়ের পত্নী কুন্তী দেবী ছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু অপরাহ্ন স্নানাদি সেরে গোদাবরী তটে সে বৃক্ষ মুলে যখন উপবেশন করলেন, শ্রীরামানন্দ রায় এক ভৃত্য সঙ্গে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সন্নিধানে এলেন। রামানন্দ রায় দণ্ডবৎ করতেই মহাপ্রভু উঠে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন ও ধরে বসালেন। অনন্তর দুজনে প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে কৃষ্ণকথা আলাপ করতে লাগলেন। মহাপ্রভু প্রশ্ন করতে লাগলেন, শ্রীরামানন্দ রায় উত্তর দিতে লাগলেন।

শ্রীরামানন্দ রায় সাধ্য তত্ত্বের উত্তরে—প্রথমতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম উল্লেখ করে, পরপর কর্মার্পণ, নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞানমিশ্রা, জ্ঞানশূন্যা ও শুদ্ধাভক্তির কথা বললেন। মহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত কোনটিকেই সাধ্যসার বলে স্বীকার করলেন না। অতঃপর শ্রীরামানন্দ রায় শুদ্ধ কৃষ্ণরতি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির কথা বললেন। মহাপ্রভু বললেন—আরও বল। শ্রীরামানন্দ রায় মধুর রতিতে ব্রজগোপীদের কথা বলে তাঁদের মধ্যে শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর অসাধারণ ভাবের কথা বললেন। তখন মহাপ্রভু বললেন—ইহা সাধ্যসার। আর কিছু বল,—শ্রীরামানন্দ রায় বলতে লাগলেন—শ্রীরাধাই কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতিকা-স্বরূপিণী এবং সখিগণ সে লতার পল্লব পুষ্প পত্রাদি স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ,

শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিণী। রসরাজ ও মহাভাব মিলিত অবতার যিনি ছলপূর্ব্বক আমাকে নাচাচ্ছেন। মহাপ্রভু উঠে রামানন্দের মুখে হস্ত চাপা দিয়ে আর বলতে নিষেধ করলেন। বললেন যথেষ্ট, আর বলতে হবে না। এ রাত্রির মত কথোপকথন শেষ করে দু'জন শয়ন করতে গেলেন।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে পুনঃ শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীমহাপ্রভুর চরণ-প্রান্তে এলেন ও দন্ডবৎ করলেন। মহাপ্রভু উঠে গাঢ় প্রণয়সহ্ আলিঙ্গন করলেন। তারপর কথা আরম্ভ করলেন।

মহাপ্রভু প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং রামানন্দ রায় তার উত্তর দিতে লাগলেন।

প্রঃ। বিদ্যামধ্যে কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ?
উঃ। কৃষ্ণ-ভক্তি বিদ্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

প্রঃ। জীবের কীর্ত্তি কি?
উঃ। শ্রীকৃষ্ণদাস পদবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠকীর্ত্তি।

প্রঃ। জীবের পরম ধর্ম কি?
উঃ। শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমই পরম ধর্ম।

প্রঃ। জীবের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ কি?
উঃ। কৃষ্ণ ভক্তের বিরহ দুঃখ।

প্রঃ। জীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্ত কে?
উঃ। কৃষ্ণ-প্রেমিকই মুক্ত শিরোমণি।

প্রঃ। গানের মধ্যে কোন্ গান শ্রেষ্ঠ?
উঃ। রাধাগোবিন্দের লীলা গান।

প্রঃ। জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল কি?
উঃ। কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ।

প্রঃ। একমাত্র স্মরণীয় কি?
উঃ। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণাদি।

প্রঃ। জীবের একমাত্র ধ্যেয় কি?
উঃ। শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম।

প্রঃ। জীবের শ্রেষ্ঠ বাসস্থান কি?
উঃ। শ্রীকৃষ্ণ লীলাক্ষেত্র।

প্রঃ। জীবের শ্রেষ্ঠ শ্রবণের বিষয় কি?
উঃ। শ্রীরাধা গোবিন্দের প্রেম লীলা।

প্রঃ। জীবের একমাত্র কীর্ত্তনীয় কি?
উঃ। শ্রীরাধা গোবিন্দ নাম।

প্রঃ। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর গতি কি?
উঃ। স্থাবর দেহ ও দেব দেহ।

প্রঃ। জ্ঞানী ও ভক্তের বৈশিষ্ট্য কি?
উঃ। অরসজ্ঞ কাক জ্ঞান-নিম্ব-ফল খায়, রসজ্ঞ কোকিল (ভক্ত) প্রেমাম্র-মুকুল রস-পান করে।

অতঃপর মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে রসরাজ ও মহাভাব মিলিত স্বরূপ দেখালেন। তদ্দর্শনে রামানন্দ রায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান পেয়ে বিবিধ স্তব স্তুতি করতে লাগলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে এ সব রূপের কথা গোপন রাখতে বললেন। মহাপ্রভু বিদায় চাইলেন—রামানন্দ রায় কেঁদে চরণ তলে লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলেন—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার লীলা কে বুঝতে পারে? একমাত্র প্রার্থনা দাসের দাস করে শ্রীচরণ সেবার সুযোগ প্রদান কর। মহাপ্রভু বললেন—তুমি বিষয় ত্যাগ করে নীলাচলে এস, তথায় দুজনে নিরন্তর কৃষ্ণ-কথা রসে দিন কাটাব। এ বলে

মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশের তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন।

মহাপ্রভু তীর্থ ভ্রমণ করে পুরীতে ফিরে এলেন। এদিকে শ্রীরামানন্দ রায়ও রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুমতি নিয়ে পুরী চলে এলেন।

শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রধান মিত্র শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু। শ্রীরামানন্দ রায় কৃষ্ণলীলা নাটক লিখে, দেবদাসীদের দ্বারা তা শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে অভিনয় করাতেন। মহাপ্রভু রামানন্দ সম্বন্ধে বলেছেন যোগীদিগের মন প্রকৃতির মূর্ত্তি দর্শনে বিচলিত হতে পারে; কিন্তু সাক্ষাৎ দেবদাসী স্পর্শে রামরায়ের মন টলে না। শ্রীরামানন্দ রায় ও শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভুর অন্ত্যলীলার সাথী।

রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ।।
—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬।৬)

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর শ্রীরামানন্দ রায় অপ্রকট হন।

হেনকালে প্রভুর অদর্শনের কথা শুনি।
অঙ্গ আছাড়িয়া রাজা লুটায় ধরণী।।
শিরে করাঘাত করি হৈল অচেতন।
রায় রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন।।
—(ভঃ রঃ ৩।২১৮)

— — ꞉꞉ * ꞉꞉ — —

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন।।
— (চৈঃ চঃ আদি ১১।৩০)

শ্রীজগদীশ ভট্ট পূর্ব্বদেশে গৌহাটী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম—শ্রীকমলাক্ষ ভট্ট। ইনি গয়ঘর বন্দ্যঘাটার ভট্টনারায়ণের সন্তান। জগদীশের পিতা ও মাতা উভয়েই পরম বিষ্ণুভক্ত গৃহস্থ ছিলেন। মা বাপের অপ্রকটের পর জগদীশ স্বীয় ভার্যাসহ গঙ্গাতীরে আগমন করেন। তাঁর পত্নীর নাম দুঃখিনী দেবী। জগদীশের ছোট ভ্রাতা মহেশও ভা'য়ের অনুগমনে গঙ্গা তীরে আসলেন। ইঁহারা গঙ্গাতটে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ সন্নিধানে বসবাস করতেন।

"শ্রীগৌরসুন্দর জগদীশকে হরিনাম প্রচারের জন্য নীলাচলে যেতে আদেশ করেন। জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর আদেশে নীলাচলে নাম প্রচার কালে শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনার ফলে জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি নিয়ে এসে আধুনিক চাকদহ থানার অধীন গঙ্গাতীরস্থ যশোড়া গ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে যে জগদীশ পণ্ডিত পুরুষোত্তম থেকে এ জগন্নাথ মূর্ত্তি যশোড়া গ্রামে একটী যষ্টিতে বহন করে নিয়ে আসেন। অদ্যাপি একটি যষ্টি (বাঁক) জগদীশ পণ্ডিতের জগন্নাথ বিগ্রহ—আনা যষ্টি ব'লে যশোড়ার সেবায়েতগণ-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়ে থাকে।"

—(চৈঃ চঃ আদি ১১।৩০ শ্লোকের অনুভাষ্য)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মাঝে মাঝে যশোড়া গ্রামে আগমন করতেন এবং সংকীর্ত্তন মহোৎসব করতেন। শ্রীজগদীশ পন্ডিতের পুত্রের নাম শ্রীরামভদ্র গোস্বামী। যশোড়া মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দেব, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ ও গৌর গোপাল মূর্ত্তি আছেন। প্রবাদ আছে, গৌর গোপাল মূর্ত্তি—শ্রীদুঃখিনী দেবীর স্থাপিত। এ গৌর গোপাল মূর্ত্তিটি পীতবর্ণ। মহাপ্রভু জগদীশ পন্ডিতের ঘরে কয়েক দিন মহোৎসব করবার পর নীলাচলে যেতে উদ্যত হলে জগদীশ পত্নী শ্রীদুঃখিনী দেবী গৌর বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। তখন মহাপ্রভু এ মূর্ত্তি দিয়ে বলেন—আমি নিত্য বিগ্রহরূপে তোমার ঘরে রইলাম। তদবধি এ গৌর গোপাল মূর্ত্তি সেবিত হচ্ছেন।

অপরে যজ্ঞপত্নৌ শ্রীজগদীশ হিরণ্যকৌ।
একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাহঘসৎ প্রভুঃ।।

কেহ কেহ বলেন—পূর্ব্বে যাঁরা যজ্ঞপত্নী ছিলেন, এবার তাঁরা জগদীশ হিরণ্য নামে খ্যাত হয়েছেন। আবার কেহ কেহ বলেন—যিনি পূর্ব্বে চন্দ্রহাস নামে ব্রজের নর্ত্তক ছিলেন, অধুনা তিনি নৃত্য বিনোদী জগদীশ পন্ডিত নামে খ্যাত। মহাপ্রভু শিশুকালে এক একাদশী তিথিতে জগদীশ পন্ডিত ও শ্রীহিরণ্য পন্ডিতের ঘরের অন্ন মেগে খেয়েছিলেন।

প্রভু বোলে,—যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ।।
জগদীশ পন্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত।।
একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার।।

সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ।।
—(চৈঃ ভাঃ আদিঃ ৬।২০-২৩)

একদিন শিশু গৌরহরির ক্রন্দন আর থামে না। সকলে বলতে লাগলেন—বাপ! তুমি কি চাও? যা চাইবে তা পাবে। বালক বললেন—আজ একাদশীতে জগদীশ ও হিরণ্য পন্ডিতের ঘরে বিষ্ণুর জন্য অনেক নৈবেদ্য করেছে। সে সব যদি খেতে পারি তবে আমি সুস্থ হব। বালকের এরূপ অসম্ভব কথা শুনে শ্রীশচীমাতা শিরে হাত দিয়ে খেদ করতে লাগলেন। আজ একাদশী এটুকু শিশু তা কি করে জানল? নারীগণ বললেন—বাপ নিমাই! তুমি কান্না বন্ধ কর, তোমাকে তাই দিব।

"শুনিয়া শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর।।"
—(চৈঃ ভাঃ আদিঃ ৬।২৭)

জগদীশ ও হিরণ্য দুই জন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পরম মিত্র ছিলেন। এ ব্যাপার তাঁরা লোক মুখে শ্রবণ করলেন। তাঁরা পূর্ব্বে জানতে পেরেছিলেন জগন্নাথমিশ্রের ঘরে শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই তাঁরা শ্রীহরির জন্য যা কিছু করেছিলেন, সবকিছু নিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের সম্মুখে রেখে দিলেন ও বললেন—

"দুই বিপ্র বোলে,—বাপ, খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার।।"
—(চৈঃ ভাঃ আদি ৬।৩৩)

বাপ বিশ্বম্ভর! সুখে এ সমস্ত জিনিষ খাও। অদ্য আমাদের কৃষ্ণ পূজা সার্থক হল। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর শিশুগণের সঙ্গে সে অন্ন আনন্দে

ভোজন করতে করতে জগদীশ ও হিরণ্য পন্ডিতকে দিব্য বালগোপাল-স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন।

অনেকশিশুমন্ডলী বিহিতমন্ডলান্তস্থিতং
স্ফুরন্নব-ঘন প্রভং শিখিশিখন্ডচূড়োজ্জ্বলম্।
মুদাশ্নদতিসুন্দরং প্রকটিতং শচীসূনুনা
হিরণ্যজগদীশয়োর্নয়নবর্ত্ম ভেজে বপুঃ।।

—(গৌরাঙ্গ চম্পূ-৯।২০)

নবমেঘসম কান্তিতে উদ্ভাসিত ময়ূর-পুচ্ছে চূড়ায় অতিশয় সমুজ্জল অনেক শিশুমন্ডলীর মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক আনন্দের সহিত ভোজনরত, এরূপ সুন্দর বিগ্রহ শচীনন্দন কর্ত্তৃক প্রকটিত হয়ে জগদীশের ও হিরণ্যের নয়ন পথে দৃষ্ট হলেন।

জগদীশ ও হিরণ্য সে দিব্য রূপ দেখে আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বোধ হয় শ্রীজগদীশ পন্ডিত যশোড়াতে এসে বাস করতেন। প্রতি বছর গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মহাপ্রভুর দর্শনে পুরীতে যেতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পাণিহাটিতে যে চিড়াদধি মহোৎসব করেছিলেন, তাতে শ্রীজগদীশ পন্ডিত উপস্থিত ছিলেন।

পৌষ শুক্লতৃতীয়া শ্রীজগদীশ পন্ডিতের তিরোভাব তিথি।

জয় শ্রীজগদীশ পন্ডিত কি জয়!

— — ঃঃ ঃঃ — —

শ্রীমহেশ পন্ডিত

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মহেশ পন্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কা বাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল।।
—(চৈঃ চঃ আদি ১১ ।৩২)

ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, উদার গোপাল ছিলেন মহেশ পন্ডিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত মাতালের ন্যায় নৃত্য করতেন। শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়—"মহেশ পন্ডিতঃ শ্রীমন্মহাবাহু ব্রজে সখা।।" মতান্তরে মহেশ পণ্ডিত মহাবাহু নামে সখা ছিলেন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ সহচর ছিলেন। পাণিহাটিতে চিড়া-দধি মহোৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। ইহার শ্রীপাট বর্ত্তমান চাকদহে আছে।

"কেহ কেহ বলেন মহেশ পন্ডিত যশোড়ার শ্রীজগদীশ পন্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তবে এ বিষয়ে কোন প্রামাণিক উক্তি না থাকায় সন্দেহ আছে।"
— (চৈঃ চঃ আদি ১১ ।৩২ অনুভাষ্য)

ভক্তিরত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গে দেখা যায়, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যখন খড়দহে আগমন করেন, তখন তিনি শ্রীমহেশ পন্ডিতের শ্রীচরণ দর্শন করেছিলেন। "মহেশ পন্ডিত অতি পরম মহান্ত।।"—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ৫ ।৭৪৪)

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহেশ পন্ডিতকে পরম মহান্ত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়জন বলে বলেছেন। পৌষ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীমহেশ পন্ডিত অপ্রকট হন।

— — ঃঃ — —

শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিত

ধনঞ্জয় পন্ডিত — মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ।।
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫ ।৭৩৩)

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই বলে শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিতের মহিমা বর্ণন করেছেন। শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিতের শ্রীপাট শীতল গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন—ধনঞ্জয় পন্ডিতের জন্ম হয়েছিল চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত জাড়গ্রামে। সেখান থেকে এসে শীতল গ্রামে বা সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে ইনি শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন।

নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-বিলাসে শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিত অবস্থান করতেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধাম থেকে ফিরে এসে জলন্দি নামক গ্রামেও শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেছিলেন। বর্ত্তমান এ স্থানে শ্রীশ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই গৌর ও শ্রীশ্রীদামোদর শালগ্রাম সেবিত হচ্ছেন। শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিতের কোন বংশধর ছিল না। শ্রীসঞ্জয় নামে তাঁর এক ভাই ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম—শ্রীরাম কানাই ঠাকুর। এঁর শ্রীপাট বর্ত্তমান—বোলপুরের সন্নিকট মুলুক গ্রামে আছে। কেহ কেহ বলেন—সঞ্জয় শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিতের শিষ্য ছিলেন। শীতল গ্রামে এখন যাঁরা সেবাইত আছেন তাঁরা শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিতের শিষ্য বংশধর। শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিতের এক শিষ্য শ্রীজীবন কৃষ্ণের স্থাপিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ বর্ত্তমানে শ্রীগোপাল রায় চৌধুরীর ভবনে আছেন। শীতলগ্রামে শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিতের সমাধি মন্দির বর্ত্তমান। কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিত নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার সময়, সন্ন্যাস গ্রহণান্তর পুরী গমনের সময় এবং পুরীতে অবস্থানের সময় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জন্মস্থান ত্রিবেণীর কাছে গুপ্তিপাড়ায়। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করতে পারতেন। মহাপ্রভু যখন প্রথমে নবদ্বীপে মহাসংকীর্ত্তন-লীলা আরম্ভ করেন তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত একজন বড় গায়ক ও নর্ত্তক ছিলেন। মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে যান তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় দেবানন্দ পণ্ডিত উদ্ধার লাভ করেন।

পূর্ব্বে ভাগবত শাস্ত্রের অদ্বিতীয় অধ্যাপক বলে দেবানন্দ পণ্ডিতের খ্যাতি ছিল। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁর পাঠ শ্রবণ করতে যান এবং প্রেমে ক্রন্দন করতে থাকেন। সে সময়ে দেবানন্দের কতিপয় অজ্ঞ ছাত্র পাঠ শ্রবণের বিঘ্ন হচ্ছে মনে করে শ্রীবাস পণ্ডিতকে গৃহের বাহিরে নিয়ে রেখে দেয়। ভক্ত ভাগবতের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা স্বচক্ষে দেখেও দেবানন্দ পণ্ডিত কোন প্রতিবাদ করেন নাই। তাই মহাভাগবত চরণে তাঁর অপরাধ হয়।

শ্রীমহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ ক'রে দেবানন্দের এরূপ মহাভাগবত অবজ্ঞার কথা জানায়ে, ভাগবত সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দান করেন। তিনি বলেন— যারা গ্রন্থ-ভাগবত পড়ে, কিন্তু ভক্ত ভাগবতকে সমাদর করে না তারা অপরাধী। শত শত কল্পেও ভাগবত পড়ে তারা প্রেম পাবে না। ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবত অভিন্ন। গ্রন্থ-ভাগবত জানতে হলে অকপটে ভক্ত ভাগবতের সেবা করতে হয়। মহাপ্রভু দেবানন্দকে উপেক্ষা করলেন। কৃষ্ণ-প্রেম প্রদান করলেন না।

একদিন শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিত নবদ্বীপের কুলিয়ায় এক ভক্ত গৃহে সন্ধ্যায় নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। দেবানন্দ পন্ডিত খবর পেয়ে সেখানে গেলেন এবং বক্রেশ্বর পন্ডিতের দিব্য প্রেমাবেশ দেখে মুগ্ধ হলেন। ক্রমে লোকের খুব ভিড় হতে লাগল। শ্রীদেবানন্দ পন্ডিত তখন একখানি বেত্র হাতে সে ভিড় সামলাতে লাগলেন— যেন শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিত ঠাকুরের নৃত্য-কীর্ত্তনে কোন বিঘ্ন না হয়—এ রূপে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিত মহা-নৃত্য গীত করলেন। পরে বক্রেশ্বর পন্ডিত বসলে দেবানন্দ পন্ডিত তাঁকে দন্ডবৎ করলেন। তাঁর এ সেবায় শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিত বড় খুসী হয়ে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন—"কৃষ্ণ ভক্তি হউক"। সে দিন থেকে দেবানন্দ পন্ডিতের কৃষ্ণ ভক্তি হল। ভক্তের আশীর্ব্বাদে কৃষ্ণে ভক্তি হয়।

শ্রীমহাপ্রভু যখন পুরীধাম থেকে জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্য কুলিয়ায় এলেন, তিনি দেবানন্দ পন্ডিতকে এবার কৃপা করলেন।

প্রভু বলে,—তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর।।
বক্রেশ্বর পন্ডিত—প্রভুর পূর্ণ শক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে তাহারে করে ভক্তি।।
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর।।
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়।।
—(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৯২-৪৯৬)

এ ভাবে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীবক্রেশ্বরের মহিমা গান করেছেন। শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিত পূর্ব্বে নবদ্বীপে বাস করতেন। পরবর্ত্তী কালে মহাপ্রভুর সেবার জন্য তিনি পুরীতে থাকতেন।

পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর।
গদাধর, জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর।।
দামোদর পন্ডিত, ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথদাস।।
ইত্যাদিক প্রভু সঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি প্রভুর করেন সেবন।।
—(চৈঃ চঃ আদি ১০।১২৫-১২৭)

কথিত আছে পরবর্ত্তী কালে কাশীমিশ্র ভবনে শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিত বাস করতেন। সেখানে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী ধ্যান চন্দ্র পদ্ধতি নামে যে গ্রন্থ লিখেছেন, তাতে আছে—

"যিনি পূর্ব্বে ব্রজে নৃত্যগীত বিশারদ তুঙ্গবিদ্যা গোপী ছিলেন অধুনা তিনি শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিত নামে খ্যাত হন। আষাঢ়ী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিতের আবির্ভাব দিন। তিনি অপ্রকট লীলাবিষ্কার করেন আষাঢ় শুক্লাষষ্ঠীতে।

উৎকলের কবি শ্রীগোবিন্দ দেব শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিতের পরিবারভুক্ত, তিনি সপ্তদশ শকের শেষভাগে "শ্রীশ্রীগৌর কৃষ্ণোদয়" নামে একখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তা প্রকাশ করেন।

পদকর্ত্তা শ্রীবৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-রাস মহোৎসবে শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিতের নাম স্মরণ করেছেন।

জীবের ভাগ্যে অবনী আইলা গৌরহরি।
ভুবন মোহন রূপ সোনার পুতলী।।

হরিনামামৃত দিয়া করিলা চেতন।
কলিযুগে ছিল যত জীব অচেতন।।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গদাধর।
সকল ভকত মাঝে সাজে পহুবর।।
খোল করতাল মন্দিরা ঘন রোল।
ভাবের আবেশে গোরা বলে হরিবোল।।
ভুজ তুলি নাচে পহু শচীর নন্দন।
রামাই সুন্দর নাচে শ্রীরঘুনন্দন।।
শ্রীনিবাস হরিদাস আর বক্রেশ্বর।
দ্বিজ হরিদাস নাচে পণ্ডিত শঙ্কর।।
জয় জয় জয় ধ্বনি জগতে প্রকাশ।
আনন্দে মগন ভেল বৃন্দাবন দাস।।

নীলাচলে রথযাত্রাকালে যে চারটি সম্প্রদায় গঠিত হত, তার মধ্যে এক সম্প্রদায়ের প্রধান নৃত্যকার হলেন শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে লিখেছেন—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় ভৃত্য।
এক ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য।।
আপনে মহাপ্রভু গান যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে।।
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্র মুখ।
তারা গায় মুঞি নাঁচো তবে মোর সুখ।।
প্রভু বলে তুমি মোর এক শাখা।
আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা।।
—(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৭-২০)

শ্রীগৌরীদাস পন্ডিত

শ্রীনিত্যানন্দ শাখা বর্ণনে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

শ্রীগৌরীদাস পন্ডিতের প্রেমোদ্দন্ড ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেমা দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি।।
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দে করি প্রাণপতি।।
—(চৈঃ চঃ আদি ১।২৬-২৭)

শ্রীগৌরীদাস পন্ডিতের পিতার নাম—শ্রীকংসারি মিশ্র, মাতার নাম-শ্রীকমলা দেবী। তাঁরা ছয় ভ্রাতা ছিলেন— দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ-চৈতন্য। শ্রীগৌরীদাস পন্ডিত ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবল সখা ছিলেন।

বর্দ্ধমান জেলায় অম্বিকা কালনা—এ ক্ষুদ্র মহকুমা শহর শান্তিপুরের পর পারে। এ শহরে শ্রীগৌরীদাস পন্ডিত বাস করতেন। বর্ত্তমানে শ্রীগৌরীদাস পন্ডিতের গৃহে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করছেন। শ্রীমন্দিরে মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত-লিখিত গীতা পুঁথি আছে। প্রবাদ আছে শ্রীমহাপ্রভু নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে বৈঠাখানি শ্রীগৌরীদাস পন্ডিতের কাছে এ বলে রেখে যান— এ বৈঠা দিয়ে তুমি জীবদের ভব নদীর পর-পারে নিয়ে যেয়ো। মন্দিরে আজও এ বৈঠা আছে। গৌরীদাস পন্ডিতের বড় ভাই সূর্য্যদাস সরখেল। তাঁর দুই কন্যা—শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবী। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু নবদ্বীপে বিবিধ লীলা বিলাস করবার পর যখন সন্ন্যাস লীলা করতে ইচ্ছা করেন এবং কালনায় শ্রীগৌরীদাস পন্ডিতের নিকট বিদায় চাইতে আসেন, তখন শ্রীগৌরীদাস পন্ডিত অত্যন্ত বিরহ কাতর হয়ে পড়লেন।

তথাহি গীত— (ভাটিয়ারী)

ঠাকুর পন্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী।।
আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
রহিব সে নিরখিয়া কায়।।
তোমরা যে দুটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঞি,
তবে সবার হয় পরিত্রাণ।
পুনঃ নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি,
তবে জানি পতিত পাবন।।
প্রভু কহে গৌরীদাস ছাড়হ এমত আশ,
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
সত্য মোর এই বাক্য রাখ।।
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিঃশ্বাস,
ফুকারী ফুকারী পুনঃ কান্দে।
পুনঃ সেই দুই ভাই, প্রবোধ করয়ে তায়,
তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে।।

কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরণে আশ,
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা দুই জনে,
ভকত বৎসল তেঞিঁ গায়।।

তথাহি রাগ—

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে,
আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞিঁ।
নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি,
রহিলাম এই দুই ভাই।।
এতেক প্রবোধ দিয়া, দুই প্রতি মূর্ত্তি লৈয়া,
আইলা পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারি জন দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিস্ময় ভেল,
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ন।।
পুনঃ প্রভু কহে তাঁরে, তোর ইচ্ছা হয় যারে,
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীত লাগি, তোর ঠাঞিঁ খাব মাগি,
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে।।
শুনিয়া পণ্ডিত রাজ, করিলা রন্ধন কাজ,
চারি জনে ভোজন করিলা।
পদ্ম মাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বুলাদি সমর্পিয়া,
সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিলা।।
নানা মতে পরতীত, করাঞা ফিরাল চিত,
দোঁহারে রাখিল নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই খায় মাগি,
দোঁহে গেলা নীলাচলপুরী।।

পন্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা,
সেইমত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস, তার পদ করি আশ,
কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস।।

শ্রীগৌরীদাসের প্রেমাধীন হয়ে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ শ্রীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিহার করতে লাগলেন, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ মৃদু হাস্য করতে করতে গৌরীদাসকে বললেন—হে গৌরীদাস। তুমি পূর্ব্বে সুবলসখা ছিলে। এ সব কি তোমার মনে নাই? যমুনা পুলিনে আমরা কত বিলাস করেছি। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ এ-রূপ মধুর আলাপ করতে করতে কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি ধারণ করলেন। সেই গোপবেশ, হস্তে শিঙ্গা, বেত্র ও বেণু; শিরে শিখি-পুচ্ছ। গলে বনমালা, চরণে নূপুর দাম। শ্রীগৌরীদাসও পূর্ব্বভাব ধারণ করলেন। এ ভাবে কিছুক্ষণ বিলাস করলেন। অতঃপর প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীগৌরীদাস স্থির হলেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

প্রতিদিন বহুবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করে শ্রীগৌরীদাস শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ভোগ দিতেন। সর্ব্বদা সেবায় তন্ময়। নিজের শারীরিক ক্লেশাদির অনুভূতি নাই। পন্ডিত ক্রমে বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হলেন। তথাপি ঐরূপ রন্ধন করে ভোগ দেওয়া বন্ধ করলেন না। তাঁর রন্ধন-শ্রম দেখে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ একদিন বাইরে রোষ-ভাব দেখিয়ে অভুক্ত অবস্থায় রইলেন। তখন পন্ডিত প্রণয়-কোপ করে বলতে লাগলেন—

বিনা ভক্ষণেতে যদি সুখ পাও মনে।
তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারণে।।
এত কহি গৌরীদাস রহে মৌন ধরি।
হাসি প্রভু পন্ডিতে কহয়ে ধীরি ধীরি।।

অল্পে সমাধান নহে তোমার রন্ধন।
অন্নাদি করহ বহু প্রকার ব্যঞ্জন।।
নিষেধ না মান শ্রম দেখিতে না পারি।
অনায়াসে যে হয় তাহাই সর্বোপরি।।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের এ উক্তি শুনে শ্রীগৌরীদাস বললেন—আজ ত' ভোজন কর; বহু পদ করে তোমাদের আর ভোজন করাব না। শাক-মাত্র রন্ধন করে তোমাদের পাতে দিব। পন্ডিতের কথা শুনে দুই ভাই হাসতে হাসতে ভোজন করতে লাগলেন।

কোন সময় পন্ডিতের ইচ্ছা হল গৌর-নিত্যানন্দকে অলঙ্কার পরাবেন। তাঁর এ ইচ্ছা জানতে পেরে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিবিধ অলঙ্কার পরে সিংহাসনে বিরাজ করতে লাগলেন। পন্ডিত মন্দিরে প্রবেশ করে অবাক্ হলেন। এত অলঙ্কার কোথা থেকে এল? শ্রীগৌরীদাস আনন্দে বিহ্বল হলেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এরূপে কত ভাবে কত লীলা বিলাস করে শ্রীগৌরীদাসের ঘরে বিরাজ করতে লাগলেন।

শ্রীগৌরীদাসের প্রিয় শিষ্য ছিলেন শ্রীহৃদয়চৈতন্য। একবার শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীগৌরীদাস শিষ্য-গৃহে গেলেন। যাবার সময় শ্রীহৃদয়-চৈতন্যকে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবাভার দিয়ে গেলেন। হৃদয়চৈতন্য খুব প্রেমভরে সেবা করতে লাগলেন। গৌর-জন্মোৎসব নিকটবর্ত্তী হল। মাত্র তিন দিন সময় আছে। এখন পর্য্যন্ত শ্রীগৌরীদাস ফিরে এলেন না। হৃদয়চৈতন্য খুব চিন্তা করতে লাগলেন। অতঃপর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উৎসবের পত্রাদি লিখে শিষ্য-ভক্তদের কাছে প্রেরণ করলেন। ঠিক এ-সময় শ্রীগৌরীদাস ফিরে এলেন, হৃদয়চৈতন্য শ্রীগুরুদেবের কাছে পত্রাদি লিখে তিনি যে শিষ্য-ভক্তদের আমন্ত্রণ করেছেন তা জানালেন। অন্তরে যদিও সুখী হলেন তথাপি বাইরে ক্রোধ দেখিয়ে বলতে লাগলেন—

মোর বিদ্যমানে কৈলা স্বতন্ত্রাচরণ।।
নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা যথা তথা।
যে কৈলা সে কৈলা এবে না রহিবা এথা।।
ঐছে শুনি প্রণমিয়া চরণ-যুগলে।
গঙ্গা-তীরে গিয়া রহিলেন বৃক্ষতলে।।

শ্রীহৃদয়চৈতন্য শ্রীগুরু চরণে প্রণাম করে গঙ্গাতীরে এলেন এবং এক বৃক্ষতলে অবস্থান করতে লাগলেন। এমন সময় একজন ধনী নৌকায় বহুধন নিয়ে হৃদয়চৈতন্যের নিকট এলেন। হৃদয়চৈতন্য সেই ধন গুরু—গৌরীদাসের নিকট পাঠায়ে দিলেন। সেই ধন দিয়ে শ্রীগৌরীদাস হৃদয় চৈতন্যকে গঙ্গাতীরে উৎসব করতে বললেন। শ্রীগুরুদেবের আদেশ পেয়ে শ্রীহৃদয়চৈতন্য গঙ্গা তীরে উৎসব আরম্ভ করলেন। ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবগণ সেখানে সমবেত হতে লাগলেন। হৃদয় চৈতন্য ভক্ত মহান্তগণকে নিয়ে উদ্দন্ড নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। তাঁদের মধ্যে স্বয়ং শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য গীত করলেন: হৃদয় চৈতন্য স্বচক্ষে তা দেখতে পেলেন। এদিকে শ্রীগৌরীদাস উৎসব করছেন: পূজারী বড় গঙ্গাদাস মন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন সিংহাসনে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ নাই। এ-ব্যাপার তিনি শীঘ্র শ্রীগৌরীদাসকে জানালেন। পন্ডিত বুঝতে পারলেন--হৃদয়চৈতন্যের প্রেমে বশ হয়ে দুই ভাই তাঁর কীর্ত্তনে যোগদান করেছেন। তখন শ্রীগৌরীদাস মৃদু হাসতে হাসতে একখানি যষ্টি হাতে নিয়ে গঙ্গাতটে যেখানে কীর্তন হচ্ছিল সেখানে এলেন।

চলিলেন গঙ্গাতটে যথা সংকীর্ত্তন।
দেখে দুই ভাই তথা করয়ে নর্তন।।
দুই ভাই দেখি পন্ডিতের ক্রোধাবেশ।
অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশ।।

শ্রীগৌরীদাস দেখলেন গৌর নিত্যানন্দ শ্রীহৃদয়ের হৃদয়-মন্দিরে

প্রবেশ করছেন। তা দেখে আনন্দে শ্রীগৌরীদাস নয়নাশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। বাহ্যতঃ যে ক্রোধ ছিল তা ভুলে গেলেন ও দুই ভুজ উত্তোলন করে ধেয়ে জড়িয়ে ধরলেন শ্রীহৃদয়কে, বললেন—তুমি ধন্য! আজ হতে তোমার নাম "হৃদয় চৈতন্য" হল! নয়ন জলে হৃদয় চৈতন্যকে সিক্ত করতে লাগলেন। হৃদয় চৈতন্য প্রেমে লুটিয়ে পড়লেন শ্রীগৌরীদাসের শ্রীচরণ-তলে। অতঃপর পণ্ডিত হৃদয় চৈতন্যকে নিয়ে স্বগৃহে এলেন এবং প্রাঙ্গণে মহাসংকীর্ত্তন নৃত্য আরম্ভ করলেন। বৈষ্ণবগণ মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত করতে লাগলেন। এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মোৎসব শেষ হল। অতঃপর শ্রীগৌরীদাস শ্রীহৃদয় চৈতন্যকে সেবার অধিকার প্রদান করলেন।

শ্রাবণ শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীগৌরীদাসের তিরোভাব হয়। শ্রীগৌরীদাসের শিষ্য শ্রীহৃদয় চৈতন্য ও শ্রীহৃদয় চৈতন্যের শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে সপ্তম তরঙ্গে শ্রীগৌরীদাসের মহিমা বর্ণন করেছেন।

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

শ্রীনবদ্বীপের কুলিয়ায় শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন। শ্রীমহাপ্রভু তাঁর দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের মহিমা জগতে প্রকাশ করেছেন। ভাগবত শাস্ত্রের বক্তা হিসাবে দেবানন্দ পণ্ডিতের খুব খ্যাতি ছিল। অনেকে তাঁর কাছে ভাগবত পড়তেন।

একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দের কাছে ভাগবত শুনতে এলেন। দেবানন্দ ভাগবত পাঠ আরম্ভ করলেন। চারিদিকে ছাত্রগণ পাঠ শুনছে, কেহ বা সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি দেখছে। শ্রীবাস পরম রসিক ভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের মধুর শ্লোকাবলী শুনতেই প্রেমার্দ্র হয়ে পড়লেন। প্রেমে ক্রন্দন করতে করতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। এ সব দেখে দেবানন্দের ছাত্রগণ মনে করল, --লোকটি পাগল। আমাদের পাঠ শুনতে দিচ্ছে না। চল, একে ধরে বাইরে রেখে দি। জ্ঞানহীন ছাত্রগণ শ্রীবাস পণ্ডিতকে বাইরে রেখে এল। এ সব দেবানন্দ পণ্ডিত দেখলেন, কিন্তু ছাত্রদের বাধা দিলেন না। গুরু যেমন অজ্ঞমতি, ছাত্রগণও তেমনি পাপমতি। শ্রীবাস পণ্ডিত কাকেও কিছু না বলে দুঃখ পেয়ে গৃহে এলেন। এ সব ঘটনা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে হয়েছিল।

অতঃপর মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তিনি শৈশব লীলায় বিদ্যাধ্যয়ন, যৌবনে অধ্যাপকরূপে বিদ্যা-বিলাস এবং অনন্তর আত্মপ্রকাশ করলেন। এ সময় একদিন শ্রীবাস-মন্দিরে মহাভাব প্রকাশ করে ভক্তগণের অতীত কাহিনী বলতে বলতে শ্রীবাস পণ্ডিতকে বললেন--শ্রীবাস! তোমার কি মনে আছে তুমি একদিন

দেবানন্দের গৃহে ভাগবত শুনতে গিয়েছিলে? মধুর ভাগবত শ্লোকাবলী শুনে প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলে, দেবানন্দের অজ্ঞ ছাত্রগণ তোমাকে গৃহের বাইরে রেখে ছিল; তুমি দুঃখ পেয়ে গৃহে এসেছিলে। এ সব কথা শুনে শ্রীবাস মহাপ্রভুর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়লেন।

একদিন মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করতে করতে সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ পণ্ডিতের জাঙ্গালে এলেন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন। তখন দেবানন্দ গৃহে ভাগবত পাঠ করছিলেন। মহাপ্রভু দূর থেকে শুনতে পেলেন। তাঁর পাঠ শ্রবণে প্রভুর ক্রোধ হল—

কোপে বলে প্রভু—বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে।।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার।

* * *

সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয়।।
চারি বেদ—দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত।।
মোর প্রিয় শুক জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত।।
মুঞি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে।।
—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।১৩-১৮)

মহাপ্রভু বললেন—ভক্তি ছাড়া ভাগবতের যারা অন্য অর্থ করে সে অধার্মিক ভাগবতের কিছুই জানে না। মহাপ্রভু ক্রোধ ভরে এই সমস্ত বলতে

বলতে তাঁর গৃহাভিমুখে ধাবিত হলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ধরলেন ও অনুনয় করতে লাগলেন। প্রভু পুনরায় বলতে লাগলেন—

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপ প্রতিষ্ঠায়।।
'ভাগবত বুঝি' হেন যা'র আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ।।
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তিসার।।
—(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।২৩-২৫)

যিনি ভাগবতকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বুদ্ধি করেন তিনি ভাগবত জানতে পারেন। ভাগবতের অর্থ একমাত্র ভক্তি প্রেম দ্বারা বুঝা যায়। ভাগবতের অর্থ বুঝতে হলে ভক্ত-ভাগবতের সেবা করতে হয়। মহাপ্রভু এ রূপ অনেক তত্ত্ব কথা বলে নগর ভ্রমণ করে গৃহে ফিরে এলেন। দেবানন্দ দূর থেকে এসব কথা শুনতে পেলেন। কিন্তু কিছু মনে করলেন না।

কিছুদিন বাদে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরী ধামে চলে গেলেন। তখন দেবানন্দের মনে নির্ব্বেদ হতে লাগল। এমন পুরুষের কাছে আমি একদিন গেলাম না? এমন মহাপ্রেমিক পুরুষকে চিনতে পারলাম না?

একদিন কুলিয়াতে শ্রীবক্রেশ্বর পন্ডিত এক ভক্তের গৃহে এলেন; তিনি রাত্রিকালে তথায় কীর্ত্তন ও নৃত্য করবেন—এ সংবাদ চারিদিকে ঘোষণা করা হল। সন্ধ্যা হতেই ভক্তগণ আসতে লাগলেন। সেই কথা শুনে দেবানন্দ স্থির থাকতে পারলেন না। তিনিও কীর্ত্তনের স্থানে উপস্থিত হলেন। শ্রীবক্রেশ্বরের তেজোময় মূর্ত্তি দেখে এবং মধুর কীর্ত্তন শুনে দেবানন্দ স্তম্ভিত হলেন। তিনি এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। যত রাত্রি হতে লাগল তত লোকের

ভিড় বাড়তে লাগল। দেবানন্দ পন্ডিত তখন একখানি বেত্র হাতে নিয়ে ভিড় সামলাতে লাগলেন। "বক্রেশ্বর পন্ডিত নাচেন যতক্ষণ। বেত্র হস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ।।" —(চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩।৪৭৭) নৃত্য করতে করতে বক্রেশ্বর পন্ডিত যখন প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন তখন দেবানন্দ সাবধানে তাঁকে কোলে তুলে নেন। অঙ্গের ধূলা স্বীয় উড়নী দ্বারা ঝেড়ে দেন ও সে ধূলি অঙ্গে লেপন করেন। এভাবে সেদিন দেবানন্দের ভক্ত সেবা হল।

"কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।"

—(চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩।৩৪৫)

নীলাচল হতে কুলিয়া নগরে মহাপ্রভুর শুভাগমনে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের জন্য সকলে আসতে লাগলেন। পূর্ব্বে যাঁরা প্রভুর চরণে অপরাধ করেছিলেন তাঁরাও প্রভুর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। মহাপ্রভু সকলকে ক্ষমা করে সদুপদেশ দিতে লাগলেন। এমন সময় দেবানন্দ পন্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে এলেন। "দন্ডবৎ দেবানন্দ পন্ডিত করিয়া। রহিলেন এক ভিতে সঙ্কোচিত হৈয়া।।" -(চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩।৪৯০) মহাপ্রভুকে দন্ডবৎ করে দেবানন্দ পন্ডিত সঙ্কোচিত হয়ে একপাশে দাঁড়ায়ে রহিলেন। প্রভু তখন তাঁকে বলতে লাগলেন—তুমি যে আমার প্রিয় বক্রেশ্বরের সেবা করেছ তাতেই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। সেই সেবার ফলে তুমি আমার কাছে আসতে পেরেছ। বক্রেশ্বর কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি। যে তাঁকে সেবা করে সে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করে। মহাপ্রভুর এ কথা শুনে ভক্তি গদ্‌গদ্ চিত্তে দেবানন্দ বলতে লাগলেন—তুমি ঈশ্বর; জীব উদ্ধারের জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছ। আমি পাপী দৈব দোষে তোমার শ্রীচরণ সেবা করি নাই। তোমার অহৈতুকী কৃপা থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। হে সর্বভূতাত্মা অন্তর্য্যামী প্রভো। তুমি পরম দয়ালু। তুমি দয়া করে আমায় দর্শন দিয়েছ তাই

দর্শন পেয়েছি! হে করুণময়, আমাকে কিছু সদুপদেশ প্রদান কর ও ভাগবতের কি ব্যাখ্যা করব—কৃপা করে আমায় বলে দাও। দেবানন্দ পন্ডিতের বাক্য শুনে মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

শুন বিপ্র! ভাগবতে এই বাখানিবা।
'ভক্তি' বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা।।
আদি মধ্য অন্ত্যে ভাগবত এই কয়।
বিষ্ণু-ভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়।।

* * *

যেন রূপ মৎস্য কূর্ম আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা' সবার।।
এই মত ভাগবত কা'রো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়।।
ভক্তি যোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি যে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়।।
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত সর্ব শাস্ত্রে গায়।।
'ভাগবত বুঝি' হেন যা'র আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ।।
অজ্ঞ হই' ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত অর্থ তা'র হয় দরশন।।
প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ।।

—(চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩।৫০৫-৫১৬)

হে বিপ্র! পূর্বে তুমি যে শ্রীবাস পন্ডিতের চরণে অপরাধ করেছিলে, তাঁর চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কর। গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত দুই সমান। ভক্ত ভাগবতের কৃপা হলে গ্রন্থ-ভাগবত স্ফূর্তি হবে। দেবানন্দ তৎক্ষণাৎ শ্রীবাস পন্ডিতের চরণে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। শ্রীবাস দেবানন্দকে আলিঙ্গন করলেন। দেবানন্দের অপরাধ দূর হল। চতুর্দ্দিকে ভাগবতগণ 'হরি হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। সে দিন থেকে শ্রীদেবানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেন।

পৌষ কৃষ্ণৈকাদশী তিথি শ্রীদেবানন্দ পন্ডিতের তিরোভাব দিবস।

শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর

শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের অন্য নাম ছিল শ্রীরাম দাস। শ্রীকৃষ্ণ লীলায় যিনি শ্রীদাম নামক গোপ-সখা ছিলেন, তিনি অধুনা অভিরাম বা রাম দাস নামে খ্যাত। অভিরাম গোপাল ঠাকুর খাঁনাকুল কৃষ্ণনগরে বাস করতেন। তিনি নিত্যানন্দের প্রিয় পাত্র ছিলেন। অভিরাম গোপাল ঠাকুরের পত্নীর নাম--শ্রীমালিনী দেবী। শ্রীগোপীনাথ জীউ অভিরাম গোপাল ঠাকুরকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে খাঁনাকুল কৃষ্ণনগরে প্রকট হন। প্রবাদ তিনি ভূমির মধ্যে ছিলেন স্বপ্নে বলেন--আমি এখানে আছি , আমাকে বের করে পূজা কর। অতঃপর শ্রীঅভিরাম সে স্থান খনন করতেই ভূগর্ভে মনোহর শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। ঐ স্থানের নাম হয় রাম কুন্ড।

গোপীনাথ প্রকট কুন্ডের দিব্যজল।
স্নান পানে হৈলা সবে আনন্দ বিহ্বল।।
'রামকুন্ড' বলি খ্যাতি হইল তাহার।
লোক গতায়াত যত সীমা নাই তার।।
— (শ্রীভক্তি রত্নাকর ৪র্থ তরঙ্গ)

একদিন শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর কৃষ্ণ-ভাবাবিষ্ট হয়ে সখ্য রসে বংশী বাজাতে ইচ্ছা করেন। প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে ঠাকুর চতুর্দিকে বংশীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এমন সময় সামনে একটী বৃহৎ কাষ্ঠ খন্ড দেখলেন। ষোলজন লোক সেই কাষ্ঠ-খন্ড তুলতে সমর্থ হচ্ছিল না। তিনি সেই কাষ্ঠ-খন্ড তুলে বংশী তৈরী করে বাজাতে লাগলে। "রাম দাস মুখ্যশাখা

সখ্য প্রেমরাশি। ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলি কৈল বাঁশী।।" —(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ১১।১৬) শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের একটী প্রসিদ্ধ চাবুক ছিল। তার নাম ছিল জয়-মঙ্গল। তিনি যাকে সেই চাবুক মারতেন তার কৃষ্ণ প্রেমোদয় হত।

একদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁর দর্শনের জন্য এলেন। তাঁর অঙ্গে ঠাকুর তিনবার ঐ চাবুক স্পর্শ করতেই, ঠাকুরের পত্নী শ্রীমালিনী দেবী বলতে লাগলেন—ঠাকুর! আর মোরো না, শান্ত শ্রীনিবাস বালক; তোমার চাবুক স্পর্শে সে অধীর হয়ে পড়বে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের চাবুক-স্পর্শে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় হল।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড় দেশে প্রচার কার্য্য করতে আদেশ করেন, শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীরামদাস, শ্রীগঙ্গাধর দাস প্রভৃতিকে দিয়েছিলেন। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরকে দেখে পাষন্ডগণ কম্পমান হত। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছানুসারে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর আমতা এবং বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর, কোতলপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্যবর্গের বংশধরগণ বসবাস করেন। শ্রীপাট খাঁনাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ বিরাজ করছেন। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর চৈত্র কৃষ্ণ সপ্তমীতে অন্তর্ধান হন।

— — ঃঃ * ঃঃ — —

শ্রীবাসুদেব ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর

শ্রীবাসুদেব ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর এঁরা তিন ভাই সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তিন ভাইয়ের গানের তালে তালে স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করতেন। "মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব তিন ভাই। গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই।।-(চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৫।১৫৯) কেহ্ কেহ্ বলেন— তাঁদের মাতুলালয় শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বুড়ন বা বুরঙ্গী গ্রামে ছিল। কোন কারণে শ্রীবাসু ঘোষ ঠাকুরের পিতা কুমারহট্টে এসে বাস করেন। পরবর্ত্তী কালে বাসু ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর নবদ্বীপে এসে বাস করেন। তাঁরা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে আবির্ভূত হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও শ্রীগৌরসুন্দরের তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলেছেন এঁরা তিন ভাই ব্রজের মধুর রসের আশ্রয় বিগ্রহের (শ্রীরাধিকার) কায়ব্যূহ ছিলেন।

শ্রীবাসু ঘোষ ঠাকুর মহাপ্রভুর শৈশব লীলার পদ অধিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত একটি অপূর্ব্ব শৈশব লীলা বর্ণন— যথা ঃ—

গীত

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।।

বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে—বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু।।
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে।।
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমনো লোভা।।

শ্রীগৌরাঙ্গই শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে বাসু ঘোষ ঠাকুর সুন্দর গীত লিখেছেন — যথা গীত —

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবন করে যাঁর চরণ বন্দন।।
নীলাচলে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধর।
নদীয়া নগরে দন্ড কমন্ডলু কর।।
কেহ বলে পুরবেতে রাবণ বধিলা।
গোলোকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা।।
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
"হরে কৃষ্ণ" নাম গৌর করিলা প্রচার।।
বাসুদেব ঘোষ বলে করি যোড় হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ।।

—— — ಃ০ಃ — ——

কি কহিব শত শত তুয়া অবতার।
একলা গৌরাঙ্গ চাঁদ পরাণ আমার।।
বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী।
শিব, শুক, নারদ লইয়া জনা চারি।।

সেতু বন্ধ কৈলা তুমি রাম অবতারে।
এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে।।
কলিযুগে কীর্ত্তন করিয়া সেতু বন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু জড় অন্ধ।।
কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী।
গোরা গুণে মাতিল ভুবন দশ চারী।।
না জানিয়ে জপ তপ এ-বেদ বিচার।
কহে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার।।

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস বর্ণন—গীত

সুধা খাটে দিল হাত, বজ্র পড়িল মাথাত,
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে,
শচীর মন্দির কাছে গেল।।
শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের কাছে বসি,
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা অন্তে কোথা গেল,
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।।
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি দু'নয়নে,
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু কেশে যায়, বসন না রহে গায়,
শুনিয়া বধূর মুখে কথা।।
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি,
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে, কান্দিয়া কান্দিয়া পথে,
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া।।
তা' শুনি নদীয়ার লোকে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে,
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজনে পথে ধায়, দশজনে পুছে তায়,
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা।।
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে,
কাঞ্চন-নগরের পথে ধায়।
বাসুকহে—আহা-মরি, আমার শ্রীগৌরহরি,
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়।।

শ্রীনিত্যানন্দের রূপ গুণাদি বর্ণন—তথা হি গীত

নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু।
জীবের চির পুণ্য ফলে, বিধি আনি মিলাইলে,
রঙ্ক মাঝে রতনের সিন্ধু।।ধ্রুঃ।।
দিগ্ নেহারিয়া যায়, ডাকে পহু গোরা রায়,
ধরণীতে পড়ে মুরছিয়া।
প্রিয় সহচর মেলে, নিতাইরে করি কোলে,
কান্দে চাঁদ বদন হেরিয়া।।
নব কঞ্জারুণ আখি, প্রেমে ছল্ ছল্ দেখি,
সুমেরু বহিয়া মন্দাকিনী।
মেঘ গভীর স্বরে, ভাই ভাই রব করে,
পদ ভরে কম্পিত মেদিনী।।
নিতাই করুণাময়, জীবে দিল প্রেমাশ্রয়,
হেন দয়া জগতে বিদিত।

নিজ-নাম সংকীর্ত্তনে, উদ্ধারিলা জগজনে,
বাসু কেনে হইল বঞ্চিত।।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরও মহাপ্রভুর বিভিন্ন সময়ের লীলাবলী অতি সুন্দর বর্ণনা করেছেন।

প্রাণের মুকুন্দ হে। কি আজি শুনিলু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ।।
ইহাতো না জানি মোরা, সকালে মিলিলুঁ গোরা,
অবনত মাথে আছে বসি।।
নিঝরে নয়ন ঝরে, বুক বহি ধারা পড়ে,
মলিন হৈয়াছে মুখ শশী।।
দেখিতে তখন প্রাণ, সদা করে আন ছান,
সুধাইতে নাই অবসর।
ক্ষণেকে সম্বিত হৈল, তবে মুই নিবেদিল,
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর।।
আমি ত বিবশ হৈয়া, তাঁরে কিছু না কহিয়া,
ধাইয়া আইলুঁ তুয়া পাশ।
এই ত কহিলুঁ আমি, যে করিতে পার তুমি,
মোর নাহি জীবনের আশ।।
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
গদাধরের বদন হেরিয়া।
এ গোবিন্দ ঘোষ কয়, ইহা যেন নাহি হয়,
তবে মুঞি যাইমু মরিয়া।।

—— — ঃঃ * ঃঃ — ——

হেদে রে নদীয়া-বাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদে ফিরাও।।
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে।।
কি শেল, হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
পরাণ পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।।
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন বিলাস।।
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া।।

শ্রীমাধব ঘোষ ঠাকুরও বিশেষ সংগীত রচয়িতা ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্য-লীলা, নদীয়া সংকীর্ত্তন বিলাস ও সন্ন্যাস-লীলা প্রভৃতির সুন্দর বর্ণন করেছেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর তাঁর সংকীর্ত্তন-বিলাসের একটী রূপের বর্ণন।

নাচে পহু কলধৌত গোরা।
অবিরত পূর্ণ কল, মুখ বিধু মন্ডল,
নিরবধি প্রেমরসে ভোরা।।
অরুণ কমল পাখী, জিনি রাঙ্গা দুটি আঁখি,
ভ্রমর ফুল দুটি তারা।
সোনার ভূধরে যৈছে, সুরনদী বহে ঐছে,
বুক বহি পড়ে প্রেমধারা।।
কেশরীর কটি জিনি, তাহাতে কৌপীন খিনি,
অরুণ বরণ বহির্বাস।

গলায় দোলয়ে মালা, ভূষণ করিয়া আলা,
নাসা তিল-কুসুম বিলাস।।
কনক মৃণাল যুগ, সুবলিত দুটি ভুজ,
কর-যুগ কঞ্জের বিলাস।
রাতা উৎপল ফুল পদ নহে সমতুল
পরশনে মহীর উল্লাস।।
আপাদ-মস্তক গায়, পুলকে পুরিত তায়,
যৈছে নীপ ফুল অতি- শোভা।
প্রভাতে কদলী-জনু, সঘনে কম্পিত তনু,
মাধব ঘোষের মন লোভা।।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়—শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরকে যথাক্রমে ব্রজের কলাবতী, রসোল্লাসা, ও গুণতুঙ্গা সখী বলে উল্লেখ করেছেন। মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থান কালে তিন ভাই প্রতি বছর পুরীতে যেতেন এবং রথযাত্রায় কীর্ত্তনাদি করতেন। পরবর্ত্তী কালে তিন ভাই তিন জায়গায় বসবাস করতে থাকেন। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপে, শ্রীমাধব ঘোষ ঠাকুর দাঞীহাটায় ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর তমলুকে গিয়ে বাস করেন।

কিংবদন্তী আছে যে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের কোন সন্তান ছিল না। তিনি চিন্তান্বিত হন যে মৃত্যুর পরে পিন্ড প্রদান করবে কে? শ্রীগোপীনাথ স্বপ্নযোগে বলেন—তুমি খেদ কোরো না– আমি পিন্ড প্রদান করব। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অপ্রকট হলে, পর দিবসে শ্রীগোপীনাথ পিন্ড প্রদান করলেন। আজও গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীগোপীনাথ পিন্ড প্রদান করেন। শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর কার্ত্তিক শুক্ল দ্বিতীয়াতে অপ্রকট হন।

——— ঃ০ঃ ———

শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর

শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর পূর্ব্বে নবদ্বীপে অবস্থান করতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর কিছুদিন কাটোয়ায় বসবাস করেন। অতঃপর গঙ্গাতীরে এঁড়িয়াদহ নামক গ্রামে এসে বাস করেন। শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের শিষ্য কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী। শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর গৌর-নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরকে শ্রীরাধার অঙ্গ-শোভা-স্বরূপ বলা হয়েছে। শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দগণ হ'লেও সখ্য-ভাব-ময় গোপাল নহেন। তিনি মধুর-রসে গোপীভাবে নিজেকে সর্ব্বদা ভাবনা করতেন। মস্তকে গঙ্গাজলের কলসী ধারণপূর্ব্বক—"কে গোরস কিনবে গো?" বলে হাঁক দিতেন। কখন বা গোপীভাবে "কে দই কিনবে গো?" বলে অট্ট হাস্য করতেন।

শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে যখন গৌড়দেশে নাম-প্রেম প্রচার করতে আদেশ করেন, তখন সঙ্গে শ্রীরামদাস ও শ্রীগদাধর দাসকেও প্রেরণ করেন।

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ।।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে।।

—(চৈঃ চঃ আদিঃ ১১।১৩-১৪)

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের মহিমা এভাবে বর্ণন করেছেন—

নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে।।
হেনমতে গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্য পার্ষদ মধ্যে যাঁহার গণনা।।
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে।।
হেন কাজী দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়।।

—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ পঞ্চম অধ্যায়)

শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর একদিন প্রেমোন্মত্ত-চিত্তে হরিসংকীর্ত্তন করতে করতে কাজীর গৃহে এলেন এবং কাজীকে ডাকতে লাগলেন, কাজী ক্রোধভরে ঘরের ভিতর থেকে বাহিরে এলেন; কিন্তু শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের দিব্য-মূর্ত্তি ও দিব্য-ভাব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কাজীর বদনমন্ডল সখ্য ভাব ধারণ করল, ক্রোধও প্রশমিত হল। কাজী বললেন—ঠাকুর! তুমি এখন এলে কেন?

শ্রীগদাধর দাস বললেন—তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

কাজী—আমার সঙ্গে কি কথা আছে বল।

শ্রীগদাধর—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে আপামর জন-সাধারণকে হরিনাম দিয়েছে। সে মধুর হরিনাম তুমি নিচ্ছ না কেন?

কাজী—কাল হরিনাম নেব।

গদাধর—কাল কেন আজই নাও। আমি এসেছি তোমাকে হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করবার জন্য। তুমি পরম মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম নাও। অদ্যই তোমার সমস্ত পাপ-তাপ থেকে তোমায় আমি উদ্ধার করব।

কাজী শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের বাণী শুনে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হলেন অতঃপর হাস্য করতে করতে বললেন—কাল হরি বলব, শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কাজীর মুখে 'হরি' শব্দ শুনে প্রেমসুখে মত্ত হয়ে বললেন আর কাল কেন? এই ত তুমি 'হরি' শব্দ বললে। তোমার সমস্ত পাপ তাপ দূর হল, তুমি পরম শুদ্ধ হলে। এ বলে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর প্রেমে নৃত্য করতে লাগলেন। কাজী পরম শুদ্ধ হলেন এবং গদাধর দাস ঠাকুরের শ্রীচরণে শরণ নিলেন।

এইভাবে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কত পাপী যবনাদিকে নাম দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমীতে অপ্রকট হন। জয় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কী জয়।

— — ঃঃ * ঃঃ — —

শ্রীগদাধর পন্ডিত গোস্বামী

শ্রীগদাধর পন্ডিত শিশুকাল থেকেই মহাপ্রভুর সঙ্গী। শ্রীগদাধরের পিতার নাম শ্রীমাধব মিশ্র, মাতার নাম শ্রীরত্নাবতী দেবী। তিনি মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ সন্নিকটে থাকতেন। রত্নাবতী দেবী শচীদেবীকে বড় ভগিনীর ন্যায় দেখতেন, তাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা মেলামেশাদি করতেন। শিশু-লীলার সময় শ্রীগৌরহরি গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে কখনও স্বীয় অঙ্গনে কখনও গদাধরের গৃহে বিবিধ ক্রীড়া করতেন। গ্রামের পাঠশালায় উভয়ে একসঙ্গে অধ্যয়ন করতেন। শ্রীগদাধর বয়সে মহাপ্রভুর কয়েক বছরের ছোট। মহাপ্রভু ক্ষণকালও গদাধর ছাড়া থাকতে পারতেন না। গদাধরও মহাপ্রভু ছাড়া একক্ষণ থাকতে পারতেন না।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়—যিনি ব্রজে শ্রীবৃষভানু কুমারী শ্রীরাধা, তিনি অধুনা শ্রীগদাধর পন্ডিত নামে খ্যাত। শ্রীস্বরূপ দামোদরকৃত কড়চায়-

"অবধি-সুর বরঃ শ্রীপন্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ
স খলু ভবতি রাধা শ্রীলগৌরাবতারে।"

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর লিখেছেন—

আগম অগোচর গোরা।
অখিল ব্রহ্মাপর, বেদ উপর,
না জানে পাষন্ডী মতি ভোরা।।
নিত্য নিত্যানন্দ, চৈতন্য গোবিন্দ,
পন্ডিত গদাধর রাধে।

চৈতন্য যুগলরূপ, কেবল রসের কূপ,
অবতার সদাশিব সাধে।।
অন্তরে নবঘন, বাহিরে গৌরতনু,
যুগলরূপ পরকাশে।
কহে বাসুদেব ঘোষে যুগল ভজন বশে,
জনমে জনমে রহু আশে।।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

পন্ডিতের ভাব মুদ্রা কহন না যায়।
গদাধর প্রাণনাথ নাম হৈল যায়।।
পন্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
'গদাইর গৌরাঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকেগায়।।
—(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৬০১৬৪)

শ্রীঈশ্বর পুরী নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে কয়েক মাস অবস্থান করেন। সে সময় পুরীপাদ অতি স্নেহ করে গদাধরকে স্বরচিত কৃষ্ণলীলামৃত নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করান।

গদাধর পন্ডিতেরে আপনার কৃত।
পুঁথি পড়ায়েন নাম 'কৃষ্ণলীলামৃত'।।
—(চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১১।১০০)

শ্রীগদাধর পন্ডিত শৈশবকাল থেকে ধীর, শান্ত, নির্জ্জনতা প্রিয় ও বৈরাগ্যবান্ ছিলেন। শৈশবে গৌরসুন্দর খুব চঞ্চলভাব প্রকট করে যাকে তাকে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন। গদাধরের তা বিশেষ পছন্দ হত না। তজ্জন্য তিনি তাঁর থেকে কখন কখন দূরে থাকতে চাইতেন। কিন্তু গৌরসুন্দর তাঁকে ছাড়তেন না; বলতেন—গদাধর! কিছুদিন বাদে আমি এমন বৈষ্ণব হব যে আমার দ্বারে ব্রহ্মা শিবাদিও আসবে।

গদাধর পন্ডিত মুকুন্দ দত্তকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কোন স্থান থেকে সাধু-সন্ন্যাসী নবদ্বীপে এলে মুকুন্দ সে সংবাদ শ্রীগদাধরকে জানাতেন এবং দুজনে দর্শনে যেতেন। একবার চট্টগ্রাম থেকে শ্রীপুন্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে এলেন। মুকুন্দ গদাধর পন্ডিতকে বৈষ্ণব দেখতে যাবার কথা জানালেন। শ্রীগদাধর বৈষ্ণব দর্শনের জন্য কৌতূহলযুক্ত হয়ে মুকুন্দের সঙ্গে পুন্ডরীক বিদ্যানিধিকে দর্শন করতে এলেন। শ্রীগদাধর তাঁর মহাবিষয়ী-প্রায় বেশ-ব্যবহারাদি দেখে যে শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছিলেন, তা, হারিয়ে ফেলেন; বললেন—বৈষ্ণবের এত বিষয়ীর মত ব্যবহার কেন? মুকুন্দ গদাধরের মন জানতে পেরে একটি কৃষ্ণলীলা শ্লোক সুস্বরে কীর্ত্তন করলেন। মুকুন্দ দত্ত পুন্ডরীক বিদ্যানিধির পূর্ব্ব-পরিচিত ছিলেন। মুকুন্দের কণ্ঠধবনি অতি মধুর ছিল। পুন্ডরীক বিদ্যানিধি মুকুন্দের কৃষ্ণলীলা গীত যেই শ্রবণ করলেন, অমনি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে রোদন করতে করতে ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

শুনিলেন মাত্র ভক্তি-যোগের বর্ণন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।
নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার।।

—(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৭।৭৮-৭৯)

শ্রীগদাধর পন্ডিত এবার মনে মনে নির্ব্বেদযুক্ত হলেন। বললেন—না বুঝে এ হেন মহাভাগবত-পুরুষকে বিষয়ী-জ্ঞান করেছি—অপরাধ হয়েছে। অতএব তাঁর কাছে মন্ত্র গ্রহণ ছাড়া অপরাধ থেকে নিস্তার পাব না।

শ্রীগদাধর পন্ডিত অনন্তর শ্রীপুন্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে মন্ত্র চাইলেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীপুন্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট গদাধর পন্ডিতের সবিশেষ পরিচয় বললেন। তা শুনে বিদ্যানিধি বড়ই হরষিত হলেন।

শুনিয়া হাসেন পুন্ডরীক বিদ্যানিধি।
আমারে ত' মহারত্ন মিলাইলা বিধি।।
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই।।
—(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৭।১১৭-১১৮)

অতঃপর শুভদিনে শ্রীগদাধর পন্ডিত শ্রীপুন্ডরীক বিদ্যানিধি থেকে মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

মহাপ্রভু গয়াধামে গিয়ে প্রথম প্রেম প্রকাশ আরম্ভ করলেন। সেখানে শ্রীঈশ্বর পুরীর আশ্রয় লীলা করলেন। গৃহে ফিরে এলেন, এবার এক নূতন জীবন প্রকট করলেন। অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেম সিন্ধুতে ভাসতে লাগলেন। শ্রীগদাধর পন্ডিত মহাপ্রভুর সে অদ্ভুত কৃষ্ণ-প্রেমাশ্রু দর্শন করে স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন থেকে শ্রীগদাধর মহাপ্রভুকে ত্যাগ করে মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও যেতেন না। একদিন গদাধর তাম্বুল নিয়ে প্রভুর নিকট এলে প্রভু ভাবাবেশে জিজ্ঞাসা করলেন --গদাধর! পীত বসনধারী শ্যামসুন্দর কোথায়? এ বলে ক্রন্দন করতে লাগলেন। গদাধর কি জবাব দিবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। সসম্ভ্রমে বললেন--কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে আছেন। এ কথা শুনে মহাপ্রভু নিজ নখে হৃদয় চিরতে লাগলেন। গদাধর তাড়াতাড়ি মহাপ্রভুর হাত চেপে ধরলেন। প্রভু বললেন---গদাধর! আমার হাত ছেড়ে দাও। আমি কৃষ্ণ দর্শন বিনা থাকতে পারছিনা। গদাধর বললেন---তুমি একটু স্থির হও, কৃষ্ণ এখনই আসবেন। এই ত তাঁর আসবার সময় হয়েছে। গদাধরের বাক্য শুনে প্রভু স্থির হলেন। দূর থেকে শচীমাতা গৌর গদাধরের এ রঙ্গ দেখে ছুটে এলেন ও তুষ্ট হয়ে বললেন--গদাধর শিশু হলেও অতি বুদ্ধিমান; আমি ভয়ে গৌরের সামনে যেতে পারি না। গদাধর কেমন কৌশলে তাকে শান্ত করল।

মুঞি ভয়ে নাহি পারি সম্মুখ হইতে।
শিশু হই' কেমন প্রবোধিলা ভালমতে।।
—(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২।২১০)

শ্রীশচীমাতা বললেন—গদাধর! তুমি সর্ব্বদা নিমাইয়ের সঙ্গে থেকো। তুমি তার সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হই। একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে প্রভু কৃষ্ণ-কথা বলবেন—শুনে গদাধরও সেখানে গেলেন ও গৃহের মধ্যে বসলেন। বাহিরে বারান্দায় বসে প্রভু কৃষ্ণ কথা আরম্ভ করলেন। কথা বলতে বলতে স্বয়ং প্রেমরসে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ প্রেমরসে ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ এরূপে প্রেম-রসাস্বাদন হল। গদাধরের প্রেম আর ভাঙে না। মাথা নীচু করে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে প্রভু বললেন—গৃহের মধ্যে কে ক্রন্দন করছে? ব্রহ্মচারী বললেন—তোমার গদাধর। প্রভু বললেন গদাধর? তুমি সুকৃতিমান্। শিশুকাল থেকে কৃষ্ণে তোমার সুদৃঢ় মতি। আমার জন্ম বৃথা গেল, নিজ কর্ম্মদোষে প্রাণনাথ কৃষ্ণকে পেলাম না। প্রভু একথা বলে গদাধরকে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন।

প্রভু যখন নবদ্বীপ-পুরে লীলা বিলাস করতে লাগলেন, তখন প্রধান সহায় গদাধর। ব্রজের রাই-কানাই এবার গৌর-গদাধর রূপে গঙ্গাতটে বিহার করছেন। একদিন প্রভু নগর ভ্রমণ করতে করতে গঙ্গাতটে এলেন এবং উপবন মধ্যে বসলেন। তখন ব্রজ লীলার কথা স্মরণ হল। মুকুন্দ দত্ত মধুর স্বরে পূর্ব্বরাগ গাইতে লাগলেন। গদাধর বন থেকে পুষ্প চয়ন করে হার গেথে প্রভুর কণ্ঠে দিলেন। পূর্ব্বে বৃন্দাবনে শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সাজাতেন, গদাধর ঠিক সেইভাবে প্রভুকে সাজাতে লাগলেন। কেহ মধুর গীত গাইতে লাগলেন, কেহ মধুর-ছন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর গদাধরকে নিয়ে এক বৃক্ষ-মূলে বেদীর উপর বসলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য

আরতি করতে লাগলেন। প্রভুর দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বসলেন। শ্রীবাস পন্ডিত ফুলের হার দিয়ে সাজাতে লাগলেন। নরহরি চামর ব্যজন করতে লাগলেন। শুক্লাম্বর চন্দন লাগাচ্ছেন, মুরারি গুপ্ত জয় জয় ধ্বনি করছেন। মাধব, বাসুদেব, পুরুষোত্তম, বিজয় ও মুকুন্দ প্রভৃতি বিবিধ রাগে গান করতে লাগলেন।

এইরূপে প্রভু নদীয়া-লীলা সাঙ্গ করে যখন সন্ন্যাস-লীলা করলেন এবং জননীর আদেশে নীলাচলে বাস করতে লাগলেন। তখন গদাধরও নীলাচলে গিয়ে বাস করলেন। শ্রীগদাধর পন্ডিত শ্রীগোপীনাথের সেবা করতেন। প্রভু প্রিয়-গদাধরের মন্দিরে প্রায়-সময় কৃষ্ণ-কথা রসে ডুবে থাকতেন। প্রভু যখন বৃন্দাবনে যাত্রা করেন, তখন বিরহ সইতে না পেরে গদাধর প্রভুর সঙ্গে যাবার জন্য উদ্যত হন। প্রভু অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নীলাচলে রেখে যান।

শ্রীগদাধর পন্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন। সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর বসে শুনতেন।

"গদাধর পন্ডিত প্রভুর আগে বসি'।
পড়ে ভাগবত—সুধা ঢালে রাশি রাশি।।"
—(ভঃ রঃ ৩।১০৭)

আটচল্লিশ বছর প্রভু বিচিত্র লীলা করবার পর, শ্রীগদাধর পন্ডিতের সেবিত শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে শ্রীমহাপ্রভু বিলীন হন।

"ন্যাসী শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার?
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার।।
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন,—পুনঃ না আইলা বাহিরে।।'
—(ভঃ রঃ ৮।৩৫৬-৩৫৭)

স্মর গৌর-গদাধর-কেলিকলাং
ভব গৌর-গদাধরপক্ষচরং।
শৃণু গৌর গদাধর চারুকথাং
ভজ গোদ্রুম কানন-কুঞ্জবিধুম।।
—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

বৈশাখ অমাবস্যা তিথিতে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আবির্ভুত হন।

——ঃঃ * ঃঃ——

শ্রীসনাতন গোস্বামী

শ্রীমদ্ জীব গোস্বামীর লঘু-বৈষ্ণব-তোষণীতে স্বীয় বংশ গোত্রাদির পরিচয় প্রদান করেছেন—"তাঁদের আদি বংশধর কর্ণাটক দেশাধিপতি ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ শ্রীসর্ব্ব জগদ্গুরু ছিলেন। তাঁর পুত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ দেব। যুদ্ধ ও বিদ্যাশাস্ত্রে পারঙ্গত ছিলেন শ্রীহরিহর দেব। তিনি বলপূর্ব্বক শ্রীরূপেশ্বর দেবের রাজ্য গ্রহণ করেন। তখন রূপেশ্বর দেব আটটি অশ্ব নিয়ে পত্নীর সঙ্গে পৌলস্ত্যদেশে গমন করেন। সে দেশের অধিপতি শ্রীশেখরেশ্বরের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা হয়। শ্রীরূপেশ্বর দেবের পুত্র শ্রীপদ্মনাভদেব। তিনি নিখিল বেদশাস্ত্রে পন্ডিত ছিলেন। শ্রীপদ্মনাভদেব শেখরেশ্বরের রাজ্য থেকে গঙ্গাতটে নৈহাটিতে এসে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁর আট কন্যা ও পাঁচটি পুত্র। পুত্রগণ সকলে বেদশাস্ত্রে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁদের নাম পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দদেব। শ্রীমুকুন্দদেব জ্ঞাতিগণের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে বাক্‌লা চন্দ্র-দ্বীপে এসে বাসগৃহ নির্মাণ করেন। তিনি যশোরে ও ফতেয়াবাদে যজমান গৃহে সর্ব্বদা যাতায়াত করতেন বলে তথায়ও বাসগৃহ নির্মাণ করে রেখেছিলেন। শ্রীমুকুন্দ দেবের পুত্র শ্রীকুমার দেব। তাঁর অনেকগুলি সন্তান ছিল। তাঁদের মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম বা বল্লভ এঁরা পরম ভাগবত ছিলেন।"

শ্রীসনাতন গোস্বামীর জন্ম খৃষ্টাব্দ ১৪৮৮, শকাব্দ ১৪১০ (গৌড়ীয় ২১।২-৪)। শ্রীরূপ গোস্বামীর জন্ম খৃষ্টাব্দ ১৪৯৩, শকাব্দ ১৪১৫। এঁরা রাজধানী গৌড়ের নিকটে সাকুর্মা নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুল গৃহে থেকে

পড়াশুনা করতেন।

গৌড়ের বাদশা হুসেন সাহ সজ্জনের মুখে শ্রীরূপ ও সনাতনের মহিমা শুনে তাঁদিগকে মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত করলেন। অনিচ্ছুক হলেও যবন-রাজের ভয়ে তারা কার্য্য করতে লাগলেন। বাদশা তাঁদিগকে প্রচুর সম্পত্তি দান করেন। শ্রীরূপ সনাতন গৌড়ের রাজধানী রামকেলিতে বাস করতে লাগলেন। দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় পন্ডিত ব্রাহ্মণ তাঁদের গৃহে আগমন করতেন। কর্ণাটক থেকে ব্রাহ্মণগণ এলে তাঁদের থাকার বিশেষ ব্যবস্থা তাঁরা করতেন। গঙ্গার নিকট তাদের বসতবাটী স্থাপিত হওয়ায় অদ্যাপি ঐ গ্রাম ভট্টবাটী নামে খ্যাত। নবদ্বীপ থেকে ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ রামকেলিতে এলে শ্রীরূপ সনাতন তাঁদের বিশেষ সেবা করতেন।

শ্রীরূপ সনাতনের অধ্যাপক ছিলেন—গৌড়ের অলঙ্কার-স্বরূপ শ্রীবিদ্যাভূষণ পাদ। তাঁদের দর্শন-শাস্ত্রের গুরু—নবদ্বীপের সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি। এ ছাড়া তাঁদের শিক্ষক ছিলেন—শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামপদ ভদ্রপাদ প্রভৃতি। ভাগবতে দশম-টিপ্পনীতে এঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম তিন ভাই শৈশব কাল থেকে ভগবদ-ভক্তিভাব সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা গৃহ সন্নিকটে বৃন্দাবন স্মৃতিতে সুরম্য তমাল, কদম্ব, যুথিকা ও তুলসী কানন তৈরী করেন ও তার মধ্যে রাধাকুন্ড এবং শ্যামকুন্ড নামক সরোবর খনন করে নিত্য শ্রীমদনমোহনদেবের সেবায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁরা লোক-পরম্পরায় শ্রীগৌরসুন্দরের চরিতাবলী শুনে তাঁর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হতেন। কিন্তু অন্তরে কে যেন বলত —তোরা ধৈর্য্য ধারণ কর। এখানেই সেই পতিতপাবন ঠাকুরের দর্শন পাবি।

শ্রীসনাতন গোস্বামীর বয়স তখন অল্প। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখছেন—এক ব্রাহ্মণ তাঁকে একখানি শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রদান করছেন। শ্রীসনাতন ভাগবত পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন স্বপ্ন ভঙ্গ হল। তিনি কা'কেও দেখতে

পেলেন না ; বড় দুঃখিত হলেন। সকাল বেলা স্নান পূজাদি সমাপ্ত করে তিনি বসেছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ একখানি ভাগবত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন—তুমি এই ভাগবত খানি নাও ও নিত্য অধ্যয়ন কর; সর্ব্বসিদ্ধি হবে। এ কথা বলে ব্রাহ্মণ তাঁকে ভাগবত দিয়ে চলে গেলেন। যথার্থ ভাগবত প্রাপ্তিতে শ্রীসনাতনের আনন্দের সীমা রইল না। সে দিন থেকে শ্রীসনাতন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্র-সার জ্ঞানে অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন মদ্‌গুরো মন্মহাধন।
মন্নিস্তারক মদ্ভাগ্য মদানন্দ নমোঽস্তুতে।।
—(শ্রীমদ্ভাগবত মহিমাস্তোত্রম্)

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের বন্দনা করে বলছেন—আমার একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র বন্ধু, গুরু, মহাধন, আমার নিস্তারকারী, আমার ভাগ্যস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।

নদীয়ার প্রাণধন-শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাসী হয়ে পুরী ধামে গেছেন এ সংবাদ শুনে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ মূর্চ্ছিত হলেন। এ জীবনে আর তাঁর দর্শন পাবেন না বলে দুই ভাই কত খেদ করতে লাগলেন। এমন সময় দৈববাণী হল—"তোমরা খেদ ক'র না। করুণাময় গৌরহরি শীঘ্র আসছেন।" দৈববাণী শুনে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন।

পাঁচ বছর সুখে পুরীতে অবস্থান করে জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্য মহাপ্রভু গৌড় দেশে আগমন করলেন। ভক্তগণের সুখের সীমা রইল না; বহুদিন পরে গৌরকে পেয়ে শ্রীশচীমাতা সুখে দেহ-স্মৃতি-রহিত হলেন। তিনি কয়েকদিন রন্ধন করে গৌরসুন্দরকে খাওয়ালেন। প্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ভবনে কয়েক দিন সুখে থাকবার পর রামকেলি গ্রামে এলেন।

ঐছে চলি 'আইলা প্রভু' রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপাম।।
যাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১।১৬৬-১৬৭)

মহাপ্রভুর প্রভাব শুনে বাদশা হুসেন সাহ্ বলতে লাগলেন—

বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়।
সেই তো গোসাঞী ইহা জানিহ নিশ্চয়।
কাজী, যবন ইহার না করিহ হিংসন।
আপন-ইচ্ছায় বুলুন যাঁহা উঁহার মন।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১।১৬৯-১৭০)

মহাপ্রভুর শুভাগমনে রামকেলি গ্রাম আনন্দে মুখরিত হল। চতুর্দ্দিক থেকে লোক মহাপ্রভুকে দেখতে আসতে লাগলেন। কেশব ছত্রী বাদশার বিশিষ্ট প্রতিনিধি। বাদশা তাঁকে প্রভুর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। কেশব ছত্রী বললেন—হাঁ শুনেছি একজন ভিখারী সন্ন্যাসী এসেছেন; তাঁর সঙ্গে দু'চারজন লোক আছে। বাদশা বললেন—আপনি কি বলছেন? সহস্র সহস্র লোক তাঁর সঙ্গে চলেছে। এ কথা শুনে কেশব ছত্রী একটু হাস্য করলেন। ছত্রীর কথায় বাদশার মন প্রসন্ন হল না। তিনি শ্রীসনাতনকে জিজ্ঞাসা করলেন। সনাতন বললেন—তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। " যে তোমারে রাজ্য দিল সে তোমার গোসাঞা। তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিঞা।।" —(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১।১৭৬) তুমি সাক্ষাৎ দর্শন কর। মানুষের কি এরূপ শক্তি ও আকর্ষণ থাকতে পারে? এরূপ মহা আকর্ষণ করবার শক্তি ঈশ্বর ছাড়া কারও থাকে না। বাদশা শ্রীসনাতনের কথা শুনে বড়

সুখী হলেন ও তিনি স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করুন ব'লে সকলকে জানালেন।

গঙ্গাতটে এক বৃক্ষমূলে মহাপ্রভু উপবেশন করেছেন। সঙ্গে মাত্র প্রিয় পার্ষদবৃন্দ। ক্রমেই সন্ধ্যাকাল অতীত হতে চলল। এ-সময় সনাতন ও রূপ দু-ভাই দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধরে মহাপ্রভুর সামনে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাঁদের দেখে চিনতে পারলেন। প্রভু করুণার্দ্র হৃদয়ে দু-ভাইকে ভূমি থেকে উঠিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন পূর্ব্বে তোমরা যে বার বার দৈন্য-পত্র আমাকে লিখেছিলে তাতে তোমাদের স্বভাব জেনেছি। তোমরা দুই ভাই জন্মে জন্মে আমার দাস। তোমাদের জন্য আমি রামকেলিতে এসেছি। আজ থেকে তোমাদের নাম হবে—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ। বাদশা পূর্ব্বে তাঁদের নাম দিয়েছিলেন দবিরখাস ও সাকর মল্লিক। তারপর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ সমস্ত গৌর-পার্ষদগণের চরণে কৃপা প্রার্থনা করলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস আদি ভক্তগণ দুই ভাইকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ প্রদান করলেন। অনন্তর শ্রীসনাতন রূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপম পুত্র, পরিবারবর্গের সঙ্গে প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন, বন্দনাদি করলেন। অনুপমের পুত্র শ্রীজীব তখন শিশু। প্রভু তাঁর শিরে কর পদ্ম ধারণ করে ও শ্রীচরণ-রজ দিয়ে যেন ভবিষ্যৎ আচার্য্য-সম্রাটরূপে তাঁকে বরণ করলেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীগৌরহরি এইরূপে ভক্তবাসনা পূর্ণ করে পুরীর দিকে যাত্রা করলেন ও শ্রীসনাতন রূপকে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন—"শীঘ্র সংসার বন্ধন থেকে কৃষ্ণ তোমাদের মুক্ত করে দিবেন।" শ্রীসনাতনের পিতৃদত্ত নাম ছিল অমর, শ্রীরূপের সন্তোষ এবং অনুপমের বল্লভ ছিল।

মহাপ্রভু রামকেলি থেকে চলে যাবার পর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ প্রভুর শ্রীচরণ-প্রাপ্তির জন্য দুইটী পুরশ্চরণ করলেন। পরিবারবর্গকে তাঁরা চন্দ্রদ্বীপে ও ফতেয়াবাদে প্রেরণ করলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম কিছু ধন রামকেলিতে শ্রীসনাতনের জন্য রেখে আর সব নৌকায় ভরে ফতেয়াবাদে নিয়ে গিয়ে

সেই ধনের কিছুটা স্বজন এবং নিজ পরিবার বর্গের জন্য রাখলেন।

মহাপ্রভুর সংবাদ গ্রহণের জন্য যাঁদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁরা এসে তাঁর বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রার কথা শ্রীরূপকে বললেন। তিনি শুনে পরম সুখী হলেন এবং অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্য চললেন। ক্রমে চলতে চলতে প্রয়াগে এলেন। সেইখানে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করলেন। প্রয়াগে প্রভুর দর্শনের জন্য লোকের এত ভিড় যে সারাদিন দর্শনের অবকাশ হল না। সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতটে প্রভুকে দর্শন করে দুই ভাই দৈন্য-ভরে দন্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু দেখেই চিনতে পারলেন। ভূমি থেকে উঠিয়ে তাঁদিগকে আলিঙ্গন করে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা শ্রীসনাতনের ও অন্যান্য যাবতীয় সংবাদ বললেন। মৃদু হাস্য করে প্রভু বললেন —"শীঘ্র সনাতনের বন্ধন মুক্তি হবে।" ত্রিবেণীতে মহাপ্রভুর সন্নিকটে শ্রীরূপ ও অনুপম অবস্থান করতে লাগলেন ও তাঁর উপদেশ শুনতে লাগলেন। তখন শ্রীবল্লভাচার্য্য ত্রিবেণীর পর পারে আড়াইলা গ্রামে বাস করতেন। একদিন তিনি প্রভুকে আমন্ত্রণ করে নিজগৃহে নিয়ে যান। প্রভুর সঙ্গে শ্রীরূপ ও অনুপম গেলে মহাপ্রভু শ্রীবল্লভাচার্য্যের কাছে শ্রীরূপের পরিচয় করিয়ে দিলে শ্রীবল্লভাচার্য্য তাঁদের আলিঙ্গন করতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁরা দৈন্য করে দূরে সরে যান। তা দেখে বল্লভাচার্য্য পরম সুখী হলেন। প্রভু ছলনা করে বললেন- —আপনি এদের স্পর্শ করবেন না। তদুত্তরে বল্লভাচার্য্য বললেন—"এ দুই অধম নহে, সর্ব্বোত্তম। এঁদের বদনে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম নৃত্য করছে।" দুই ভাই আচার্য্যকে দন্ডবৎ করলে আচার্য্য তাঁদের স্নেহে আলিঙ্গন করলেন এবং বহু প্রশংসা করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু ত্রিবেণীতে অত্যধিক লোকের ভিড় দেখে দশাশ্বমেধ ঘাটে এলেন। তথায় দশদিন অবস্থান করে শ্রীরূপ গোস্বামীকে যাবতীয় ভাগবত তত্ত্ব-সার উপদেশ দেন—

প্রভু কহে,— শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন।।
পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক 'বিন্দু'।।
—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।১৩৬-১৩৭)

মহাপ্রভু বললেন— হে রূপ! তোমার কাছে ভক্তিরসের লক্ষণ সকল সূত্রাকারে বলছি তা শুন। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত শ্রেষ্ঠ, কোটি মুক্ত মধ্যে এক কৃষ্ণ-ভক্ত শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম ও শান্ত। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি অশান্ত —ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কামী। জীবের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম। জীব চিৎকণ ব্রহ্মের অনুশক্তি। জীব সুকৃতি-ফলে সাধু সঙ্গ পেলে স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করতে পারে। ভব বন্ধন তখন নাশ হয়। সদ্‌গুরু-কৃপায় জীব ভক্তি লতার বীজ "শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র" প্রাপ্ত হয়। সে বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন জল সেচন করতে থাকলে, ভক্তিলতা বর্দ্ধিত হয়ে পত্র পুষ্পাদিতে সুশোভিত হয়। ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ ভেদ করে গোলোকে পৌঁছে, ভজনকারী মালী তথায় সুখে প্রেম-ফল আস্বাদন করতে পারে। ভক্তির তিনটা অবস্থা— সাধন, ভাব ও প্রেম। প্রেমভক্তি যত গাঢ় হয় তত স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব উৎপন্ন হয়। ভক্তিভেদে রতি পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি। শান্ত ভক্ত নবযোগেন্দ্র ও সনকাদি। দাস্য ভক্ত—ব্রহ্মা, শিব, নারদ, ব্রজে, রক্তক পত্রকাদি। সখ্য ভক্ত —অর্জ্জুন, ভীম ও ব্রজে সুবল, শ্রীদামাদি। বাৎসল্য-ভক্ত বসুদেব, দেবকী, নন্দ ও যশোদা। মধুর ভক্ত —ব্রজে গোপীগণ। দ্বারকায় রুক্মিণী সত্যভামাদি। "এই ভক্তি-রসের করিলাম দিগ্‌দরশন। ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন।। ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে। কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রস-সিন্ধু পারে।।"—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।২৩৪-২৩৫) মহাপ্রভু শ্রীরূপকে এই সমস্ত উপদেশ দেবার পর

তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে আদেশ করলেন। তিনিও বারাণসীর দিকে যাত্রা করলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম দুই ভাই প্রভুর বিচ্ছেদে ব্যথিত হৃদয়ে বৃন্দাবনের দিকে চলতে লাগলেন।

শ্রীসনাতনের গৃহ ত্যাগ—

শ্রীরূপ ও অনুপম অর্থাদিসহ ফতেয়াবাদে চলে যাবার পর শ্রীসনাতন কেমনে রাজ-কার্য্য ত্যাগ করবেন চিন্তা করতে লাগলেন। বাদশা শ্রীসনাতন ও রূপের উপর রাজ্য চালাবার সমস্ত ভার অর্পণ করে রেখেছিলেন। তাঁদের নিয়ে তাঁর রাজত্ব। শ্রীসনাতন রাজ-দরবারে যাওয়া বন্ধ করলেন ও শরীর অসুস্থ বলে রাজাকে জানালেন। তা শুনে হুসেন শাহ্ সনাতনের কাছে বৈদ্য পাঠালেন। বৈদ্য দেখলেন সনাতন পনের বিশ জন পণ্ডিতসহ গৃহে শাস্ত্র আলোচনা করছেন। রাজ-বৈদ্য শ্রীসনাতনের শরীর পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোন রোগ দেখতে না পেয়ে এ খবর বৈদ্য বাদশাকে দিলেন। বাদশা তাঁর মনের ভাব কিছু বুঝতে না পেরে স্বয়ং তাঁর গৃহে এলেন। সনাতন বাদশাকে দেখে পণ্ডিতগণসহ গাত্রোত্থান করলেন ও বসবার জন্য তাঁকে উত্তম আসন দিলেন। বাদশা বললেন—তোমার কাছে বৈদ্য পাঠিয়েছিলাম। বৈদ্য বললে—তোমার দেহে কোন রোগ নাই। আমার সমস্ত কাজ তোমাকে নিয়ে; অথচ তুমি সব ত্যাগ করে ঘরে বসে আছ। তোমার ভাইও চলে গেছে। আমার সব কাজ নষ্ট হতে চলেছে। তোমাদের অভিপ্রায় কি বুঝতে পারছি না। শ্রীসনাতন বললেন—আমাদের দ্বারা আর কোন কাজ হবে না। আপনি অন্য লোক দিয়ে কাজ করান। তাঁর কথা শুনে যবনরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—তোমরা আমার যাবতীয় কাজ নষ্ট করলে। শ্রীসনাতন বললেন—তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর, যা ইচ্ছা তা করতে পার। যে যেমন কাজ করে, বিচার ক'রে তদনুরূপ শাস্তি তাকে প্রদান কর। এ কথা শুনে গৌড়েশ্বর ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করলেন

এবং সনাতনকে বন্দী করতে কাজীকে আদেশ দিলেন। ঐ-সময় বাদশা উড়িষ্যা দেশ জয় করবার জন্য যাত্রা করছিলেন। তিনি সনাতনকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। শ্রীসনাতন বললেন তুমি দেবতা ও সাধুদের দুঃখ দিবার জন্য যাচ্ছ আমি তোমার সঙ্গে যাব না। বাদশা উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করলেন। এমন সময় শ্রীসনাতন শ্রীরূপের একখানি পত্র পেলেন। তিনি লিখেছেন—"তুমি যে কোন রকমে বন্দী অবস্থা থেকে ছুটে এসে। মুদি ঘরে আট'শ' মোহর আছে। অনুপমকে (বল্লভকে) সঙ্গে নিয়ে আমি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলাম।" পত্র পেয়ে শ্রীসনাতন পরম সুখী হলেন।

অনন্তর শ্রীসনাতন বন্দীশালের রক্ষককে অনুনয় করে বললেন—তুমি আমার কিছু উপকার কর। তুমি একজন জিন্দাপীর। তোমার কেতাব কোরাণ-শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান আছে। তুমি যদি ধর্ম বিচার করে একজন বন্দীকে মুক্ত করে দাও ঈশ্বর তোমার অনেক উপকার করবেন। পূর্বে আমি তোমার অনেক উপকার করেছি, এখন কিছু প্রত্যুপকার কর। তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দিব। পুণ্য ও অর্থ দুইই লাভ হবে তোমার। কারাগার-রক্ষক বললে—মহাশয়, আপনাকে ছাড়তে পারি ; কিন্তু বাদশা যদি জানতে পারে, আমার অর্থ ও প্রাণ দুইটা নষ্ট হবে। শ্রীসনাতন বললেন—তুমি কোন ভয় কর না, আমি এ দেশে থাকব না। দরবেশ হয়ে মক্কা মদিনা চলে যাব। তুমি বাদশাকে বলবে শৌচ করতে গিয়ে লৌহ-বেড়িসহ জলে পড়ে কোথায় ডুবে গেছে; অনেক খোঁজ করেও পাওয়া গেল না। তোমাকে সাত হাজার মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি। সাত হাজার মুদ্রা দেখে কারা রক্ষকের লোভ হল। লৌহ-বেড়ি কেটে রাত্রে গঙ্গা পার করে দিল। শ্রীসনাতন এবার মুক্ত হলেন। রাজপথ ত্যাগ করে বন পথে এক ভৃত্যসহ পাতড়া পর্ব্বতে এলেন। তথায় এক ডাকাতের সর্দার ভূঞা বাস করত। তার সঙ্গে এক হাত গণক ছিল। সে গণনা করে কার কাছে কত অর্থ আছে বলে দিতে পারত। পথিককে খুন করে ভূঞা তার অর্থ

কেড়ে আত্মসাৎ করত। শ্রীসনাতন ভূঞাকে বললেন—মহাশয়! কৃপা করে আমাদের এ পর্ব্বতটি পার করে দিন। ভূঞা বললে— আপনাকে রাত্রে পার করে দিব। এখন রান্না করে ভোজনাদি করুন। রন্ধনের ব্যবস্থা করে দিল। শ্রীসনাতন দুই দিন পরে রন্ধন ভোজনাদি করলেন। রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তা করলেন এ ভূঞা আমাদের এত যত্ন করছে কেন? ভৃত্য ঈশানকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কাছে অর্থ-কড়ি আছে না কি? ঈশান বললে—সাতটি স্বর্ণ-মোহর আছে। তখন শ্রীসনাতন বুঝলেন এ অর্থের লোভে ভূঞা তাঁদের এত যত্ন করছে। ঈশানকে একটু ক্রোধ ভরে বললেন—তুমি সঙ্গে এ কাল যম এনেছ কেন? তারপর সর্দার ভূঞাকে ডেকে মোহরগুলি তার হাতে দিলেন ও বললেন —দয়া করে আমাদের এখন পার করে দিন।

সর্দার বললে—স্বামী! আমাকে রক্ষা করেছেন। রাত্রে আপনাদের খুন করে এ মোহর নিতাম। আমি সুখী হয়েছি, মোহর চাই না, পর্ব্বত পার করে দিব।

শ্রীসনাতন বললেন—মহাশয়! আপনি আমাদের রক্ষা করুন, মোহর নিয়ে পর্ব্বত পার করে দিন, নতুবা অন্য কেহ এ অর্থের লোভে আমাদের খুন করবে।

অতঃপর সর্দার চারটা পাইক সঙ্গে দিয়ে রাত্রি থাকতে শ্রীসনাতনকে পর্ব্বত পার করে দিল। শ্রীসনাতন পর্ব্বত পার হয়ে ঈশানকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কাছে আর কিছু আছে নাকি? ঈশান বললে—আর একটী মোহর আছে। শ্রীসনাতন বললেন—এটি নিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও। শ্রীসনাতন ভৃত্যকে বিদায় দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হলেন। হাতে করোয়া, গায়ে ছেঁড়া কাঁথা ও মুখে হরিনাম। জীবনে কত ঐশ্বর্য্য ভোগ করেছেন; তাতে কখনও এত আনন্দ পান নি, আজ নিঃসঙ্গ ভাবে যে আনন্দ পাচ্ছেন। ক্রমে

চলতে চলতে সন্ধ্যাকালে হাজিপুরে এলেন। গঙ্গাতে স্নানাদি করে তটে এক উদ্যানের মধ্যে-বসলেন। সূর্য্যদেব অস্তাচলে প্রবেশ করছেন, পশ্চিম-গগন অরুণ রঙে অরুণ বর্ণ হয়ে উঠছে, পক্ষী সকল কলরব করতে করতে আলয়ে প্রবেশ করছে, গঙ্গার উভয় তটে বৃক্ষ শ্রেণী শোভা পাচ্ছে। বিশ্বনাথের রচিত এসব সুন্দর সৃষ্টি দেখে শ্রীসনাতনের হৃদয় যেন শ্রীহরির চরণ ভজন করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

হাজিপুরে শ্রীসনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত থাকতেন। তিনি বাদশার জন্য অশ্ব খরিদ করে পাঠাতেন। শ্রীকান্ত সন্ধ্যাকালে গৃহের উপর থেকে দেখলেন দূরে উদ্যান মধ্যে একজন বৈরাগী বসে আছেন। ঔৎসুক্য হল তিনি নিকটে গিয়ে তাঁকে দেখবেন। উদ্যানে এসে দেখলেন শ্রীসনাতন। একটু বিস্ময়ান্বিত হলেন; তারপর শ্রীসনাতনের মুখে সমস্ত কথা শুনলেন। শ্রীকান্ত যত্ন করে শ্রীসনাতনকে ঘরে নিলেন এবং দু-চার দিন থাকবার অনুরোধ জানালেন। শ্রীসনাতন বললেন—তুমি আমাকে এখনই গঙ্গা পার করে দাও, এক মুহূর্ত্তকালও আমি বিলম্ব করতে পারব না। যাবার সময় শ্রীকান্ত শ্রীসনাতনকে একখানা ভোট কম্বল দিলেন। গঙ্গা পার হয়ে শ্রীসনাতন চলতে চলতে কয়েক দিনের মধ্যে কাশীতে এলেন। মহাপ্রভু কয়েকদিন পূর্ব্বে কাশীতে এসেছিলেন। তিনি শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভোজন করতেন। শ্রীসনাতন লোক-পরম্পরায় শুনে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হলেন ও দ্বারদেশে বসলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সব জানতে পেরে চন্দ্রশেখরকে বললেন— দ্বারে একজন বৈষ্ণব এসেছেন। তাঁকে নিয়ে এস। চন্দ্রশেখর ছুটে এলেন দ্বারে। কিন্তু কোন বৈষ্ণব দেখলাম না। প্রভু বললেন —কোন লোক আছে কি না? চন্দ্রশেখর বললেন—একজন দরবেশ আছে। প্রভু বললেন—তাকে নিয়ে এস। চন্দ্রশেখর দ্বারে এসে বললেন— দরবেশ! তোমাকে প্রভু ডাকছেন। শ্রীসনাতনের আনন্দের সীমা রইল না।

নয়ন দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়তে লাগল, গৃহে প্রবেশ করলেন, দেখলেন প্রভু ভক্ত-সঙ্গে বসে আছেন। শ্রীসনাতন অঙ্গনে সাষ্টাঙ্গে দন্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু দ্রুত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁকে তুলে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীসনাতন বললেন—প্রভো! আমি পাপী, নীচ, অধম, আমাকে স্পর্শ কর না। প্রভু জোরপূর্ব্বক তাঁর অঙ্গ মার্জ্জন করতে করতে বললেন—"প্রভু কহে--তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে। ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মান্ড শোধিতে।।"--(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২০।৫৬) তারপর প্রভু তাঁকে নিজ পার্শ্বে বসালেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন। তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণের নিকট মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলে শ্রীসনাতনকে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন ও বিস্ময়ান্বিত হয়ে বললেন—"কাকেরে গরুড় কর ঐছে শক্তি তোমার।।" কোথায় রাজমন্ত্রী, মহৈশ্বর্য্যশালী, আবার কোথায় সর্ব্বত্যাগী কৃষ্ণ ভক্ত ধীর; তুমি অচিন্ত্য শক্তিমান; তোমার কৃপা হলে কি না হতে পারে?

অতঃপর ভদ্রবেশ গ্রহণ করবার জন্য মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে আদেশ করলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর তাঁকে গঙ্গাতটে নিয়ে গিয়ে নাপিত দ্বারা মুন্ডন করিয়ে শিখা ধারণ করালেন, পরে স্নান করালেন। চন্দ্রশেখর তাঁকে পরিধানের জন্য নূতন বস্ত্র দিলেন, তাঁর পুরাতন বস্ত্র মেগে নিয়ে তিনি কৌপীন বহির্ব্বাস করে পরিধান করলেন ও কণ্ঠে তুলসী-মালা এবং দ্বাদশ-অঙ্গে তিলক ধারণ করে বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করলেন। শ্রীসনাতনের দিব্য বৈষ্ণববেশ দেখে সকলের আনন্দের সীমা রইল না। তপন মিশ্রের ঘরে মহাপ্রভু ভোজন করলেন। ভুক্তাবশেষ শ্রীসনাতন গ্রহণ করলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে পেয়ে যেন আনন্দ-সিন্ধুর মধ্যে ভাসতে লাগলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত যে ভোট কম্বল দিয়েছিলেন তা ত্যাগের উপায় চিন্তা করে তিনি গঙ্গাতটে এলেন। দেখলেন

এক গৌড়ীয়া কাঁথা ধুয়ে শুকাতে দিয়েছে। তাঁকে বললেন—ভাই! তুমি আমার এক উপকার করবে কি? গৌড়ীয়া বললেন— কি উপকার করতে পারি? শ্রীসনাতন বললেন —আমার কম্বলটি নিয়ে তোমার কাঁথাটি আমায় দাও। গৌড়ীয়া বললে—আপনি ভব্য-লোক হয়ে এত পরিহাস করছেন কেন? শ্রীসনাতন বললেন—পরিহাস নয়, সত্যই বলছি। এ বলে তাকে ভোট কম্বলটি দিয়ে কাঁথাটি নিলেন। অনন্তর সেটি গলায় বেঁধে প্রভুর শ্রীচরণে এসে দণ্ডবৎ করলে,প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন— সনাতন, তোমার ভোট কম্বল কোথায় গেল? শ্রীসনাতন খুলে বললেন সব কথা। প্রভু বললেন—কৃষ্ণ বৈদ্য শিরোমণি, তোমার শেষ রোগ কেন রাখবেন? যিনি আমায় কু-বিষয় গর্ত্ত থেকে উদ্ধার করেছেন, তিনিই আমার শেষ বিষয় রোগ নষ্ট করলেন—উত্তর দিলেন শ্রীসনাতন।

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম হানি হয় লোকে করে উপহাস।।
— (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২০।৯২)

অনন্তর শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—হে প্রভো! "কে আমি? কেনে আমায় জারে তাপত্রয়? ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়? সাধ্য সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি।।" —(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২০।১০২-১০৩) মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—কৃষ্ণের কৃপা তোমাতে পূর্ণভাবে আছে। তোমার কোন তাপ নাই। তুমি কৃষ্ণ-ভক্তি ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব সব জান। তথাপি দৃঢ়তার জন্য পুনঃ জিজ্ঞাসা করছ। এটি তোমার সাধু স্বভাব। তত্ত্ব বস্তু সাধুগণ জানলেও উত্তম ব্যক্তির নিকট দৃঢ়তার জন্য পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।।" —(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২০।১০৮) জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস, অনুশক্তি। শ্রীকৃষ্ণসেবা তাঁর স্বরূপের

ধর্ম্ম। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের ভেদ ও অভেদতা অচিন্ত্য স্বরূপ। কৃষ্ণ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। কৃষ্ণ সূর্য্যসদৃশ, জীব কিরণ কণ-সদৃশ। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে—চিৎ শক্তি, জীব শক্তি, মায়া শক্তি এ তিন শক্তি প্রধান। কৃষ্ণ মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। বেদ-শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ-ভজন। বেদশাস্ত্রে ত্রিবিধ তত্ত্বের কথা বলেছেন—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। কৃষ্ণ সম্বন্ধ তত্ত্ব, ভক্তি—অভিধেয় ও কৃষ্ণ-প্রেম প্রয়োজন তত্ত্ব। সাধন ভক্তি দুই প্রকার—বৈধী সাধন-ভক্তি ও রাগানুগা সাধন-ভক্তি। বৈধী-সাধন-ভক্তি চৌষট্টি প্রকার। এর মধ্যে সাধু-সঙ্গ, নাম-সংকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধাসহ শ্রীমূর্ত্তির সেবা, এই পাঁচটি অঙ্গ শ্রেষ্ঠ।

দুই মাস ধরে মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট সমস্ত ভাগবত-তত্ত্বসার উপদেশ করলেন এবং বললেন—এ সমস্ত সিদ্ধান্ত চিন্তা করে ভক্তি-শাস্ত্র রচনা কর। তোমার দুই ভাই রূপ ও অনুপম বৃন্দাবনে চলে গেছে, তুমিও তথায় গমন কর। আমি নীলাচলে চলে যাচ্ছি। সময়মত তোমরাও নীলাচলে এসো। মহাপ্রভু একথা বলে ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। প্রভুর বিরহে ভক্তগণ ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীসনাতনও কাশীবাসী ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে চললেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনাদির পূর্ব্বে সুবুদ্ধিরায় বৃন্দাবনে এসে বাস করছিলেন।

নীলাচলে শ্রীরূপ

কয়েক মাস বৃন্দাবন-বাসের পর শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করলেন। গৌড়দেশে গঙ্গাতটে পৌঁছলে অকস্মাৎ তথায় শ্রীঅনুপম স্বধাম বিজয় করেন। শ্রীরূপ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি করে বিষয় কার্য্য ব্যাপারে গৌড় দেশে নিজ গৃহে এলেন। কয়েকদিন পরে তিনি পুনঃ নীলাচলের দিকে চলতে লাগলেন। ক্রমে উড়িষ্যায় সত্যভামা

পুরে পৌছে একরাত্র তথায় এক ব্রাহ্মণ-গৃহে বিশ্রাম করলেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ে এক নাটক শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবন থেকে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। নাটকের বিষয় ভাবনা করতে করতে তিনি চলছিলেন। সত্যভামাপুরে শ্রীসত্যভামা দেবী স্বপ্নে শ্রীরূপ গোস্বামীকে বললেন—"আমার নাটক পৃথক্ ভাবে রচনা কর।" শ্রীরূপ বুঝতে পারলেন—শ্রীসত্যভামা দেবীই দর্শন দিয়ে ব্রজপুর ও দ্বারকাপুর লীলা একত্রে বর্ণন করতে নিষেধ করছেন। তখন থেকে তিনি দুই নাটকের নান্দী-শ্লোকাদি ভিন্ন ভাবে রচনা করলেন। ক্রমে চলতে চলতে পৌছালেন শ্রীনীলাচলে। দূর থেকে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দেখে ভক্তি-গদ্‌গদ্ চিত্তে দন্ডবৎ করলেন। তারপর লোক-পরম্পরায় খবর নিয়ে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এলেন। পূর্ব্বে তাঁর কথা মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসকে বলেছিলেন। শ্রীরূপ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বন্দনা করতেই, শ্রীহরিদাস ঠাকুর অতি স্নেহভরে শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করলেন। কিছু কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করবার পর বললেন, মহাপ্রভু এখনই আসবেন। মহাপ্রভুর আগমন হলে দুইজন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দন্ডবৎ করলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে ভূমি থেকে উঠিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। পাশে বসিয়ে বিবিধ কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। শ্রীসনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করলে, শ্রীরূপ বললেন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই। প্রভু বললেন, কাশীতে আমার কাছে দশদিন থাকার পর সনাতন বৃন্দাবনে গেছে। অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা শুনেপ্রভু বড় খেদ করে বললেন, ইষ্টদেবের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। অতঃপর শ্রীরূপকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কাছে থাকতে আদেশ করে প্রভু নিজ স্থানে এলেন এবং শ্রীগোবিন্দকে শ্রীরূপের জন্য প্রসাদ পাঠাতে আদেশ করলেন।

দ্বিতীয় দিন মহাপ্রভু প্রধান প্রধান ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীরামানন্দ ও শ্রীসার্ব্বভৌম প্রভৃতির নিকট শ্রীরূপের পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীরূপ অতি

দৈন্যের সহিত সকলকেই দন্ডবৎ করলেন, সকলে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং ভক্তদের কাছে শ্রীরূপের জন্য কৃপা ভিক্ষা চাইলেন। অন্যান্য বারের মত এবারও মহাপ্রভু গুন্ডিচা মার্জ্জনোৎসব এবং আইটোটাতে ভোজনোৎসব করলেন। রথযাত্রা মহোৎসবে মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিয়ে মহানৃত্য-গীত কীর্ত্তন মহোৎসব করলেন। শ্রীরূপ সমস্ত দর্শন করলেন।

একদিন মহাপ্রভু একটী শ্লোক বললেন—"কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে।।"—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১।৬৬) এ শ্লোক অকস্মাৎ শ্রীরূপের কাছে বলে মহাপ্রভু চলে গেলেন। শ্রীরূপ শুনে খুব বিস্ময়ান্বিত হলেন; বললেন অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সব জানতে পেরেছেন। সত্যভামাদেবীও এ কথাই বলেছিলেন। ব্রজপুরলীলা ও দ্বারকাপুর-লীলা এখন থেকে পৃথক পৃথক লিখব। রথযাত্রাকালে মহাপ্রভু এক শ্লোক পাঠ করেন। শ্লোকের বাস্তব অর্থ একমাত্র শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু জানতেন, অন্য কেহই জানে না। শ্রীরূপ সেই শ্লোক শুনে অনুরূপ একটী শ্লোক রচনা করে চালে গুঁজে রেখে সমুদ্র-স্নানে গিয়েছেন এমন সময় মহাপ্রভু এলেন। উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই চালে গোঁজা তাল-পত্রে শ্লোকটী দেখতে পেলেন। শ্লোক বের করে প্রভু পাঠ করতে লাগলেন। যেন অমৃতের ধারা, যেমন হস্তাক্ষর, তেমনি রসের পরিপাটী। আপন মনের কথা। মহাপ্রভু ভাবে আবিষ্ট হয়ে আছেন। এমন সময় শ্রীরূপ সমুদ্র-স্নান করে ফিরে এসে মহাপ্রভুকে দন্ডবৎ করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে এক চাপড় মেরে জড়িয়ে ধ'রে বললেন - "গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে?" প্রভু শ্লোকটী স্বরূপ দামোদরকে দেখালেন। শ্লোক পড়ে স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর দিকে তাকাতে লাগলেন। মহাপ্রভু বললেন—রূপ আমার অভিপ্রায় কিরূপে জানল? স্বরূপ-দামোদর বললেন--আমি অনুমান করছি পূর্ব্বে এঁকে তুমি কৃপা করেছ। তোমার কৃপা ছাড়া এ সমস্ত কে লিখতে পারে?

একদিন ভক্তগণ-সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এলেন এবং শ্রীরূপের লিখিত নাটক শুনতে চাইলেন। শ্রীরূপ লজ্জায় পড়তে চান না। মহাপ্রভু বারবার পড়তে অনুরোধ করায় শ্রীরূপ শ্লোক পড়লে লাগলেন। নাটক শুনে রামানন্দ রায় বললেন—"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার। নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার।। প্রেম পরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন। শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন।"—(চৈঃ চঃ অন্তঃ ১।১৯৩-১৯৪) তারপর রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে বললেন আপনার শক্তি ছাড়া জীবের এমন বর্ণন করার শক্তি থাকতে পারে না। অনুমানে বুঝতে পারছি, আপনি শক্তি দিয়ে করাচ্ছেন। শ্রীরূপের অপূর্ব্ব কবিত্ব, রস বিচার ও দৈন্যযুক্ত ব্যবহার দেখে সকলে শত মুখে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। প্রভু কয়েকমাস নিজস্থানে শ্রীরূপকে রাখার পর পুনঃ বৃন্দাবনে যেতে আদেশ করলেন। শ্রীরূপ প্রভুর আদেশ শিরে ধারণ করে বৃন্দাবনে ফিরে এলেন।

শ্রীনীলাচলে-শ্রীসনাতন

মথুরা থেকে একাকী ঝারিখন্ডের বন পথে শ্রীসনাতন গোস্বামী নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। বন পথ দুর্গম, তথাকার জল দূষিত। শ্রীসনাতন চলতে লাগলেন, উপবাসে দিন কাটছে। মাঝে মাঝে জল পান করছেন মাত্র। জলবায়ুর দোষে তাঁর শরীরে কন্ডু-রসা হল। তিনি ভাবলেন, এ দেহ নিয়ে মহাপ্রভুর ও শ্রীজগন্নাথের দর্শন হবে না। শুনেছি মহাপ্রভু জগদীশের মন্দিরের সন্নিকটে থাকেন, মন্দির-সন্নিধানে আমার যাবার সাধ্য নাই। প্রচলিত মার্গে জগন্নাথের সেবকগণ যাতায়াত করেন, তাঁদের স্পর্শ করলে মহা অপরাধ হবে। শ্রীসনাতন ঠিক করলেন, শ্রীজগন্নাথের-রথ চক্রের তলে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন। এ পাপ-দেহ আর রাখবেন না। ক্রমে লোক-পরম্পরায় খবর নিয়ে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বন্দনা করলেন। দেখেই শ্রীহরিদাস ঠাকুর বুঝতে পারলেন, শ্রীরূপের বড় ভাই। শ্রীহরিদাস

আনন্দে শ্রীসনাতনকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে বললেন—আপনি কি শ্রীরূপের বড় ভাই শ্রীসনাতন? শ্রীসনাতন বললেন—হ্যাঁ আমি সেই অধম।

শ্রীহরিদাস—মহাপ্রভুর শ্রীমুখে আপনার মহিমা শুনেছি।

শ্রীসনাতন—এ পাপীর আবার মহিমা কি?

শ্রীহরিদাস—আপনি বৈষ্ণব-শিরোমণি। মহাপ্রভু বলেছেন আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই।

শ্রীসনাতন—(কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে) শ্রীবিষ্ণু। শ্রীবিষ্ণু।

দুজনার আলাপ হচ্ছিল। এমন সময় মহাপ্রভু তথায় শুভাগমন করলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীসনাতন প্রভুর শ্রীচরণ মূলে দন্ডবৎ হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসকে আলিঙ্গন করতে হরিদাস বললেন —সনাতন দন্ডবৎ করছে।

মহাপ্রভু বললেন—এ্যাঁ, সনাতন এসেছে? ভূমি থেকে উঠিয়ে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন তাঁকে।

শ্রীসনাতন বললেন—প্রভো। আমায় ছুঁয়ো না, আমি নীচ অধম। তাতে শরীরে কন্ডুরসা।

মহাপ্রভু— সনাতন। এ শরীর তোমার? না, আমার? মহাপ্রভু জোর করে পুনঃ আলিঙ্গন করলেন। শ্রীসনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর সে-রকম স্নেহ দেখে ভক্তগণ বিস্ময়ান্বিত হলেন। প্রভু ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীসনাতনের মিলন করিয়ে দিলেন। বৈষ্ণবগণের চরণ বন্দনা করতেই তাঁরা শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। অতঃপর মহাপ্রভু সনাতনের কুশল বিষয়ে প্রশ্ন করলেন ও মথুরায় অন্যান্য বৈষ্ণবগণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। প্রভু বললেন—রূপ দশ মাস নীলাচলে ছিল; দিন দশ আগে গৌড় দেশে গেছে। অনন্তর প্রভু অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি সংবাদ শ্রীসনাতনকে জানালেন। শুনে সনাতন

বলতে লাগলেন শিশুকাল থেকে অনুপম শ্রীরামের উপাসনা করত। দিন-রাত রামায়ণ পাঠ করত। রূপ ও আমি একদিন তাকে পরীক্ষা করবার জন্য বললাম—অনুপম! শ্রীকৃষ্ণ পরম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সার, তুমি তাঁর ভজন কর;তিন ভাই একসঙ্গে কৃষ্ণকথা রসে কাল যাপন করব। আমাদের কথায় তার মন কিছুটা ফিরল, বলল—আমি চিন্তা করে দেখি। সারা রাত শ্রীরামের ত্যাগের কথা চিন্তা করতে করতে কেঁদে কেঁদে কাটাল, প্রাতঃকালে এসে বলল—

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা।।
—(চৈঃ চঃ অন্তঃ ৪।৪০)

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তার এইরূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে দু-ভাই তাকে আলিঙ্গন করে বললাম—তুমি সাধু, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের ভজন কর, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য আমরা এরূপ বলেছিলাম।

মহাপ্রভু বললেন—" সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজজন।।" (চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৪।৪৬) তারপর শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কাছে থাকতে বলে প্রভু নিজ স্থানে এলেন ও গোবিন্দের দ্বারা দুজনার জন্য মহাপ্রসাদ প্রেরণ করলেন।

একদিন মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এসে সনাতনকে বলতে লাগলেন—সনাতন! দেহত্যাগাদি দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায় না; এ সব তমোধর্ম্ম। ভজনের দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায়।

সনাতন বললেন—হে সর্ব্বজ্ঞ! আমি অতি দীন। আমাকে বাঁচিয়ে তোমার কি লাভ হবে?

মহাপ্রভু—সনাতন! তোমার শরীর আমার বড় সম্পত্তি। তুমি পরের

সম্পত্তি নাশ করতে চাও কেন?

হরিদাস ঠাকুর বললেন—সনাতন। তুমি ধন্য। তোমার দেহ প্রভুর সেবায় সহায়-স্বরূপ।

মহাপ্রভু—সনাতন! কৃষ্ণ-প্রেম, ভক্তি-তত্ত্ব, বৈষ্ণবাচার ও বৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার প্রভৃতি তোমার ঐ দেহ দ্বারা করাব।

সনাতন গোস্বামী—আপনার গভীর মন, কারও বুঝবার শক্তি নাই। আমাকে যেমন নাচাবেন তেমনি নাচব।

জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন শ্রীগদাধর পন্ডিত মহাপ্রভুকে ও শ্রীসনাতনকে দ্বিপ্রহরে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। প্রভু যথাকালে শ্রীগদাধর পন্ডিতের গৃহে এলেন। কিছুক্ষণ সনাতনের জন্য অপেক্ষা করে শেষে ভক্তগণের অনুরোধে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। ভক্তগণ শ্রীসনাতনের জন্য বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীসনাতন এলেন। তাঁর শরীর ঘর্মাক্ত, লাল হয়ে গেছে। মধ্যাহ্নের তপ্ত বালুকায় পা পুড়ে ফোস্কা পড়েছে। ভক্তগণ তাড়াতাড়ি উঠে অভ্যর্থনা করে তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালেন। মহাপ্রভুর অবশেষ পাত্রটি গোবিন্দ শ্রীসনাতনকে দিলেন। ভক্তগণ একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলেন। প্রসাদ গ্রহনের পর শ্রীসনাতন মহাপ্রভুর কাছে এসে দন্ডবৎ করে বসলেন। প্রভু শুধালেন—সনাতন এত দেরী করলে কেন? শ্রীসনাতন বললেন--সমুদ্র পথে এসেছি। তাই একটু দেরী হল। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন — সিংহদ্বারের শীতল পথ ছেড়ে তপ্ত বালুকা-পথে এলে কেন? শ্রীসনাতন বললেন তপ্ত-বালুকা পথে চলতে আমার কোন কষ্ট হয়নি। সিংহদ্বারের পথ দিয়ে আসবার অধিকার আমার নাই। কারণ ঐ পথে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ নিয়ত যাতায়াত করেন। তাঁদের ছোঁয়া গেলে আমার মহা-অপরাধ হবে। প্রভু বললেন—তুমি পরম পবিত্র স্বরূপ। তোমার স্পর্শে দেব মুনিগণও পবিত্র হয়।

"তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ।।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ।।"

—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৪।১৩০-১৩১)

সনাতন। তুমি বিজ্ঞ-শিরোমণি। তুমি যদি শাস্ত্র-মর্য্যাদা জগতকে শিক্ষা না দাও, জগত কেমনে শিখবে? মহাপ্রভু একথা বলে শ্রীসনাতনকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীসনাতনের বৈরাগ্য-সদাচারে ও শিষ্টাচারে সমস্ত গৌরভক্তগণ চমৎকৃত হয়ে ধন্য ধন্য বলে তাঁকে প্রশংসা করতে লাগলেন।

একদিন শ্রীজগদানন্দ পন্ডিত এলেন শ্রীসনাতনকে দর্শন করতে। শ্রীসনাতন পন্ডিতকে দন্ডবৎ করে এক দুঃখের কথা নিবেদন করলেন এবং একটি সৎ পরামর্শ চাইলেন। শ্রীজগদানন্দ পন্ডিত বললেন—রথযাত্রা দর্শন করে আপনি বৃন্দাবনে চলে যান, সেটি আপনার প্রভু-দত্ত আদেশ। সনাতন গোস্বামী পন্ডিতের কথায় পরম সুখী হলেন। কিছুক্ষণ ইষ্ট-গোষ্ঠী করে শ্রীজগদানন্দ পন্ডিত নিজ স্থানে চলে গেলেন। এমন সময় মহাপ্রভু তথায় এলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী দন্ডবৎ করতেই তাঁকে ধরে প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। তাতে শ্রীসনাতন মনঃক্ষুন্ন হয়ে বললেন—শ্রীজগদানন্দ পন্ডিত বলছেন রথাযাত্রা দেখে বৃন্দাবনে যেতে। তাই ভাল, অপরাধের থেকে রক্ষা পাই। একথা শুনে শ্রীজগদানন্দের প্রতি ক্রোধের ভাব দেখিয়ে মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—জগা কালকের পড়ুয়া, সে তোমাকে উপদেশ দেয়। ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য। সে নিজের অধিকার বুঝে না। তুমি পরম প্রামাণিক বিজ্ঞজন। আমারও উপদেষ্টা। প্রভুর এ কথা শুনে সনাতন গোস্বামী প্রভুর চরণ তুলে লুটিয়ে পড়ে খেদ পূর্ব্বক বলতে লাগলেন—আজ বুঝতে পারলাম আপনি শ্রীজগদানন্দকে কত আপন জ্ঞান করেন, সে কত

সৌভাগ্যবান্। শ্রীজগদানন্দকে আত্মীয়তারূপ সুধারস পান করাচ্ছেন, আর, গৌরব স্তুতির দ্বারা আমাকে পান করাচ্ছেন নিম্ব-নিসিন্দা রস। আজও আপনি আঁমাকে আপন বলে কৃপা করলেন না। আমার দুর্ভাগ্য। শ্রীসনাতনের কথা শুনে প্রভু যেন খুব লজ্জিত হলেন ও শ্রীসনাতনকে সুখী করবার জন্য বলতে লাগলেন—সনাতন! তোমা অপেক্ষা জগদানন্দ আমার প্রিয় নহে। মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি সইতে পারি না। তোমার কথা শুনে তোমায় স্তুতি করতে বাধ্য হচ্ছি। সনাতন! তোমার দেহকে তুমি ঘৃণ্য জ্ঞান কর, কিন্তু আমি অমৃতের সমান জ্ঞান করি। আমি তোমাদিগকে লাল্য এবং নিজেকে লালক জ্ঞান করি। লাল্যের লালনাদিতে লালকের ঘৃণা বোধ হয় না, সুখ বোধ হয়। তদ্রূপ তোমাদের সংস্পর্শে এলে আমার পরম আনন্দ হয়। ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত নিত্য শুদ্ধ। পরীক্ষা করবার জন্যই কৃষ্ণ তোমার দেহে কণ্ডু রসা সৃষ্টি করেছেন। ঘৃণা করে যদি তোমায় আলিঙ্গন না করতাম কৃষ্ণ স্থানে আমার অপরাধ হত। এই বলে মহাপ্রভু পুনঃ শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করলেন, তৎক্ষণাৎ কণ্ডু-রসা দূর হয়ে অঙ্গ সুবর্ণের ন্যায় হল। অতঃপর শ্রীসনাতন গোস্বামী দোলযাত্রা দর্শন করে মহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। যে পথ দিয়ে মহাপ্রভু বৃন্দাবন গিয়েছিলেন শ্রীসনাতনও সে পথ ধরে বৃন্দাবনে চললেন। তিনি বৃন্দাবনে এলে শ্রীরূপ গোস্বামীও গৌড় দেশস্থ কুটুম্ব-বর্গের যথাযথ ব্যবস্থা করে পুনঃ বৃন্দাবনে ফিরে এলেন।

শ্রী শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট

একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী যমুনার তীরে বসে ভজন করছেন এবং মহাপ্রভুর কথা চিন্তা করছেন—"প্রভুর আদেশ কিছুই পালন করতে পারলাম না।" এমন সময় এক ব্রজবাসী তথায় এলেন, দেখতে বড় সুন্দর। তিনি বললেন স্বামিন্! আপনাকে বড় দুঃখী মনে হচ্ছে। কারণ কি? "আমি মহাপ্রভুর আদেশ পালন করতে পারলাম না। আমার জীবন বৃথা।"

ব্রজবাসী— মহাপ্রভুর কি আদেশ?

শ্রীরূপ— শ্রীমূর্ত্তির সেবাপ্রকাশ, লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার প্রভৃতি।

ব্রজবাসী— স্বামিন্! আমার সঙ্গে আসুন।

শ্রীরূপ গোস্বামী ব্রজবাসীর সঙ্গে চললেন। ব্রজবাসী একটী টিলা দেখিয়ে বললেন—এ টিলার নাম গোমা-টিলা। এর মধ্যে শ্রীগোবিন্দদেব আছেন, প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে একটি গাভী এসে টিলাটিকে দুগ্ধ ধারায় স্নান করিয়ে যায়। ব্রজবাসী এ বলে অন্তর্ধান হলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী বিস্ময়ান্বিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—ইনি কে? কি কথাই বা বলে গেলেন? এ কি স্বপ্ন না বাস্তব? পর দিন পূর্ব্বাহ্নে তিনি তথায় গেলেন, দেখলেন একটী গাভী এসে টিলাটির উপর দাঁড়িয়ে দুধের ধারা বর্ষণ করে চলে গেল। তখন শ্রীরূপ গোস্বামীর পূর্ণ বিশ্বাস হল, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। গ্রামে এসে তিনি বিশিষ্ট গোপগণের কাছে এ কথা বললেন। শুনে সকলে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। অনন্তর তাঁরা কোদাল কুড়ালি নিয়ে গোমাটিলায় এলেন ও শ্রীরূপ গোস্বামীর নির্দ্দেশমত খনন আরম্ভ করলেন। কিছুটা খনন করতেই শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হলেন। শ্রীগোবিন্দদেবের মূর্ত্তিখানি যেন কোটি কন্দর্পের দর্পহারী-রূপ;নয়ন-মনের আনন্দ বর্দ্ধন করছিল। আনন্দভরে গোপগণ 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী সজল-নয়নে সাষ্টাঙ্গে দন্ডবৎ করতে লাগলেন। "শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট ধ্বনি হৈতে। উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারিভিতে।।"—(ভঃ রঃ ২।৪৩৩) ব্রজবাসী গোপগণ আনন্দ-ভরে ভারে ভারে দই-দুধ-চাল-তরকারি প্রভৃতি আনতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ নৈবেদ্য তৈরী করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণগণ শ্রীগোবিন্দদেবের মহাভিষেক করে নৈবেদ্য ভোগ লাগালেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর আনন্দের সীমা রইল না। গোস্বামিগণ উপস্থিত হ'লেন, শ্রীগোবিন্দদেব দর্শন করে সুখ সিন্ধুতে ভাসতে লাগলেন। এ সংবাদ শ্রীরূপ গোস্বামী শীঘ্র নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ

করলে মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে আনন্দ-সাগরে যেন নিমজ্জমান হলেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতকে বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন।

শ্রীশ্রীমদনগোপালদেব প্রকট

মহাবনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের সন্নিকটে এক পত্র-কুটিরে শ্রীসনাতন গোস্বামী ভজন করতেন। মাধুকরীর জন্য তিনি একদিন যমুনার তট দিয়ে গ্রামে যাচ্ছেন। মদন গোপালদেব তখন যমুনার তীরে গোপ-বালকদের সঙ্গে খেলা করছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে দেখেই বাবা! বাবা! বলে ছুটে এলেন এবং তাঁর হাত ধরলেন, বললেন—বাবা! আমি তোমার কাছে যাব।

শ্রীসনাতন—লালা! আমার কাছে কেন যাবে?

গোপাল— তোমার কাছে আমি থাকব।

শ্রীসনাতন—আমার কাছে থাকবে, খাবে কি?

গোপাল—বাবা! তুমি কি খাও?

শ্রীসনাতন—আমি শুষ্ক রুটি চানা খাই।

গোপাল— আমিও তা খাব।

শ্রীসনাতন—তুমি তা খেয়ে থাকতে পারবে না, তুমি মা-বাপের কাছেই থাক। পুনঃ গোপাল বললেন, বাবা! আমি তোমার কাছে থাকব। সনাতন গোস্বামী বালকটিকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে মাধুকরীতে গেলেন। তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন সে শিশুটি হাসতে হাসতে কাছে এসে তাঁর হাত ধরে বলছেন—বাবা! আমার নাম মদন গোপাল, আমি কাল তোমার কাছে আসব। এ বলে মদন গোপালদেব অন্তর্ধান হলেন। শ্রীসনাতনের স্বপ্ন ভাঙ্গল। আনন্দে আত্মহারা হলেন, কি দেখলাম? এমন সুন্দর শিশু কখনও দেখিনি। হরি স্মরণ করতে করতে কুটিরের কপাট খুললেন, দেখলেন দরজার

সামনে এক অপূর্ব্ব গোপাল মূর্ত্তি, তাঁর অঙ্গ শোভায় চারিদিক আলোকিত। শ্রীসনাতন গোস্বামী স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর প্রেমাশ্রু ফেলতে ফেলতে ভূতলে দন্ডবৎ করলেন। অতঃপর শ্রীমূর্ত্তির পূজা অভিষেকাদি করলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে প্রেমাবিষ্ট হলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী স্বীয় পত্র-কুটিরে মদনগোপাল দেবের সেবা করতে লাগলেন। এ শুভ সংবাদ মহাপ্রভুকে দেওয়ার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী তৎক্ষণাৎ একজন লোককে পুরী ধামে প্রেরণ করলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী আটা ভিক্ষা করে এনে, রুটি করে গোপালের ভোগ দেন। তার সঙ্গে একটু শাক তরকারী দেন। কোন দিন তৈল ও লবণের অভাবে তরকারী তৈরী করা হয় না, শুষ্ক রুটি মাত্র ভোগ দেন। এতে শ্রীসনাতনের বড় দুঃখ হতে লাগল। কিন্তু উপায় নাই;কারণ মহাপ্রভু তাঁকে যে সেবা দিয়েছেন—ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়নাদি, তা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন কখন তিনি পয়সা ভিক্ষা করে তৈল লবণ আনবেন? শ্রীসনাতন গোস্বামীর মনে কষ্ট হতে লাগল—"মহারাজ-কুমার মদন মোহন। তিঁহ শুষ্ক রুটি ভুঞ্জে দুঃখী সনাতন।।" (ভঃ রঃ ২।৪৬২) অন্তর্য্যামী ভগবান্ সনাতনের মন জানলেন। আমি শুষ্ক রুটি খাই, সনাতনের মনে তাতে দুঃখ হচ্ছে, সনাতন রাজ সেবা করতে চায়। "সনাতন মন জানি মদন গোপাল। নিজ সেবা-বৃদ্ধি ইচ্ছা হইল তৎকাল।।" (ভঃ রঃ ২।৪৬৩) শ্রীমদন গোপাল দেবের নিজ-সেবা বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করলেন।

মুলতানের একজন ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়—নাম শ্রীকৃষ্ণ দাস কপূর। তিনি বাণিজ্য করবার জন্য মথুরায় এসেছিলেন। যমুনার চড়ায় তাঁর নৌকা লেগে গিয়েছিল, কোন উপায়ে নৌকা জলে নামাতে পারলেন না। কি হবে? কৃষ্ণ দাস কপূর লোক-মুখে শুনতে পেলেন বৃন্দাবনে এক বড় সাধু বাস করেন, তাঁর নাম—শ্রীসনাতন গোস্বামী। কৃষ্ণ-দাস কপূর শ্রীসনাতনের কাছে এসে

দেখলেন, বাবা বসে লিখছেন, পরিধানে কৌপীন মাত্র, বৈরাগ্যে শুষ্ক তনু। কৃষ্ণদাস কপূর দন্ডবৎ করলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁকে বসবার জন্য একটি পত্রের আসন দিলে, আসনটা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে কৃষ্ণদাস নীচে বসে বললেন, বাবা! কৃপা করুন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন—আমি ভিখারী, কি কৃপা করব?

কৃষ্ণদাস কপূর—কেবলমাত্র আপনার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। যমুনার চড়ায় আমার নৌকা লেগে গেছে, কোন উপায়ে সরে না।

শ্রীসনাতন—আমি ত কিছুই জানি না, ঐ মদন গোপালকে সব কথা বলুন।

কৃষ্ণদাস—(দন্ডবৎ করে) হে মদন গোপাল দেব! তোমার কৃপায় যদি চড়া থেকে নৌকা সরে, এবার যত লাভ হবে সব তোমার সেবার জন্য দিয়ে দেব। এরূপ প্রার্থনা করে কপূর শেঠ বিদায় হল। সে দিন বিকেল বেলা, এমন ঝড় বৃষ্টি হল যে কপূর শেঠের নৌকা অনায়াসে যমুনার মধ্যে চলে গেল। কৃষ্ণদাস কপূর সব বুঝতে পারলেন। সে-বার ব্যবসা করে কৃষ্ণদাস বহু টাকা লাভ করেন এবং সেই সমস্ত অর্থ দিয়ে শ্রীমদন গোপাল দেবের মন্দির, ভোগশালাদি ও নিত্য রাজ-সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। মদন গোপালের রাজ-সেবা দেখে শ্রীসনাতন গোস্বামী বড়ই সুখী হলেন। কৃষ্ণদাস কপূর শ্রীসনাতন গোস্বামীর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

শ্রীবৃন্দাদেবীর আত্মপ্রকাশ

শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদন গোপাল ও যোগ-পীঠের পুনঃ আবির্ভাবের পর শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাদেবীর কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এক রাত্রিতে বৃন্দাদেবী এসে শ্রীরূপকে বলছেন আমি ব্রহ্মকুন্ডের তীরে আছি, তুমি তথায় আমার দর্শন পাবে। শ্রীরূপ প্রাতঃকালে যমুনায় স্নান করে ভজন পূজনাদি

সমাপ্ত করলেন। অনন্তর স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে এসে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলেন তীর দেশে সুবর্ণ-কান্তি-নিন্দিত এক দিব্য নারী! তাঁর অঙ্গচ্ছটায় দশদিক আলোকিত এবং মাধুর্য্যে দশদিক্ স্নিগ্ধ। শ্রীরূপ গোস্বামী বুঝতে পেরে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে স্তুতি করতে লাগলেন—হে গোবিন্দ-সেবা সহায়িনী! গোবিন্দ বাঞ্ছা-পূর্ত্তিকারিণী! তোমাকে বারবার বন্দনা করি। এ ভাবে শ্রীবৃন্দাদেবীও পুনঃ প্রকট হলেন।

শ্রীরাধারাণীর দর্শন দান

শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথ দাসকে দেখবার জন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী একদিন রাধা-কুণ্ডে এলে দুই জন উঠে তাঁকে বন্দনা করলেন এবং বসবার জন্য আসন দিলেন। পরে তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী করতে লাগলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী চাটু পুষ্পাঞ্জলি নামক একটি শ্রীরাধা স্তব লিখেছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী স্তবটি পড়লেন। তাতে একটী শ্লোক আছে—

নবগোরোচনাগৌরী প্রবরেন্দী বরাম্বরাম্।
মণিস্তবক-বিদ্যোতিবেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাম্।।
—(শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলি)

"ব্যালাঙ্গনাফণাম্" শ্রীরাধা-ঠাকুরাণীর 'বেণী' সর্পিণীর ফণার ন্যায় শোভা পাচ্ছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী এই উপমা বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—"বিষধর ফণিনীর ফণার সঙ্গে তুলনা যুক্তিযুক্ত কিনা?

মধ্যাহ্নকালে স্নানের জন্য শ্রীসনাতন রাধা-কুণ্ডে এসে কুণ্ডের স্তুতি করে স্নান করতে লাগলেন। এমন সময় কুণ্ডের তীরে কিছু দূরে বৃক্ষের তল-দেশে গোপ-কুমারীগণকে খেলা করতে দেখলেন। তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই তাঁদের পৃষ্ঠ-দেশে দোদুল্যমান লম্বিত বেণীগুলিতে শ্রীসনাতন গোস্বামীর সর্প ভ্রম হল। তিনি তখন ব্যগ্র হয়ে কুমারিগণকে আহ্বান করে

বললেন— হে কুমারিগণ। সাবধান হও, তোমাদের পৃষ্ঠ দেশে সর্প উঠছে। কুমারিগণ নিজ মনে সানন্দে খেলছিল, তাঁর কথা শুনছিল না। তখন তিনি স্বয়ং বাধা দেওয়ার জন্য ছুটলেন;তাঁকে আসতে দেখে গোপ-কুমারিগণসহ শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী হাসতে হাসতে অন্তর্ধান হ'লেন। অবাক হয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর শ্রীরূপের উপমার কথা বুঝতে পারলেন।

"শ্রীদানকেলিকৌমুদী"

শ্রীরূপ গোস্বামী "ললিত মাধব" নামে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন;নাটকটিতে বর্ণিত আছে দ্বারকা-লীলা। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে নাটকখানি পাঠ করতে দিলেন। গ্রন্থখানি পাঠ করে রঘুনাথ দাস গোস্বামী এত বিরহ-বিধুর হলেন যে প্রাণ ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে ভাবাক্রান্ত দেখে শ্রীরূপ গোস্বামী সব বুঝতে পারলেন। তখন তিনি ব্রজের নিত্য-লীলাযুক্ত "দানকেলি কৌমুদী" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে উহাও পাঠ করবার জন্য শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দিলেন। এবার এ গ্রন্থ পাঠ করে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী যেন সুখের সাগরে ডুবে গেলেন।

দানকেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর।
সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরন্তর।।

— (ভক্তি রত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গে ৭৭৪)

"শ্রীকৃষ্ণের দুগ্ধ দান"

অন্ন-জল ত্যাগ করে শ্রীসনাতন গোস্বামী পাবন-সরোবর তটে নির্জ্জন বনে ভজন করতে লাগলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ সব জানতে পারলেন— ভক্ত অনাহারে আছেন। ভক্তের আহার ভগবান্ নিজেই যোগান—এ কথা তাঁর বাণীতে আছে। গোপ বালকের বেশে শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধ নিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে গোস্বামীর নিকট এলেন।

কৃষ্ণ গোপ-বালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া।
দাঁড়াইলা গোস্বামী সম্মুখে হর্ষ হৈয়া।।

(ভঃ রঃ ৫।১৩০৩)

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—বাবা! তোমার জন্য দুধ এনেছি।

শ্রীসনাতন—তুমি কেন কষ্ট করে দুধ আনলে?

শ্রীকৃষ্ণ—তুমি না খেয়ে আছ, তাই।

শ্রীসনাতন—তুমি কেমনে জানলে যে আমি না খেয়ে আছি?

শ্রীকৃষ্ণ—সরোবরের তীরে গোচারণ করতে এসে দেখেছি তুমি না খেয়ে আছ।

শ্রীসনাতন—অন্য কেহ এলেন না কেন?

শ্রীকৃষ্ণ—ঘরে অনেক কাজ, তাই আমাকে আসতে হয়েছে।

শ্রীসনাতন—আহা! তুমি অতটুকু শিশু, তোমার কত কষ্ট হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ—না, না, বাবা! আমার কোন কষ্ট হয় নাই।

শ্রীসনাতন গোস্বামী তাড়াতাড়ি ভাণ্ডটি নিয়ে বললেন—লালা, বস; পাত্রটি খালি করে দিই।

শ্রীকৃষ্ণ—না বাবা! আমি বসতে পারব না, সন্ধ্যা হয়ে আসছে গো-দোহন করতে হবে, ভাণ্ড কাল নিয়ে যাব। এ কথা বলতে বলতে বালক অদৃশ্য হল। শ্রীসনাতন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সব কথা বুঝতে পারলেন, শ্রীকৃষ্ণই এ সব করেছেন। নেত্র-জলে ভাসতে ভাসতে উঠে দুধ পান করলেন তারপর থেকে তিনি মাধুকরী করে খেতেন। ব্রজবাসিগণ তাঁর থাকার জন্য একটি কুটির করে দিলেন।

"শ্রীরাধিকার স্নেহ"

একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামীকে পায়স খাওয়াতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু পায়স তৈরী করার কোন সামগ্রী তখন কুটিরে ছিল না। ভক্ত ইচ্ছা পূর্ণকারিণী শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী সব বুঝতে পারলেন। তখন একটি গোপকুমারী বেশে তিনি শ্রীরূপের জন্য দুধ, চাল ও চিনি নিয়ে এলেন এবং ডাকতে লাগলেন—স্বামিন্! স্বামিন্! সিধা গ্রহণ করুন। কুমারীর কণ্ঠধ্বনি শুনে শ্রীরূপ গোস্বামী কুটিরের দ্বার খুললেন। দেখলেন এক অপরূপ কুমারী সিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী বললেন—লালি! তুমি এ-সময়ে এলে কেন?

শ্রীরাধা—স্বামিন্! আপনাদের সেবার জন্য সিধা এনেছি।

শ্রীরূপ—লালি! তুমি এত কষ্ট করলে কেন?

শ্রীরাধা—বাবা! কিসের কষ্ট? সাধুর সেবার জন্য এনেছি।

শ্রীরূপ—সিধা নিয়ে বসতে বললে, কুমারী বললেন আমি বসতে পারব না, ঘরে কাজ আছে। বলতে বলতে কুমারী অদৃশ্য হলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ফিরে দেখলেন কুমারী নাই তিনি পরম বিস্ময়ান্বিত হলেন। অনন্তর পায়স তৈরী করে শ্রীগোবিন্দদেবকে ভোগ দিলেন। প্রসাদ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে দিলেন। প্রসাদ পেয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী আনন্দে আত্মহারা! জিজ্ঞাসা করলেন চাল দুধ কোথায় পেলে? শ্রীরূপ বললেন একজন গোপ-কুমারী দিয়ে গিয়েছে। শ্রীসনাতন বললেন— হঠাৎ দিয়ে গেল? শ্রীরূপ বললেন হাঁ হঠাৎ দিয়ে গেল, আজ সকাল বেলা আমার ইচ্ছা হল আপনাকে একটু পায়স খাওয়াই, এমন সময় দেখি এক কুমারী সিধা নিয়ে হাজির। এ কথা শুনে শ্রীসনাতনের নয়ন দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়তে লাগল, বললেন এত স্বাদিষ্ট দ্রব্য আর কে দিবেন? শ্রীরাধাঠাকুরাণীই দিয়েছেন। তুমি যেন এরূপ আকাঙ্ক্ষা আর কখন ক'র না।

"শুনিয়া গোস্বামী নিষেধয়ে বারবার।"

—(ভঃ রঃ সিঃ ১৩।২২)

"শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের কৃপা"

প্রতিদিন চৌদ্দ মাইল গোবর্দ্ধন-গিরি শ্রীসনাতন গোস্বামী পরিক্রমা করতেন। বার্দ্ধক্য-হেতু তাঁর কষ্ট হত, কিন্তু তিনি নিয়ম ভঙ্গ করতে চাইতেন না। কষ্ট করে পরিক্রমা করতেন। ভক্তের কষ্ট ভগবান্ বুঝতে পারলেন। এক গোপ-শিশুরূপে শ্রীসনাতনের কাছে এলেন, বললেন—বাবা! তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, এত কষ্ট করে গিরিরাজ পরিক্রমা আর ক'র না। শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন—ইহা আমার নিত্য ভজন—নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, বৃদ্ধকালে নিয়ম ত্যাগ কর। শ্রীসনাতন বললেন— নিয়ম কখনও ত্যাগ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন— বাবা! আমার কথা মান্‌বে? শ্রীসনাতন বললেন—মান্‌বার মত যদি হয়, মান্‌ব। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজ পদচিহ্নযুক্ত একটী শিলা খন্ড দিয়ে বললেন—বাবা এটি সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধন-শিলা। শ্রীসনাতন বললেন—এ-শিলা আমি কি করব? শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এ শিলা পরিক্রমা কর, গিরিরাজ পরিক্রমার ফল পাবে। "শিলা সমর্পিয়া কৃষ্ণ হলেন অদর্শন।" শ্রীসনাতন গোস্বামী অবাক হলেন, তিনি বুঝতে পারলেন গিরিরাজ স্বয়ং দিয়ে গেলেন, সে দিন থেকে তিনি সেই পদচিহ্ন-শিলা পরিক্রমা করতেন।

"শ্রীমদনগোপালের দর্শন দান"

শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাবনে থাকতেন। একদিন যমুনা তটে তিনি শ্রীমদন গোপালকে খেলতে দেখলেন। অবাক হলেন। এ কি সে মদন গোপাল খেলছে না কি? আবার চিন্তা করলেন কোন গোপ-বালক হবে। সে দিন গেল। আর একদিন দেখলেন যমুনার তটে সে শিশুটি অন্যান্য গোপ-শিশুর সঙ্গে খেলছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী লক্ষ্য করবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। আজ দেখব শিশু কোথায় যায়।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল। খেলা সাঙ্গ করে অন্যান্য গোপশিশুগণ ঘরে চলে গেল। মদনগোপাল মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তখন সনাতন গোস্বামী বুঝতে পারলেন, মদনগোপাল প্রতিদিন যমুনা-তীরে ক্রীড়া করেন।

"ব্রজবাসীগণের স্নেহ"

শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী যখন ব্রজের যে গ্রামে যেতেন সে গ্রামের গোপগণ দু'ভাইকে প্রাণের থেকে অধিক স্নেহ করতেন। গ্রামবাসিগণ তাঁদের দই দুধ খাওয়াতেন।

গোস্বামিদ্বয় গ্রামবাসিদের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরিকর মনে করতেন। সে ভাবে তাঁদের সম্মান করতেন। তাঁদের গৃহের যাবতীয় খবর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করতেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে লিখেছেন—

কার কত কন্যা পুত্র—বিবাহ কোথায়।
কি নাম কাহার—কৈছে প্রবীণ নির্ভয়।।
গাভী বৃষাদিক কত কৃষিকর্ম কার।
কার গৃহে শস্য কত, কৈছে ব্যবহার।।
শরীর আরোগ্য কার কৈছে মনোবৃত্তি।
ঐছে জিজ্ঞাসিতে সবে হন হর্ষ অতি।।

—(ভঃ রঃ ৫।১৩৬৯-১৩৭১)

গোস্বামীদ্বয় এভাবে ব্রজবাসিদের খবর নিতেন। মাঝে মাঝে তাঁদের শারীরিক হিতোপদেশ দিতেন ; ব্রজবাসিগণের দুঃখের কথা শ্রবণ করে দুঃখী হতেন। সুখের কথা শ্রবণ করে সুখী হতেন ও তাঁদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসাদি করতেন। গ্রামে গেলে ব্রজবাসিগণ তাঁদের ছাড়তে চাইতেন না। তাঁদের কয়দিন না দেখলে বড় দুঃখী হতেন। শ্রীরূপ সনাতনের প্রাণ যেমন

ব্রজবাসিগণ, তেমনি ব্রজবাসিগণের প্রাণও তাঁরা দুই জন।

"বৈষ্ণব-চূড়ামণি শিবের স্নেহ"

গোবর্দ্ধনে চাক্‌লেশ্বর নামক স্থানে শ্রীসনাতন গোস্বামী ভজন করতেন। সেখানে মশকের উৎপাত বড় বেশী হল। মশকের দংশনে বিরক্ত হয়ে, শ্রীসনাতন একদিন বললেন—এখানে আর থাকব না। ভজনও করা যায় না, মহাপ্রভুর সেবা—গ্রন্থ লিখনাদিও হয় না।

অন্তর্য্যামী শ্রীশিব শ্রীসনাতনের মনের কথা জানতে পেরে রাত্রে শ্রীসনাতনকে স্বপ্নে বললেন—সনাতন! তুমি স্বচ্ছন্দে ভজন ও মহাপ্রভুর সেবা করতে থাক, মশকের উৎপাত কাল থেকে আর থাকবে না। সে দিন থেকে সেখানে মশা আর রইল না, শ্রীসনাতন গোস্বামী নিরুপদ্রবে ভজন করতে লাগলেন।

"শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের রচিত গ্রন্থাবলী"

শ্রীসনাতন গোস্বামীকৃত—শ্রীবৃহৎ-ভাগবতামৃত, শ্রীহরিভক্তি-বিলাস ও উহার দিগ্‌দর্শিনী টীকা, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব বা দশম চরিত, শ্রীমদ্ভাগবতের টিপ্পনী ও বৃহৎ বৈষ্ণব-তোষণী।

শ্রীমদ্‌রূপগোস্বামীকৃত— হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম তিথি বিধি, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা (বৃহৎ ও লঘু) শ্রীস্তবমালা। শ্রীবিদগ্ধ মাধব নাটক, শ্রীললিত মাধব নাটক, দানকেলি কৌমুদী, শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, সংক্ষেপ ভাগবতামৃত। সামান্য বিরুদাবলী লক্ষণ ও উপদেশামৃত।

"শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের মহিমা গীত"

জয় মোর সাধু-শিরোমণি রূপ সনাতন।

জিনকে ভক্তি—	এক রস নিবহী	প্রীত কৃষ্ণ রাধাতন।।
বৃন্দাবন কী	সহজ মাধুরী	রৌম রৌম সুখ গাতন।।
সব তেজি কুঞ্জ কেলি,	ভজি অহর্নিশি	অতি অনুরাগ রাধাতন।।
করুণা সিন্ধু	কৃষ্ণচৈতন্য কে	কৃপা ফলী দৌ ভ্রাতন।।
তিন বিনু ব্যাস	অনাথন যে	সে সুখে তরুবর পাতন।।

শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের জন্ম তারিখ—সজ্জন তোষণী ২য় বর্ষ ২৫পৃঃ (ইং ১৮৮৫) প্রকাশিত আছে যথা—

শ্রীসনাতন—জন্ম ১৪১০ শকাব্দ, ১৫৪৪ সম্বৎ, ১৪৮৮ খৃঃ তিনি গৃহে ২৭ বছর ও ব্রজে ৪৩ বছর বাস করেছিলেন।

তাঁর প্রকট স্থিতি— ৭০ বছর, অপ্রকট—১৪৮০ শকাব্দ; ১৬১৫ সম্বৎ, ১৫৫৮ খৃঃ আষাঢ়ী-পূর্ণিমায়।

শ্রীরূপ—জন্ম ১৪১১ শকাব্দ, ১৫৪৬ সম্বৎ, ১৪৮৯ খৃঃ গৃহে বাস ২২ বছর, ব্রজে—৫১ বছর। শ্রীরাধারমণ ঘেরার মতে—জন্ম ১৪১৫ শকাব্দ, ১৫৫০ সম্বৎ, ১৫৬৮ খৃঃ। প্রকট স্থিতি ৭৫ বছর।

তাঁর অপ্রকট ১৪৮৬ শকাব্দ, ১৬২১ সম্বৎ, ১৫৬৪ খৃঃ শ্রাবণী শুক্লাদ্বাদশী ১৫৬৮ খৃঃ মতান্তরে ১৪৯০ শকাব্দ, ১৬২৫ সম্বৎ, ১৫৬৮ খৃঃ।

"শ্রীসুবুদ্ধি রায়"

শ্রীসুবুদ্ধি রায় পূর্ব্বে গৌড়ের রাজা ছিলেন, হুসেন সাহ এঁর অধীনে কাজ করতেন। শ্রীসুবুদ্ধি রায় এক দীঘিকা খনন কার্য্য আরম্ভ করেন। সে কার্য্যের মুন্‌শী হলেন হুসেন সাহ। একদিন হুসেন সাহের বিশেষ ভুলের

জন্য শ্রীসুবুদ্ধি রায় তাঁর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করেন।

কালক্রমে হুসেন সাহ গৌড়ের বাদশা হলেন। তখন শ্রীসুবুদ্ধি রায় তাঁর অধীনে কাজ করতে লাগলেন।

একদিন হুসেন সাহের বেগম বলেন— তোমার অঙ্গে এরূপ চিহ্ন কেন?

হুসেন সাহ— কোন কারণে।

বেগম— সে কারণ আমায় না বললে আমি আহার করব না।

হুসেন সাহ—এ বহুদিনের কথা।

বেগম—বহুদিনের হলেও আমায় বলতে হবে।

হুসেন সাহ—তবে শুন, যখন শ্রীসুবুদ্ধি রায় গৌড়ের রাজা ছিলেন তখন আমি তাঁর অধীনে কাজ করতাম। কোন কাজ বারবার বুঝান হলেও আমি বুঝতে পারছিলাম না। তাই আমাকে বুঝাবার জন্য বেত্রাঘাত করেছিলেন। তাতে আমি কিছু মনে করি নাই। আমার ভালর জন্যই তিনি আমায় মেরেছিলেন।

বেগম বললেন—আমি এ সব কথা সইতে পারি না। শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের প্রাণ সংহার কর! তবে ভোজন করব।

হুসেন সাহ— বেগম! তুমি এ কি কথা বলছ? শ্রীসুবুদ্ধিরায় আমার পালক, পিতৃসদৃশ। তাঁর প্রাণ সংহার করা আমার পক্ষে কখনও উচিত হয় না।

বেগম—যদি তাকে না মার, তার জাতি নাশ কর।

বাদশা—জাতি নাশ করলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করতে পারেন।

বেগম—তা যদি না হয় আমি নিজেই প্রাণ ত্যাগ করব।

বাদশা মহা বিপদে পড়লেন। অনেক চিন্তা করে সুবুদ্ধি রায়কে করোঁয়ার পাণি পান করালেন। শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট হল। ব্রাহ্মণ সমাজ

তাঁকে ত্যাগ করলেন। শ্রীসুবুদ্ধি রায় কাশীতে গেলেন ; প্রায়শ্চিত্ত করলে তাঁর পাপ ক্ষয় হবে কি না পন্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলে, তাঁরা বললেন—"তপ্ত ঘৃত খেয়ে প্রাণ ত্যাগই এর প্রায়শ্চিত্ত।"

শ্রীসুবুদ্ধি রায় কাশীতে রইলেন কিছুদিন। এমন সময় তথায় মহাপ্রভুর আগমন হল। শ্রীসুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করলেন। একদিন প্রভুর শ্রীচরণ ধরে প্রায়শ্চিত্তের কথা নিবেদন করলে, মহাপ্রভু বললেন—

এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে।।
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহা পাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২৫।১৯৯-২০০)

অনন্তর মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীসুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনে এলেন এবং শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করে বাজারে বিক্রি করে যে পয়সা পেতেন, তা দিয়ে চানা কিনে খেয়ে জীবন ধারণ করতেন ; দুঃখী বৈষ্ণবদের সেবা করে যেতেন, আর গৌড়দেশ থেকে আগত বৈষ্ণব যাত্রীদের খাওয়াতেন দই ভাত।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রয়াগ থেকে ব্রজে এলে শ্রীসুবুদ্ধি রায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। পূর্ব্বে হতেই দু-জনার মধ্যে সখ্যভাব ছিল। শ্রীসুবুদ্ধি রায় শ্রীরূপকে দ্বাদশ বন দর্শন করালেন। এইভাবে শ্রীসুবুদ্ধি রায় শ্রীসনাতনের সহিত মিলিত হলে উভয়েরই পরম আনন্দ হল।

শ্রীসুবুদ্ধি রায় ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন। মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে শ্রীহরিনাম আশ্রয়পূর্ব্বক, শ্রীব্রজধামে অতি দীনভাবে ও গোস্বামিদিগের সঙ্গে শ্রীভগবদ্ প্রসঙ্গে দিন যাপন করতেন।

——o——

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তম জন ষড়-গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামী। মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও সনাতনের দ্বারা পৃথিবী তলে স্বীয় স্বাভীষ্ট শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন। ভক্তগণ এ দুই জনকে সেনাপতি বলেছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর বংশ পরিচয় শ্রীল জীব গোস্বামী লঘু বৈষ্ণব তোষণীতে দিয়েছেন।

উদ্যচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিনী
জিহ্বা কল্পলতাত্রয়ী মধুকরী ভূয়োনরীনৃত্যতে।
রেজে রাজসভা সভাজিত পদঃ কর্ণাটভূমিপতিঃ
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর্ভূবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ।।

অনুবাদ ঃ— শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নামে কর্ণাট দেশাধিপতি পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত নৃপতিরূপে বিরাজিত ছিলেন। তাঁর উৎকৃষ্ট শব্দবিন্যাসময়ী অমৃত নিঃস্যন্দিনী এবং বেদত্রয়রূপ কল্পতলায় মধুকরীতুল্যা জিহ্বা নিরন্তর নৃত্য করত। তাঁর পাদপদ্মযুগল রাজমন্ডলী কর্তৃক পূজিত হত এবং তিনি ভরদ্বাজ গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। এই কর্ণাট-ভূপতি জগদ্‌গুরু শ্রীসর্ব্বজ্ঞের অভ্যুদয়কাল—দ্বাদশ শক শতাব্দীতে। শ্রীসর্ব্বজ্ঞের আত্মসম পুত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ দেব। শ্রীঅনিরুদ্ধের দুই পুত্র শ্রীরূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বর ছিলেন শাস্ত্রে বিচক্ষণ এবং হরিহর ছিলেন অস্ত্রে বিচক্ষণ। পিতার অন্তর্ধানের পর রূপেশ্বর ছোট ভাই হরিহর দ্বারা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। তৎকালে

তিনি আটটি অশ্বসহ পৌলস্ত্য দেশে আগমন করেন এবং পৌলস্ত্যের রাজা শ্রীশিখরেশ্বরের সঙ্গে তার মৈত্রীভাব হয়। রূপেশ্বরের পরম সুন্দর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ পুত্রের নাম শ্রীপদ্মনাভ দেব। শ্রীপদ্মনাভ গঙ্গাতটে বাস অভিপ্রায়ে নৈহাটি নামক গ্রামে এলেন এবং তথায় সাধ্বী পত্নীসহ সুখে বাস করতে লাগলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি পূজা করতেন। শ্রীপদ্মনাভ দেবের আঠারটি কন্যা এবং পাঁচটি পুত্র হয়। পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ পাঁচটি পুত্রের নাম।

শ্রীমুকুন্দ দেবের পুত্র শ্রীকুমারদেব, ইনি পরম সদাচারী ও বিপ্রকুলের রত্নসদৃশ ছিলেন এবং নিরন্তর যাগ—যজ্ঞাদি পরায়ণ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে স্বজনগণের দ্বারা তিনি পীড়িত হয়ে নৈহাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে 'বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ' গ্রামে এসে বসবাস করতে লাগলেন। তত্রস্থ সজ্জনগণ কর্ত্তক তিনি পরম আদৃত হলেন। কুমারদেব যশোরে ফতেয়াবাদ নামক গ্রামেও একখানি বসতবাটী করেছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অনেকগুলি সন্তান ছিলেন তাঁর মধ্যে তিনটি পুত্র ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

কুমার দেবের হৈল অনেক সন্তান।
তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ।।
সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ এই ত্রয়।
সগোত্র অন্যত্র যে অর্চ্চিত অতিশয়।।

—(ভঃ রঃ ১।৫৬৭-৫৬৮)

শ্রীরূপ গোস্বামীর বড় ভাই হলেন শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং ছোট ভাই হলেন শ্রীবল্লভ বা অনুপম। শ্রীঅনুপমের পুত্র হলেন শ্রীজীব গোস্বামী।

শ্রীল কবি কর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে ব্রজলীলায় শ্রীরূপ গোস্বামী 'শ্রীরূপমঞ্জরী' ছিলেন বলেছেন।

শ্রীরূপমঞ্জরীখ্যাতা যাসীদ্ বৃন্দাবনে পুরা।
সাদ্য রূপাখ্য গোস্বামী ভূত্বা প্রকটতা মিয়াৎ।।

যিনি পূর্ব্বে ব্রজলীলায় "শ্রীরূপমঞ্জরী" নামে খ্যাতা ছিলেন, তিনি অধুনা সদ্য শ্রীরূপ গোস্বামী নামে প্রকটিত হয়েছেন।

শ্রীরূপ সনাতন ছিলেন এক প্রাণ। তাঁরা এক সঙ্গে অধ্যয়নাদি করেছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী "দশম টিপ্পনীর" বন্দনাতে যাঁদের নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যাপনাদি করেছিলেন তাদের বন্দনা করেছেন—

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ বিভূষণম্।।
বন্দে শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকম্।।

অনুবাদ ঃ— আমি অধ্যাপক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গৌড়দেশ বিভূষণ বিদ্যাভূষণ, বিদ্যা বাচস্পতি, রসপ্রিয় পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, এবং বাক্চতুর অধ্যাপক রাম ভদ্রাদিকে বন্দনা করি।

এ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী যাঁদের নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের নাম পাওয়া যায়। শ্রীরূপ সনাতন অল্প বয়সে নিখিল বেদশাস্ত্র অধ্যয়নাদি করে পরম বিদ্বান হয়েছিলেন। তাঁরা কিভাবে তৎকালে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ বাদশাহের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। তৎ সম্বন্ধে কিছু প্রবাদ আছে—

বাদশাহের যে গুরু মৌলবী ছিলেন তিনি বেশ সাধক পুরুষ ছিলেন, ভূত ভবিষ্যতের কথাদি বলতে পারতেন। কোন সময় বাদশাহ তাঁর কাছে অভ্যুদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন তোমার এ মহানগরীতে

পরম বিদ্বান সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন দুইটী ব্রাহ্মণ সন্তান বাস করছেন, তাঁদের নাম 'রূপ' ও 'সনাতন'। তাঁদের মন্ত্রীপদ দিলে তোমার বহু বৈভব রাজ্যাদি সম্পদ লাভ হবে। বাদশাহ্ গুরুর কথানুসারে শ্রীরূপ সনাতনকে মন্ত্রিপদ দান করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর জন্ম খৃষ্টাব্দ ১৪৯৩, শকাব্দ ১৪১৫। তিনি রাজধানী গৌড়ের নিকটে সাকুর্মা নামক এক পল্লীতে মাতুল গৃহে থেকে পড়াশুনা করেন।

গৌড়ের বাদশাহ হুসেনসাহ জোর পূর্ব্বক শ্রীরূপ ও সনাতনকে এনে রাজমন্ত্রিত্ব পদ দেন। তারা অনিচ্ছুক হলেও যবনরাজের ভয়ে রাজকার্য্য করতে লাগলেন। বাদশা তাঁদিগকে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন। শ্রীরূপ ও সনাতন তখন থেকে গৌড় রাজধানী রামকেলিতে বসবাস করতে লাগলেন। দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ তাঁদের গৃহে আগমন ও বিবিধ শাস্ত্র চর্চ্চাদি করতেন। কর্ণাটক থেকে ব্রাহ্মণগণ এলে বহু যত্ন পূর্ব্বক তাঁদের বাসস্থান প্রদান করতেন। গঙ্গার তটে তাদের বসত বাটী স্থাপিত হওয়ায় অদ্যাপি ঐ গ্রাম ভট্টবাটী নামে খ্যাত।

যে সময় শ্রীরূপ ও সনাতন রামকেলিতে বাদশাহের মন্ত্রির কার্য্য করছিলেন ঠিক সেই সময় নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে নিয়ে মহাসংকীর্ত্তন বিলাস ও পাপী তাপী উদ্ধার লীলা করছিলেন। শ্রীরূপ ও সনাতন নিয়ত মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সেই মহাবদান্যতার ও কৃপালুতার কথা শুনেছিলেন। নিত্যারাধ্যদেব শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনের জন্য তাঁদের হৃদয়ে পরম উৎকণ্ঠা জেগেছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী কোন সময়ে শ্রীগৌরসুন্দরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—তাঁর শ্রীচরণ দর্শনের জন্য। শ্রীরূপের সেই পত্রোত্তরে মহাপ্রভু জানিয়েছিলেন—"পর পুরুষ অনুরক্তা রমণী যেমন বাহ্য স্বামীর সেবায় অনুরক্ততা দেখায়; তদ্রূপ তোমরা চিত্তটি শ্রীকৃষ্ণপদে রেখে বাহ্য

রাজকার্য্যে অনুরাগ দেখাও। অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের প্রতি কৃপা করবেন।"

শ্রীরূপ গোস্বামী তৎকালে শ্রীনবদ্বীপ নগরে যেতে পারেননি। তথাপি তিনি নবদ্বীপ নিবাসী জনগণের প্রতি অতিশয় প্রীতি দেখাতেন। এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভক্তিরত্নাকরে সুন্দর বর্ণনা করেছেন—

নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত।
কহিতে না পারি তা সবারে ভক্তি কত।।

—(ভঃ রঃ ১।৫৯৭)

শ্রীরামকেলিতে গ্রামে শ্রীরূপ ও সনাতন কিরূপ ঐশ্বর্য্য সমন্বিত ছিলেন তা ভক্তিরত্নাকরে বর্ণনা করেছেন—

গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভূত বিলাস।।
ইন্দ্রসম সনাতন রূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানা দেশ হৈতে।।
গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি কবিগণ।
সর্ব্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ।।
নিরন্তর করেন অনেক অর্থ-ব্যয়।
কোনরূপে কার অসম্মান নাহি হয়।।
সদা সর্ব্বশাস্ত্রে চর্চ্চা করে দুইজন।
অনায়াসে করে দোঁহে খন্ডন স্থাপন।।

* * *

বাড়ীর নিকট অতি নিভৃত স্থানেতে।
কদম্ব কানন, রাধাশ্যাম কুন্ড তা'তে।।

বৃন্দাবন লীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ।।
শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন সেবায় রত।
সদা খেদ উক্তি তাহা কহিব বা কত।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বিহরে নদীয়া।
সদা উৎকণ্ঠিত তাঁর দর্শন লাগিয়া।।
—(ভঃ রঃ ১।৫৮৫-৬০৭)

অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন এবং নদীয়া ছেড়ে চললেন শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে। এ কথা শুনে শ্রীরূপ পরম ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, জীবনে আর শ্রীগৌরসুন্দরের রাতুল শ্রীচরণ যুগল দর্শন হবে না, বলে প্রাণটি বিদীর্ণ হতে লাগল, অন্তরে অন্তরে অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরহরি অভয় পদে দারুণ বেদনার কথা নিবেদন করতে লাগলেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের আহ্বানে স্থির থাকতে পারলেন না, ভক্তকে দেখা দিতেই হবে ভেবে, কিছুদিন শ্রীগৌরসুন্দর পুরীধামে থেকে পুনঃ গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। ভক্তের আকর্ষণে ভগবান চঞ্চল হয়ে উঠেন। গৌড়দেশে শ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের ভ্রাতা বিদ্যা বাচস্পতির ভবনে শুভবিজয় করলেন। তখন ভক্তগণের যেন হৃদয়ের অপহৃত মহাধনের পুনঃ প্রাপ্তি ঘটল, আনন্দের অবধি রইল না।

মহাপ্রভু কয়েকদিন বিদ্যানগরে অবস্থানের পর কুলিয়া নগরে শুভবিজয় করলেন।

কুলিয়া-গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি' কৈল দরশন।।
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রেরে ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ।।

পাষন্ডী নিন্দুক আসি' পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি' তারে দিল কৃষ্ণ প্রেমে।।
—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১।১৫২-১৫৪)

মহাপ্রভু কুলিয়া নগরে কয়েকদিন থেকে বহু পাপী তাপী জীবের উদ্ধার পূর্ব্বক প্রেমদান করলেন এবং সেখান থেকে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন, সঙ্গে সহস্র সহস্র লোক চলতে লাগলেন। অকস্মাৎ ভক্ত বৎসল প্রভুর মনে কি ভাবের উদয় হল, তিনি গৌড় রাজধানী রামকেলি গ্রামাভিমুখে চলতে লাগলেন—

ঐছে চলি' আইলা প্রভু 'রামকেলি' গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপাম।।
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ।।
—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১।১৬৬-১৬৭)

গৌড়াধ্যক্ষ বাদশাহ মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব প্রভাব শ্রবণ করে বিস্মিত হয়ে কর্মচারীগণের প্রতি বলতে লাগলেন—বিনা দানে এর পিছে এত লোক চলেন, তিনি নিশ্চয় ঈশ্বর জানতে হবে। অতএব তাঁকে যদি কেহ কোন প্রকার হিংসাদি করে তবে তার উচিত শাস্তি প্রদান করা হবে। সেই মহাপুরুষ ইচ্ছামত ভ্রমণ করুক।

শ্রীরূপের বাদশাহ দত্ত নাম হল দবির খাস। বাদশাহ পরিশেষে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে দবির খাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন—

যে তোমার রাজ্য দিল, যে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিঞা।।

তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্য সিদ্ধি হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রই জয়।।
—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১।১৭৬-১৭৭)

রাজা! তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি নরাধিপ বিষ্ণু অংশ তুল্য। তোমার মনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহাই প্রমাণ। বাদশাহ বললেন—আমার মনে হয় শ্রীচৈতন্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহাতে সংশয় নাই। বাদশাহ এ কথা বলে দরবার গৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। শ্রীরূপ (দবির খাস) নিজ গৃহে এলেন। শ্রীরূপ ও সনাতন দেখলেন বিধাতা যেন অকস্মাৎ সদয় হয়ে অসাধনে গৌর চিন্তামণি মিলিয়ে দিয়েছেন। মহাপ্রভু গঙ্গাতটে এক বকুল বৃক্ষের মুলে অবস্থান করলেন, মহাসংকীর্ত্তন রোলে দিক্ দিগন্তে মুখরিত হচ্ছিল, সন্ধ্যাগমনে তা বিরাম লাভ করল, ভক্তগণ মহাপ্রভুর চারিদিকে অবস্থান করছেন, এমন সময় সেই প্রাণের দেবতা শ্রীগৌরসুন্দরের অভয় পাদপদ্ম যুগল দর্শন বাসনায় ছদ্মবেশে সামান্য মাত্র বস্ত্র পরিধান করে শ্রীরূপ ও সনাতন দুই গুচ্ছ তৃণ মুখে ধরে প্রেম পুলকিত প্রেমাশ্রু স্মরণ নেত্রে সাষ্টাঙ্গ দন্ডবৎ হয়ে পড়লেন শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ যুগল মূলে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর নিকট দুই ভাইয়ের কথা নিবেদন করে দুই ভাইকে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে সমর্পণ করলেন। দুই ভাই মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম তলে পড়ে অতি দৈন্য ভরে স্তুতিপূর্ব্বক রোদন করতে লাগলেন। তখন শ্রীগৌর তাঁদের ভূমি হতে উঠিয়ে বলতে লাগলেন—

—মহাপ্রভু কহে,—শুন দবির-খাস।
তুমি দুই ভাই—মোর পুরাতন দাস।।
আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ সনাতন'।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন।।

দৈন্যপত্রী লিখি, মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রীদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার।।
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রীদ্বারে।
তোমা শিখাইতে শ্লোক পাঠাইল বারে বারে।।

*　　　　*　　　　*

গৌড়-নিকটে আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা-দুঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন।।
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে, কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে।।
ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে।।
জন্মে জন্মে তুমি দুই—আমার কিঙ্কর।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১।২০৭-২১৫)

মহাপ্রভু দবির খাস (শ্রীরূপ) ও সাকর মল্লিককে (সনাতন) বিবিধ উপদেশ এবং প্রবোধ দিয়ে বিদায় করলেন। তাঁরা যাবার সময় বার বার মহাপ্রভুর শ্রীচরণ যুগল শিরে ধারণ ও প্রার্থনা করতে করতে সমস্ত গৌর ভক্ত অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীহরিদাস ও শ্রীগদাধর প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় হলেন, সকলে হরিধ্বনি পূর্ব্বক বললেন— তোমাদের কোন ভয় নাই মহাপ্রভুর কৃপা হয়েছে। অতঃপর ভক্তগণসহ শ্রীগৌরহরি কানাইর নাটশালাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীরূপ ও সনাতন দুইজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণমন্ত্রে দুইটি পুরশ্চরণ করলেন, অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণ আশ্রয় পাবার জন্য।

শ্রীরূপ গোস্বামী যশোহরে ফতেয়াবাদে নিজ গৃহে নৌকাতে করে

বহুধন নিয়ে এলেন। সেই ধন কিছু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণকে কিছু কুটুম্ব ভরণ পোষণের এবং ভবিষ্য কোন আপৎ কালাদির জন্য ভাল ভাল বিপ্রস্থানে রেখে দিলেন। গৌড় রামকেলিতে সনাতনের বন্ধন মোচনের জন্য দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা মুদি ঘরে রেখে দিলেন।

অতঃপর শ্রীরূপ যখন শুনলেন শ্রীমহাপ্রভু বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করছেন, তখন কাল বিলম্ব না করে ছোট ভাই অনুপমের সহিত তিনি বের হয়ে পড়লেন। শীঘ্র চলতে চলতে শ্রীরূপ অনুপমের সহ প্রয়াগে পৌঁছলেন। প্রভুর দর্শন পেলেন। প্রভু চলেছেন শ্রীবিন্দুমাধব দর্শনে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রভু দর্শনের জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হচ্ছেন। দুই ভাই দূর থেকে প্রভুকে দন্ডবৎ প্রণাম করলেন।

অনন্তর তত্রস্থ এক দাক্ষিনাত্য ব্রাহ্মণ গৃহে আমন্ত্রিত হয়ে প্রভু তথায় ভোজন করতে গেলেন, সেইসময় রূপ ও অনুপম প্রভুর সঙ্গে ঐ ব্রাহ্মণ গৃহে সাক্ষাৎভাবে মিলিত হলেন। দুই ভাই মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করতেই প্রভু রূপকে ভূমি হতে উঠিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন এবং শ্রীসনাতনের সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের যাবতীয় সমাচার প্রদান করলেন। তা শুনে মহাপ্রভু বললেন—সনাতনের শীঘ্রই বন্ধন মোচন হবে।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদী পোষ্টী মার্গের আচার্য্য শ্রীবল্লভ ভট্ট তখন প্রয়াগে আড়াইল গ্রামে বসবাস করতেন, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনের জন্য দাক্ষিণাত্য বিপ্রগৃহে আগমন করলেন। বল্লভ ভট্ট দন্ডবৎ করতেই তাঁকে প্রভু ধরে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর দুইজন কৃষ্ণালাপন করতে লাগলেন, কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন কিন্তু ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু প্রেম সম্বরণ করলেন। তারপর মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের নিকট শ্রীরূপের ও অনুপমের পরিচয় বললেন, তা শুনে বল্লভাচার্য্য রূপকে আলিঙ্গন করতে উঠলেন, রূপ অনুপম দুই ভাই দূরে পলায়ন করলেন এবং বললেন আমরা অস্পৃশ্য, ছুঁইবেন না। এ কথা

শ্রবণে বল্লভ ভট্ট বিস্ময়ান্বিত হলেন। মহাপ্রভুও পরীক্ষার জন্য বল্লভ ভট্টকে বললেন আপনি কুলীন বৈদিক ব্রাহ্মণ এদের ছুইবেন না। বল্লভাচার্য্য বললেন এ দুয়ের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিরাজমান, ইহারা অধম নহে সর্ব্বোত্তম।

দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্তন।
এই-দুই 'অধম' নহে হয় সর্ব্বোত্তম।।
—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।৭১)

বল্লভাচার্য্য অনন্তর মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে নিজ গৃহে আড়াইল গ্রামে নৌকা করে নিয়ে এলেন, সঙ্গে শ্রীরূপ ও অনুপম ছিলেন। সেখানে ভোজনের অবশেষ রূপ ও অনুপমকে দিলেন। পুনঃ মহাপ্রভু রূপ ও অনুপমের সঙ্গে প্রয়াগে ফিরে এলেন। প্রভুর দর্শনের জন্য বহু লোকের ভিড় হ'তে লাগল। তা দেখে মহাপ্রভু রূপ ও অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে নির্জ্জনে দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসে কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত।।
—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।১১৫)

শ্রীরূপের হৃদয়ে মহাপ্রভু শক্তিসঞ্চার করে সর্ব্ব তত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে প্রবীণ করলেন। শ্রীরূপ শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলা উনবিংশ পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছেন। শেষে মহাপ্রভু শ্রীরূপের প্রতি বললেন—আমি ভক্তিরসের সামান্য দিগ্‌দর্শন করলাম। ইহা তুমি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কর, ভাবতে ভাবতে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি করাবেন। কৃষ্ণকৃপা হলে অজ্ঞও রসসিন্ধুর পার হতে পারে।

অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে যাবার আদেশ করে পরে পুরীধামে মিলিত হবার আদেশ করলেন। দুই ভাই বৃন্দাবনাভিমুখে চললেন।

মহাপ্রভু বারাণসীর দিকে যাত্রা করলেন।

মহাপ্রভু যখন বারাণসী তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান করছিলেন। সে সময় শ্রীসনাতন গৌড় রাজবন্দী থেকে পালিয়ে বন পথে বহু কষ্টে বারাণসীতে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে দেখে পরম সুখী হলেন এবং দুই মাস কাশীতে থেকে শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দিলেন। সনাতনকে মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাবার আদেশ দিয়ে নিজে পুরীধামের দিকে চললেন।

যখন সনাতন বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন শ্রীরূপ বৃন্দাবন থেকে গৌড়দেশ হয়ে পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। শ্রীরূপ ক্রমে চলে এলেন কাশীতে। তথায় তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তথা অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ক্রমে রূপের ও অনুপমের মিলন হল। তপন মিশ্র শ্রীরূপের কাছে শ্রীসনাতনের মিলন বার্তা ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার প্রভৃতির কথা বললেন,তা শ্রবণে শ্রীরূপ খুব আনন্দিত হলেন। দশ দিন শ্রীরূপ কাশীতে থেকে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীরূপ অনুপমের সঙ্গে গৌড়দেশে গঙ্গাতটে আগমন করতেই অকস্মাৎ অনুপম গঙ্গা প্রাপ্তি হলেন। শ্রীরূপ গৌড়দেশে কয়েকদিন অবস্থান করবার পর নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীবল্লভ (অনুপম) অপ্রকট হৈলা গঙ্গাতীরে।

নীলাচলে গেলা রূপ কিছুদিন পরে।।

— (ভঃ রঃ ১।৬৬৯)

শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবন ধাম থেকেই একখানি কৃষ্ণলীলা নাটক রচনা আরম্ভ করেন। পথে চলতে চলতে কড়চা আকারে ঘটনাগুলি লিখতে লাগলেন।

পথে গঙ্গাতটে ভ্রাতা অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হল অনন্তর তিনি গৌড়দেশে এসে কয়েক দিবস পরে নীলাচলে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে উড়িষ্যার সত্যভামাপুর নামক গ্রামে এলেন, একরাত্র সে গ্রামে শ্রীরূপ অবস্থান করলেন। তথায় রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন স্বয়ং সত্যভামাদেবী এসে বলছেন—"আমার নাটক পৃথকভাবে রচনা কর, আমার কৃপায় নাটক সুন্দর হবে।" এ স্বপ্ন দেখে শ্রীরূপ বুঝতে পারলেন সত্যভামাদেবী তার নাটক পৃথকভাবে বর্ণনা করতে আদেশ করছেন।

শ্রীরূপ নীলাচলে এলেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে পৌঁছালেন। শ্রীরূপ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দন্ডবৎ করতেই তিনি বললেন—মহাপ্রভু তোমার আগমন বার্ত্তা আমাকে বলেছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপকে অতিশয় আদরের সঙ্গে স্বীয় কুটীরে রাখলেন। মহাপ্রভুর প্রতিদিন নিয়ম ছিল, তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের উপল ভোগ দর্শন করে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আগমন করা। মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরে আজও এলেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন তখন হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুকে বললেন—শ্রীরূপ আপনাকে দন্ডবৎ করছেন। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হবার পর শ্রীরূপকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীরূপ অতিশয় দৈন্য প্রকট করতে লাগলেন। অতঃপর মহাপ্রভু তাঁকে নিয়ে উপবেশন এবং কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠাদি করবার পর শ্রীসনাতনের বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীরূপ বললেন সনাতনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। আমি গঙ্গা পথে এসেছি, তিনি রাজপথে চলে গেছেন। প্রয়াগে শুনলাম তিনি বৃন্দাবনে গেছেন। তারপর আমি গৌড়দেশে ছোট ভ্রাতা অনুপমের সঙ্গে আসতেই গঙ্গাতটে অনুপমের অকস্মাৎ গঙ্গা প্রাপ্তি ঘটে। মহাপ্রভু অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি শুনে বললেন—"অনুপমের শ্রীরাম নিষ্ঠা অতুলনীয়" ইত্যাদি বলে অনেক প্রশংসা করলেন। শ্রীরূপকে মহাপ্রভু হরিদাসের সন্নিকট থাকবার আদেশ করে স্বীয় বাসভবন

গম্ভীরার দিকে চললেন।

অপর দিবস মহাপ্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আগমন করলেন, শ্রীহরিদাসের সহ শ্রীরূপ মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যকে মহাপ্রভু বললেন তোমরা শ্রীরূপকে কৃপা কর। যাতে শ্রীরূপ ব্রজ রসতত্ত্ব বর্ণনা করতে পারে। মহাপ্রভু প্রতিদিন শ্রীহরিদাসের জন্য মন্দিরে প্রাপ্ত প্রসাদ নিয়ে দিতেন। শ্রীরূপের সঙ্গে শ্রীহরিদাস, প্রভুর দেওয়া প্রসাদ অতিশয় আনন্দ ভরে গ্রহণ করতেন। তারপর ভক্তসঙ্গে মহাপ্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করতে লাগলেন। স্বরূপ দামোদরের প্রতি লক্ষ্য করে মহাপ্রভু রূপের কথা বলতে লাগলেন—পূর্ব্বে রথযাত্রা কালে আমি ভাবাবিষ্ট ভাবে যে শ্লোক বলেছিলাম একদিন সমুদ্রে স্নান করে রূপের কুটীরে এলে ঐ শ্লোকের প্রত্যুত্তরজনক একটি শ্লোক চালে গোঁজা পেলাম। শ্লোক পড়ে আমি অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হলাম শ্রীরূপ আমার মনের খবর কি করে পেল। তদুত্তরে স্বরূপ দামোদর বললেন—

"যাতে এই শ্লোক দেখিলুঁ।
তুমি করিয়াছ কৃপা, তবঁহি জানিল।।
—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১।৯০)

শ্রীরূপের লিখিত বিদগ্ধ নাটকের একটি পত্র হাতে নিয়ে প্রভু পড়ে অতিশয় ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্রীরূপের হস্তাক্ষরকে স্তুতি করতে লাগলেন—

শ্রীরূপের অক্ষর—যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করেন প্রভু অক্ষরের স্তুতি।।
—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১।৯৭)

ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে মহাপ্রভু যখন শ্লোকটি পড়তে ছিলেন শ্রীহরিদাস তা

শ্রবণ করে নৃত্য করতে করতে বললেন লাগলেন—

কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র-সাধু-মুখে জানি।
নামের মাধুরী ঐছে কাঁহা নাহি শুনি।।
—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১।১০১)

আমি পূর্ব্বে শাস্ত্র ও সাধু মুখে অনেক নামের মহিমা শুনেছি কিন্তু শ্রীরূপের বর্ণনার সমান নাম মহিমা কোথাও শুনি নাই।

আর একদিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর পন্ডিত প্রভৃতি সঙ্গে শ্রীহরিদাসের কুটিরে এলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপের সহিত সকলকে বন্দনা করলেন। অনন্তর মহাপ্রভু সকলকে নিয়ে বসে ইষ্টগোষ্ঠী করতে করতে শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটক ও ললিত মাধব নাটকের কথা উত্থাপন করলেন। হরিদাস সকলের কাছে ঐ দুই নাটকের ভুরী ভূরী প্রশংসা করতে লাগলেন। তচ্ছ্রবনে সার্ব্বভৌম পন্ডিত ও রামানন্দ রায় নাটকদ্বয়ের ভূমিকা প্রভৃতি শুনতে চাইলেন। শ্রীরূপ অতিশয় লজ্জা বশতঃ অবনত শিরে বসে রইলেন। মহাপ্রভু বললেন—লজ্জা কিসের? বৈষ্ণবগণ আদর করে শুনতে চাচ্ছেন যখন, তখন তুমি পাঠ করে শুনাও। প্রভুর আদেশে শ্রীরূপ গ্রন্থের নান্দী শ্লোক প্রভৃতি পাঠ করলেন। তা শুনে ভক্তগণ বলতে লাগলেন—

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সার।।
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন।।
—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১।১৯৩-১৯৪)

এ ত কবিত্ব নয় যেন অমৃতের ধারা, নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের

সারস্বরূপ এত প্রেম পরিপাটিযুক্ত বর্ণনা, যা শুনলে শ্রোতার কর্ণ মনের আনন্দ বর্দ্ধন করে। এ সমস্ত তোমার কৃপা, তুমি শক্তি না দিলে এমন ভাবে রসের বর্ণনা কে করতে পারে?

মহাপ্রভু বললেন তোমরা সকলে এঁকে কৃপা কর। যাতে ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণনা করতে পারে। এঁর বড় ভাই শ্রীসনাতন পৃথিবীতে তাঁর সমান বিজ্ঞ ব্যক্তি দেখিনি। শ্রীরূপ সমস্ত গৌরভক্তগণের পাদপদ্ম বন্দনা ও কৃপা প্রার্থনা করলেন। সকলেই শ্রীরূপের প্রতি কৃপা আশীর্ব্বাদ দিলেন। এইরূপ ভাবে নীলাচলে ভক্ত সঙ্গে শ্রীরূপ দোলযাত্রা পর্য্যন্ত অবস্থান করবার পর মহাপ্রভু ও ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীরূপ গৌড়দেশে ফতেয়াবাদ নিজ গৃহে কিছু আবশ্যকীয় কার্য্য পূর্ণ করে শীঘ্র বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীরূপের বৃন্দাবনে পৌঁছানোর পূর্ব্বেই শ্রীসনাতন নীলাচলের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্রীসনাতন নীলাচলে হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে পৌঁছলে শ্রীহরিদাস অতিশয় আদর পূর্ব্বক শ্রীসনাতনকে নিজ সন্নিধানে রাখলেন তথায় মহাপ্রভুর সহ মিলন হল। পথের জলবায়ু দোষে সনাতনের সমগ্র শরীরে কণ্ডুরসা (খুজলী) হয়েছিল, মহাপ্রভু জোরপূর্ব্বক আলিঙ্গন দিয়ে কণ্ডুরসা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত করলেন। মহাপ্রভু সনাতনের শরীরকে নিজ শরীর জ্ঞান করতেন। প্রভু কয়েকমাস সনাতন গোস্বামীকে কাছে রেখে অনেক সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়ে পুনঃ ব্রজে প্রেরণ করলেন।

বৃন্দাবনে রূপ সনাতনাদি দ্বারায়।
কৈল অলৌকিক কার্য্য প্রভু গৌররায়।।
—(ভঃ রঃ ২।৩৬০)

শ্রীরূপ মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালনার্থে বৃন্দাবনে আগমন করলেন।

মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ হচ্ছে না দেখে শ্রীরূপ বড়ই চিন্তিত হলেন। বিগ্রহ গোবিন্দ কোথা আছেন বনে বনে গৃহে গৃহে খোঁজ করতে লাগলেন কিন্তু কোথাও পেলেন না। একদিন যমুনার তটে বসে বিষণ্ণ হৃদয়ে ঐ চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন। এমন সময় একজন ব্রজবাসী শ্রীরূপের সন্নিকটে এলেন, ব্রজবাসী অল্পবয়স্ক সুন্দর মূর্ত্তিধারী, হাসতে হাসতে বললেন— হে স্বামিন্! আপনি এত দুঃখিত কেন? শ্রীরূপ গোপকুমারের মধুর সম্ভাষণ শুনে প্রাণে বড়ই সন্তোষ লাভ করলেন; তারপর শ্রীরূপ ব্রজবাসীর নিকট মহাপ্রভুর আদেশের কথা বললেন। গোপকুমার বললেন স্বামিন্! আমার সঙ্গে চলুন। শ্রীরূপ বললেন— হে গোপকুমার কোথায় যাব। স্বামিন্! যে বিগ্রহ সেবা প্রকাশের জন্য আপনি এত চিন্তাযুক্ত সে বাসনা পূর্ণ হবে। হে গোপকুমার! আমার আশা পূর্ণ হবে? নিশ্চয় হবে। আসুন আমার সঙ্গে। গোপকুমার শ্রীরূপকে নিয়ে এলেন গোমাটিলায়। বললেন স্বামিন্! এ টিলাটিকে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে এক গাভী এসে দুগ্ধ ধারায় স্নান করিয়ে যান। আপনি আগামী দিবস পূর্ব্বাহ্নে এখানে এলে সাক্ষাৎ দর্শন পাবেন। এ গোমাটিলাতেই বিগ্রহ আছেন। এখন যা উচিত তা করুন আমি চললাম। শ্রীরূপ গোমাটিলাটির দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন পিছে ফিরে দেখলেন গোপকুমার অদৃশ্য। ভাবতে লাগলেন—কে এই গোপকুমার? মনে হয় প্রাণের আরাধ্য শ্রীগোবিন্দ। প্রেমে পুলকিত হয়ে শ্রীরূপ সেই গোমাটিলা মহাযোগ পীঠস্থানটি উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। অনন্তর শ্রীরূপ নিজস্থানে ফিরে এলেন, পরদিবস প্রাতে সেই গোমাটিলা দর্শনে এলেন, দেখলেন, এক অপূর্ব্ব সুরভী তথায় আগমন করে স্বরিত দুগ্ধধারায় টিলাটি স্নান করিয়ে চলে গেলেন। শ্রীরূপের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল, ঠাকুর এখানে আছেন। অতঃপর তিনি গোপপল্লীতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গোপগণকে একত্রিত করে এ আখ্যান বললেন। গোপগণ বিস্ময়ান্বিত হয়ে কুদাল কুড়ুলাদি নিয়ে শীঘ্রই গোমাটিলায় এলেন; শ্রীরূপও এলেন। টিলার মাটি সামান্য মাত্র অপসারিত করতেই,

কোটি মদন বিনিন্দিত শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি দর্শন পেলেন। সকলের আর আনন্দের সীমা রইল না, মহানন্দে হরি হরি ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করে তুললেন। পুনঃ শ্রীগোবিন্দ প্রকট হ'লেন। শ্রীরূপ প্রেমাশ্রু স্বরণ নেত্রে শ্রীগোবিন্দ পাদমূলে দন্ডবৎ করে বহু স্তব স্তুতি করতে লাগলেন। শীঘ্র এ বার্তা ব্রজের সমস্ত গোস্বামিদিগের কাছে জানালেন, তচ্ছ্রবনে গোস্বামিগণ আনন্দ সিন্ধুতে ভাসতে ভাসতে শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্মে উপস্থিত হলেন।

শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট ধ্বনি হৈতে।
উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারি ভিতে।।
মিশাইয়া মনুষ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ।
পরম উল্লাসে করে গোবিন্দ দর্শন।।
তিলার্দ্ধেক লোক ভিড় নিবৃত্ত না হয়।
কোথা হৈতে আইসে কেহ লখিতে না পায়।।
গোবিন্দ প্রকট মাত্র শ্রীরূপ গোসাঞি।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাঞি।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পার্ষদ সহিতে।
পত্রী পড়ি আনন্দে না পারে স্থির হৈতে।।

—(ভঃ রঃ ২।৪৩৩-৪৩৭)

নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দর এ শুভ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই গোবিন্দের সেবকরূপে শ্রীকাশীশ্বর পন্ডিতকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন।

যে সময় শ্রীরূপ ও সনাতন ব্রজধামে বাস করছিলেন সে সময় ব্রজে

ভারতের বিভিন্ন দেশ হতে প্রসিদ্ধ নামাচার্য্য, ভক্তগণ ও সন্ন্যাসিগণ ব্রজধামে বসবাস করছিলেন, গুজরাট দেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য সে সময় তিনিও ব্রজধামে বসবাস করছিলেন। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ব্রজ ধামে বাস করছিলেন, বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধনামা ভূতপূর্ব্ব গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীসুবুদ্ধি রায় তিনিও ব্রজধামে বাস করছিলেন। সেকালে ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণ ব্রজধামে আগমন করতেন।

শ্রীরূপ সনাতন ব্রজবাসিগণকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পরিকর জ্ঞান করতেন তাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করতেন। ব্রজবাসিগণ শ্রীরূপের ব্যবহারে একেবারেই বিমুগ্ধ। ব্রজবাসিগণ সকলেই শ্রীরূপ সনাতনকে আপন বুদ্ধি করতেন। গৃহের সুখ-দুঃখজনক যাবতীয় ব্যবহারিক কথা তাদের কাছে বলতেন ও সদুপদেশ চাইতেন। ব্রজগোপীগণ তাঁদের পুত্র প্রায় বোধ করতেন।

শ্রীরূপ ও সনাতন ব্রজের বিভিন্নস্থানে থাকতেন। দুই ভাই একসঙ্গেও থাকতেন না। শ্রীসনাতন গোকুল মহাবনে; শ্রীরূপ মথুরায় বা বৃন্দাবনে নন্দঘাটাদিতে থাকতেন। এঁদের সঙ্গী ছিলেন শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতি।

যেমন শ্রীরূপের কাছে গোবিন্দ দেব প্রকট হলেন, তেমনি শ্রীসনাতনের কাছে মদন গোপাল প্রকট হলেন। শ্রীগোপাল ভট্টের কাছে শ্রীরাধা রমণ ও শ্রীমধু পণ্ডিতের কাছে শ্রীগোপীনাথ প্রকটিত হলেন। যুগপৎ বহু ঠাকুর প্রকটিত হলেন। কৃষ্ণ পুনঃ ব্রজে নিত্য বিহার লীলা করতে লাগলেন।

মহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত শ্রীরূপ সনাতন গ্রন্থ লিখন কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। শ্রীরূপ বিদগ্ধ মাধব নাটক, ললিত মাধব নাটক আরও অন্যান্য গ্রন্থ লেখার

পর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ আরম্ভ করলেন। এই সময় একদিন শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীরূপের সন্নিধানে আগমন করলেন, শ্রীরূপ তাঁকে দন্ডবৎ প্রভৃতি করে বসতে আসন দিলেন। দুইজনে কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করলেন। অনন্তর শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতের প্রথম বন্দনা শ্লোকটি বল্লভাচার্য্যের হাতে পড়তে দিলেন, তিনি অনেক সময় দেখার পর বললেন— কোন কোন স্থানে কিছু অশুদ্ধি আছে। এ সময় শ্রীরূপের ছোট ভাই শ্রীঅনুপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী অল্পদিন হল বঙ্গদেশ থেকে এসেছেন। তিনি শ্রীরূপের অঙ্গে বাতাস-করছিলেন। তিনি ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে পরম পন্ডিত ছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের কথায় তিনি সুখী হলেন না। শ্রীবল্লভাচার্য্য যখন যমুনায় স্নান করতে এলেন তখন শ্রীজীব যমুনার জল আহরণ ছলে সে ঘাটে এলেন এবং শ্লোকে কোথায় অশুদ্ধি আছে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীজীবের পান্ডিত্য প্রতিভা দেখে বল্লভাচার্য্য আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। কিছুক্ষণ জীব বল্লভাচার্য্যের সঙ্গে শ্লোক বিচারের পর জল নিয়ে কুটীরে ফিরে এলেন। অল্পক্ষশ পরে শ্রীবল্লভাচার্য্য এসে শ্রীরূপকে ঐ বালকটির কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর বিদ্যা প্রতিভার প্রশংসা করলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য নিজ স্থানে চলে যাবার পর শ্রীজীবকে শ্রীরূপ গোস্বামী আহ্বান করলেন এবং বললেন— আমরা যাঁদের গুরু জ্ঞান করে দন্ডবৎ প্রণামাদি করি তাঁদের তুমি দোষ বিচার করতে চাও ইহা অশিষ্টাচার। আমার হিতের জন্য তিনি আমাকে এমন কথা বলেছিলেন—তুমি ইহা সহন করতে পারলে না। "এ অতি অল্প বাক্য সহিতে নারিলা" তাহে পূর্ব্ব দেশ শীঘ্র করহ গমন। মন স্থির হইলে আসিবা বৃন্দাবন।। (ভঃ র ৫।১৬৪৩) একথা বলে শ্রীরূপ জীবকে গৃহে যাবার আদেশ দিলেন। শ্রীরূপের আজ্ঞায় শ্রীজীব পূর্ব্বদিকে চলতে মনস্থ করলেন, শ্রীরূপের কুটীর থেকে বাহির হলেন এবং শ্রীনন্দ রাজের কোন এক জীর্ণ মন্দিরে নিরাহারে পড়ে রইলেন এবং দুঃখে ক্রন্দন করতে লাগলেন। গ্রামের লোকজন ঐ সুন্দর বালকের নিরাহারে খেদ করতে দেখে সকলেই চিন্তান্বিত হলেন, এমন

সময় তথায় শ্রীসনাতন গোস্বামী এলেন, তার কাছে সকলে ঐ বালকের কথা বললেন। তিনি তথায় গিয়ে দেখলেন শ্রীজীব পড়ে আছে, নিরাহারে শরীর শুকিয়ে গেছে, তাকে এমত অবস্থায় দেখে অত্যন্ত করুণার্দ্র হৃদয়ে ভূমি থেকে উঠিয়ে স্নেহ করতে লাগলেন এবং সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীজীব সব কথা বললেন। শ্রীসনাতন জীবকে অনেক প্রবোধ বাক্য বলে শ্রীরূপের কাছে গেলেন। শ্রীরূপ কথা প্রসঙ্গে জীবের কথা উঠালেন, তখন শ্রীসনাতন জীবের কথা বলেন। তচ্ছ্রবনে শ্রীরূপ শীঘ্রই জীবকে নিয়ে এলেন।

শ্রীজীবের দশা দেখি শ্রীরূপ গোঁসাই।
করিলেন শুশ্রূষা—কৃপার সীমা নাই।।

—(ভঃ রঃ ৫।১৬৬৩)

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে অতিশয় আদর পূর্ব্বক শুশ্রূষাদি করতে লাগলেন, শ্রীজীব সুস্থ হলে এবার তাঁর লিখিত সমস্ত গ্রন্থের সংশোধন করবার ভার দিলেন।

শ্রীরূপ যেমন শিশু শ্রীজীবকে কঠোর শাসন করেছেন, আবার তেমনি অতিশয় স্নেহ করেছেন। সদ্‌শিষ্যের ও সদ্‌গুরুর আদর্শ তারা জগতে প্রদর্শন করলেন।

শ্রীরূপ ললিত মাধব নাটক রচনার পর উহা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে আস্বাদন করতে দিলেন। ললিত মাধব নাটকখানি বিপ্রলম্ভ রসাত্মক অর্থাৎ প্রবাস বর্ণন। গ্রন্থ পাঠ করে দাস গোস্বামী দিবারাত্র কৃষ্ণ বিরহে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

গ্রন্থ পাঠে রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে।
হইল উন্মাদ দুঃখে—ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।।

—(ভঃ রঃ ৫।৭৬৮)

সে সংবাদ শ্রবণে শ্রীরূপ গোস্বামী চিন্তান্বিত হলেন এবং দানকেলি কৌমুদী নামক এক খন্ড কাব্য রচনা করে শ্রীরঘুনাথ দাসকে দিলেন এবং ললিত মাধব নাটকখানি সংশোধন করবার নাম করে নিয়ে নিলেন। শ্রীদাস গোস্বামী দানকেলি পড়ে অতিশয় সুখ লাভ করলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীকে এক সময় পরমান্ন ভোজন করানোর ইচ্ছা করলেন। দুধ ও শর্করা কোথায় পাবেন কোন ঠিক নাই। শ্রীরূপের কুটীরে একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী এলেন, শ্রীরূপ চিন্তা করছেন আজ শ্রীগোস্বামী এলেন কি খেতে দিব? ঠিক এমন সময় এক গোপবালিকা ঘৃত, দুগ্ধ, তন্ডুল ও শর্করা নিয়ে শ্রীরূপকে ডাকতে লাগলেন—বাবা! বাবা! সিধা রাখুন। শ্রীরূপ শীঘ্র কুটীরের বাইরে এলেন, বালিকার হাত থেকে সিধাটি নিয়ে নিলেন। সিধা পাত্রটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপ বালিকা অন্তর্দ্ধান হলেন, তাঁকে আর না দেখে শ্রীরূপ বিস্ময়ান্বিত হলেন। তাতে পরমান্ন করে গিরিধারীর ভোগ দিয়ে সেই পরমান্ন শ্রীসনাতনকে খাওয়ালেন। তা খেয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রেমাবিষ্ট হলেন এবং শ্রীরূপকে কোথায় এসব সামগ্রী পেলে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীরূপ সব কথা বললেন তা শুনে শ্রীসনাতন বললেন "ঐছে ভক্ষ্য দ্রব্য চেষ্টা না করিহ আর" (ভঃ রঃ ৫।১৩২২) শ্রীরূপও খেদ যুক্ত হলেন, হায় হায় আমি শ্রীরাধারাণীকে দুঃখ দিলাম বলে। স্বপ্নে শ্রীরাধারাণী রূপকে দেখা দিয়ে প্রবোধ দিলেন।

ভগবান্ ভক্তের জন্য সব কিছু করে থাকেন। তিনি ভক্ত বৎসল। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ সনাতনের দ্বারা পুনঃ ব্রজধাম ও ব্রজ লীলা যেন জগতে প্রচার করলেন। শ্রীরূপ ও সনাতন মহাপ্রভুর পুত্রোপম স্থানিয়া; নিজ হৃদয়ের কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করে তাঁদের দ্বারা নিজাভীষ্ট পূর্ণ করলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীকে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বন্দনা করেছেন—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।

যিনি পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মনোভীষ্ট পূর্ণ করেছেন, কবে সেই শ্রীরূপ গোস্বামী আমাকে নিজ পদান্তিকে স্থান প্রদান করবেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত গ্রন্থাবলী শ্রীহংসদূত কাব্য, শ্রীউদ্ধব সন্দেশ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম তিথির বিধি, শ্রীবৃহৎ গণোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীলঘুগণোদ্দেশ দীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিত মাধব, দানকেলি কৌমুদী, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা, মথুরা মহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দিকা ও লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের অপ্রকট তিথি শ্রাবণী শুক্লাদ্বাদশী শকাব্দ ১৪৮৬, খৃষ্টাব্দ ১৫৬৪, গৃহবাস ২২ বছর, ব্রজেবাস ৫১ বছর, প্রকট স্থিতি ৭৩ বছর মতান্তরে ৭৫ বছর।

—o—

শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম এই তিন ভাইয়ের মহৈশ্বর্য্যময় সংসারে একমাত্র পুত্র—শ্রীজীব। শিশুটির পালনের পরিপাটির অন্ত ছিল না। শিশুর গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তিতে গৃহ আলোকিত হত। দীঘল নয়নে কি সুন্দর চাহনি—প্রতিটী অঙ্গে লাবণ্যের ছটা। রামকেলিতে শ্রীগৌরসুন্দর শুভাগমন করলে শিশুটি স্বীয় ইষ্টদেবের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেন। তখনই মহাপ্রভু তাঁকে শ্রীচরণ-রজঃ দিয়ে ভবিষ্যৎ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন। যদ্যপি শ্রীজীব তখন অতি শিশু, মহাপ্রভুর ভুবনমোহন রূপটি যেন তিনি দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করলেন। শিশুর ভোজনে, শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে সর্ব্বদা সে দিব্য রূপের চিন্তা হত।

অতঃপর শ্রীজীবের পিতা অনুপম, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তিন জন একই সময়ে সেই মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ আনন্দ কোলাহল মুখরিত সংসার থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। একমাত্র শিশু জীব ফতেয়াবাদে বিশাল রাজপ্রাসাদে শোকাশ্রু-সিক্তা জননীর ক্রোড়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলেন। জননীর ও শিশুর ক্রন্দনে বন্ধু-বান্ধবগণের হৃদয়ে বিষাদের ছায়া পড়েছিল, তাঁরা খুব কষ্টে তাঁদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

শিশু শ্রীজীবের হৃদয়ে জেগে উঠে পিতৃব্যদ্বয়ের কথা ও পিতৃদেবের কথা। আবার তার সঙ্গে জাগে প্রেমময় গৌরহরির কথা; তখন আর ধৈর্য্য ধারণ করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে ভূমিতে পড়তেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা

অন্য ক্রীড়াদি জানতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তিকে সুন্দর সাজাতেন, পূজা করতেন, নৈবেদ্য দিতেন, অনিমেষ নয়নে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করতেন ও দন্ডবৎ প্রণতি হতেন ভূতলে পড়ে।

"শ্রীজীব বাল্যকালে বালকের সনে।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে।।"
—(ভঃ রঃ ১।৭১৯)

গৃহে পন্ডিতগণ-স্থানে শ্রীজীব অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর অসাধারণ মেধা দেখে অধ্যাপকগণ বলতেন—এরূপ মেধাবী নর-শিশু সচরাচর দেখা যায় না। এ শিশু কালে মহাপুরুষ হবে। শ্রীজীব বাল্যকালে অধ্যয়ন করতে করতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কথা চিন্তা করতেন। একদিন শ্রীজীব স্বপ্নে দেখলেন-শ্রীরাম ও কৃষ্ণ যেন নিতাই-গৌররূপে নৃত্য করছেন।

"শ্রীজীবের মনে হৈল মহা চমৎকার।
অনিমিষ-নেত্রে শোভা দেখয়ে দোহাঁর।।"
—(ভঃ রঃ ১।৭৩২)

করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ শ্রীজীবকে চরণের ধূলি দিয়ে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক অন্তর্ধান হলেন। শ্রীজীবের স্বপ্ন ভঙ্গ হল, তিনি অন্তরে একটু আশ্বস্ত হলেন। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—সংসার ত্যাগ করে কবে একান্তভাবে মহাপ্রভুর সেবা করতে পারবেন। শ্রীজীব সংসারে একমাত্র পুত্র;জননী তাঁর বদন পানে চেয়ে সব দুঃখ ভুলে আছেন।

পিতৃব্যদ্বয় ও পিতা শ্রীবৃন্দাবন ধামে আছেন—শ্রীজীব এতাবৎকাল এরূপ ভাবনা করতেন। যখন শুনলেন পিতা অনুপমদেব গঙ্গাতটে দেহ রক্ষা করেছেন তখন তিনি দুঃখে অধীর হয়ে উঠলেন। দু'নয়ন জলে নিয়ত সিক্ত

হতে লাগল। স্বজনগণ কত সান্ত্বনা দিতে লাগলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন শান্ত হ'ল না। সংসার একেবারে দুঃখময় হয়ে উঠল। শ্রীজীবের এ-প্রকার দশা দেখে স্বজনগণ বললেন—নবদ্বীপে গিয়ে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ দর্শন করে যদি একটু শান্তি লাভ করে, শ্রীজীব তথায় যাক্। শ্রীজীবের নবদ্বীপে যাওয়া ঠিক হ'ল। দেশের যাত্রীদের সঙ্গে এক ভৃত্যসহ্ নবদ্বীপে যাত্রা করলেন। "ফতেয়াবাদ হৈতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া।।"—(ভঃ রঃ ১।৭৪১) অন্তর্যামী শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীজীব যে আগমন করছেন তা জানতে পারলেন। তিনি খড়দহ থেকে তাড়াতাড়ি নবদ্বীপে মায়াপুরে এলেন।

এদিকে শ্রীজীব ক্রমে নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করলেন ও নগরের মনোহর শোভা দেখে মুগ্ধ হলেন। সাষ্টাঙ্গে গঙ্গাদেবীকে বন্দনা করলেন। জিজ্ঞাসা করতে করতে শ্রীমায়াপুরে এসে লোকমুখে শুনলেন শ্রীবাস-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আছেন। শ্রীজীব দ্বারদেশে প্রেমভরে ভূতলে দন্ডবৎ হয়ে পড়লেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পন্ডিতসহ দ্বারে এসে শ্রীজীবকে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন—তুমি রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র? শ্রীজীব পুনঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে পড়লেন। শ্রীজীবকে গৃহে নিলেন এবং স্বজন-গৃহাদির কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বৈষ্ণবগণের চরণ বন্দনাদি করলেন শ্রীজীব। বৈষ্ণবগণ পরম সুখী হলেন শ্রীজীবকে দেখে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ পেয়ে পর-দিবস প্রাতঃকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সাথে শ্রীশচীমাতার গৃহে এলেন। প্রভুর জন্ম-গৃহের কি অপূর্ব্ব শোভা! শ্রীজীবের হৃদয় শীতল হল। শ্রীজীব ভূপতিত হয়ে দন্ডবৎ করলেন। শ্রীজীব দেখলেন—গৃহ-বারান্দায় অতি বৃদ্ধা শ্রীশচীমাতা বসে আছেন। শুভ্র-বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকা, গাত্রে রেশমের চাদর, বস্ত্রের সঙ্গে কেশের শুভ্রতা সাযুজ্য পাচ্ছে। শ্রীশচীমাতার দেহটী বার্দ্ধক্যবশতঃ কম্পমান। যদ্যপি অঙ্গ অতি ক্ষীণ ও জীর্ণ তথাপি শ্রীঅঙ্গের দিব্য-তেজে গৃহ আলোকিত হচ্ছে।

জননী শ্রীগৌরসুন্দরের চিন্তায় আত্মবিস্মৃত হয়ে মুদিত নেত্রে বসে আছেন। ভগবদ্-জননী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আগমন বুঝতে পারলেন—অমনি শিরে অবগুণ্ঠন টেনে ভৃত্য ঈশানকে বললেন—ঈশান! শ্রীপাদ এসেছেন, তাঁর চরণ ধৌত করে দাও। শ্রীঈশান নিত্যানন্দপ্রভুর চরণ ধৌত করে দিলেন। ভগবদ্-জননীকে নমস্কার করে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বসলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শচীমাতাকে শ্রীজীবের পরিচয় দিলে, শচীমাতা শ্রীজীবের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য শ্রীশচীমাতার আশীর্ব্বাদকরলেন। "কৃপা করি শচীদেবী কৈলা আশীর্ব্বাদ পেয়ে শ্রীজীব আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। শ্রীশচীমাতার আমন্ত্রণে তাঁরা দ্বিপ্রহরে শচীগৃহে ভোজন করলেন।

খাও বাছা নিত্যানন্দ জননীর স্থানে।
এই আমি গৌরচন্দ্র ভুঞ্জানু গোপনে।।

—(শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য)

কয়েকদিন শ্রীজীব নিত্যানন্দ প্রভু-স্থানে নবদ্বীপে অবস্থান করে নবদ্বীপ-ধামে প্রভুর বিবিধ লীলা-স্থান সকল দর্শনাদি করলেন। অনন্তর নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশমত প্রথমে কাশী হয়ে শ্রীবৃন্দাবন ধাম অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীজীব কাশীধামে এসে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুদিন থেকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে যে ভাগবত সিদ্ধান্তপর বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন, সে সিদ্ধান্ত পুনঃ তিনি মধুসূদন বাচস্পতিকে শিক্ষা দেন। মধুসূদন বাচস্পতি কাশীতে সে শুদ্ধ ভাগবত-সিদ্ধান্ত ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন।

কাশী থেকে শ্রীজীব বৃন্দাবনে আগমন করেন এবং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন। শ্রীজীবকে দেখে শ্রীরূপ সনাতন বড় সুখী হলেন;যাবতীয় খবর জিজ্ঞাসা করলে শ্রীজীব সমস্ত খবর

বললেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে কাছে রেখে ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে লাগলেন ও মন্ত্র-দীক্ষা দিয়ে শ্রীশ্রীরাধা দামোদরের সেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীজীব অল্পকাল মধ্যে ভাগবত-সিদ্ধান্তে পরম পারদর্শী হয়ে উঠলে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁকে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ সংশোধন করতে দিলেন। শ্রীজীব গ্রন্থ সংশোধন করতে করতে "দুর্গম সঙ্গমনী" নামক এক টীকা লিখলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী ১৪৭৬ শকাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টিপ্পনী—শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী লিখেন। এ গ্রন্থের সংশোধন করেন শ্রীজীব। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় ১৫০০ শকাব্দে শ্রীজীব ঐ গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ লিখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন"লঘুবৈষ্ণব-তোষণী"।। এ ছাড়া শ্রীজীব গোস্বামী বহু গ্রন্থ ও গোস্বামী গ্রন্থের টীকাদি লিখেছিলেন। শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীকৃষ্ণ দাস, শ্রীকাশীশ্বর পন্ডিত, শ্রীমধু পন্ডিত ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির অপ্রাকৃত কাব্যমাধুর্য্য তৎকালীন বিদ্বজ্জনকে মুগ্ধ করতে থাকে। ব্রজধামে এক সুবর্ণ যুগ আরম্ভ হল।

আদর্শ শিষ্য

শ্রীজীব নিয়মিত ভাবে শ্রীরূপের ও শ্রীসনাতনের স্নানের জল আনয়ন, মস্তকে তৈল মর্দ্দন, আশ্রম সংস্কার, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরন্ধন ও গ্রন্থাদির সংশোধন করতেন।

পুষ্টি-মার্গের প্রবর্ত্তক শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গী ছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাকে গুরুতুল্য সম্মান দিতেন। তিনি শ্রীরূপ সনাতনকে পরম স্নেহ করতেন ও বারবার তাঁদের দর্শনের জন্য আসতেন। একদিন শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামীর স্থানে এলে শ্রীরূপ গোস্বামী দন্ডবৎ করে তাঁকে আসনে বসালেন ও স্বকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি তাঁর হাতে দিলেন। তিনি পড়ে বললেন সুন্দর হয়েছে, একটু ভুল আছে,

ইহা সংশোধন করে দিব। তারপর ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলাপ আলোচনাদি করে বিদায় হলেন। শ্রীরূপ দৈন্য করে পুনর্ব্বার আসবার জন্য বললেন। তখন গ্রীষ্মকাল। শ্রীজীব শ্রীরূপের পিছনে দাড়িয়ে পাখা করতে করতে সব কথা শুনলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীরূপের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের কি সংশোধন করবেন শ্রীজীব তা বুঝতে পারলেন না। তখন তিনি কিছু না বলে পরে যমুনা-ঘাটে জল নিতে এসে শ্রীবল্লভাচার্য্যের কাছে জিজ্ঞাসা করে, আচার্য্য যে ভুল দেখাতে চেয়েছিলেন তা খন্ডন করলেন। শুনে বল্লভাচার্য্য খুব সুখী হলেন। "শুনি ভট্ট প্রশংসা করিল সর্ব্বমতে।।" (শ্রীভক্তিরত্নাকর পঞ্চম-তরঙ্গে)। অন্য দিবস শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট বিবিধ ভগবদ্-প্রসঙ্গ আলোচনা করবার পর শ্রীজীবের পরিচয় জানতে চাইলেন এবং তাঁর শাস্ত্রে অগাধ বোধ আছে বলে খুব প্রশংসা করলেন। শ্রীজীব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলে, শ্রীরূপ গোস্বামী পরিচয় দিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য নিজ স্থানে বিদায় হলেন।

অতঃপর শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে আহ্বান করে কিছু শাসন-বাক্য বলে গৃহে ফিরে যাবার জন্য আদেশ করলেন। অস্থির-মনে পান্ডিত্য বুদ্ধি নিয়ে ব্রজবাস হয় না। এ বলে শ্রীরূপ গোস্বামী মৌনী হলেন। শ্রীজীব মনে বড় দুঃখ পেয়ে অপরাধ করেছেন বিবেচনা ক'রে তাঁকে দন্ডবৎ করে গৃহে চলে যাবার সংকল্প পূর্ব্বক শ্রীরূপের নিকট থেকে যাত্রা করলেন। পুনঃ কি মনে করে শ্রীনন্দ-ঘাটে একটি জনশূন্য কুটীরে নিরাহারে রোদন করতে লাগলেন। গ্রামবাসী লোকগণ ছুটে এলেন এবং এ সংবাদ শীঘ্র শ্রীসনাতন গোস্বামীর কাছে পৌছাল। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীজীবের স্থানে এসে তাঁর ক্ষীণ-শরীর ও দুঃখের ভাব দেখে তাঁকে ভূতল থেকে তুলে অঙ্গের ধুলাদি ঝেড়ে প্রবোধ দিতে লাগলেন। নিজের স্থানে তাঁকে নিয়ে এসে স্নান ভোজনাদি করালেন। সনাতন গোস্বামী শ্রীরূপের কাছে এ সমস্ত কথা বললে, শ্রীরূপ গোস্বামী শুনে স্নেহার্দ্র হৃদয়ে কোন লোককে পাঠিয়ে তৎক্ষণাৎ শ্রীজীবকে

নিজ স্থানে আনলেন। শ্রীজীব দন্ডবৎ করতেই শ্রীরূপ অতি স্নেহ ভরে তাঁকে ভূমি থেকে উঠিয়ে কোলে নিয়ে অঙ্গের ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে অনেক কথা বললেন।

শ্রীজীবের দশা দেখি, শ্রীরূপ গোঁসাই।
করিলেন শুশ্রূষা—কৃপার সীমা নাই।।
—(ভক্তি রত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গ-১৬৬৩)

শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে যেমন শাসন করেন, তেমন স্নেহও করেন। শ্রীরূপ-সনাতনের অনুগ্রহে শ্রীজীব পৃথিবীতলে সর্ব্বশাস্ত্রে ও কৃষ্ণ ভক্তিতে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের অপ্রকটের পর শ্রীজীব শ্রীরূপ-সনাতনের মনোভীষ্ট পূরণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। একবার শ্রীজীব গোস্বামী রাজপুতদের সঙ্গে গঙ্গা যমুনা নিয়ে বাদশার যে বিবাদ হয়েছিল, তার সুমীমাংসা করবার জন্য আগ্রা যান। যমুনার স্থান গঙ্গার উপরে শ্রীজীব গোস্বামী প্রমাণ করেন—গঙ্গা শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভুত, যমুনা শ্রীহরিপ্রেয়সী। এ-কথা শ্রবণে বাদশা সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীজীব গোস্বামীকে তুলট কাগজ ভেট দেন। বাদশা তাঁকে ভেট দিতে চাইলে তিনি এ ভেট নিয়েছিলেন।

শ্রীমদ্ লোকনাথ গোস্বামীর অনুগ্রহ-পাত্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর অনুগ্রহ পাত্র শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুর অনুগ্রহ-পাত্র শ্রীশ্যামানন্দ, এ তিনজন শ্রীজীবের পরম কৃপাভাজন হলেন। সমগ্র গোস্বামী-শাস্ত্র শ্রীজীব তাঁদের পড়িয়েছিলেন এবং প্রচার করবার ভার তাঁদের উপর দিয়েছিলেন।

শ্রীজীব গোস্বামীর রচিত গ্রন্থাবলীঃ—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, ধাতুসূত্রমালা, শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু, শ্রীগোপালবিরুদাবলী, শ্রীমাধব মহোৎসব

কাব্য, শ্রীসংকল্প কল্পদ্রুম,শ্রীব্রহ্মসংহিতার টীকা, শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুর টীকা—দুর্গমসঙ্গমনী, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির টীকা— লোচন রোচনী, শ্রীগোপালচম্পু, ষট্‌সন্দর্ভ (তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবদ্‌সন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতি সন্দর্ভ) শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা—ক্রমসন্দর্ভ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের টীকা—লঘুবৈষ্ণব তোষণী, সর্ব্বসম্বাদিনী (ষট্‌সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা) শ্রীগোপাল তাপনী টীকা— সুখবোধিনী, পদ্মপুরাণস্থ যোগসারস্তোত্র টীকা,অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রী ব্যাখ্যা-বিবৃতি। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা, সূত্রমালিকা ও ভাবার্থচম্পু।

শ্রীজীব গোস্বামীর জন্ম—১৩২৩ খৃষ্টাব্দ, মতান্তরে ১৫৩৩ খৃঃ (১৪৫৫ শকাব্দ) ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশী। অপ্রকট ১৫৪০ শকাব্দ পৌষী শুক্লা তৃতীয়া, প্রকট-স্থিতি ৮৫ বৎসর।

— ஃ * ஃ —

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

দন্ডপরণাম করি, ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু 'রঘুনাথ' বলি কৈলা আলিঙ্গনে।।

—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৩।১০১)

কাশীধাম থেকে পদব্রজে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট পুরী ধামে এলেন। মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করতেই প্রভু, রঘুনাথ বলে আলিঙ্গন করলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রঘুনাথ ভট্টের সমস্ত দুঃখ দূর হল। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট চিন্তা করতে করতে এসেছিলেন, বহুদিন পরে প্রভুকে দর্শন করতে যাচ্ছি; তিনি চিনতে পারবেন কিনা জানি না। পূর্ব্বের মত আদর করবেন কি? তাঁর কত প্রিয় ভক্ত রয়েছেন। আমাদের ন্যায় অধম ভক্তদের কথা মনে রেখেছেন কি? কিন্তু মহাপ্রভু যখন সহাস্য বদনে রঘুনাথ বলে আলিঙ্গন করলেন, রঘুনাথ প্রেমাশ্রুতে সিক্ত হতে লাগলেন। সজল নয়নে প্রভুর শ্রীচরণ ধরে বললেন— হে করুণাময় প্রভো! সত্য-সত্যই এ অধমের কথা এখনও মনে রেখেছেন? প্রভু বললেন— রঘুনাথ! তোমার পিতা-মাতার স্নেহের কথা এ জন্মে কেন, কোন জন্মেও ভুলতে পারব না। প্রতিদিন কত স্নেহ করে আমাকে ভোজন করাতেন।

অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট রঘুনাথ ভট্টের পরিচয় করে দিলেন। ভক্তগণ বড় সুখী হলেন। রঘুনাথ পিতা-মাতার দন্ডবন্নতি জ্ঞাপন করলেন; চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণের কুশলবার্ত্তা প্রদান করলেন। পরিশেষে স্নেহময়ী জননী প্রভুর জন্য যে-সব খাদ্য সামগ্রী দিয়েছিলেন ঝালি থেকে

বের করে একে একে সব তাঁকে দেখালেন। প্রভু খুব খুশী হয়ে গোবিন্দকে ডেকে সব জিনিস রাখতে বললেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্টের পিতার নাম—শ্রীতপন মিশ্র। প্রভু গার্হস্থ্য জীবনে যখন পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মানদী তটে অধ্যাপকরূপে শুভাগমন করেছিলেন, তপন মিশ্রের সঙ্গে তখন তাঁর পরিচয় হয়। তপন মিশ্র পূর্ব্ববঙ্গের লোক, শাস্ত্রজ্ঞ-পন্ডিত ছিলেন। তিনি সাধ্য ও সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তার যথার্থ অর্থ নির্ণয় করতে পারলেন না। নির্ব্বিন্ন হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখছেন, এক দেবতা এসে বললেন—মিশ্র তুমি কোন চিন্তা করো না। শ্রীনিমাই পন্ডিতের নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে সাধ্য সাধন-তত্ত্ব ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।

"মনুষ্য নহেন তেঁহো—নর-নারায়ণ।
নর-রূপে লীলা তাঁ'র জগৎ-কারণ।।'

—(চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৪।১২৩)

এ বলে দেবতা অন্তর্ধান হলেন। সকাল বেলা প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য চললেন। দেখলেন শ্রীনিমাই পন্ডিত একটি উচ্চ চৌকির উপর বসে আছেন। গৃহখানি তাঁর অঙ্গ কান্তিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। তাঁর নয়ন যুগল প্রফুল্ল পদ্মদলের ন্যায়, শিরে কুঞ্চিত কেশদাম, বক্ষস্থলে শুভ্র উপবীত ও পরিধানে পীতবস্ত্র। চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে নক্ষত্রমালার ন্যায় শিষ্যগণ চারিধারে উপবিষ্ট। তপন মিশ্র দন্ডবৎ করে করযোড়ে বলতে লাগলেন—হে দয়াময়। আমি অতি দীন হীন। আমাকে কৃপা করুন। প্রভু হাস্য সহকারে তাঁকে ধরে বসালেন এবং তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তপন মিশ্র নিজ পরিচয় ব'লে সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

মহাপ্রভু বললেন—ভগবান যুগে যুগে জীবের কল্যানের জন্য অবতীর্ণ

হন এবং কিভাবে তাঁর ভজন করতে হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্যা ও কলিতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন।

"কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
চারি যুগে চারিধর্ম জীবের কারণ।।"
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১৩৭)

জীবের বল, বীর্য্য ও আয়ু বিচার করে শ্রীভগবান আচার্য্যমূর্ত্তিতে এ সমস্ত ধর্ম্ম নির্ণয় করেছেন। অতএব এর অন্যথা করলে কোন ফল হয় না।

"অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার।।"
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১৩৯)

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। অন্য সাধন বাসনা ত্যাগ করে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করুন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১৪৫)

এ মন্ত্র-প্রভাবে আপনি সাধ্য ও সাধন তত্ত্বাদি সব কিছু জানতে পারবেন। শ্রীহরিনামই সাধ্য ও ইহাই সাধন। শ্রীনাম ও নামী অভেদ।

তপন মিশ্র প্রভুর উপদেশ-শ্রবণে সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং প্রভুসঙ্গে নবদ্বীপে আসতে চাইলেন। প্রভু আদেশ করলেন — আপনি শীঘ্র কাশী যান, সেখানে আমাদের পুনঃ মিলন হবে; তখন বিশেষভাবে সব তত্ত্বোপদেশ দান করব। এ বলে প্রভু নবদ্বীপের দিকে যাত্রা করলেন। তপন মিশ্র সপত্নীক কাশীর দিকে চললেন।

কয়েক বছর পরে করুণাময় গৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণ করে জননীর আদেশে পুরীধামে এলেন। কয়েক মাস পুরীতে অবস্থান করবার পর, ঝারিখন্ডের (ছোট নাগপুরের) পথে বৃন্দাবন যাত্রা করে পথে কাশীধামে উপস্থিত হলেন। প্রভু মণিকর্ণিকা ঘাটে 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি করলেন। তপন মিশ্র তখন সে ঘাটে স্নান করছিলেন। অকস্মাৎ হরিধ্বনি শুনে চমকে উঠলেন। মরুভূমির মধ্যে সমুদ্রের বান, মহা-মায়াবাদীদের মধ্যে 'হরিধ্বনি' দেখলেন তীরদেশে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী ; অঙ্গকান্তিতে চারিদিক আলোকিত হচ্ছে। বিস্ময়ান্বিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—ইনি কে? নবদ্বীপের শ্রীনিমাই পন্ডিত নাকি? শুনেছি তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন। জল থেকে উঠে দেখলেন সত্যই সেই শ্রীনিমাই পন্ডিত সন্ন্যাসীবেশে এসেছেন। অমনি প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করে আনন্দে রোদন করতে লাগলেন। প্রভু তাঁকে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন। অনেক দিনের পর মিলন হল। তপন মিশ্র বহু আদর করে প্রভুকে গৃহে আনলেন, তারপর তাঁর শ্রীচরণ ধৌত করে, সে জল সপরিবারে পান করলেন। পরম আনন্দ হল। তপন মিশ্রের পুত্র শিশু-রঘুনাথ পাদমূলে বন্দনা করতে প্রভু তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। মিশ্র শীঘ্র রন্ধনের ব্যবস্থা করে দিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করলেন। প্রভুর স্নানের ব্যবস্থা হল এবং স্নানাদি আবশ্যকীয় কর্ম্ম শেষ করে, প্রভু ভোজন করলেন। অবশেষ পাত্র পেলেন মিশ্র। মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ প্রভুর শ্রীচরণ সম্বাহন করতে লাগলেন। "মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন।" (চৈঃ চঃ মধ্যঃ) প্রভু বিশ্রাম করলেন।

মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ শ্রবণে চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্রবিপ্র প্রভৃতি ভক্তগণ এলেন ও তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন;প্রভু চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করলেন ও সকলকে নিয়ে কিছুক্ষণ কৃষ্ণ কথা বললেন। প্রভু বিশ্বেশ্বর, বিন্দুমাধব ও দশাশ্বমেধ ঘাট প্রভৃতি দর্শন করলেন। শ্রীচন্দ্রশেখরের ঘরে মহাপ্রভু অবস্থান করতেন ও তপন মিশ্রের গৃহে ভোজন করতেন। শ্রী চন্দ্রশেখর

গ্রন্থাদি নকলের কার্য্য করতেন। তিনি বৈদ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কাশীতে ব্রহ্ম, আত্মা ও চৈতন্য তিন শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ নাই। প্রভুর আগমনে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হল। মহারাষ্ট্রবিপ্র প্রভুর শ্রীচরণ ধরে প্রার্থনা করতে লাগলেন— হে প্রভো! কাশীপুর উদ্ধার করুন। সন্ন্যাসীদের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট আমি তিনবার আপনার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম উচ্চারণ করলাম কিন্তু তিনি তিন বার কেবল 'চৈতন্য' শব্দ বললেন। কৃষ্ণ শব্দ বললেন না। প্রভু বললেন—মায়াবাদীগণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে অপরাধী বলে তাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণ শব্দ বহির্গত হয় না। শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ তিনের মধ্যে কোন ভেদ নাই। এ তিনটি চিদানন্দ স্বরূপ। প্রভু এ সমস্ত উপদেশ করে পরদিন বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। যাবার সময় বলে গেলেন কৃষ্ণের কৃপা হলে সব উদ্ধার হবে।

শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রভু কিছুদিন স্বানন্দে ভ্রমণাদি করবার পর পুনঃ কাশী ধামে এলেন। একদিন ছল করে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে প্রভু সাক্ষাৎকার করলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুর দৈন্য, অপরিসীম সৌন্দর্য্য, ওদার্য্য ও বদান্যতা দেখে তাঁর শ্রীচরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন। সন্ন্যাসিগণ প্রভুর চরণ বন্দনা করে তাঁর মহিমা গান করতে লাগলেন। এবার কাশীতে হরিনামের বন্যা প্রবাহিত হল, কাশীর মায়াবাদ-রূপ ময়লা যেন ধুয়ে গেল। কাশীতে প্রভু এবার দশদিন রইলেন, ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্র বিপ্র প্রভৃতি ভক্তগণ প্রাণ ভরে প্রভুর সেবা করলেন। মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ দিন দশেক ইষ্ট-দেবের সেবা করবার পরম সৌভাগ্য লাভ করলেন।

অনন্তর প্রভু ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে পুরীর দিকে চলবার উদ্যোগ করলেন। প্রভুর বিরহে ভক্তগণ বড়ই কাতর হলেন। মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ কাঁদতে কাঁদতে প্রভুর শ্রীচরণ-মূলে লুটিয়ে পড়লেন। প্রভু তাঁকে কোলে নিয়ে অঙ্গ

ঝেড়ে অনেক বুঝালেন। বললেন—পিতামাতার সেবা কর, মাঝে মাঝে পুরী ধামে এস, দর্শন হবে। তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর আদি ভক্তগণকে আলিঙ্গন করলেন ও অনেক তত্ত্ব উপদেশ দিয়ে মহাপ্রভু বিদায় হলেন।

শ্রীরঘুনাথ অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হলেন। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করতে লাগলেন। রঘুনাথের একটু বয়স হ'লে পিতা আদেশ করলেন তুমি পুরী ধামে গিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করে এস। শ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। রঘুনাথের জননী প্রভুর সেবার জন্য বিবিধ খাদ্য সামগ্রী তৈরী করে একটি ঝালি প্রস্তুত করলেন। শ্রীরঘুনাথ পিতামাতার অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে একটি ভৃত্যসহ পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। রাস্তায় একজন রাম-ভক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হল—নাম শ্রীরাম দাস। তিনি জাতিতে কায়স্থ, রাজকর্মচারী ও কাব্য প্রকাশের অধ্যাপক রাম দাস শ্রীরঘুনাথ ভট্টের পদধূলি মাথায় নিলেন এবং ভৃত্যের কাছ থেকে সামগ্রীর ঝালিটি নিয়ে স্বীয় মাথায় করে চলতে লাগলেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বললেন—আপনি পণ্ডিত হয়ে এ কি করছেন?

রাম দাস—ভট্ট জী! আমি শূদ্রাধম, ব্রাহ্মণের একটু সেবা করে সুকৃতি সঞ্চয় করি।

শ্রীরঘুনাথ—পণ্ডিত জী! আমি অনুরোধ করছি ঝালিটি ভৃত্যের মাথায় দেন। তথাপি শ্রীরাম দাস আনন্দ ভরে ঝালি নিয়ে চলতে লাগলেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট শ্রীরাম দাসের সঙ্গে বিবিধ শাস্ত্র প্রসঙ্গ করতে করতে ক্রমে পুরী ধামে পৌঁছালেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এলেন ও সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করলে প্রভু রঘুনাথ বলে ভূমি থেকে তুলে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভু তাঁর

পিতা-মাতার কুশল প্রশ্ন করলেন ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীরঘুনাথ একে একে সমস্ত কথা বললেন। শ্রীরামদাসকে প্রভু-স্থানে আনলেন। শ্রীরাম প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেও অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁর অন্তরে মুক্তি কামনা আছে দেখে তাঁকে তত আদর করলেন না। প্রভু রঘুনাথকে সমুদ্র-স্নানপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ দর্শন করে আসতে আজ্ঞা করলেন। কোন ভক্ত-সঙ্গে ভট্ট সমুদ্র স্নান ও জগন্নাথ দর্শন করে ফিরে এলে গোবিন্দ মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ তাঁকে প্রদান করলেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্টের ভোজনের ও থাকবার ব্যবস্থা মহাপ্রভু করে দিলেন; সেখানে শ্রীরঘুনাথ থাকতেন। কোন কোন দিবস বাসা ঘরে রন্ধন করে প্রভুকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যত্ন করে ভোজন করাতেন। শ্রীরঘুনাথ আট মাস নীলাচলে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সুখে কাটালেন, জগন্নাথ দেবের সামনে মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য, গীত ও বিবিধ ভাব বিকারাদি তিনি দর্শন করলেন। তারপর মহাপ্রভু তাঁকে কাশীতে পিতা-মাতা স্থানে ফিরে যেতে আদেশ করলেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর বিচ্ছেদের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন। প্রভু তাঁকে বিবিধ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—বিবাহ কর না, বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা কর ও বৈষ্ণবদের সাথে ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন কর পুনর্বার নীলাচলে এসে জগন্নাথ দেবকে দর্শন কর। মহাপ্রভু এ বলে স্বীয় কণ্ঠের মালাটি শ্রীরঘুনাথকে দিলেন। প্রভু তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবদের জন্য জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ দিলেন। বিদায় কালে রঘুনাথ ভট্ট কাতর-চিত্তে প্রভুর পাদপদ্ম-মূলে দন্ডবৎ হয়ে পড়লে, প্রভু তাঁকে তুলে দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় করলেন। প্রভুর বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিত চিত্তে রঘুনাথ ভট্ট কাশী-অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট কাশী এসে পিতা-মাতার সেবা এবং ভাগবত অধ্যয়ন করতে লাগলেন। বৃদ্ধ পিতা ও মাতার অপ্রকট হলে রঘুনাথ শ্রীমহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত সংসারে প্রবিষ্ট না হয়ে পুরী ধামে তাঁর শ্রীচরণে এলেন। প্রভু

রঘুনাথকে দেখে খুব খুশী হ'লেন। তাঁর বৈষ্ণব পিতা-মাতার সম্বন্ধে অনেক মহিমা বললেন। রঘুনাথ আনন্দে প্রভু-সন্নিধানে দিন যাপন করতে লাগলেন। আট মাস কেটে গেল। একদিন প্রভু রঘুনাথ ভট্টকে ডেকে বলেন—"তুমি বৃন্দাবনে যাও, ব্রজে তোমার অনেক কাজ আছে। আমি জননীর আদেশে এখানে বসে আছি, ব্রজের কোন কাজ করতে পারছি না। তোমাদের দ্বারা সে কাজ করাব"। প্রভুকে ছেড়ে যেতে হবে বলে রঘুনাথের মনে খেদ হতে লাগল, প্রভু তা জানতে পেরে বললেন তথায় রূপ ও সনাতনের সঙ্গে অবস্থান কর, সর্বদা ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা কর। প্রভুর আদেশে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, অন্যান্য বৈষ্ণবদের থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর শ্রীচরণে এলেন। মহাপ্রভু বিদায় কালে রঘুনাথকে জগন্নাথের চৌদ্দহাত লম্বা প্রসাদি-মালা ও তাম্বুল মহাপ্রসাদ প্রভৃতি দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। বিদায় হয়ে রঘুনাথ ভট্ট যে পথে প্রভু বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন সে পথে চললেন। স্থানে স্থানে প্রভুর কীর্ত্তি দর্শন ও লোকমুখে তাঁর চরিত শুনতে শুনতে ক্রমে বৃন্দাবনে এলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁকে অতি স্নেহ ভরে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক স্বাগত করলেন। গোস্বামিগণ অতিশয় সুখী হলেন। আপন ভ্রাতা জ্ঞানে রঘুনাথ ভট্টকে স্নেহ করতে লাগলেন। বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তিনি সকলকে বশীভূত করলেন—

রূপ গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত-পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন।।
অশ্রু, কম্প, গদ্‌গদ্ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠ রোধে বাষ্প না পারে পড়িতে।।
—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৩।১২৬-১২৭)

শ্রীরঘুনাথ ভট্টের কণ্ঠ কোকিলের ন্যায় সুমধুর ছিল। এক এক শ্লোকের কত রকমের রাগ-রাগিণী ফিরাতেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

শ্রীগোবিন্দদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি কোন ধনাঢ্য শিষ্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ করালেন। মহাপ্রভু তাঁকে যে মালা দিয়েছিলেন স্মরণ কালে তা কণ্ঠে ধারণ করতেন।

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়।।

—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৩।১৩২)

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়—"রঘুনাথাখ্যকেন ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী।" শ্রীব্রজ লীলায় যিনি শ্রীরাগমঞ্জরী সখী ছিলেন, অধুনা তিনি শ্রীরঘুনাথ ভট্ট নামে কীর্ত্তিত।

তাঁর জন্ম ১৪২৭ শকাব্দ, ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ, আশ্বিন শুক্লদ্বাদশী ও অপ্রকট ১৫০১ শকাব্দ, ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ জ্যৈষ্ঠ শুক্লদশমী ;প্রকট স্থিতি ৭৫ বছর।

—(গৌঃ ২১ বর্ষ)

— ০ —

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ।।

—(চৈঃ চঃ আদিঃ ১১।৪১)

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় " সুবাহুর্যো-ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ।" পূর্ব্বে যিনি ব্রজে সুবাহু নামক গোপসখা ছিলেন, অধুনা তিনি শ্রীউদ্ধারণ দত্ত নামে খ্যাত।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন—

কতদিনে থাকি' নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ-সহে।।
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম।।
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ।।
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম।।
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল ভুবনে।
সর্ব্ব পাপক্ষয় হয় যাঁ'র দরশনে।।

নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম-আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব্ববৃন্দে।।
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে।।
কায়-মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য তাঁ'র।।
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর।।
যতেক বণিক্-কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে।।
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার।।
সপ্ত-গ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাই চাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে।।
বণিক্-সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ।।
বণিক্-সবার কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে।।
নিত্যানন্দ-প্রভুবর মহিমা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার।।
সপ্তগ্রামে প্রভুবর নিত্যানন্দ-রায়।
গণসহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায়।।

সপ্ত-গ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন-বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার।।
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে।।

—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৪৪৩-৪৬১)

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পিতার নাম শ্রীকর দত্ত, মাতার নাম-শ্রীভদ্রাবতী। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নৈহাটী গ্রামের রাজার দেওয়ান্ ছিলেন। আজও রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। ঠাকুর রাজ-কার্য্য উপলক্ষ্যে যে স্থানে বাস করতেন তাহা আজও উদ্ধারণপুর নামে অভিহিত।

—(চৈঃ চঃ আদিঃ ১১।৪১;অনুভাষ্য)

সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের স্বহস্তে-সেবিত শ্রীমহাপ্রভুর যড়ভুজ মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তির দক্ষিণে নিত্যানন্দ, বামে শ্রীগদাধর বিরাজমান। অন্য সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও নিম্নে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আলেখ্য আছে।

শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে এসেছিলেন। "ঈশ্বরী গেলেন শীঘ্র উদ্ধারণ ঘরে।।" (ভঃ রঃ ১১।৭৭৫) ঈশ্বরী জাহ্নবা দেবী যখন এসেছিলেন তখন শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রকট ছিলেন না।

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পুত্রের নাম শ্রীনিবাস দত্ত ঠাকুর। পৌষী কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর অপ্রকট হন।

জয় শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কী জয়!

— ০ —

শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী

শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী শ্রীবক্রেশ্বর প্রভুর শিষ্য ছিলেন। তিনি উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ। শিশুকাল থেকেই তিনি বক্রেশ্বর প্রভুর নিয়ামকত্বে অবস্থান করেন। মহাপ্রভু তাঁর প্রতি বড়ই স্নেহশীল ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে নানা রহস্য করতেন। প্রভু রহস্য করে তাঁকে 'গুরু' বলে ডাকতেন। তখন থেকে তিনি 'গুরু' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভুর ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সঙ্গ প্রভাবে তিনি রসোপাসনার পদ্ধতি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। কাশী মিশ্র ভবনে, যেখানে মহাপ্রভু থাকতেন, সেখানে পরে শ্রীবক্রেশ্বর প্রভু অবস্থান করেন। এখন ঐ স্থানের নাম শ্রীগম্ভীরা। শ্রীবক্রেশ্বর প্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী তথায় অবস্থান করতেন। তিনি সেখানে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী 'স্মরণ পদ্ধতি' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে ছাব্বিশটি অধ্যায় আছে। শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বড় আচার্য্য ছিলেন। তিনি "ধ্যান চন্দ্র পদ্ধতি" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যখন নীলাচলে যান তখন কাশী মিশ্র ভবনে তাঁর সঙ্গে শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর সাক্ষাৎ হয়।

নরোত্তম গেলা কাশী মিশ্রের ভবন।
শ্রীগোপালগুরু-সহ হইল মিলন।।

—(ভঃ রঃ ৮।৩৮২)

শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী ব্রজের তুঙ্গবিদ্যা সখী। কার্ত্তিক শুক্লা নবমী তাঁর তিরোধান তিথি।

— — ঃঃ * ঃঃ — —

মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেব

গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র ছিলেন উৎকলের গঙ্গা বংশীয় রাজা। কটকে তাঁর রাজধানী ছিল। শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর ' গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়' লিখেছেন-

"ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা।
জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সম ইন্দ্রেন সোঽধুনা।।"

যিনি পুরাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চক, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি অধুনা প্রতাপরুদ্র নামে ইন্দ্রের ন্যায় অনন্ত ঐশ্বর্য্য সমন্বিত হয়ে উৎকল রাজ্যে বিরাজমান।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পিতার নাম—শ্রীপুরুষোত্তম দেব, মায়ের নাম শ্রীরূপাম্বিকা বা শ্রীপদ্মাবতী দেবী। শ্রীজগন্নাথদেবের বিবিধ ব্রতোৎসব ও যাত্রা-পর্ব্বাদির ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীপুরুষোত্তম দেব। তিনি নিজেকে শ্রীজগন্নাথদেবের ভৃত্য জ্ঞান করতেন। রথ-যাত্রার সময় স্বহস্তে সুবর্ণের ঝাড়ু দিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণ মার্গ পরিষ্কার করতেন।

শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীপুরুষোত্তম দেবের প্রতি এত সদয় ছিলেন যে স্বয়ং কাঞ্চিরাজ্যের অধিপতিকে পরাজিত করে তাঁর কন্যা পদ্মাবতীকে গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম দেবকে সম্প্রদান করেন। সে কন্যারই গর্ভে গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের জন্ম হয়।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর পিতার ন্যায় নিজেকে শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় নিয়োজিত করেন। এ সমস্ত কথা ' শ্রীসরস্বতী

বিলাস' নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের আদেশেই 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটক রচনা করেন। "শ্রীমৎ প্রতাপরুদ্রেণ শ্রীহরিচরণমধিকৃত্য কমপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টোঽস্মি।" শ্রীমৎ প্রতাপরুদ্র কর্তৃক শ্রীহরি-পাদপদ্ম অবলম্বনে কোন প্রবন্ধ (নাটক) অভিনয় করবার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীধামে এলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত প্রভুর অনেক দিব্য বিভূতি দর্শন করলেন। তিনি পূর্বে শঙ্কর-বেদান্তী অদ্বৈতবাদী ছিলেন, মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি পরম বৈষ্ণব হলেন। পুরীধামে কয়েকমাস অবস্থান করবার পর মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে নাম-প্রেম বিতরণ করতে যাত্রা করলেন। উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্র লোকপরম্পরায় প্রভুর মহিমা কিছু কিছু শ্রবণ করলেন। তাতেই তাঁর মনে প্রভুর দর্শনের ইচ্ছা জাগল। একদিন সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে তিনি তাঁর গৃহে ডাকলেন ও বসতে আসন দিয়ে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন—

শুনিলাঙ তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা, তেঁহো মহা কৃপাময়।।
তোমারে বহু কৃপা কৈলা, কহে সর্বজন।
কৃপা করি, করাহ মোরে তাঁহার দর্শন।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।৫-৬)

শুনেছি আপনার ঘরে একজন মহাপুরুষ এসেছেন। তিনি আপনাকে বহু কৃপা করেছেন। আমায় দয়া করে একবার তাঁর দর্শন করান। সার্ব্বভৌম বললেন আপনি যা শুনেছেন তা ঠিক। আপনার পক্ষে তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তিনি পরম বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী। কখনও রাজদর্শন করেন না। তথাপি চেষ্টা করে দেখতাম। কিন্তু তিনি ত বর্ত্তমানে এখানে নেই, দক্ষিণ

দেশে গমন করেছেন। প্রতাপরুদ্র বললেন—শ্রীজগন্নাথদেবকে ছেড়ে তীর্থ করতে গেলেন কেন? ভট্টাচার্য্য বললেন—মহান্তগণের এ এক লীলা। তীর্থে গিয়ে তাঁরা তীর্থ পবিত্র করেন। কারণ তাঁদের হৃদয়ে তীর্থপাদ শ্রীহরি সদা বিরাজমান। মহান্তগণ তীর্থভ্রমণ ছলে জগদ্‌বাসীকে কৃপা করেন। তাঁরা জীবের ন্যায় নহেন, তাঁরা স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুল্য। রাজা বললেন—তীর্থ করবার জন্য তাঁকে যেতে দিলেন কেন? তাঁর চরণ ধরে রাখলেন না কেন? ভট্টাচার্য্য বললেন আপনি বিজ্ঞ শিরোমণি হয়ে তাঁকে যখন ঈশ্বর বলছেন, আমি তাঁকে ঈশ্বর বলে মানি। পুনর্বার তিনি নীলাচলে এলে আমায় একবার দর্শন করাবেন। ভট্টাচার্য্য বলেন—তিনি কিছুদিনের মধ্যে আসবেন, তবে তাঁর জন্য একখানি নির্জ্জন ঘর প্রয়োজন। রাজা বললেন—শ্রীকাশী মিশ্রের ভবন খুব নির্জ্জন ও শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে। আশা করি উহা তাঁর উপযোগী হবে। ভট্টাচার্য্য রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে-দিনই কাশী মিশ্রে কাছে গেলেন। শ্রীমিশ্রকে আদ্যোপান্ত সব কিছু বললেন। শুনে তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন—আমি বড় ভাগ্যবান্, "মোর গৃহে প্রভুপাদের হবে অবস্থান।"

শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করবার জন্য ভক্তগণের উৎকণ্ঠা দিন দিন বাড়তে লাগল। ঠিক এ সময় প্রভু পুনঃ নীলাচলে ফিরে এলেন, ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। প্রভুর চরণে ভক্তগণ আনন্দে মিলিত হলেন। সার্ব্বভৌম দন্ডবৎ করতেই প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অনন্তর ভট্টাচার্য্য কাশী মিশ্র ও ভবানন্দ প্রভৃতি পুরীর ভক্তগণকে প্রভুর সঙ্গে মিলন করিয়ে দিলেন। কাশীমিশ্র প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করতেই তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে মিশ্র প্রেমাবিষ্ট হলেন। কাশী মিশ্র বহু ভক্তি-পুরঃসর প্রভুকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন ও তাঁর শ্রীচরণ পূজা করে সপরিবারে আত্মনিবেদন করলেন। মহাপ্রভু সে-কালে তাঁকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখালেন—

প্রভু চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি' তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।৩৩)

কাশী মিশ্রের পুষ্পবাটিকা মধ্যে এক নির্জ্জন গৃহে প্রভু সুখে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর কাছে বললেন— উৎকলাধিপতি গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র আপনার মহিমা শুনে আপনার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে চান। সার্ব্বভৌমের কথা শুনে প্রভু "নারায়ণ" স্মরণপূর্ব্বক কানে অঙ্গুলি দিলেন ও বললেন—ভট্টাচার্য্য! আপনি অযোগ্য কথা বলছেন কেন? আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী। রাজ-দর্শন আমার পক্ষে নিষিদ্ধ— স্ত্রী দর্শনের ন্যায় বিষতুল্য। ভট্টাচার্য্য বললেন—আপনি ঠিক বলেছেন কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের সেবক ভক্তোত্তম। মহাপ্রভু বললেন—জগন্নাথের সেবক হলেও সে রাজা বিষয়ী, কাল সর্প সম। ভট্টাচার্য্য! রাজ-দর্শনের কথা পুনঃ মুখে আনবেন না যদি পুনঃ বলেন, আমি অদ্যই অন্যত্র চলে যাব। প্রভুর কথা শুনে ভট্টাচার্য্য ভয় পেলেন, তাঁকে দণ্ডবৎ করে অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক স্বগৃহে এলেন। প্রভুর সঙ্গে রাজার কেমনে মিলন ঘটাবেন সে বিষয় সার্ব্বভৌম খুব চিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে শ্রীরামানন্দ প্রভুর আজ্ঞামত বিষয়-আশয় সব ত্যাগ করে দক্ষিণ গোদাবরী থেকে পুরীধামে এলেন। তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে মিলিত হলে প্রভুর আজ্ঞায় রামানন্দ বিষয় ত্যাগ করেছেন শুনে রাজা খুব সুখী হলেন রাজা বললেন—বর্ত্তমানে আপনি যে বেতন পাচ্ছেন তাই আপনাকে দেওয়া হবে, আপনি মহাপ্রভুর সেবা করুন।

অতঃপর শ্রীরামানন্দ রায় মহাপ্রভুর কাছে এসে দণ্ডবৎ করতেই প্রভু তাঁকে ধরে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। উভয়ে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা বললেন।

অনন্তর রাজা প্রতাপরুদ্রের সদ্ব্যবহারের কথা শ্রীরামানন্দ রায় প্রভুর কাছে সমস্ত জানালেন। শ্রীরামানন্দ রায় আরও জানালেন যে—প্রভুর প্রতি রাজার যে প্রীতি দেখালেন, সে প্রীতির লেশমাত্র তাঁর নিজে নাই। প্রভু বললেন—আপনি কৃষ্ণ-ভক্তোত্তম,—"আপনাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্।" রাজা আপনাকে প্রীতি করছেন এজন্য কৃষ্ণ তাঁকে কৃপা করবেন।

এদিকে মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব, সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে গৃহে এনে, মহাপ্রভুর চরণে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সার্ব্বভৌম দুঃখিত চিত্তে সব কথা বললেন। তাঁকে যদি আবার বলা যায়, তিনি হয়ত পুরীধাম ছেড়ে চলে যাবেন। শুনে, মহারাজ দুঃখ করে বলতে লাগলেন—

পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই মাধাই তেঁহ করিলা উদ্ধার।।
প্রতাপরুদ্রের ছাড়ি' করিবে জগৎ নিস্তার।
এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার?
—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১১।৪৫-৪৬)

মহারাজ বললেন—প্রভু যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাকে দর্শন দেবেন না আমিও তেমনই প্রতিজ্ঞা করছি, তাঁর কৃপা ছাড়া প্রাণ ধারণ করব না। মহাপ্রভুর কৃপা যদি লাভ করতে না পারি, এ দেহ, রাজ্য ধন প্রভৃতি দিয়ে কি করব? সার্ব্বভৌম রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন—দেব! আপনি বিষাদ করবেন না, ধৈর্য্য ধারণ করুন;মহাপ্রভু কৃপাময়, অবশ্যই কৃপা করবেন।

রথযাত্রা আগত প্রায়। গৌড়দেশ থেকে প্রভুর ভক্তগণ পুরীধামে আগমন করতে লাগলেন। রাজার ইচ্ছা হল, প্রভুর ভক্তগণকে দর্শন করেন। রাজা সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে নিয়ে স্বীয় অট্টালিকায় আরোহণ করলেন এবং

উপবিষ্ট হয়ে ভক্তগণকে দর্শন করতে লাগলেন। সার্ব্বভৌম ভক্তগণের পরিচয় দিলেন একে একে প্রভুর ভক্তগণকে দেখে রাজা চমৎকৃত হলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণের দিব্য তেজোময় বিগ্রহ দর্শন করে রাজা সেখান থেকে তাঁদের প্রণাম করতে লাগলেন। তিনি ভক্তগণের সৎকারের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করে দিলেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব কটক গিয়ে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের নিকট এক পত্র লিখলেন—

যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি, 'যোগী হই' হইব ভিখারী।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১২।১০)

পত্রখানি ভট্টাচার্য্য ভক্তগণকে দেখালেন, ভক্তগণও চিন্তিত হয়ে পড়লেন ভক্তগণ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে উপস্থিত হলে, অন্তর্য্যামী প্রভু জানতে পেরে বললেন—আপনারা কিছু জিজ্ঞাসা করবার জন্য এসেছেন মনে হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন— তুমি অন্তর্যামী, সব জান, তথাপি বলছি— মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব বড় ঐকান্তিকতার সহিত তোমার চরণ আশ্রয় করেছেন। তোমার দর্শন না পেলে যোগী হবেন, তোমার পাদপদ্ম দর্শন ব্যতীত সমস্ত সুখ তাঁর তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রভু বললেন—আপনাদের ইচ্ছা আমাকে কটক নিয়ে রাজার সঙ্গে মিলন করান। এতে ত পরমার্থ দূরের কথা, লোকে নিন্দা করবে। লোকের কথা দূরে থাকুক দামোদর আমাকে ভর্ৎসনা করবে। দামোদর যদি বলে, রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারি। শ্রীদামোদর বললেন—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমস্তই জান। আমি ক্ষুদ্র জীব তোমাকে কি বিধি দিব? তুমি স্নেহের বশ, রাজা তোমাকে স্নেহ করেন, তোমাদের মিলন একদিন দেখবই। তাঁর স্নেহ তোমার মিলন ঘটাবে। যদ্যপি তুমি ঈশ্বর, পরম স্বতন্ত্র, তথাপি তোমার স্বভাব প্রেম পরতন্ত্র।

অতঃপর ভক্তগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, মহাপ্রভুর একখানি বস্ত্র রাজার কাছে প্রেরণ করলেন। সে বস্ত্রখানি সাক্ষাৎ প্রভু জ্ঞানে রাজা পূজা করতে লাগলেন।

একদিন শ্রীরামানন্দ রায় রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে প্রভুর কাছে এলেন। রাজকুমারের অঙ্গ শ্যাম বর্ণ, পরিধানে উজ্জ্বল-পীতবস্ত্র, কর্ণে কুণ্ডল, গলে মণি-মুক্তার মালা, নানা আভরণে অঙ্গ ঝলমল্ করছে। রাজকুমার দর্শনে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ হল, তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে প্রেমে কুমারকে আলিঙ্গন করলেন। রাজকুমার প্রভু স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হয়ে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে লাগলেন। প্রভু রাজকুমারকে কৃপা করলেন। শ্রীরামানন্দ রায় রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজের কাছে এলেন এবং পুত্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপার কথা বললেন, শুনে রাজা বড় সুখ পেলেন এবং পুত্র স্পর্শ করে যেন প্রভুর স্পর্শ লাভ করলেন।

রথযাত্রা এল। রথযাত্রার পূর্ব্ব দিন মহাপ্রভু শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন উৎসব সম্পন্ন করলেন। রথযাত্রার দিন ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-উৎসব দর্শন করতে লাগলেন। রাজবেশ ত্যাগ করে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীমন্দির থেকে রথ পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথের বিজয়-মার্গ সুবর্ণের ঝাড়ু দিয়ে মার্জ্জন ও চন্দন জল দিয়ে ধৌত করে দিলেন। রাজাকে এত দীন ভাবে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করতে দেখে মহাপ্রভুর মনে কৃপার উদ্রেক হল।

উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন।।
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে-সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে-সেবা হইতে।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৩।১৭-১৮)

অতঃপর রথে বসে শ্রীজগন্নাথের গুণ্ডিচা যাত্রাকালে মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের আগে চৌদ্দ সম্প্রদায় নিয়ে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন। তা দেখে রাজার আনন্দের সীমা রইল না। মহারাজ স্বয়ং পাত্র-মিত্র নিয়ে লোকের ভিড় রক্ষা করতে লাগলেন। নৃত্য করতে করতে মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সামনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। অমনি প্রতাপরুদ্রদেব তাঁকে ধরে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যদশা ফিরে এলে তিনি বুঝতে পারলেন, ভক্তগণের অসাবধানতা হেতু রাজা তাঁকে স্পর্শ করেছেন। প্রভু রাজার সেবায় অন্তরে সুখী হলেও বাহ্যে বলতে লাগলেন—ছি—ছি রাজা আমাকে স্পর্শ করেছে। প্রভুর এ তাচ্ছিল্য ভাব দেখে রাজা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তখন সার্ব্বভৌম পণ্ডিত রাজাকে আশ্বাস দিয়ে শান্ত করলেন। রথ ক্রমে বলগণ্ডি নামক স্থানে এল। সেখানে ভক্তগণসহ মহাপ্রভু মহানৃত্য গীত করতে করতে প্রেমে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হলেন। এদিকে, বলগণ্ডিতে জগন্নাথের ভোগের সময় হয়েছে দেখে ভক্তগণ প্রভুকে "জগন্নাথবল্লভ" উদ্যানে নিয়ে গেলেন এবং একবৃক্ষমূলে বেদিকার উপর শয়ন করিয়ে রাখলেন। কাননটির সৌন্দর্য্য ঠিক যেন বৃন্দাবনের। এ সময় শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিতের পরামর্শে মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে তথায় প্রবেশ করলেন এবং ভক্তগণের অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করতে করতে রাস পঞ্চাধ্যায়ের গোপী গীত শ্লোক মধুর স্বরে পাঠ করতে লাগলেন।

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
'বল, বল' বলি' প্রভু বলে বার বার।।
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি, প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন কৈল।।
তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিলুঁ আলিঙ্গন।।

* * *

'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি' করে আলিঙ্গন।
ইহোঁ নাহি জানে,—ইহোঁ হয় কোন জন।।
পূর্ব্ব সেবা দেখি' তাঁরে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৪।৯-১৫)

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা দেখে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না।

শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করে মহাপ্রভু কটক মহানদীর কিনারে এলেন ও সাক্ষী-গোপাল দর্শন করলেন। সেখানে স্বপ্নেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভোজন করলেন এবং বকুল-তলায় এসে বিশ্রাম করলেন। এ খবর পেয়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাড়াতাড়ি মহাপ্রভুর দর্শনে এলেন এবং দূর থেকে প্রভুকে বহু স্তব স্তুতি করতে লাগলেন—

তাঁর ভক্তি দেখি, প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি, মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৬।১০৫)

অতঃপর মহাপ্রভু রাজাকে কৃষ্ণ নাম উপদেশাদি করলেন। রাজার প্রতি এ কৃপা দেখে ভক্তগণ প্রভুর এক নাম দিলেন—"প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা"।

সন্ধ্যায় যে ঘাটে মহানদী পার হয়ে মহাপ্রভু যাত্রা করবেন, সে ঘাটের পার্শ্বে হস্তী-পৃষ্ঠে রাজপরিবারবর্গ মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য সারি সারি দাঁড়ালেন। মহারাজ নূতন নৌকা নিয়ে পাত্র মিত্র সঙ্গে ঘাটে অবস্থান করতে লাগলেন। অতঃপর মহাপ্রভু নদী পারের জন্য ঘাটে এলে, মহারাজ সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভুকে বন্দনা করে সজল-নয়নে নৌকা আরোহণের জন্য প্রার্থনা জানালেন। মহাপ্রভু

রাজার প্রীতি দেখে প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে তাঁদের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করতে করতে এবং তাঁকে আশীর্ব্বাদ দিতে দিতে নৌকা আরোহণ করলেন। প্রভুর নৌকা আরোহণ দেখে রাজপরিবার বর্গ প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহারাজ ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত রাজাকে সাবধানে ধরে সান্তনা দিতে লাগলেন। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়।" "কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে অশ্রুসিক্ত নয়নে রাজা ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীরামানন্দ রায়কে বলে দিলেন—"শ্রীপ্রভুপাদ যে যে ঘাটে নদী পার হবেন এবং বিশ্রাম করবেন, সে সে ঘাটে যেন তাঁর চরণ স্মৃতি চিহ্ন-স্বরূপ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হয়।" আমি নিত্য সে ঘাটে স্নান করব এবং এ-দেহ অন্তিম সময়ে তথায় ত্যাগ করব।

তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর 'মহাতীর্থ' করি'।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি।।
—(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ষোড়শ অধ্যায়)

শ্রীপ্রতাপরুদ্র সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বর্ণনা—

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বর্ণনানুসারে, মহাপ্রভু যে সময় নীলাচলে প্রথম শুভ বিজয় করেন তখন গজপতি প্রতাপরুদ্র বিজয় নগর জয় করবার জন্য গিয়েছিলেন। কিছুদিন পুরীতে বাস করবার পর গঙ্গা ও শচীমাতাকে দেখবার জন্য মহাপ্রভু গৌড়দেশে আসেন এবং পুনঃ রামকেলি হয়ে নীলাচলে যাত্রা করেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র এই সময় মহাপ্রভুকে দেখবার জন্য কটক থেকে পুরীতে আগমন করলেন ও তাঁকে দর্শন করবার জন্য ভক্তগণকে বিশেষ অনুনয় বিনয় করতে থাকেন। রাজার আর্ত্তি দেখে ভক্তগণ রাজাকে অন্তরাল থেকে মহাপ্রভুর নৃত্য-গীত দেখতে পরামর্শ দেন। অন্তরালে থেকে রাজা

মহাপ্রভুর নৃত্য-গীত দেখতে আরম্ভ করলেন। দেখতে পেলেন দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মূর্চ্ছিত হয়ে মহাপ্রভু ভূতলে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, নয়নের জলে ও মুখের লালায় তাঁর শ্রীঅঙ্গ সিক্ত হচ্ছে। দিব্যভাব রাজা বুঝতে পারলেন না, তাঁর মনে ঘৃণার ভাব এল। রাজা প্রভুর এ-সমস্ত দেখে গৃহে ফিরে এলেন। সে-দিবস রাত্রে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন—

রাজা দেখে—জগন্নাথ-অঙ্গ ধূলাময়।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা-ধারা হয়।।
দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখের লালা পড়ে, তিতে কলেবর।।

—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।১৬৮-১৬৯)

রাজা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করতে উদ্যত হলে শ্রীজগন্নাথ বলছেন— তোমার অঙ্গ কর্পূর-চন্দনে বিলেপিত। আমার শরীর ধূলা-লালাময়। তুমি আমায় স্পর্শ কর না। আমি যখন নৃত্য করছিলাম, তখন আমার অঙ্গে ধূলা লালা দেখে তুমি আমায় ঘৃণা করেছিলে।

সেই ক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।
চৈতন্যগোসাঞি বসি, আছেন আপনে।।
সেই মত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।
রাজারে বলেন হাসি,—'এ ত' যোগ্য নয়।।

—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।১৭৭-১৭৮)

এবার গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজ বুঝতে পারলেন যিনি জগন্নাথ তিনিই সন্ন্যাসীরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তখন মহারাজ ভূতলে পড়ে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বংশাবলী

সূর্য্য বংশের শেষ রাজা শ্রীচূড়ঙ্গদেব। শ্রীচূড়ঙ্গদেবের সপ্তম অধস্তন পুরুষ শ্রীঅনঙ্গ ভীমদেব। ইনি শ্রীজগন্নাথের বর্ত্তমান মন্দির প্রায় আটশত বছর আগে নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীঅনঙ্গ ভীমদেবের সপ্তম অধস্তন পুরুষ শ্রীকপিলেন্দ্রদেব (১৪৩৫-১৪৭০ খৃষ্টাব্দ)। তাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদেব (১৪৭০-১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ)। শ্রীপুরুষোত্তম দেবের পুত্র শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭-১৫৪১ খ্রীঃ) পদ্মা, পদ্মলয়া, শ্রীইলা ও মহিলা এই চারজন প্রতাপরুদ্রের মহিষী ছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের তিন পুত্র ছিলেন—(১) পুরুষোত্তম জানা, (২) কালু আদেব ও (৩) কখাড় আদেব। শ্রীমতী তুক্কা নাম্নী শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের এক কন্যা ছিলেন। শ্রীসরস্বতী বিলাস নামক গ্রন্থে উৎকল রাজাদের বংশাবলীর বিশেষ বর্ণনা আছে।

শ্রীপুরুষোত্তম জানা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী কর্ত্তৃক স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে নীলাচল চক্রবেড়ের মধ্য হতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দেব সমীপে আগমন করেছিলেন।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের রাজ্য সীমা—(১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ) বাংলা দেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাজের গুণ্টুর জেলা পর্য্যন্ত এবং তেলেঙ্গনার অধিকাংশ প্রতাপরুদ্রের অধিকারে ছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রবল পরাক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণদেব রায় বিজয় নগরের সিংহাসনে আরোহণ করবার পর উড়িষ্যা রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। তাই দক্ষিণ সীমা রক্ষা করবার জন্য শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেব দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। এ সময় মহাপ্রভু নীলাচলে শুভাগমন করেন।

"যে সময় ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখন প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে।।

যুদ্ধ রসে গিয়াছেন বিজয় নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলা সেই বারে।।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে, দক্ষিণ গোদাবরী, উত্তরে রূপ-নারায়ণ নদের তীরবর্ত্তী পিছলদা পর্য্যন্ত।

"পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইলা।"
—(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা)

শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের অপ্রকট সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় না। ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা থেকে এগার মাইল দক্ষিণে পূর্ব্বদিকে প্রতাপপুর নামে এক গ্রাম আছে। প্রতাপরুদ্র মহারাজের সমাধি মন্দির নাকি তথায় ছিল। বর্ত্তমান নদীর ভাঙ্গনে তা জলমগ্ন হয়েছে। বিগ্রহগণ (মহাপ্রভু, জগন্নাথ ও দধিবামন) প্রতাপপুরে অন্যত্র অবস্থান করছেন। শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথিতে প্রতাপপুরে মহোৎসব হয়।—(শ্রীক্ষেত্র, গৌড়ীয় মিশন)

— o —

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু

শ্রীমদ্ বীর চন্দ্র বা শ্রীবীর ভদ্র প্রভু কার্ত্তিক কৃষ্ণ নবমী তিথিতে আবির্ভূত হন।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন —

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—স্কন্ধ মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত, অসংখ্য তাঁর লেখা।।
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত।
বেদ ধর্মাতীত হঞা বেদধর্মে রত।।
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ।।
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে।।
সেই বীরভদ্র-গোসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ।।

— (চৈঃ চঃ আদি ১১।৮-১২)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখেছেন—শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র ও শ্রীজাহ্নবা মাতার শিষ্য। ইনি শ্রীবসুধার গর্ভজাত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়—

"সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়িনামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহঃ।।"

শ্রীসঙ্কর্ষণ দেবের ব্যূহ পয়োব্ধিশায়ী বিষ্ণুর অবতার শ্রীবীর চন্দ্র প্রভু। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অভিন্ন বিগ্রহ-স্বরূপ।

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী লিখেছেন—

রাজবলহাটের নিকট ঝামটপুরে।
গেলেন ঈশ্বরী এক ভৃত্যের মন্দিরে।।
তথা বিপ্র যদুনন্দনাচার্য্য বৈসয়।
ঈশ্বরী কৃপায় তেঁহো হৈলা ভক্তিময়।।
যদু নন্দনের ভার্য্যা লক্ষ্মী নাম তাঁর।
কহিতে কি অতি—পতিব্রতাধর্ম যাঁর।।
তাঁর দুই দুহিতা—শ্রীসতী, নারায়ণী।
সৌন্দর্য্যের সীমাদ্ভুত অঙ্গের বলনী।।
শ্রীঈশ্বরী ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্।
প্রভু বীরচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান।।

—(ভক্তিরত্নাকর ত্রয়োদশ তরঙ্গ-২৪৯-২৫৩)

শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর শিষ্য হয়েছিলেন। শ্রীসতীকে ও শ্রীনারায়ণীকে শ্রীজাহ্নবা মাতা মন্ত্র দীক্ষা দান করেন। শ্রীবসুধা দেবীর গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবী, তিনি সাক্ষাৎ গঙ্গার অবতার ছিলেন। শ্রীমাধব আচার্য্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শ্রীমাধব আচার্য্য শান্তনু রাজার অবতার ছিলেন।

বৈষ্ণব বন্দনায় আচার্য্যের নাম আছে—

প্রেমানন্দময় বন্দো আচার্য্য মাধব।
ভক্তি বলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ।।

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর তীর্থ ভ্রমণ

জননীর অনুমতি নিয়ে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ধাম যাত্রা করেন। তিনি প্রথমে সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে আগমন করেন। শ্রীউদ্ধারণ

দত্ত ঠাকুরের পুত্র শ্রীনিবাস দত্ত ঠাকুর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুকে বিশেষ সম্মানসহ দুই দিবস সৎকার করেন। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু তথা হ'তে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আগমন করেন। অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুকে বহু সম্মান পুরঃসর সৎকার করেন ও সংকীর্ত্তনে মগ্ন হন। সেখান থেকে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু অম্বিকা কালনা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে আগমন করেন। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু তাঁকে বহু আদর করে সৎকার করেন। তথা থেকে নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে আগমন করলে প্রভুর পরিকরগণ তাঁকে নিত্যানন্দাত্মজ জেনে আনন্দে বহু সৎকার করেন। দুই দিবস তথায় অবস্থান করে তিনি শ্রীখণ্ডে শুভাগমন করেন। দুই দিবস তথায় অবস্থান করে তিনি শ্রীখণ্ডে শুভাগমন করেন। খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীকানাই ঠাকুর তাঁকে বহু সম্মান প্রদান করেন ও আলিঙ্গন করেন। কয়েক দিবস তথায় অবস্থান করবার পর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু যাজীগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করেন। আচার্য্য প্রভু মহাভক্তিভরে তাঁকে পূজা করেন। সেখানে কয়েকদিন সংকীর্ত্তন মহোৎসব করবার পর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু কণ্টক নগরে আগমন করলেন। একদিন তথায় অবস্থান করে বুধরী গ্রামে শ্রীগোবিন্দ রাজের গৃহে শুভাগমন করেন। বহু ভক্ত পুরঃসর শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তাঁকে পূজা করে সৎকার করেন। তাঁদের ভক্তিতে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে দুই দিবস তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর শ্রীখেতরি গ্রামে শুভ পদার্পণ করেন।

শ্রীঠাকুর নরোত্তম কত না আনন্দে।
আগুসরি লৈয়া গেল প্রভু বীরচন্দ্রে।।
সংকীর্ত্তন নৃত্য কৈলা গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
আইলা অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে।।

—(ভক্তিরত্নাকর ত্রয়োদশ তরঙ্গে)

খেতরি গ্রামে কয়েকদিন সংকীর্ত্তন মহোৎসব করবার পর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করলেন। তাঁর প্রভাবে পথে অনেক পাষণ্ডী উদ্ধার

হয়। তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য ব্রজের মহান্ত গোস্বামীগণ আগমন করেন—শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীঅনন্তাচার্য্য, শ্রীহরিদাস পণ্ডিত, শ্রীমদন গোপালদেবের সেবাধিকারী - শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য - শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপীনাথ অধিকারী, শ্রীমধু পণ্ডিত, তাঁর সতীর্থ ভ্রাতা - শ্রীগোপীনাথের পূজারী শ্রীভবানন্দ, শ্রীকাশীশ্বর, তাঁর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী ও শ্রীমাধবাচার্য্য প্রভৃতি।

প্রভু বীরচন্দ্রে লৈয়া আইলা সর্ব্বজনে।
ব্রজবাসিগণ হর্ষ প্রভুর দর্শনে।।
প্রভু প্রেম ভক্তিরীতে কেবা না বিহ্বল।
গায় গুণ ব্রজবাসী বৈষ্ণব সকল।।
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
সবা-সহ বীরচন্দ্র করিলা দর্শন।।

—(ভক্তিরত্নাকর ত্রয়োদশ তরঙ্গ—৩২৫-৩২৭)

অতঃপর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর ও শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমতি নিয়ে বন ভ্রমণে যাত্রা করেন। তিনি দ্বাদশ বন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গোবর্দ্ধন গিরিরাজ প্রভৃতি দর্শন করে অত্যদ্ভুত প্রেম প্রকট করেন, তা' দেখে ব্রজবাসিগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এরূপে কিছুদিন ব্রজ ধাম দর্শন করে পুনঃ গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এরূপ অত্যদ্ভুত প্রেম দর্শনে সর্ব্বত্রই তাঁর যশ প্রচারিত হয়। তাঁর ঐশ্বর্য্য ছিল অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার একাদশ পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকের অনুভাষ্যে লিখেছেন—গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র—এ তিন জন শিষ্যই ইঁহার পুত্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কনিষ্ঠ রামচন্দ্র খড়দহে বাস করতেন, তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বটব্যাল। জ্যেষ্ঠ গোপীজন বল্লভ বর্দ্ধমান জেলার মানকরের নিকট লতাগ্রামে এবং মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গণেশ পুরে বাস করতেন।

— — ঃঃ * ঃঃ — —

শ্রীকালিয় কৃষ্ণদাস ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

কালা-কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন।।
—(চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৭)

ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, 'লবঙ্গ' সখা। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—"কালঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সখা ব্রজে।।" যিনি পূর্ব্বে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের লবঙ্গ নামক সখা ছিলেন, অধুনা তিনি কালা কৃষ্ণদাস নামে প্রসিদ্ধ।

ইঁহার শ্রীপাট বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া থানার অন্তর্গত আকাই-হাট গ্রামে, নবদ্বীপ—কাটোয়া রাজপথের ধারে অবস্থিত। আকাই-হাট বিরল-বসতি এক অতি ক্ষুদ্র গ্রাম।

চৈত্র কৃষ্ণ দ্বাদশী শ্রীকালিয় কৃষ্ণদাস ঠাকুরের অপ্রকট তিথি। কালা কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বংশধরগণ অদ্যাপি পাবনা জেলার সোনাতলা প্রভৃতি স্থানে বসবাস করছেন।

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুর

ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারি-নাম যাঁর।
'শ্রীহট্টে' এ-সব বৈষ্ণবের 'অবতার'।।
—(চৈঃ ভাঃ আদি ২।৩৫)

শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ও শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুর—শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট বর্ত্তমান বাংলা দেশের একটি জেলা। শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুর বৈদ্য কুলে আবির্ভূত হন। শ্রীহট্ট থেকে এসে তিনি নবদ্বীপে মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ সন্নিধানে বাস করতেন। এঁর পিতামাতার নাম অজ্ঞাত। মহাপ্রভু অপেক্ষা তিনি বয়সে বড় ছিলেন।

শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত, শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুর সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন। ন্যায়ের ফাঁকিতে শ্রীগৌরসুন্দর সকলকে পরাস্ত করতেন। ব্যাকরণের ও ন্যায়ের ফাঁকি প্রভৃতি নিয়ে তিনি পড়ুয়াদের সঙ্গে খুব তর্ক-বিতর্ক করতেন, কেহ তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না। শেষ পর্য্যন্ত মারা-মারি, কাদা ছোড়া-ছুড়ি, ধাক্কা-ধাক্কি প্রভৃতি হ'ত। গঙ্গার ঘাটে এত হুড়াহুড়ি হত যে সমস্ত জল বালু-কাদাময় হয়ে যেত, মহিলারা জল নিতে পারতেন না। ব্রাহ্মণেরা স্নান করতে পারতেন না। এ ভাবে গঙ্গার ঘাটে শ্রীগৌরসুন্দর জলকেলি করে বেড়াতেন।

তবে হয় মারামারি যে যারে পারে।
কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহ মারে।।

এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া সকল।
বালি কাদাময় হয় সব গঙ্গাজল।।

— (শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি-লীলা অষ্টম অধ্যায়)

কয়েক বছরের মধ্যে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাঠশালায় শ্রীগৌরসুন্দর প্রথম স্থান অধিকার করলেন। তখন তাঁর কাছে ছাত্রবৃন্দের নতি স্বীকার করতে হল। মুরারি কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতেন না বা পাঠ সম্পর্কে কোন আলাপ আলোচনা করতেন না। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের মনে ক্রোধ হত। তিনি মুরারি গুপ্তকে ডেকে বলতেন—

প্রভু বোলে,—"বৈদ্য, তুমি ইহা কেনে পঢ় ?
লতা-পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দড়।।
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই — বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত, অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি।।

— (চৈঃ ভাঃ আদি ১০।২১-২২)

এ সব কথা শুনে মুরারি যদিও মনে মনে রুষ্ট হতেন বাহিরে রোষ প্রকাশ করতেন না। শুধু মহাপ্রভুর দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে থাকতেন। প্রভুর দিব্য প্রশান্ত-মূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁর সুকোমল করতল স্পর্শে কারও কিছু বলবার থাকত না; সকলে শান্ত হত।

তখন শ্রীগৌরসুন্দর ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনা মাত্র আরম্ভ করেছেন। মুরারি গুপ্ত তাঁর সঙ্গে, অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করতেন; কিন্তু তাঁকে পরাস্ত করতে পারতেন না। আশ্চর্য্য হয়ে মনে মনে বলতেন—এমন পাণ্ডিত্য কোন সাধারণ মানুষের থাকতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হবেন। নবদ্বীপের কোন ছাত্র তাঁর সঙ্গে তর্কে পেরে উঠতেন না। মুরারি বৈদ্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে এরূপ তর্ক বিতর্ক হত, আবার মিত্রভাবে দুজন

গঙ্গা স্নানে যেতেন।

মহাপ্রভু গয়াধাম থেকে এসে যখন প্রেম প্রকাশ করতে লাগলেন, মুরারি গুপ্ত প্রভুর পরম ভক্ত হলেন। শুক্লাম্বর পণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভুকে দিব্যভাবে ক্রন্দন করতে দেখে মুরারি গুপ্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীরাম-সীতার উপাসনা করতেন। একদিন মহাপ্রভু হঠাৎ তাঁর গৃহে উপস্থিত হয়ে বরাহভাবে গর্জন করতে করতে একটি জলপাত্র দন্তে ধারণ করে উঠালেন! অবাক মুরারি গুপ্ত দিব্য বরাহরূপী শ্রীগৌরসুন্দরকে দণ্ডবৎ করলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর বললেন—"মুরারি। তুমি আমার স্তুতি কর।" মুরারি গুপ্ত স্তুতি করতে লাগলেন। স্তুতি শুনে মহাপ্রভু খুব সুখী হয়ে বললেন—"মুরারি! তোমার নিকট আমি সত্য করে বলছি, আমি সকল বেদের সার, এবং সংকীর্ত্তন প্রচার করতে ও করাতে আমি অবতীর্ণ হয়েছি, ভক্ত-দ্রোহ আমি সইতে পারি না, ভক্ত-দ্রোহী যদি পুত্রও হয় তথাপি তার মস্তক ছেদন করি, তার প্রমাণ নরকাসুর।" মুরারির প্রতি প্রভু অনেক নিগূঢ় আত্মকথা বলে নিজ গৃহে এলেন।

অন্য একদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে সাত প্রহরিয়া ভাব প্রকট করে ভক্তগণকে আহ্বান করে ইষ্টবর দিতে লাগলেন, শ্রীমুরারি গুপ্তকে ডেকে বললেন—মুরারি! তুই এতদিনে জানিস না আমি কে? আমার স্বরূপ দেখ।

"মোর রূপ দেখ।"
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক।।
দূর্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্ধর।।
জানকী-লক্ষ্মণ দেখে বামেতে, দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে।।

আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর।
সকৃৎ দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর।।
—(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০।৮-১০)

মুরারি গুপ্ত তখন দেখতে পেলেন নবদুর্ব্বাদলশ্যাম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্বান হাতে রত্নাসনে বসে আছেন, বামে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা সীতা এবং দক্ষিণে ধনুর্বাণ হাতে লক্ষ্মণ শোভা পাচ্ছেন, সামনে বড় বড় বানর বীরগণ স্তুতি করছেন, মুরারি নিজেকেও সে বানরগণের মধ্যে দেখতে পেলেন। মাত্র একবার এ দিব্য রূপ দেখে মুরারি গুপ্ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তখন মুরারিকে ডেকে বললেন —মুরারি! ওঠ! আমার দিব্যরূপ দেখ। তুই কি ভুলে গিয়েছিস, সীতা-হরণকারী রাবণের লঙ্কা দগ্ধকারী হনুমান তুই। ওঠ, তোর জীবন-স্বরূপ লক্ষ্মণকে দর্শন কর। যার দুঃখে তুই কত কেঁদেছিলি, সে সীতাকে প্রণাম কর। মহাপ্রভুর বাক্যে মুরারি চৈতন্য লাভ করলেন এবং দিব্যরূপ দেখে বারবার তাঁকে দণ্ডবৎ করতে করতে কাঁদতে লাগলেন। মুরারির প্রতি প্রভুর কৃপা দেখে ভক্তগণ আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে বসে আছেন। এমন সময় তথায় শ্রীমুরারি গুপ্ত এলেন। প্রথমে মহাপ্রভুকে ও পরে নিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করলেন। প্রভু বললেন—মুরারি! ব্যতিক্রম হল। মুরারি বললেন—তুমি যেমন প্রেরণা দিলে তেমনি করলাম। প্রভু বললেন—ঘরে যাও সব কিছু পরে জানতে পারবে। মুরারি গুপ্ত গৃহে ফিরে ভোজনাদি করে শয়ন করলেন। তারপর স্বপ্ন দেখলেন—

স্বপ্নে দেখে মহাভাগবতের প্রধান।
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান।।
নিত্যানন্দ-শিরে দেখে মহা-নাগ-ফণা।
করে দেখে শ্রীহল, মুষল তাল বানা।।

নিত্যানন্দ মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বম্ভর।।
—(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০।১৪-

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ হলধর—অনন্তদেব, মহাভাগবত-স্বরূপ
হল মুষল শোভা পাচ্ছে। আগে আগে চলছেন। পিছনে আছেন শিরে
পাখাধারী বিশ্বম্ভর। মুরারি বুঝতে পারলেন, কে বড়। প্রভু হাসতে হ
বললেন—মুরারি। এখন বুঝতে পারলে ত'? তুমি ব্যতিক্রম করলে কি
চলবে? মুরারি গুপ্ত স্বপ্ন-ঘোরে "নিত্যানন্দ," "নিত্যানন্দ" বলে ক্রন্দ
উঠলেন। পতিব্রতা পত্নী 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে তাঁকে জাগালেন। মুরারি
বুঝতে পারলেন নিত্যানন্দ বড় মহাভাগবত। শ্রীগৌরকে তিনিই প্রকাশ ক
তাঁর কৃপা না হলে গৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করা যায় না।

অন্য দিবস মুরারি গুপ্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে এসে দেখলেন মহাপ্র
ভাবে দিব্য আসনে বসে আছেন। ভক্তগণ নিজ নিজ সেবা করছেন। শ্রী
প্রভুকে তাম্বুল দিচ্ছেন, প্রভু আনন্দে তাম্বুল চর্ব্বণ করছেন, নরহরি
ব্যজন করছেন। মুরারি গুপ্ত নমস্কার করলেন, প্রভু মুরারির হাতে
তাম্বুল দিলেন। চর্ব্বিত তাম্বুল মুখে দিয়ে মুরারি মাথায় হাত মুছলেন
প্রভু বললেন—মুরারি! আমার উচ্ছিষ্ট তোমার অঙ্গে লাগল।
বললেন— আজ আমার সর্ব্ব অঙ্গ পবিত্র হল। প্রসাদ অপ্রাকৃত। ভগ
নাম ও প্রসাদ অভিন্ন, উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি করলে অপরাধ হয়। প্রভুর চর্ব্বিত
খেয়ে মুরারি কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়ে গৃহে এলেন, পতিব্রতা পত্নী
দিয়ে তাঁকে বসালেন ও সামনে অন্নের থালা এনে দিলেন। মুরারি ভা
হয়ে সে অন্ন মুষ্টি মুষ্টি খাও খাও বলে ভূমিতে ফেলতে লাগলেন
এসব রহস্য জানতেন। তাই তিনি বললেন স্বামিন্! আর দিতে হবে না
আপনি ভোজন করুন। ভাবাবেশে মুরারি কিছু ভোজন করলেন ত

শয়ন করলেন।

সকাল বেলা মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তের গৃহে এসে তাকে বার বার ডাকতে লাগলেন। মুরারি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে তাড়াতাড়ি উঠে প্রভুকে নমস্কার করে এত প্রত্যূষে আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রভু বললেন— মুরারি! তোর কি মনে নাই? খাও— খাও— বলে কত ঘৃত মাখা অন্ন তুই আমায় কাল রাত্রে খাইয়েছিস? তুই দিলে আমি কি না খেয়ে থাকতে পারি? বহু ঘৃত মাখা অন্ন খেয়ে অজীর্ণ হয়েছে, আমায় এর ঔষধ দে। একথা শুনে মুরারি বড় খেদ করতে লাগলেন। অতঃপর প্রভু বললেন—মুরারি! "তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ তোর জল।" (চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২০।৬৯) এ বলে তথাস্থিত এক জলপূর্ণ ঘটের জল পান করতে লাগলেন। মুরারি গুপ্ত তা দেখে হাহাকার করে বললেন—প্রভো! আমি অধম, নীচ, আমার গৃহে জল আপনার পানের যোগ্য নয়।

ভগবান্ ভক্তবৎসল। ভক্তের গৃহে তিনি ভোজন করেন। ভক্ত তাঁকে যেভাবে রাখেন; তিনি ঠিক সেভাবে থাকেন। যা খাওয়ান তা খান। ভক্তের রুচিই তাঁর রুচি। এভাবে প্রভু নিত্যপ্রিয় হনুমান বা গরুড়ের অবতার শ্রীমুরারি গুপ্তকে নিয়ে কত লীলা করতে লাগলেন।

একদিন শ্রীমুরারি গুপ্ত চিন্তা করলেন— প্রভুর অগ্রে যদি দেহত্যাগ করতে পারি ভাল হয়। এভাবে আত্মহত্যা করবার জন্য তিনি একখানা ছোরা তৈরী করলেন এবং তা ঘরে লুকিয়ে রাখলেন। অন্তর্যামী প্রভু সব জানতে পেরে তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে গিয়ে বলতে লাগলেন— মুরারি! আমার যত বিলাস সব তোমায় নিয়ে; তুমি যদি চলে যাও, আমার কি করে চলবে? আমি সব জানি। মুরারি প্রভুর চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন, তারপর প্রভু তাঁকে অনেক বুঝায়ে স্বীয় গৃহে এলেন। নদীয়া নগরে প্রভু যে বিলাস করেছেন, সে বিলাসের নিত্য সহচর ছিলেন শ্রীমুরারি গুপ্ত।

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরী ধামে চলে গেলেন, প্রতি বছর রথযাত্রার সময় মুরারি গুপ্ত তাঁর জন্য বহুবিধ ভোজনসহ সপত্নীক গৌড়-ভক্তদের সঙ্গে পুরী যেতেন। সেবক গোবিন্দ সে ভোজ্য দ্রব্যের প্রত্যেকটির নাম উল্লেখ করে মহাপ্রভুকে ভোজন করাতেন।

বাসুদেব-দত্তের এই মুরারি গুপ্তের আর।

বুদ্ধিমন্ত খাঁনের এই বিবিধ প্রকার।।

—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০।১২১)

"জয় শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুর কী জয়।"

—০—

শ্রীজাহ্নবা মাতা

শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল শালি গ্রামে বাস করতেন। দামোদর, জগন্নাথ, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য—শ্রীসূর্য্যদাসের এই পাঁচজন ভাই ছিলেন। পিতার নাম শ্রীকংসারি মিশ্র। মাতার নাম শ্রীকমলা দেবী। সূর্য্যদাস গৌড়ের রাজার পয়সাকড়ির হিসাব রক্ষকের কার্য্য করতেন বলে তাঁকে সরখেল উপাধি দেওয়া হয়।

শ্রীসূর্যদাস সরখেলের দুটি কন্যা ছিল। বড় জনের নাম শ্রীবসুধা ও ছোটজনের নাম শ্রীজাহ্নবা। গৌর গণোদ্দেশ দীপিকাতে কবিকর্ণপুর বলেছেন-

শ্রীবারুণী রেবত্যোরংশসম্ভবে।
তস্য প্রিয়ে শ্রীবসুধা চ জাহ্নবা।।
শ্রীসূর্য্যাদাসাখ্যমহাত্মনঃ সুতে।
ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়াদ্বয় শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবী, বারুণী এবং রেবতীর অংশে জন্ম। শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত সূর্য্যের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট রৈবতরাজ ককুদ্মির অংশসম্ভূত ছিলেন। শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল শ্রীনিত্যানন্দের ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি কন্যাদ্বয়ের যৌবন দশা দেখে তাহাদের বিবাহের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

সূর্যদাস পণ্ডিত চিন্তিয়া মনে মনে।
করিতে শয়ন নিদ্রা হইল সেইক্ষণে।।

স্বপ্নচ্ছলে দেখে মহামনের আনন্দে।
দুই কন্যা সম্প্রদান করে নিত্যানন্দে।।
—(শ্রীভক্তি রত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ-৩৯০০-৩৯০১)

অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করে সূর্য্যদাস পণ্ডিত আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর নিদ্রা ভঙ্গ হল। প্রাতঃকালে একজন মিত্র ব্রাহ্মণের নিকট স্বপ্ন-কথা বলতে লাগলেন—আমি দেখছি নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ বলরাম। তাঁর অপূর্ব্ব অঙ্গকান্তিতে দশদিক আলোকিত। নানা রত্নালঙ্কারে অঙ্গ সুশোভিত। আমার কন্যা দুটি দুই পার্শ্বে বারুণী ও রেবতী রূপে শোভা পাচ্ছে। অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে আমি কন্যা দান করব। তা না করা পর্য্যন্ত আমার চিত্তে কোন শান্তি নাই। এরূপ অনেক কথা বলে শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল মিত্র ব্রাহ্মণটিকে নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে প্রেরণ করলেন। অতি দ্রুত ব্রাহ্মণটি শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে এলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাসের-গৃহে অবস্থান করছিলেন। ব্রাহ্মণটি সূর্য্যদাস সরখেলের নিবেদন শ্রীবাস পণ্ডিতকে সব জানালে, শ্রীবাস পণ্ডিত শুনে সুখী হলেন ও সেই কথা সময়মত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন। করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের অভিপ্রায় পূর্ণ করবেন বলে ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিলেন। এ কথা শ্রবণে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও পরম সুখী হলেন। শীঘ্র এ কার্য্য হউক এরূপ বললেন। ব্রাহ্মণ শালিগ্রামে ফিরে এসে সূর্য্যদাস পণ্ডিতকে শুভ সমাচার দিলেন। ইহা শুনে সূর্য্যদাসের আনন্দের সীমা রইল না।

বড়গাছিগ্রাম-নিবাসী রাজা হরিহোড়ের পুত্র—শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর একান্ত প্রিয় ভক্ত। তিনি এ বিবাহের যাবতীয় ব্যয় বহন করবেন এবং তার গৃহেই এ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হবে—সংকল্প করে শীঘ্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রার্থনা করে বড়গাছি গ্রামে আনলেন ও বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ করলেন। শ্রীবাস, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভৃতি যাবতীয়

গৌরভক্তবৃন্দ সমবেত হয়ে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণদাস শীঘ্র বড়গাছি গ্রামে এলেন ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তথা যাবতীয় বৈষ্ণবগণকে নিয়ে শালিগ্রামে এলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ও যাবতীয় ভক্তগণকে দর্শন করে সূর্য্যদাস পণ্ডিত পরমানন্দে কিছু পথ অগ্রসর হয়ে অভিনন্দন পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে আনলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

লোটাইয়া পড়ে নিত্যানন্দ পদতলে।
সূর্য্যদাস ভাসে দুই নয়নের জলে।।
দুই হাতে ধরি' চরণ দু'খানি।
কহিতে চাহয়ে কিছু না স্ফুরয়ে বাণী।।
মন্দ মন্দ হাসি' নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে।
কৃপা করি' কৈলা আলিঙ্গন সূর্য্যদাসে।।
সূর্য্যদাস আনন্দে বিহ্বল নিরন্তর।
কে বুঝিতে পারে সূর্য্যদাসের অন্তর।।
দেখিয়া ভ্রাতার প্রেমচেষ্টা গৌরীদাস।
না ধরে ধৈরয, অতি অন্তরে উল্লাস।।

—(ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ-৩৯৪৩-৩৯৪৭)

অতঃপর শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদ পদ্মযুগল পূজা করে শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা দেবীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন।

লোক-শাস্ত্রমতে সূর্য্যদাস ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান।।

—(ভঃ রঃ ১২।৩৯৮৩)

এবারে শুভ পরিণয় হবার পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কয়েকদিন শালিগ্রামে অবস্থান করে পত্নীদ্বয় সঙ্গে বড়গাছি শ্রীকৃষ্ণ দাসের গৃহে এলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থান করবার পর শ্রীনবদ্বীপে এলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দুই

প্রিয়াসহ শ্রীশচীমাতার গৃহে এসে শ্রীশচী মাতাকে নমস্কার করলেন। বসুধা জাহ্নবা দেবীকে দেখে শ্রীশচী মাতা অতিশয় হর্ষিত হলেন এবং স্নেহ করে কোলে নিয়ে বার বার তাঁদের চিবুক স্পর্শ করতে লাগলেন। "শ্রীবসু, জাহ্নবা দোঁহে দেখি' এথা আই। করিল যতেক স্নেহ—কহি সাধ্য নাই"।।—(ভঃ রঃ ১২।৪০১০)

বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ বধূদ্বয়কে পরম স্নেহ করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অতঃপর শ্রীশচীমাতার আজ্ঞা নিয়ে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে এলেন। শ্রীসীতা ঠাকুরাণী বসুধা জাহ্নবাকে দর্শন করে আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন, কোলে নিয়ে কত স্নেহ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিছুদিন অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে অবস্থান করে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বিশেষ প্রার্থনায় সপ্তগ্রামে তাঁর ভবনে এলেন। তথায় কয়েকদিন সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব সমাপনান্তে খড়দহ গ্রামে আগমন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে অনন্তর সংকীর্ত্তন-রঙ্গে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করতে বাহির হলেন।

শ্রীবসুধা দেবীর গর্ভে শ্রীগঙ্গা নাম্নী কন্যা ও বীরচন্দ্র নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীজাহ্নবা দেবীর কোন পুত্র সন্তান হয় নাই।

* * *

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং অন্যান্য গৌরপার্ষদগণের অপ্রকটের পর পুনঃ সংকীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত করেন শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা শক্তিত্রয় শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর তথা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু। আচার্য্যত্রয় যে লোক-বিশ্রুত মহামহোৎসব করেছিলেন খেতরি গ্রামে রাজা সন্তোষ দত্তের গৃহে, সে-উৎসবে শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা আচার্য্যবৃন্দের বিশেষ প্রার্থনায় শুভাগমন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণদাস মিশ্র (শ্রীজাহ্নবা দেবীর কাকা) মীনকেতন, রামদাস, মুরারি চৈতন্য, জ্ঞানদাস, শ্রীপরমেশ্বরী দাস, বলরাম দাস ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয়তম ভক্তগণ। শ্রীজাহ্নবা মাতা প্রথমে ভক্তগণ সঙ্গে অম্বিকা কালনা তাঁর কাকা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে এলেন,

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয় চৈতন্য দাস অতি সাদরে ঈশ্বরী শ্রী জাহ্নবা মাতাকে ও যাবতীয় ভক্তবৃন্দকে অভ্যর্থনা করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা তথায় স্বহস্তে রন্ধন করে শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ভোগ লাগান। একরাত্র তথায় মহোৎসব করে শ্রীনবদ্বীপে এলেন। মহাপ্রভুর গৃহে এসে এবার শ্রীশচীমাতার দর্শন না পেয়ে, তাঁর বিরহে শ্রীজাহ্নবা দেবী বহু খেদ করলেন। শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এসে শ্রীঈশ্বরীকে অতি আদর করে নিজ গৃহে নিয়ে এলেন। তথায় শ্রীঈশ্বরী শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীমালিনী দেবীর চরণ দর্শন না পেয়ে অতিশয় কাতর হৃদয়ে কত ক্রন্দন করেন। একদিন তথায় অবস্থান পূর্ব্বক শান্তিপুরে আগমন করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও শ্রীসীতা ঠাকুরাণীর অপ্রকটে শ্রীজাহ্নবা মাতা বহু খেদ করলেন। আচার্য্যের পুত্রদ্বয় শ্রী অচ্যুতানন্দ ও শ্রী গোপাল বনু আদর পূর্ববক শ্রীজাহ্নবা মাতাকে ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত বৈষ্ণবকে সৎকার করেন। অনন্তর শ্রী জাহ্নবা মাতা ভক্তগণ সঙ্গে কন্টক নগর হয়ে তেলিয়াবুধরি গ্রামে এলে, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ শ্রীঈশ্বরীকে বহু সম্মান পুরঃসর পূজা এবং সৎকার করেন। একরাত্র তথায় অবস্থান করে খেতরি গ্রাম অভিমুখে রওনা হলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত পদ্মানদী পারের ব্যবস্থা এবং পালকী করে তথা হতে খেতরি গ্রাম পর্য্যন্ত যাবার ব্যবস্থা সুন্দরভাবে করে রেখেছিলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত মার্গের বহু দূর এসে শ্রীজাহ্নবা মাতাকে ও সমস্ত বৈষ্ণবগণকে পুষ্প মাল্যাদি দিয়ে স্বাগত জানান। বৈষ্ণবগণ মহাসংকীর্ত্তন মুখে খেতরি গ্রামে প্রবেশ করেন। এ সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু অগ্রসর হয়ে তাঁদের স্বাগত জানান এবং ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবন্নতি করেন। বৈষ্ণবগণ পরস্পর প্রেমে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। চতুর্দ্দিক মহা আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হল।

রাজা সন্তোষ দত্ত শ্রীজাহ্নবা মাতার জন্য ও বৈষ্ণবগণের জন্য নবনির্মিত সুন্দর গৃহ এবং দুটি করে ভৃত্য ও যাবতীয় সেবা-সম্ভার পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা ও বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ অন্তে বিশ্রাম করলেন। রাজা সন্তোষ দত্তের

সেবা পরিপাটী দেখে সকলে পরম সুখী হলেন।

পরদিবস শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ আবির্ভাব তিথি। নবনির্মিত মন্দিরে ছয়টী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবার বিপুল আয়োজন হতে লাগল। সন্ধ্যায় অধিবাস সংকীর্ত্তন। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর মঙ্গল অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। খেতরি গ্রাম লোকে লোকে পূর্ণ হল। সভা মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন। তাঁকে দর্শন করে এবং বৈষ্ণবগণের দর্শন পেয়ে ও কীর্ত্তন শ্রবণ করে পাপী-পাষণ্ডিগণও পরম শুদ্ধ হলেন। সকলে গৃহ কার্য্যাদি পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব দর্শন ও মধুর কীর্ত্তন শ্রবণে মগ্ন হলেন। সকলে আনন্দ-সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন। বৈকুণ্ঠানন্দে সকলে নিমগ্ন। মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত অধিবাস-কীর্ত্তন মহোৎসব হল।

দ্বিতীয় দিবসে মহাসমারোহে শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বয়ং ছয়টী বিগ্রহের অভিষেক কার্য্যাদি করলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবগণের ও শ্রীজাহ্নবা মাতার আদেশে কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। সেই কীর্ত্তনে স্বয়ং স্বপার্ষদ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ আবির্ভূত হলেন। এ দিনে যে কি সুখ-সিন্ধু খেতরি গ্রামে উদ্বেলিত হয়েছিল তা কে বর্ণন করতে পারে? সে উৎসব এক স্মরণীয় ঘটনা বলে খ্যাতি লাভ করল।

তৃতীয় দিবসে মহামহোৎসব। শ্রীবিগ্রহগণের জন্য স্বয়ং শ্রীজাহ্নবা মাতা ভোগ রন্ধন করলেন।

শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া।
প্রাতঃকালে করিলেন স্নানাহ্নিক ক্রিয়া।।
পরম উৎসাহে কৈল অপূর্ব্ব রন্ধন।
অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত না হয় বর্ণন।।

—(ভক্তি রত্নাকর দশম তরঙ্গে -৬৮৬-৬৮৭)

মহামহোৎসবের প্রসাদ মহান্তগণকে স্বয়ং শ্রীজাহ্নবা মাতা পরিবেশন করলেন। সবশেষে শ্রীজাহ্নবা মাতা প্রসাদ গ্রহণ করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতার

চরিত্রে বৈষ্ণব মহান্তগণ পরম মুগ্ধ হলেন।

শ্রীজাহ্নবা মাতা খেতরীর উৎসব শেষ করে ভক্তবৃন্দ সাথে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে প্রয়াগ, কাশী হয়ে মথুরায় এলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি দর্শন, আদি কেশব ও বিশ্রাম ঘাটে স্নানাদি করে বৃন্দাবনে আগমন করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণবগণ মথুরায় এলেন। শ্রীপরমেশ্বরী দাস বৈষ্ণবগণের পরিচয় শ্রীজাহ্নবা মাতার নিকট বলতে লাগলেন—

ইঁহ শ্রীগোপালভট্ট গৌর প্রেমময়।
এই ভূগর্ভ, লোকনাথ গুণালয়।।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, এ শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত।
শ্রীমধু পণ্ডিত, ইঁহ শ্রীজীব বিদিত।।
ঐছে সকলের নাম, ক্রিয়া জানাইল।
শুনি ঈশ্বরীর মহা আনন্দ বাড়িল।

—(ভক্তিরত্নাকর, ১১ তরঙ্গ-১০৪-১০৬)

শ্রীগোস্বামিগণ শ্রীঈশ্বরীর নিকট এসে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনিও তাঁদের প্রতি প্রণাম করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা, গোস্বামিগণের প্রেম চেষ্টা নিরীক্ষণ করে বড় আনন্দিত হলেন। অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন ও শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন করলেন। গোস্বামিগণ শ্রীঈশ্বরীর থাকবার উত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েকদিন তিনি শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করবার পর গোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুন্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনের জন্য বহির্গত হলেন। শ্রীভগবানের লীলাস্থলী সকল দর্শনে শ্রীঈশ্বরীর যে সমস্ত দিব্য ভাব সকল উদয় হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। কিছুদিন সুখে শ্রীবৃন্দাবন ধাম ভ্রমণ করবার পর তিনি গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গৌড়মণ্ডলে পৌছে শ্রীঈশ্বরী প্রথমে খেতরি গ্রামে এলেন। শ্রীনরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ অগ্রসর হয়ে তাঁকে স্বাগত

অভ্যর্থনা জানালেন। কয়েকদিন তিনি তথায় অবস্থান করবার পর বুধরি গ্রামে এলেন। বুধরি গ্রামে শ্রীবংশীদাসের ভ্রাতা শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী বাস করতেন। তাঁর কন্যা শ্রীহেমলতাকে বড় গঙ্গাদাসের সঙ্গে ঈশ্বরী বিবাহের প্রস্তাব করলে শ্রীশ্যামদাস ঈশ্বরীর আদেশমত বড় গঙ্গাদাসকে কন্যা দান করলেন। বিবাহের পর ঈশ্বরী বড় গঙ্গাদাসকেশ্যামসুন্দর জীউর সেবা ভার দিলেন। কয়েকদিন শ্রীজাহ্নবা মাতা বুধরি গ্রামে থাকবার পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শনের জন্য একচক্রা গ্রামে এলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন, পিতা হাড়াই পণ্ডিতের ও মাতা পদ্মাবতী দেবীর কথা শ্রবণ করতেই শ্রীজাহ্নবা মাতা শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা স্মরণ পূর্ব্বক অশ্রুসিক্ত নয়নে ক্রন্দন করতে লাগলেন। স্থানীয় কোন ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যলীলা স্থান সকল দর্শনাদি করালেন।

যদ্যপি ভবন শূন্য ভগ্ন অতিশয়।
তথাপি কার না চিত্ত আকর্ষয়?
নিত্যানন্দ লীলাস্থলী করিয়া দর্শন।
হৈলা প্রেমাবিষ্ট যৈছে না হয় বর্ণন।।
সে দিবস ভগ্ন ভবনেতে বাস কৈলা।
শ্রীনাম-কীর্ত্তনে কথো রাত্রি গোঙাইলা।।

—(শ্রীভক্তিরত্নাকর দশম তরঙ্গে)

একরাত্র একচক্রাপুরে থাকবার পর কন্টক নগরে এলেন। প্রভুর সন্ন্যাস স্থান দর্শন করে ঈশ্বরী ক্রন্দন করতে লাগলেন। তথা হতে যাজীগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য গৃহে প্রবেশ করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বৈষ্ণবগণসহ বহু ভক্তি পুরঃসর শ্রীঈশ্বরীকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে নিলেন এবং তাঁর পূজাদি করলেন। আচার্য্য ভার্য্যাদ্বয় শ্রীঈশ্বরীয় সেবায় নিমগ্ন হলেন। কয়েকদিন যাজীগ্রামে অবস্থান করে শ্রীঈশ্বরী শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান দর্শনে এলেন। এ সময়ে শ্রীগৌরগৃহে একমাত্র বৃদ্ধ শ্রীঈশান ঠাকুর ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ভবনে প্রবেশ করতেই শ্রীঈশ্বরী প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হয়ে

পড়লেন। ভক্তগণ তাঁর তাদৃশ প্রেমাবেশ দেখে তাঁরাও প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহাপ্রভুর ভবন থেকে শ্রীঈশ্বরী শ্রীবাস অঙ্গনে এসে তথায় রাত্রিবাস করলেন। রাত্রিকালে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ মহাসংকীর্ত্তন নৃত্যাদি করলেন। শ্রীঈশ্বরী রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণসহ বিচিত্র লীলা বিলাসাদির দর্শন পেলেন। পরদিন বার বার নবদ্বীপ ধামকে বন্দনা করে অম্বিকা কালনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

পুনঃ শ্রীজাহ্নবা মাতার শুভাগমনে অম্বিকাবাসী ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হলেন। শ্রীঈশ্বরী শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতকে স্মরণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করতে করতে শ্রীগৌড়-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মযুগল বন্দনা করলেন। ভক্তগণ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলে সে মহাসংকীর্ত্তনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাব হল। রাত্রে ঈশ্বরী রন্ধনপূর্ব্বক শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে ভোগ অর্পন করলেন। সেই প্রসাদ ভক্তগণকে পরিবেশন করে স্বয়ং গ্রহণ করলেন। রাত্রে বিশ্রামকালে, স্বপ্নে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দের দর্শন পেলেন। সকলেই শ্রীজাহ্নবা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

পরদিবস শ্রীজাহ্নবা মাতা ভক্তদের থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে এলেন। তথায় একরাত্র মহোৎসব করবার পর নৌকা যোগে স্বীয় গৃহে খড়দহ গ্রামে পৌঁছালেন। খড়দহবাসী ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। অতি উল্লাসের সহিত সকলেই শ্রীজাহ্নবা মাতাকে দর্শন করবার জন্য অগ্রসর হলেন। ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ শ্রীঈশ্বরীকে অভ্যর্থনা করলেন। পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র ও কন্যা শ্রীগঙ্গা শ্রীঈশ্বরীর চরণ বন্দনা করতেই তিনি তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে আনন্দে চিবুক ঘ্রাণ নিতে লাগলেন। ঈশ্বরী বসুধাদেবীকে প্রণাম করতেই উভয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস হল। অতঃপর ঈশ্বরী ভক্তগণের কাছে ব্রজমণ্ডলের ও গৌড়মণ্ডলের যাবতীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। শ্রীপরমেশ্বরী দাস শ্রীঈশ্বরীর সেবায় রইলেন। অন্যান্য বৈষ্ণবগণ বিদায় গ্রহণ করলেন।

শ্রীজাহ্নবা মাতা গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল ভ্রমণ করে গৌড়ীয় বৈ
সমাজে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রেখে গেছেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা প্রেমভক্তির অ
এবং অভিন্ন নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী। বহু পাপী পাষণ্ডীকে তিনি উদ্ধার করে
তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সকলেই আকৃষ্ট হয়েছেন।

বৈশাখ শুক্লাষ্টমীতে শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা আবি
হন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীজাহ্নবা মাতার শ্রীচরণে এইরূপ প্র
করেছেন—

ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান।।
না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞান-বল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম—না আছে সম্বল।।
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি, না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার।।
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে' উত্তেজন।।
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী।।
ওগো শ্রীজাহ্নবা দেবী! এ দাসে করুণা।
কর' আজি নিজ গুণে, ঘুচাও যন্ত্রণা।।
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব করেছি নিশ্চয়।।
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদকল্পতরু।।
কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার।।

—(কল্যাণকল্পত

— ঃঃ * ঃঃ —

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

ভগবান্ শ্রীগৌরহরির প্রিয় পার্ষদ ছিলেন শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য। বর্ত্তমান নবদ্বীপ বা চাঁপাহাটি থেকে—আড়াই মাইল দূরে বিদ্যানগর নামক প্রসিদ্ধ পল্লীতে তার জন্ম। পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ। ভ্রাতার নাম বিদ্যা বাচস্পতি। বাসুদেব ভট্টাচার্য্য ছিলেন ভারতের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক। তিনি মিথিলায় গিয়ে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তদানীন্তন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র ছিলেন তাঁর গুরু। সার্ব্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্য্য ন্যায়বিদ্যা সমাপ্ত করে যখন বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন ন্যায়ের কোন গ্রন্থ তিনি সঙ্গে আনতে পারেন নাই। তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমগ্র ন্যায়গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ নগরে ফিরে এলেন। নবদ্বীপে নব্য ন্যায়-শাস্ত্রের এক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করলেন। অগণিত ছাত্রকে ন্যায়বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যে নবদ্বীপ নগর ন্যায়বিদ্যা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হল। তখনকার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ছিলেন সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের ছাত্র। শিরোমণির ন্যায়ের টীকার নাম'‘দীধিতি—”। এর জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর নিজের লিখিত ন্যায়শাস্ত্রের টীকা গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শঙ্কর বেদান্তেরও অত্যদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ছাত্রকে অদ্বৈত বেদান্ত অধ্যয়ণ করাতেন। উৎকলাধিপতি গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বিশেষ আগ্রহে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীজগন্নাথ পুরীধামে গিয়ে শঙ্কর বেদান্ত অধ্যাপনা করতেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস-গ্রহণের পর কয়েকজন ভক্তসহ পুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমে রেমুনা, কটক, সাক্ষীগোপাল ও ভুবনেশ্বর হয়ে আঠার-নালায় এলেন। সেখান থেকে ভঙ্গি করে ভক্তগণের সঙ্গ ছেড়ে

তিনি একাকী শ্রীজগন্নাথ ধামে এলেন এবং শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চললেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করে দূর থেকে জগন্নাথদেবের দর্শন করেই প্রেমাবেশে অচৈতন্য হয়ে ভূতলে পড়লেন। দৈবক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানে ছিলেন। পড়িছাগণ (পাহারাদারগণ) ছুটে এল কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর অঙ্গ স্পর্শ করতে তাঁদের নিষেধ করলেন।

প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌম হইলা বিস্মিত অপার।।

—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৬)

বহুক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও প্রভুর চৈতন্য হল না। এদিকে মন্দিরে ভোগের সময় হল। তখন শিষ্যবর্গ ও পড়িছাদের সাহায্যে সার্ব্বভৌম পণ্ডিত প্রভুকে নিজ গৃহে নিয়ে এক পবিত্রস্থানে শায়িত করে রাখলেন। নাসারন্ধ্রের কাছে তুলা ধরে দেখলেন তিনি জীবিত। তারপর ভট্টাচার্য্য বিচার করলেন—"এঁর শরীরে যে ভাব দেখছি তা সাধারণ জীবে থাক্‌তে পারে না। এই সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণেরই হয়ে থাকে। অধিরূঢ় মহাভাব যার থাকে তারই এই রকম মহাভাবের উদয় হয়।"

মহাপ্রভুর সঙ্গে যে ভক্তগণ ছিলেন তাঁরা এর মধ্যে জগন্নাথ মন্দিরে এলেন এবং জানতে পারলেন যে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করে প্রেমে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে গিয়েছেন। ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে সার্ব্বভৌম গৃহে এলেন এবং দেখলেন যে তখনও মহাপ্রভু প্রেমে অচৈতন্য অবস্থায় আছেন। তখন সকলে উচ্চ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। এবার মহাপ্রভুর চৈতন্য ফিরে এল। "হরি হরি" ধ্বনি করে তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। তখন সকলে মিলে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। তারপর সকলে বিশ্রাম করলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রীমহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করলেন ও মধ্যাহ্ন-ভোজন করবার জন্য

নিবেদন জানালেন। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর সমস্ত পরিচয় জানালেন। গোপীনাথ আচার্য্য ছিলেন মহাপ্রভুর পরম ভক্ত এবং শ্রীসার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি। ভক্তগণকে নিয়ে মহাপ্রভু সমুদ্র স্নান করে এলেন। ইতিমধ্যে সার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মন্দির থেকে প্রচুর প্রসাদ আনালেন এবং সেই প্রসাদ দ্বারা মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের যথাযোগ্য সৎকার করালেন। এস্থলে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বড় সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল।।
সুবর্ণ থালীর অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন।।
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে,—মোরে দেহ লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনে।।
পীঠা-পানা দেহ তুমি ইহাঁ সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে জুড়ি দুই করে।।
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন।
এত বলি পীঠা-পানা সব খাওয়াইলা।
ভিক্ষা করাঞা আচমন করাইলা।।

—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৪১-৪৬)

মহাপ্রভুর বিশ্রামের জন্য সার্ব্বভৌম একটি ছোট ঘরের ব্যবস্থা করলেন। তথায় মহাপ্রভু কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। অনন্তর সার্ব্বভৌম পণ্ডিত গোপীনাথ আচার্য্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রভুর কাছে এলেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত মহাপ্রভুকে "নমো নারায়ণায়" বলে নমস্কার করলেন। মহাপ্রভু "কৃষ্ণ মতি রহু" বলে আশীর্ব্বাদ করলেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত তখন বুঝতে পারলেন ইনি

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। গোপীনাথ আচার্য্যের কাছে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভু সম্বন্ধে সবকিছু আগেই জেনেছিলেন। মহাপ্রভু নদীয়ার লোক বলে সার্ব্বভৌম তাঁকে খুব যত্ন করতে লাগলেন।

একদিন মহাপ্রভু নিভৃতে সার্ব্বভৌমকে বললেন—"আমি বালক সন্ন্যাসী, ভাল মন্দ কিছুই বুঝি না। আপনার আশ্রয় নিলাম। আপনি আমার গুরু-স্বরূপ, আপনার সঙ্গ লাভের জন্যই এখানে এসেছি। আপনি আমায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করবেন।" ঈশ্বরের মায়া কাটিয়ে উঠা বড় কঠিন। এই মনোহর বাক্য শুনে সার্ব্বভৌম মোহিত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন—"তুমি অতি অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভুল করেছ। তোমার যে ভক্তি যোগ দেখছি তাতে সন্ন্যাসে কি করবে? তবে আমি সর্ব্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করব এবং বেদান্ত শ্রবণ করাব।" প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ সার্ব্বভৌম তাঁকে বেদান্ত শ্রবণ করাতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে সাতদিন বেদান্ত ব্যাখ্যা করবার পর অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি সাতদিন বেদান্ত শ্রবণ করেছ– কিন্তু –ভাল মন্দ কিছুই বলছ না। বুঝতে পারছ কি না তাও জানতে পারছি না।" মহাপ্রভু বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন—"আমি মূর্খ, আমার পড়াশুনা মোটেই নাই। আপনার আদেশ মত বেদান্ত শুনেছি বটে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।" সার্ব্বভৌম বললেন —"না যদি বুঝতে পার, জিজ্ঞাসা করবে ত?" মহাপ্রভু বললেন —"আপনি তো জিজ্ঞাসা করতে বলেন নাই। সন্ন্যাস ধর্ম্ম রক্ষা করবার জন্য বেদান্ত শুনতে বলেছেন। তাই আমি শুনেছি।" তখন সার্ব্বভৌম বললেন—" তোমার মনের গভীর ভাব আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। তুমি মৌন হয়ে শুধু শুনছ।" মহাপ্রভু মৃদু হাস্য করে বললেন—"আমি ত বেদান্ত সূত্রের অর্থ ভালই বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমার মন বিকল হয়ে যাচ্ছে। যেমন স্বপ্রকাশিত সূর্য্যকে মেঘ আচ্ছাদিত করে সেরূপ আপনার ব্যাখ্যা যেন স্বতঃ প্রকাশিত অর্থটিকে

আচ্ছাদিত করে রাখছে। আপনি মুখ্য অর্থটি বলছেন না, কল্পনাজাত অর্থের দ্বারা মূল সূত্রটিকে আবৃত করছেন মাত্র।" সার্ব্বভৌম বললেন— "আমি ত শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ব্যাখ্যা করে বলেছি।" মহাপ্রভু বললেন— "শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য করেছেন তা মায়াবাদ ভাষ্য। তাতে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের শক্তি লোপ পেয়েছে। শ্রুতি উপনিষদের মুখ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে কতকগুলি কল্পনাজনক অর্থ করেছেন।"

'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগৎ উৎপত্তি।।

—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭৪)

অনাদিসিদ্ধ বেদশাস্ত্রে প্রণবকে মহাবাক্য বলা হয়েছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদের একদেশসূচক বাক্য "তত্ত্বমসি" কে মহাবাক্যরূপে কল্পনা করেছেন। ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আচার্য্য শঙ্কর সে বিগ্রহকে সত্ত্বগুণের বিকার বলেছেন। শ্রুতির ভগবদ-স্বরূপের "এক অদ্বিতীয়" শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি তার সমস্ত শক্তিকে মায়া মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু ঈশ্বর অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন—তিনি যুগপৎ বহু শক্তি প্রকট করে বিহার করতে পারেন। তাতে তাঁর বিরাটত্বের হানি হয় না। খনি বহু সুবর্ণ প্রসব করলেও স্বরূপে সমান থাকে। একটি দীপ থেকে বহু দীপ জ্বালালেও মূল দীপ সমান থাকে। তদ্রূপ ভগবান্ বহু শক্তি যুগপৎ প্রকাশ করলেও মূল স্বরূপের কোন হানি হয় না। অতএব পরিণামবাদ অর্থাৎ শক্তিবাদ ব্যাস সূত্রের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত। শঙ্করাচার্য্য সে পরিণামবাদ বা শক্তিবাদকে মিথ্যা মায়া বলে কল্পনা করেছেন। ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ ভগবান্— তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। শঙ্করাচার্য্য তা না বলে ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, নিরাকার বলে কল্পনা করেছেন। এইভাবে ব্যাসদেবের বাস্তব সিদ্ধান্তটিকে অবজ্ঞা করে তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের কাল্পনিক অর্থ করেছেন। তবে এটি শঙ্করাচার্য্যের দোষ নহে। তিনি সাক্ষাৎ শঙ্কর। তিনি ভগবানের আদেশে

অসুরগণকে বিমোহিত করবার জন্য ধরাতলে শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং কল্পিত ভাষ্য রচনা করেছিলেন—এই কথা পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে আছে।

মহাপ্রভুর মুখে এইসব কথা শুনে সার্ব্বভৌম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। তখন মহাপ্রভু বললেন —"ভট্টাচার্য্য। আপনি বিস্ময়ান্বিত হবেন না। ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ। মুক্ত আত্মারাম পুরুষগণও এ ভক্তিযোগে ঈশ্বরের ভজন করে থাকেন। এর প্রমাণস্বরূপ ভাগবতে "আত্মারাম" শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেছেন। শ্রীমদ্ শুকদেব পূর্ব্বে মহাজ্ঞানী ছিলেন। পরে ভক্তিযোগে ভগবদ্ উপাসনা করেছিলেন–যথা ভাগবত-কীর্ত্তন।"

অতঃপর মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে "আত্মারাম" শ্লোক ব্যাখ্যা করতে বললেন। ভট্টাচার্য্য ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করে তিনি যত প্রকার ব্যাখ্যা পারলেন বললেন। মহাপ্রভু সেই শ্লোকের চৌষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু তাঁর এত প্রকারের ব্যাখ্যার মধ্যেও সার্ব্বভৌমের কোন ব্যাখ্যার একটি শব্দ পর্য্যন্ত ছিল না। এবার সার্ব্বভৌম বিস্ময়ে হতবম্ব হয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন—

ইঁহো ত' সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—মুঞি না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হঞা।।

—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৬।২০০)

অতঃপর তিনি মহাপ্রভুর চরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন এবং অতি দৈন্যের সঙ্গে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয় গলে গেল এবং তাঁকে কৃপা করবার ইচ্ছা হল। তিনি সার্ব্বভৌমকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখালেন। ত্রেতাযুগে রাম, দ্বাপরে কৃষ্ণ, কলিতে দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ। সার্ব্বভৌমের সমস্ত সংশয় দূর হল। প্রভুর কৃপায় তাঁর সমস্ত তত্ত্ব

বিকাশ প্রাপ্ত হল। তৎক্ষণাৎ শত শ্লোকে প্রভুর স্তবগান করলেন—এই স্তবমালাটির নাম হল "সার্ব্বভৌম শতক"।

"শুনি, সুখে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন।।
অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ কম্প থরহরি।
নাচে, গায়, কান্দে, পড়ে প্রভু পদ ধরি'।।"

* * *

"জগৎ নিস্তারিলে তুমি,—সেহ অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি,—এ শক্তি আশ্চর্য্য।।
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহ পিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড।।"

—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৬।২০৭-২০৮, ২১৩-২১৪)

তিনি যে মহাপ্রভুকে শিশুজ্ঞান করে বেদান্ত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁকে রক্ষা করবার কথা বলেছিলেন এসব কথা স্মরণ করে সার্ব্বভৌম বড় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে লাগলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু সব জানতে পেরে তাঁকে বললেন— "ভট্টাচার্য্য, তুমি মুগ্ধ হয়ো না। যোগিগণের ঈশ্বর শিবও আমার মায়ায় স্থির থাকতে পারেন না।" সার্ব্বভৌম প্রভুর পরিকরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন। মহাপ্রভুর নাম ও কথা ছাড়া অন্য কথা ত্যাগ করলেন— "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌর গুণধাম" এই নাম নিরন্তর কীর্ত্তন করতে লাগলেন। সার্ব্বভৌমকে এই ভাবে উদ্ধার করাতে মহাপ্রভুর মহিমা তখন পুরীধামে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। গজপতি প্রতাপরুদ্রের পুরোহিত শ্রীকাশী মিশ্রও মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি মহাপ্রভুকে থাকবার জন্য একটি নির্জ্জন গৃহ দিলেন।

একদিন জগন্নাথদেবের মঙ্গল আরাত্রিক দর্শন করে কিছু প্রসাদ নিয়ে মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি সার্ব্বভৌম গৃহে এলেন। তখনও সার্ব্বভৌম শয্যা ত্যাগ করেন নাই। মহাপ্রভু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। সার্ব্বভৌম তাড়াতাড়ি উঠে মহাপ্রভুকে বন্দনা করলেন। জগন্নাথের প্রসাদটুকু মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের হাতে দিলেন। ভট্টাচার্য্যও তৎক্ষণাৎ নমস্কার করে প্রসাদ মুখে দিলেন। সার্ব্বভৌমের প্রসাদের উপর এরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন এবং ভট্টাচার্য্যকে ধরে নৃত্য করতে লাগলেন। মহাপ্রভু বললেন—

আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ।।
আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।।
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈল সদয়।।
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন।।
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ।।

—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৩০-২৩৪)

মহাপ্রভু এইরূপ বলে নিজ স্থানে ফিরে এলেন। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের বিষ্ণুভক্তি দর্শন করে চমৎকৃত হলেন। একদিন সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর নিকটে এলে মহাপ্রভু তাকে কিছু বলতে বললেন। সার্ব্বভৌম ভাগবতের শ্লোক পাঠ করতে লাগলেন—একটি শ্লোকের পাঠ বদল করে "ভক্তি পদে স দায়ভাক্" এইরূপ পদ উচ্চারণ করলেন। মহাপ্রভু

বললেন—"মুক্তিপদে দায়ভাক্" পদটি এইরূপ বদল করবার কারণ কি? সার্ব্বভৌম উত্তরে বললেন—

মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত' উল্লাস।।

একথা শুনে মহাপ্রভু আনন্দে সার্ব্বভৌমকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন।

একবার মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। সার্ব্বভৌমের পত্নী মহাপ্রভুর জন্য বহু যত্নে বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন ও পিঠা প্রস্তুত করেছিলেন। প্রথমে ভগবান্‌কে অর্পণ করে সার্ব্বভৌম প্রভুর ভোজনের জন্য আসন পাতলেন এবং থালার চারিদিকে বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন পিঠা প্রভৃতি সাজিয়ে প্রার্থনা করে মহাপ্রভুকে ভোজন করতে বসালেন। তাঁদের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে ভক্তবৎসল মহাপ্রভুও— সানন্দে ভোজন করতে লাগলেন। সার্ব্বভৌম স্বয়ং পরিবেশন করছিলেন। ইতিমধ্যে সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের অজ্ঞাতসারে তথায় এসে মহাপ্রভুর ভোজন দেখল। অমোঘ পণ্ডিত নিন্দুক স্বভাবের লোক ছিল। সন্ন্যাসী আবার এত ভোজন করে' বলে প্রভুকে নিন্দা করল এবং সে কথা আবার সার্ব্বভৌমের কানে এল। অমনি সার্ব্বভৌম পণ্ডিত ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন। লাঠি নিয়ে অমোঘকে মারতে তাড়া করলেন, সে কিন্তু পালিয়ে গেল। ভট্টাচার্য্য গালি দিয়ে বললেন—'তোর মৃত্যু হউক, ভগবৎ নিন্দুকের মুখ যেন আর না দেখতে হয়'। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর চরণ ধরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু হাসতে হাসতে তাকে অনেক বুঝিয়ে ভোজন করতে বললেন এবং নিজ স্থানে চলে এলেন। সার্ব্বভৌম ও তাঁর পত্নী দুঃখে দিনরাত কিছু ভোজন করলেন না, শুয়ে পড়লেন। ভগবদ্ চরণে অপরাধ করার ফলে সেই রাত্রিতেই বিসূচিকা রোগে অমোঘের মৃত্যু হল। প্রাতঃকালে কোন ভক্ত মহাপ্রভুকে সেকথা জানালেন। ভক্তবৎসল গৌরহরি বললেন,

অমোঘের মৃত্যু হয়েছে। যেখানে অমোঘের মৃতদেহ ছিল অন্তর্য্যামী প্রভু কাকেও জিজ্ঞাসা না করে ঠিক সেখানে এলেন এবং অমোঘের বক্ষঃ স্পর্শ করে বলতে লাগলেন—

সহজে নির্মল এই 'ব্রাহ্মণ'—হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়।।
'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইঁহা বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে।।

* * *

উঠহ, অমোঘ, তুমি লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে, তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্।।

—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৭১-২৭৭)

অমোঘ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীকরকমল স্পর্শমাত্রই চৈতন্য লাভ করলেন এবং "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে উঠে প্রেমানন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। পরিশেষে অমোঘ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরে ক্রন্দন করতে করতে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। মহাপ্রভু বললেন—"তুমি সার্ব্বভৌমের জামাতা। তাই তোমার সমস্ত পাপ দূর হয়েছে। তুমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর। অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করবেন।" ভগবান্ কত ভক্ত-বৎসল। ভক্তের কোন আত্মীয় পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি কোন অপরাধ করলে, ভক্তের কথা স্মরণ করে সেই আত্মীয়ের অপরাধও ক্ষমা করেন এবং তাঁকে শ্রীচরণে আশ্রয় দেন। গৌরসুন্দরের এরূপ অহৈতুকী কৃপা দেখে ভক্তগণ পরম বিস্ময়ান্বিত হলেন।

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশে গমন করেন, দক্ষিণ গোদাবরীতে শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সার্ব্বভৌম পণ্ডিত তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে গৌরসুন্দর দেখা দিবেন না বলেছিলেন কিন্তু

সার্ব্বভৌম পণ্ডিত রথযাত্রাকালে কৌশলে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর মিলন করালেন। সার্ব্বভৌমের কন্যার নাম ছিল ষাঠী। পুরীধামে মহাপ্রভুর প্রবীণ ভক্ত ও পার্ষদরূপে সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরসুন্দরে সেবা করেছিলেন।

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত স্তব—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।।
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।।
—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৫৪-২৫৫)

শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিতের শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি নামে একজন শিষ্য কাশীতে বাস করতেন এবং বেদান্ত শাস্ত্র পড়াতেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে ভক্তিসিদ্ধান্তপর যে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন, সে ব্যাখ্যা মধুসূদন বাচস্পতি উপস্থিত থেকে শুনেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে শ্রীজীব গোস্বামী যখন কাশী যান, তখন তিনি শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বাচস্পতি মহাপ্রভুর নিকট শ্রুত সিদ্ধান্তসমূহ শ্রীজীব গোস্বামীকে শিক্ষা দেন।

— ঃঃ * ঃঃ —

শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর

শ্রীপরমেশ্বর বা শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর বৈদ্যকুলে আবির্ভূ
তাঁর শ্রীপাট ছিল আটপুরে ; হাওড়া-আমতা রেল লাইনের চাঁপাডাঙ্গ
আটপুর স্টেশন। এ স্থানের পূর্ব্ব নাম ছিল বিশাখালা। শ্রীপাটে
গোবিন্দদেব বর্ত্তমান আছেন। মন্দিরের সামনে জোড়া বকুল গাছ
মধ্যস্থানে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের সমাধি মন্দির।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দ শাখা বর্ণন
গিয়ে লিখেছেন—

পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈক-শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়,—তাঁরে যে করে স্মরণ।।

— (চৈঃ চঃ আদি ১১

শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

"নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ পরমেশ্বরঃ।"

শ্রীপরমেশ্বর দাস ঠাকুর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুন সখা নাম
ছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন—

নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বরীদাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস।।
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুই জন।
গোপভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ।।

— (শ্রীচৈতন্য ভাগবত অঃ ৫

শ্রীজাহ্নবা মাতা খেতরি মহোৎসবে যখন যান তখন শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি শ্রীজাহ্নবা মাতার সঙ্গে ব্রজধামেও গমন করেছিলেন।

শ্রীপরমেশ্বর দাস ঠাকুর শ্রীজাহ্নবা মাতার আদেশে আটপুরে শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ঈশ্বরী শ্রীজাহ্নবা মাতা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন স্থানে।।

শ্রীজাহ্নবা মাতা বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের জন্য যে শ্রীরাধা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রেরণ করেন, সেই মূর্ত্তির সঙ্গে ছিলেন শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর। তিনি শ্রীজাহ্নবা মাতার অতি প্রিয় সেবক ছিলেন।

শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথি।

— ০ —

শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী

শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী। পূর্ব্বে তাঁর নাম ছিল শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য। তিনি নবদ্বীপে বাস করতেন। সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে অবস্থান করতেন। প্রভু যখন সন্ন্যাস লীলা প্রকট করলেন, তিনি তখন পাগলের মত হন। বারাণসী গিয়ে চৈতন্যানন্দ নামক সন্ন্যাসীর থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন—নিজে বেদান্ত পড়ে লোককে বেদান্ত পড়াও।

শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য যোগ-পট্ট গ্রহণ করলেন না। শুধু শিখা-সূত্র ত্যাগ করলেন। তাই তাঁর নাম হল স্বরূপ। অতঃপর শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য গুরু চৈতন্যানন্দ স্বামীর আদেশ নিয়ে শ্রীনীলাচলে এলেন। পুনর্ব্বার প্রভু সহ মিলন হল।

আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী, রসের সাগর।।
'পুরুষোত্তম আচার্য্য' তাঁর নাম পূর্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে।।
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি' উন্মত্ত হঞা।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া।।

—(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১০২-১০৪)

তাঁর সম্বন্ধে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আরও লিখেছেন—

পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে।।

কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ।।
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, প্রভু পাছে শুনে।।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস।।
অতএব স্বরূপ-আগে করে পরীক্ষন।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা'ন শ্রবণ।।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করা'ন প্রভুর আনন্দ।।
সঙ্গীতে— গন্ধর্ব-সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি।।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম।।

—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ—১০।১১০-১১৭)

শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ;সঙ্গীতে গন্ধর্বসম ও শাস্ত্রে বৃহস্পতি। কেহ কোন শ্লোক গীত প্রভৃতি রচনা করে আনলে প্রথমে শ্রীস্বরূপ দামোদর পরীক্ষা করতেন। অতঃপর প্রভুকে শুনাতেন।

কাশীক্ষেত্র থেকে এসে শ্রীস্বরূপ-দামোদর শ্রীমহাপ্রভুকে এই শ্লোক বলে বন্দনা করলেন—

হেলোদ্ধূনিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।

—(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক)

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য। যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্র বিবাদ দূর হয়, যাহা রস বর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, অতি বিস্তারিণী তোমার সে শুভদা দয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদা দ্বারা আমার প্রতি উদিত হউক।

শ্রীস্বরূপ-দামোদর দণ্ডবৎ করলে প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন— আমি আজ স্বপ্ন দেখেছি, তুমি এসেছ। ভালই হল। অন্ধ যেমন নেত্র পেলে আনন্দ পায়, আমিও তোমায় পেয়ে আনন্দ পাচ্ছি।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বললেন —প্রভো। আমায় ক্ষমা করবেন। আপনাকে ফেলে অন্যত্র গিয়ে ভুল করেছিলাম।

তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ।
তোমা ছাড়ি' পাপী মুঞি গেনু অন্যদেশ।।
মুঞি তোমা ছাড়িল, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপা পাশ গলায় বান্ধি চরণে আনিলা।।

—(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১২৪-১২৫)

শ্রীস্বরূপের এ দৈন্য উক্তি শুনে প্রভু পুনঃ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন— শ্রীকৃষ্ণ বড় দয়াদয়। দয়া করে তোমায় আবার মিলিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে প্রভু কাছে রাখলেন। প্রভুর যখন যে ভাবোদয় হ'ত সেই ভাবানুযায়ী কীর্ত্তন তিনি প্রভুকে শুনাতেন। এ সময় দক্ষিণ দেশের বিদ্যানগর থেকে শ্রীরামানন্দ রায়ও প্রভুর শ্রীচরণে এলেন। শ্রীরামানন্দ রায় মহাকবি ছিলেন। ভঙ্গী করে যাবতীয় রসতত্ত্ব প্রভু তাঁর মুখে শ্রবণ করেছিলেন।

মহাপ্রভু দিবাভাগে সাধারণ ভক্ত সঙ্গে নামকীর্ত্তন সংকীর্ত্তন করে কাটাতেন। রাত্রে শ্রীস্বরূপ দামোদরও শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ লীলা-

রস তত্ত্ব আস্বাদন করতেন। ললিতা ও বিশাখা যেমন রাধা ঠাকুরাণীর একান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন তদ্রূপ স্বরূপ দামোদরও রামানন্দ রায় প্রভুর অন্তরঙ্গ ছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের অন্ত্য-লীলায় শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু সর্ব্বতোভাব প্রভুর সঙ্গেই অবস্থান করতেন। শ্রীরঘুনাথ দাসকে প্রভু শ্রীস্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করেছিলেন।

আষাঢ় শুক্লা-দ্বিতীয়াতে শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী অপ্রকট হন।

—০—

শ্রীশ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত

গঙ্গাদাসপণ্ডিত চরণে নমস্কার।
বেদপতি সরস্বতীপতি—শিষ্য যাঁর।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১।২৮৩)

শ্রীগৌরসুন্দরের যজ্ঞোপবীত হয়ে গেল। কিছু দিন গৃহে অধ্যয়ন করলেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবার শিশুর বিশেষ আগ্রহ দেখে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে দেওয়ার জন্য শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীনিমাইকে সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিতের বাটীতে এলেন।

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত দ্বাপরে শ্রীসান্দীপনি মুনি ছিলেন। তাঁর কাছে শ্রীরাম ও কৃষ্ণ বিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন।

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে দেখে সম্ভ্রমে উঠে আলিঙ্গন করলেন এবং অতি আদরে আসনে বসালেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বললেন— এই পুত্র আপনাকে দিলাম। এঁকে আপনি লেখা পড়া শিখাবেন।

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত বললেন— অনেক বড় সৌভাগ্য ছাড়া এইরূপ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত বালককে পড়ান যায় না। আমার যত শক্তি আছে তদনুসারে এঁকে পড়াব। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বালককে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের করে সমর্পণ করে ঘরে ফিরে এলেন।

শিষ্য দেখি, পরম-আনন্দে গঙ্গাদাস।
পুত্রপ্রায় করিয়া রাখিলা নিজ-পাশ।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ৮।৩২)

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত দিব্য বালকের অতিমর্ত্ত্য স্বভাবে বুঝতে পারলেন এ-শিশু অসাধারণ। ব্রাহ্মণ পুত্রের ন্যায় আদর করে শিষ্যকে অধ্যয়ন করাতে লাগলেন। অলৌকিক মেধাবিশিষ্ট বালক শ্রীনিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট একবার যে সূত্র শুনতেন তা কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। টোলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই শীর্ষস্থান অধিকার করলেন।

এই সময় দিব্য বালকের অসাধারণ মেধা এইরূপ প্রকাশিত হয়েছিল যে উপাধ্যায় গঙ্গাদাসের ব্যাখ্যার উপরেও স্বয়ং সুন্দর ব্যাখ্যা সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন। টোলে শত শত শিষ্য তাঁর সঙ্গে কক্ষা করে কেহই পারতেন না। ঈশ্বর যখন যে লীলা করেন তাই সর্ব্বোত্তম। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত দিব্য বালকের অদ্ভুত বুদ্ধি দেখে শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ করে দেখতেন।

শ্রীগঙ্গাদাসের শিষ্যগণ মধ্যে শ্রীকমলাকান্ত, মুরারি গুপ্ত ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ছাত্র শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের শ্রীগৌরসুন্দর নানাবিধ ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে গিয়ে তিনি পড়ুয়াদিগের সঙ্গে নানা তর্ক-বিতর্ক করতেন।

সূত্র ব্যাখ্যা কালে শ্রীগৌরসুন্দর যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন তা পুনরায় খণ্ডন করতেন। খণ্ডিত সিদ্ধান্ত আবার সুন্দরভাবে স্থাপন করতেন। তাঁর এ ধরণের প্রতিভা দেখে পড়ুয়াদের বিস্ময় উৎপাদিত হত। শ্রীগঙ্গাদাস অতিশয় আনন্দ লাভ করতেন।

শ্রীনিমাই কিছু দিন শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ন্যায় ও অলঙ্কার আদি অভ্যাস করে গুরুদেবের আদেশ নিয়ে স্বয়ং এক ন্যায় বিদ্যালয় আরম্ভ করলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের এই বিদ্যাপীঠ হল মুকুন্দ-সঞ্জয়ের দুর্গাপূজার বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। অতি অল্প বয়সে ন্যায় শাস্ত্রে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি দেখে সকলে, এমনকি গঙ্গাদাস পণ্ডিত পর্য্যন্ত বিস্মিত হতেন।

হেনমতে শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়-মন্দিরে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠ নায়ক বিহরে।।

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৫।৩২)

কিছুদিন এইরূপ বিদ্যাবিলাস করে জননী শচীকে খুব সুখী করলেন। অনন্তর শ্রীগয়া ধামে গমন করলেন। সেখানে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরীর থেকে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দীক্ষা গ্রহণ করবার পর শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রেমভক্তি প্রকাশ আরম্ভ করলেন। শ্রীগয়াধামে আবশ্যকীয় কর্ম্মাদি করে গৃহে ফিরে এলেন। এবার কৃষ্ণ বর্ণন ভিন্ন কিছু বলেন না, জানেনও না। শিষ্যগণের অনুরোধে যদিও পাঠশালায় পড়াতে বসতেন প্রতি সুত্রের কেবল কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করতেন। অগত্যা শিষ্যগণ গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সে সময়ের অবস্থা বর্ণন করলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত সমস্ত কথা শুনলেন। অপরাহ্নকালে শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতকে বন্দনা করতে এলেন, তখন তিনি স্নেহে আশীর্ব্বাদ করে বলতে লাগলেন—

গুরু বলে, —"বাপ বিশ্বম্ভর। শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য"।।

— (শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১।২৭২)

তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র উভয় কুলে কেউ মুর্খ নাই। ন্যায় শাস্ত্রাদির বাখ্যায় তুমিও পরম যোগ্য। অধ্যাপনা ছাড়লে যদি ভক্তি হয়, তোমার বাপ পিতামহ কি অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলেন? তাঁরা কি ভক্ত ছিলেন না? এ সব চিন্তা করে তুমি অধ্যয়ন কর। অধ্যয়ন করলে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ হবে। ব্রাহ্মণ যদি মূর্খ হয় তবে ভাল মন্দ কেমনে বিচার করবে? এ সব চিন্তা করে তুমি অধ্যয়ন কর এবং ছাত্রদের ভালমত পড়াও। আমি দিব্য করে বলছি তুমি যেন এ বাক্যের অন্যথা কর না।

মহাপ্রভু গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের এ সব কথা শুনে বললেন— আপনার শ্রীচরণ-প্রসাদে নবদ্বীপে এমন কেহ নাই যিনি আমার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠেন। আমি যে সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করব, দেখি নবদ্বীপে কোন্ বড় পণ্ডিত আছেন তা খণ্ডন করতে পারেন? আমি এখনই নগরে গিয়ে পড়াতে আরম্ভ করব। শ্রীগৌরসুন্দরের এই সমস্ত কথা শুনে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত সুখী হলেন। মহাপ্রভু গুরুর চরণ ধূলি নিয়ে পড়াতে চললেন—

আর কিবা গঙ্গাদাসপণ্ডিতের সাধ্য?
যাঁ'র শিষ্য—চতুর্দ্দশ-ভুবন আরাধ্য।।

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১।২৮৪)

শ্রীশ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর

সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম।।

— (চৈঃ চঃ আঃ— ১১।২৩)

শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

"পুরা সুদাম—নামাসীদ্ অদ্য ঠক্কুর সুন্দরঃ।"

— (গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা)

পূর্ব্বে ব্রজে যিনি সুদাম নামক গোপাল ছিলেন অধুনা তিনি সুন্দরানন্দ ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

"ইঁহার শ্রীপাট— মহেশপুর গ্রাম—ই, বি, আর, লাইনে মাজদিয়া ষ্টেশন থেকে ১৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে;অধুনা যশোহর জেলায় অবস্থিত। এ স্থানটিতে প্রাচীন স্মৃতি চিহ্ন একমাত্র সুন্দরানন্দের জন্ম ভিটা ভিন্ন আর কিছু নাই।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর বিবাহ করেন নাই। এজন্য তাঁর বংশ নাই। জ্ঞাতি ভ্রাতাদের এবং সেবায়েত শিষ্য বংশ বর্ত্তমানে আছেন।"

— (চৈঃ চঃ আদি ১১ পরিঃ ২৩ শ্লোক অনুভাষ্য)

প্রেমরস-সমুদ্র-সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদ প্রধান।।

— (চৈঃ ভাঃ অঃ—৫।৭২৮)

কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর অপ্রকট লীলা করেন।

— — ঃঃ * ঃঃ — —

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জননীর নাম— শ্রীনারায়ণী দেবী! শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃদুহিতা। শ্রীবাস পরবর্ত্তী কালে কুমারহট্টে গিয়ে বাস করেছিলেন। শ্রীবাস, শ্রীপতি, শ্রীরাম ও শ্রীনিধি এঁরা চারি ভাই। শ্রীবাসের একটি পুত্র ছিল, অল্পবয়সে তার পরলোক প্রাপ্তি হয়। এঁরা পূর্ব্বে শ্রীহট্টে বাস করতেন। গঙ্গাতীর্থে ভক্তসঙ্গে বাস কামনা করে নবদ্বীপে এলেন।

শ্রীমহাপ্রভু যখন শ্রীবাস অঙ্গনে মহাভাব প্রকাশ করে ভক্তগণকে আত্ম-স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন তখন নারায়ণী দেবী ছিলেন চার বছরের বালিকা।

"সর্বভূত-অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-চান্দ।
আজ্ঞা কৈলা, 'নারায়ণী'! 'কৃষ্ণ' বলি কান্দ।।
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দে, নাহিক সম্বিত।।
অঙ্গ বহি' পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ—২।৩২৩-৩২৫)

শ্রীনারায়ণী দেবীর পুত্র শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীনারায়ণী দেবী কিরূপ গৌরসুন্দরের স্নেহ পাত্রী ছিলেন তা লিখেছেন—

"ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল।।

শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান।।"
—(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২৯০-২৯১)

মহাপ্রভুর এই কৃপাপ্রসাদ প্রভাবে ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেছেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ হলেন তাঁর প্রাণ।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর স্বীয় পিতৃ-পরিচয় কোন স্থানে দেন নাই, সর্ব্বত্রই জননীর পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ভূমিকায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখেছেন— "তিনি শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয়ে পতিগৃহ লাভ করিয়া শ্রীল বৃন্দাবন দাসের পৌগণ্ড কাল পর্য্যন্ত পুত্র রত্নের লালন-পালনাদি করিয়াছিলেন।"

অনেক তথ্য অনুসন্ধান করে জানা যায় মামগাছির নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে শ্রীনারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। গর্ভ অবস্থায় তিনি বিধবা হন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে অভাব অনটনে পড়ায় শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের বাড়ীতে তিনি কামদারী স্বীকার করেন। এখানেই শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয় এবং তথায় তিনি অধ্যয়নাদি করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস গ্রহণের চার বৎসর পরে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। যখন মহাপ্রভু অপ্রকট লীলা করেন, তখন শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বয়স বিশ বছরের অধিক নয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে তিনি দীক্ষাদি গ্রহণ করেন। তিনি নিত্যানন্দের শেষ ভৃত্য। "সর্ব্বশেষ, ভৃত্য শ্রীবৃন্দাবন দাস"। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীজাহ্নবা মাতার সঙ্গে খেতরি গ্রামে মহোৎসবে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন দাসের মহিমা বিশেষ ভাবে কীর্ত্তন করেছেন।

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন দাস।।
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।।
চৈতন্য নিতাইয়ের যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা।।
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহা জানি' করিয়া উদ্ধার।।
'চৈতন্যমঙ্গল' শুনে যদি পাষণ্ডী, যান।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ।।
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।।
বৃন্দাবনদাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহ তারিলা সংসার।।

—(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

— ঃঃ * ঃঃ —

শ্রীপরমানন্দ সেন

(কবিকর্ণপুর গোস্বামী)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীমদ্ শিবানন্দ সেন। তাঁর তিন পুত্র—শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীরামদাস ও শ্রীপরমানন্দ (কবিকর্ণপুর)। এই কবিকর্ণপুরের দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীনাথ পণ্ডিত। ইনি ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য। ইনি কুমারহট্ট থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে কাঁচড়া পাড়ায় থাকতেন। শ্রীনাথ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ (শ্রীকৃষ্ণরায়) অদ্যাপি তথায় বিরাজমান। শ্রীআনন্দ-বৃন্দাবন চম্পুর প্রারম্ভে শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীনাথ পণ্ডিতকে বন্দনা করেছেন।

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকাতে নিজ জনকের পরিচয় দিয়েছেন—"পুরাকালে যিনি বীরানামক গোপিকা (দূতী) ছিলেন তিনিই শিবানন্দ সেন নামে আমার পিতা। প্রতি বৎসর ঈশ্বর-দর্শনের জন্য গৌড়দেশ থেকে ভক্তগণকে নিয়ে নীলাচলে যেতেন। শ্রীশিবানন্দ সেন কুমারহট্টে বা হালিশহরে বাস করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহ হালিশহর থেকে দেড় মাইল দূরে কাঁচড়া পাড়ায় অধুনা বিরাজমান।

চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর।।
—(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১০।৬২)

পূর্ব্বে যখন শ্রীশিবানন্দ সেন সপত্নীক পুরীতে মহাপ্রভুর নিকটে এলেন

তখন মহাপ্রভু তাঁদের আশীর্ব্বাদ করে বলেন— এবার তোমাদের যে পুত্র হবে তার নাম রাখবে 'পুরীদাস'। মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ নিয়ে শ্রীশিবানন্দ সেন ঘরে ফিরে গেলেন। মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদে সে বছরই শ্রীশিবানন্দের এক পুত্র হল। পুত্র অতি অপরূপ। নাম রাখা হল 'পরমানন্দ দাস'। পুত্রের জন্মের কয়েক মাস পরে শিবানন্দ সেন সপত্নী পুরীধামে যাত্রা আরম্ভ করলেন, সঙ্গে শিশুও ছিল। মাসাধিক কাল পদব্রজে চলবার পর শ্রীপুরীধামে এলেন। শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্ম-দর্শনে পথশ্রম জনিত সমস্ত দুঃখ দূর হল। মহাপ্রভু স্বয়ং ভক্তগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। সকলের মহাপ্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থাও করলেন। শ্রীশিবানন্দ সেন একদিন তিন পুত্র নিয়ে দণ্ডবৎ করতেই মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন— শেষ পুত্রের নাম কি রেখেছেন? শ্রীশিবানন্দ বললেন 'পরমানন্দ দাস'।

মহাপ্রভু হাস্য করে বললেন —ওর নাম "পুরীদাস"। মহাপ্রভু বালকটীর দিকে তাকিয়ে হাস্য করলে জননী তাঁকে মহাপ্রভুর সম্মুখে রাখলেন। শিশু শ্রীগৌরসুন্দরের অরুণ বর্ণ পাদপদ্মের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ঐ শ্রীচরণ চুষতে চাইলেন। মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ বালকের মুখে পুরে দিলেন। বালক আনন্দের সহিত তা চুষতে লাগলেন। শ্রীশিবানন্দের পুত্র প্রতি প্রভুর অহৈতুকী কৃপা দেখে ভক্তগণ আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। এই পুত্র ভবিষ্যৎ-কালে মহাকবি হবে ভক্তগণের অনেকে এ-কথাও বললেন।

শ্রীশিবানন্দ সেনের সৌভাগ্যের কথা কে বলতে পারে?

মহাপ্রভুর আদেশ ছিল, যতদিন শ্রীশিবানন্দ সেন ও তাঁর পরিবারবর্গ পুরীধামে থাকবেন, ততদিন প্রভুর অবশেষ পাত্র তাঁরাই পাবেন।

"শিবানন্দের 'প্রকৃতি' পুত্র যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায়।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্তঃ ১২।৫৩)

শ্রীশিবানন্দ সেন রথযাত্রা দর্শন করে মহাপ্রভুর অনুজ্ঞা নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন।

পরের বছর রথযাত্রা কালে শ্রীশিবানন্দ সেন সমস্ত গৌড়ীয় ভক্ত সঙ্গে নিয়ে পুরীধামে আবার এলেন। সকলের থাকার ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু যথাযথভাবে করে দিলেন। সে-বার শ্রীশিবানন্দ কেবল ছোট পুত্র পুরী দাসকে নিয়ে এসেছিলেন। পুত্রটিকে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নমস্কার করালেন। বালকটি মহাপ্রভুকে নমস্কার করলে, তিনি শিরে হাত দিয়ে তাঁকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে বললেন। বালক কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলল না। পুনঃ প্রভু তাঁকে বললেন— 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল। বলল না। শ্রীশিবানন্দ সেনও বললেন 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বল, তবু বলল না। উপস্থিত ভক্তবৃন্দও বললেন 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বল, বালক কিছুতেই কৃষ্ণ বলল না। তখন মহাপ্রভু বললেন— আমি বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি কত জীবকে কৃষ্ণ নাম বলিয়েছি, কিন্তু একে বলাতে পারলাম না। তখন শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু বললেন— তুমি একে কৃষ্ণ-মন্ত্র দিয়েছ, এ মন্ত্র সে কারো কাছে প্রকাশ করবে না। মনে মনে জপ করে অনুমানে আমি বুঝলাম।

একদিন শ্রীশিবানন্দ বালককে নিয়ে নিজ বাসা-ঘরে চলে এলেন। সকলে বালককে বলতে লাগলেন, মহাপ্রভু তোমায় কৃষ্ণ বলতে বললেন তুমি বললে না কেন? বালক কোন উত্তর দিল না চুপ করে রইল।

আর একদিন শ্রীশিবানন্দ সেন বালককে নিয়ে মহাপ্রভুর কাছে গেলেন। বালক মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলে মহাপ্রভু তাঁকে বললেন পুরীদাস। কিছু পড় শুনি। তখন পুরীদাস পড়তে লাগল—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবন রমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি।।

— (শ্রীচৈঃ চঃ অন্তঃ ১৬।৭৪)

যিনি শ্রবণ-যুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্র মণি-দাম, বৃন্দাবন রমণীদিগের অখিল ভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হচ্ছেন।

সাত বৎসরের শিশু, নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে,—লোকের চমৎকার মন।।
(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৬।৭৫)

এই শ্রীকৃষ্ণ-বর্ণনাত্মক শ্লোক সাত বছরের বালকের মুখে শুনে ভক্তগণ বিস্মিত হলেন। তাঁরা বললেন—শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা শিশুর প্রতি নিশ্চয়ই হয়েছে। শ্লোক শুনে মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হলেন। বালককে আলিঙ্গন করে আশীর্ব্বাদ করলেন।

"সদা শ্রীকৃষ্ণলীলা তোমার স্ফুর্ত্তি হউক।।"

শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু বললেন— এই শ্লোকটি যেমন ভক্তের কর্ণপুর-স্বরূপ, শিশুর এক নাম হবে কর্ণপুর। তাই পরে তিনি 'শ্রীকবি কর্ণপুর' নামে খ্যাত হলেন।

প্রায় দুই শত ভক্তের যাবতীয় খরচ বহন করে এক মাস পদব্রজে চলে চলে শ্রীশিবানন্দ সেন প্রতি বছর পুরীধামে আসতেন। তাঁর ধন, জন সব ভক্তসেবা ও প্রভু সেবার জন্য ছিল। শ্রীসেন মহাশয়ের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কখন কখন এসে অবস্থান করতেন। মহাপ্রভু যখন গৌড় দেশে আসতেন তখন তিনি তাঁর গৃহে শুভ পদার্পণ করতেন।

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী রচিত গ্রন্থাবলী—

(১) শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, (২) শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পু, (৩) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য, (৪) শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, (৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা, (৬) শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী, (৭) অলঙ্কার কৌস্তুভ ও (৮) আর্য্য শতক।

— ০ —

শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর

শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা-প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-গোসাঞি।।
—(চৈঃ চঃ আদি ১০।৪০)

শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর প্রভুর সহপাঠী মিত্র ছিলেন। চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত ছন্‌হরা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ।
মুকুন্দ বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ।।

পূর্ব্বে ব্রজে যাঁরা মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামক গায়ক ছিলেন, তাঁরা মুকুন্দ ও বাসুদেব নামে দত্তকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে শ্রীগৌরাঙ্গের গায়ক হয়েছেন। শ্রীবাসুদেব ও মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের কীর্ত্তনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ স্বয়ং নৃত্য করতেন। মুকুন্দ মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রভু ও মুকুন্দ সমবয়স্ক ছিলেন। একসঙ্গে পাঠশালায় অধ্যয়ন করতেন এবং বিবিধ ক্রীড়াদি করতেন। শ্রীমুকুন্দ শিশুকাল থেকে একান্ত কৃষ্ণ-নিষ্ঠ ছিলেন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোন গীত পছন্দ করতেন না। ইতর কথা বলতেও বেশী পছন্দ করতেন না। প্রভু মুকুন্দের সঙ্গে কৌতুক করবার জন্য তাঁকে দেখলেই দু'হাতে ধরতেন এবং বলতেন—আমার ন্যায়ের সূত্রের জবাব না দিয়ে যেতে পারবে না। মুকুন্দও ন্যায় পড়তেন। প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে কেবল বাদানুবাদ করতেন,

মুকুন্দের তা পছন্দ হত না। মুকুন্দ সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, অলঙ্কার জিজ্ঞাসা করে প্রভুকে পরাভূত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না। মুকুন্দ বৃথা বাদানুবাদের ভয়ে প্রভুকে দেখলে অন্য পথ দিয়ে যেতেন। প্রভু তা, বুঝতে পারতেন— "আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন। অতএব আমা দেখি করে পলায়ন।।" (চৈতন্য ভাগবত আদি লীলা এগার অধ্যায়) বেটা পালিয়ে যা, দেখি কতদিন থাক্তে পারিস? দেখব আমার পথ কেমনে এড়াস? আমি এমন বৈষ্ণব হব আমার দ্বারে সকলকেই আসতে হবে।

আর একদিন প্রভুর মুকুন্দের সঙ্গে দেখা হল। প্রভু তাঁর দুখানি হাত ধরে বললেন— আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না। মুকুন্দ বড় মুস্কিলে পড়ে বললেন ব্যাকরণ শিশুরা পড়ে। তোমার সঙ্গে অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা করব। প্রভু বললেন — তুমি জিজ্ঞাসা কর। আমি সমস্ত কথার জবাব দিব। মুকুন্দ প্রভুকে পরাভূত করবার জন্য অলঙ্কারের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু তার ঠিক ঠিক জবাব দিতে লাগলেন। কখনও সেই অলঙ্কার তিনি খণ্ডন করতে লাগলেন, কখনও তা পুনঃ স্থাপন করতে লাগলেন। প্রভু মুকুন্দকে তাঁর সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও স্থাপন করতে বললেন, মুকুন্দ তা খণ্ডন ও স্থাপন করতে পারলেন না। মুকুন্দ চিন্তা করতে লাগলেন কেমনে এঁর হাত থেকে নিস্তার পাব। অন্তর্য্যামী প্রভু ত' বুঝতে পেরে বললেন — মুকুন্দ! আজ ঘরে যাও, কাল আবার বিচার হবে। মুকুন্দ নিস্তার পেয়ে বললেন আচ্ছা তাই হউক। কাল আবার বিচার হবে। এ বলে মুকুন্দ দত্ত প্রভুর শ্রীচরণ ধূলি নিয়ে চললেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন।

মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা।।

এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে।।
—(চৈঃ ভাঃ আদি ১২।১৮-১৯)

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য বুদ্ধি হতে পারে না। এমন বুদ্ধিমান্ পুরুষ যদি কৃষ্ণ-ভক্ত হয়, তবে তিলার্দ্ধ কালও এঁর সঙ্গ ত্যাগ করব না।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ মুকুন্দের কীর্ত্তন শুনতে বড় ভালবাসতেন। শ্রীমুকুন্দ অদ্বৈত সভায় প্রতিদিন যেতেন এবং কীর্ত্তন করতেন। মুকুন্দের ভক্তি রসময় কীর্ত্তন শুনে বৈষ্ণবগণ প্রেমে গড়াগড়ি দিতেন। অদ্বৈত আচার্য্য মুকুন্দকে ক্রোড়ে নিয়ে প্রেমাশ্রুসিক্ত করতেন। শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ যখন নবদ্বীপে আগমন করেন শ্রীমুকুন্দ দত্তের গান শুনে তিনিও অতিশয় প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তখনই সকলে চিনতে পারলেন, ইনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরী।

মহাপ্রভু প্রথমে গয়াধামে প্রেম প্রকাশ আরম্ভ করেন। গৃহে ফিরে এলেন এবার নূতন ভাব নিয়ে— নিরন্তর কৃষ্ণাবেশ। ব্যাকরণ বা ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যাকরণের সমস্ত সূত্রে বা ধাতুতে কেবল কৃষ্ণ-নাম। বৈষ্ণবগণ তা' শুনে প্রভুকে দেখতে এলেন। প্রভু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে কেঁদে তাঁদের গলা জড়িয়ে ধরলেন। সকলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন প্রভুর দিকে, কিন্তু প্রভুর নয়নে কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রুধারা দেখে তাঁরাও 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। সন্ধ্যায় প্রভু নিজ গৃহে কীর্ত্তন সমারোহ করলেন। সমস্ত বৈষ্ণব এলেন। প্রথমে শ্রীমুকুন্দ দত্ত ধরলেন কীর্ত্তন। শ্রীগৌরসুন্দর শুনেই প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। আর ভক্তগণের যে প্রেমাবস্থা হল তা' কে বর্ণন করতে পারে? কিছু রাত্র এইরূপ কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কেটে গেল।

অতঃপর প্রভু মুকুন্দের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন— "মুকুন্দ। তুমি ধন্য, আমি মিথ্যা বিদ্যারসে সময় অতিবাহিত করেছি। কৃষ্ণ না পেয়ে আমার জন্ম বৃথা গেল।"

একদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীমুকুন্দ দত্ত বললেন— বৈষ্ণব দর্শন করবে? গদাধর পণ্ডিত বললেন হাঁ বৈষ্ণব দর্শন করব। মুকুন্দ বললেন— তবে আমার সঙ্গে এস। তোমাকে অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাব। গদাধর পণ্ডিত চললেন বৈষ্ণব দর্শন করতে। মুকুন্দ তাঁকে নিয়ে এলেন শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সন্নিধানে। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও মুকুন্দ এক স্থানে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। মুকুন্দ বললেন— গদাধর এঁর মত বৈষ্ণব পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। শ্রীগদাধর দেখলেন— শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর বসে তাম্বুল চর্ব্বণ করছেন। ভৃত্যগণ চামর পাখা ব্যজন করছে। যেন রাজকুমার বিজয় করছেন। গদাধর পণ্ডিত দেখে অবাক, কেমনতর বৈষ্ণব? মহা বিলাসীদের ন্যায় অবস্থান করছেন? শ্রীগদাধর পণ্ডিত আজন্ম বৈরাগ্যশীল। মুকুন্দ গদাধরের ভাব গতিক বুঝতে পারলেন— তখন তিনি ভাগবতের একটি শ্লোক গীতাকারে মধুর রাগিনী যোগে গান আরম্ভ করলেন। মুকুন্দের সে মধুর গীত শ্রবণ করেই শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেমাবিষ্ট হয়ে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন, বিদ্যানিধির অঙ্গে যুগপৎ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হল। কখন উচ্চ রোদন করতে লাগলেন, কখন ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তখন কোথায় সে দিব্য শয্যা? কোথায় দিব্য বেশ? সমগ্র শরীর ধূলিময় হল। শ্রীগদাধর পণ্ডিত নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হলেন। বিস্ফারিত নেত্রে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়িয়ে কেবল দেখতে লাগলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত মনে মনে বলতে লাগলেন— মুকুন্দ ত ঠিকই বলেছিল ; এমন বৈষ্ণব ত পূর্ব্বে কোনদিন দেখি নাই, কিম্বা এমন বৈষ্ণবের

কথা কারও মুখে শুনি নাই। আমি কি শুভক্ষণে এঁকে দেখতে এসেছি। এঁকে দেখবার আগে এঁর সম্বন্ধে অন্য রকম মনে করে অপরাধ করেছি। মুকুন্দ! তুমি বন্ধুর কার্য্য করেছ। এমন বৈষ্ণব ত্রিলোকে আছে ত' জানতাম না। এঁর দর্শনে আমিও পবিত্র হলাম। আমি তাঁকে বিষয়ীর পরিচ্ছদে দেখে বিষয়ী বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু তুমি মহাপরাধ থেকে আমাকে রক্ষা করলে। আমার অপরাধ হয়েছে, আমি যাতে তাঁর চরণ আশ্রয় করে সে অপরাধ থেকে মুক্তি পাই তুমি তার ব্যবস্থা কর।

শ্রীবাস-অঙ্গন কীর্ত্তন-পাঠ; শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের যাবতীয় বিলাস, নৃত্য, কীর্ত্তন—শ্রীমুকুন্দ দত্ত তথাকার প্রসিদ্ধ গায়ক। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর সাত প্রহর কাল পর্য্যন্ত মহাভাব প্রকাশ করলেন। এ দিন ভক্তগণকে ডেকে ডেকে তাঁর পূর্ব্ব বিবরণ বলে তাঁদের কৃপা করতে লাগলেন। এরূপে ভক্তগণ মহাপ্রভুর কৃপা পাচ্ছেন ও অভীষ্ট বর গ্রহণ করছেন। প্রায় সমস্ত ভক্তকে ডাকলেন, কিন্তু মুকুন্দকে ডাকেন না। মুকুন্দ গৃহের বাইরে বসে প্রভুর ডাকের অপেক্ষা করছেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ দেখলেন প্রভু মুকুন্দকে ডাকছেন না তাঁর অভীষ্ট বর দিচ্ছেন না। মুকুন্দ প্রভুর কৃপা পাবার জন্য অস্থির চিত্তে অবস্থান করছেন। শ্রীবাসের হৃদয় তাঁর জন্য আকুল, তিনি সইতে না পেরে কাছে গিয়ে জানালেন— তুমি দীন-হীন সকলকে কৃপা করছ। মুকুন্দকে ডাকছ না কেন? অভীষ্ট বর দিচ্ছ না কেন?

প্রভু বললেন— ও বেটার কথা আমায় বল না।

শ্রীবাস— ও কি অপরাধ করেছে?

শ্রীগৌরসুন্দর— ও বেটা খড় জাঠিয়া – আমার কৃপা পাবে না। কখনও দন্তে তৃণ ধারণ করে, কখনও বা জাঠি মারে।

শ্রীবাস— প্রভো! সে কি অন্যায় করেছে তা বুঝতে পারলাম না।

শ্রীগৌরসুন্দর— ও যখন নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীর সভায় যায় তখন তাদের সমর্থন করে। আবার যখন ভক্ত সমাজে যায় তখন প্রেম দেখিয়ে কেঁদে গড়াগড়ি দেয়। যারা আমার স্বরূপ অবজ্ঞা করে তারা আমাকে জাঠি মারে। যারা আমার স্বরূপের প্রতি ভক্তি দেখায় তারা আমাকে সুখী করে। দন্তে তৃণ ধরে কাঁদে। যারা কখনও নিন্দা করে, কখনও স্তুতি করে, তারা 'খড় জাঠিয়া' আমার কৃপা পায় না।

শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর এ কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, বললেন— এ শরীর আর রাখব না। অপরাধী শরীর ধারণ করে কি হবে? শ্রীবাস পণ্ডিত আবার প্রভুর কাছে এলেন এবং মুকুন্দের দুঃখের কথা জানালেন। প্রভু বললেন — মুকুন্দ কোটি জন্মের পর দর্শন ও কৃপা পাবে। কোটি জন্ম পরে প্রভুর দর্শন কৃপা পাবেন। মুকুন্দ শুনে আনন্দে নৃত্য করে গাইতে লাগলেন— "কোটি জন্ম পরে হে, কোটি জন্ম পরে হে, দরশন হবে রে, দরশন হবে রে।।" অঙ্গনে নৃত্য করতে করতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভক্তের প্রেমে চঞ্চল হয়ে উঠলেন, শ্রীবাসকে বললেন—মুকুন্দকে শীঘ্রই আমার কাছে নিয়ে এস, ওর কোটি জন্ম হয়ে গেছে, দর্শন করুক। শ্রীবাস বললেন— মুকুন্দ! তুমি স্থির হও, প্রভু তোমাকে ডাকছেন ; মুকুন্দ প্রেমে আত্মহারা, কেবল বলছেন— দরশন পাব হে, কোটি জন্মে দরশন হবে রে। দু'নয়ন জলে বক্ষস্থল সিক্ত হচ্ছে। শ্রীবাস পণ্ডিত দেখলেন মুকুন্দ প্রেমে আত্মহারা! তাঁর বাহ্য স্মৃতি নাই। অঙ্গে হস্ত দিয়ে তাই ডাকতে লাগলেন—মুকুন্দ! মুকুন্দ! স্থির হও—স্থির হও, প্রভু তোমাকে ডাকছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের স্পর্শে এবার মুকুন্দের চৈতন্য ফিরে এল। বললেন—পণ্ডিত! কি বলছেন? 'প্রভু তোমাকে ডাকছেন।' আমি পাপ দেহ নিয়ে প্রভুর কাছে যাব না, কেঁদে কেঁদে কোটি জন্ম কাটাব। অন্তর্য্যামী প্রভু সব বুঝতে পারলেন। তখন স্বয়ং ডাকতে লাগলেন মুকুন্দ! মুকুন্দ! এস—এস—

আমার দিব্যরূপ দেখ। শ্রীবাস পণ্ডিত মুকুন্দকে ধরে প্রভুর শ্রীচরণে নিয়ে এলেন। মুকুন্দ অশ্রু-নীরে ভাসতে ভাসতে, "হে প্রভো, আমি মহাপরাধী" বলে ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন এবং গড়াগড়ি দিয়ে বলতে লাগলেন—

ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে।।
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ।।
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ, ভক্তি-শূন্যের কারণ।।

—(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০।২১৫-২১৭)

এ সব কথা বলে মুকুন্দ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। তখন প্রভু তাঁকে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন— মুকুন্দ! কোটি জন্ম পরে তুমি আমার দর্শন পাবে বলেছিলাম, কিন্তু তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, অকপট শ্রদ্ধা হেতু কোটি জন্ম তিলার্দ্ধেকের মধ্যেই কেটে গেছে। তুমি আমার নিত্য প্রিয়পাত্র। তোমার কোন অপরাধ নাই। জগতকে শিক্ষা দিবার জন্য এ লীলা করেছি। বস্তুতঃ তোমার শরীর ভক্তিময়। তুমি আমার নিত্য দাস, তোমার জিহ্বায় আমার নিত্য বসতি।

"আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এই মত হউ তোরে সকল মহান্ত।।
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার।।"

—(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০।২৫৯-২৬০)

শ্রীমুকুন্দের প্রতি প্রভু যখন এ-বর দিলেন তখন বৈষ্ণবগণ মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সময় মুকুন্দ কীর্ত্তন করেন।

"করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন।।
'বোল' 'বোল' বলি' প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য।।
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১।৮-৯)।

মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করতেন তখনও শ্রীমুকুন্দ দত্ত তাঁর সঙ্গে থাকতেন এবং তাঁকে কীর্ত্তন শুনাতেন। রথ যাত্রাকালে বাসুদেব দত্ত, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমুরারি ও শ্রীমুকুন্দ প্রমুখ ভক্তদের এক কীর্ত্তন দল গঠিত হত। মুকুন্দ ও কাশীশ্বর পণ্ডিত দু'জন মহা শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। রথ যাত্রা কালে লোকের ভিড় ঠেলে মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের ব্যবস্থা করে দিতেন।

জ্যৈষ্ঠী-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব হয়।

— *✱* —

কবি - শ্রীজয়দেব

বঙ্গদেশাধিপতি শ্রীলক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন শ্রীজয়দেব। পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী। বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব নামক গ্রামে একাদশ শতাব্দীতে শ্রীজয়দেব জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীজয়দেবের পত্নীর নাম শ্রীপদ্মাবতী। শ্রীলক্ষ্মণ সেন রাজার যখন সভাপণ্ডিত ছিলেন তখন তিনি নবদ্বীপে গঙ্গাতটে বাস করতেন। শ্রীলক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত শ্রীজয়দেব ছাড়া আরও তিন জন ছিলেন। শ্রীজয়দেব শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন—শ্রীউমাপতিধর, আচার্য্য শ্রীগোবর্দ্ধন ও কবি-ক্ষ্মাপতি। এঁরা-সকলেই মহাকবি শ্রীজয়দেবের মিত্র।

মহাপ্রভুর প্রায় তিন শত বছর পূর্ব্বে শ্রীজয়দেব বঙ্গদেশ সমলঙ্কৃত করেন। তিনি শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থ রচনা করেন—

চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে
গায় শোনে—পরম আনন্দ।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২।৭৭)

শ্রীজয়দেবেকৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃত কমনীয়ম্।।

এই গীত-গোবিন্দ গ্রন্থ শ্রীরাধা গোবিন্দের শৃঙ্গার-রসময়ী গ্রন্থ; ইহা একমাত্র সুকৃতিশালী জনের সেব্য।

যদি হরি স্মরণে সরসং মনো যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং শৃনু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।।

যাঁদের মন শ্রীহরির লীলা-স্মরণে সরস, শ্রীহরির দিব্য লীলাবলী শ্রবণের জন্য ব্যাকুল তাঁরা শ্রীজয়দেব সরস্বতী লিখিত এ মধুর পদাবলী শ্রবণ করুন।

কবি শ্রীজয়দেবের চরিত সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে। তা কতটা সত্য সুধীগণ বলতে পারেন। এস্থলে একটী কিংবদন্তী উল্লেখ করছি— তিনি শ্রীগীত-গোবিন্দে কলহান্তরিতা নায়িকার কথা লিখতে গিয়ে অনেক কথা চিন্তা করতে থাকেন। পরে ভেবে লিখবেন ঠিক করে দ্বিপ্রহরে গঙ্গায় স্নান করতে যান। ঠিক এ সময় শ্রীহরি কবি শ্রীজয়দেবের বেশ নিয়ে সে-পদ যথাস্থানে লিখে অন্তর্হিত হলেন। শ্রীজয়দেব এ-সময় গঙ্গা স্নান করে ফিরে এলেন। শ্রীপদ্মাবতী দেবী একটু আশ্চর্য্য হলেন। শ্রীজয়দেব তাঁর পুঁথি খুলে দেখলেন, যে-কথা তিনি ভাবতে ভাবতে স্নানে গিয়েছিলেন, ঠিক সে কথা স্বর্ণাক্ষরে কে তথায় লিখে রেখেছে। পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, —তিনি বললেন একটু আগেই ত' আপনি নিজে এসে লিখে গেলেন। শ্রীজয়দেব শুনে অবাক। তাঁর নয়ন দিয়ে প্রেমাশ্রু ঝরতে লাগল, তিনি রহস্য বুঝতে পারলেন। প্রেমে গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন— পদ্মাবতী! তুমি ধন্যা। শ্রীহরির লিখিত পদ— "দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় লিখেছেন—যদিও শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-দেবের বাহ্য-প্রকাশ তখনও হয় নাই, তথাপি কবি শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীচণ্ডীদাস ও শ্রীবিদ্যাপতি প্রভৃতি শুদ্ধ ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর ভাব উদিত হয়েছিল।

কবি শ্রীজয়দেবের গীত-গোবিন্দ গ্রন্থ ছাড়াও 'চন্দ্রলোক' নামে আর একখানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

শ্রীগীতগোবিন্দ — দশাবতার গীত

[মালব গৌড় রাগ, রূপক তাল]

প্রলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে।।১।।
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণীধরণকিণ-চক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে।।২।।
বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি-কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে।।৩।।
তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং
দলিত-হিরণ্যকশিপুতনু ভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।।৪।।
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত-বামন
পদনখনীর-জনিত-জন-পাবন।
কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে।।৫।।
ক্ষত্রিয়-রুধির ময়ে-জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।।৬।।
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি-কমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে।।৭।।
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং

হলহতি-ভীতি-মিলিত যমুনাভম্।
কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে।।৮।।
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।।৯।।
ম্লেচ্ছনিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।।১০।।
শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃত দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে।।১১।।

—o—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্‌বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।

পৌষ সংক্রান্তিতে তিনি অপ্রকট হন। অদ্যাপি কেন্দুবিল্ব গ্রামে এ সংক্রান্তিতে মহোৎসব এবং 'জয়দেব মেলা' নামে মেলা হয়।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া

নবদ্বীপে শ্রীবল্লভ আচার্য্য নামে একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করতেন। লক্ষ্মী নাম্নী তাঁর এক সুশীলা সুন্দরী কন্যা ছিল। শ্রীবল্লভ আচার্য্য কন্যার জন্য একটা ভাল বরের কথা ভাবতে লাগলেন, ঘটক নিযুক্ত করলেন বনমালী আচার্য্যকে। শ্রীনিমাই পণ্ডিত যোগ্য-পাত্র মনে করে বনমালী আচার্য্য তাঁর বাড়ী এলেন এবং জননী শ্রীশচী দেবীকে বলতে লাগলেন—

"পুত্র বিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য্য।।
বল্লভ আচার্য্য কুলে-শীলে-সদাচারে।
নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে।।
তা'ন কন্যা—লক্ষ্মীপ্রায় রূপে-শীলে মানে।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে।।"

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১০।৫৪-৫৬)

পুত্রের বিবাহ দিবার সময় হয়েছে, কিন্তু আপনি কোন চিন্তাই করছেন না দেখছি। কুলে-শীলে উত্তম এবং সদাচার সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ আছেন। নাম শ্রীবল্লভ আচার্য্য, নবদ্বীপে বাস। লক্ষ্মী নাম্নী তাঁর এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। আপনার ইচ্ছে হলে, সে কন্যার সম্বন্ধ আপনার পুত্রের সঙ্গে হতে পারে।

শ্রীশচী দেবী বললেন— পিতৃহীন বালক আমার, বড় হউক পড়াশুনা করুক; তারপর এ-সব চিন্তা করব। বনমালী ঘটক শ্রীশচী মাতার কথায় প্রীত

হলেন না। বিমর্ষ হয়ে গৃহ অভিমুখে চললেন। দৈবযোগে পথে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎকার হল। শ্রীনিমাই পণ্ডিত বললেন— আচার্য্য মহাশয় কোথায় গিয়েছিলেন? বনমালী আচার্য্য বললেন— তোমাদের বাড়ী, তোমার মার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। বিষয় এই, বল্লভ আচার্য্যের লক্ষ্মী নাম্নী অতি সুন্দরী কন্যা আছে। সে তোমার উপযুক্ত বিবেচনা করে;তোমার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করলাম। কিন্তু এ-বিষয়ে তোমার জননীর কোন উৎসাহ দেখলাম না। তাই ফিরে যাচ্ছি। শ্রীনিমাই পণ্ডিত কথা শুনে একটু হাসলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়ে নিজগৃহে এলেন এবং মৌনভাবে রইলেন। শ্রীশচী মাতা পুত্রের মৌনাবস্থা দেখে বললেন—নিমাই! তুই আজ এত গম্ভীর মৌনী হলি কেন?

শ্রীনিমাই বললেন তুমি ঘটক বনমালী আচার্য্যকে ভাল সম্ভাষণ করলে না কেন?

শচীমাতা ইঙ্গিতে বুঝলেন নিমাইয়ের বিবাহ করবার ইচ্ছা আছে। শ্রীশচী মাতা তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে বনমালী ঘটককে তাঁর গৃহে আনালেন। শ্রীশচী মাতা বলতে লাগলেন—

শচী বলে—"বিপ্র, কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করাহ, কহিনু এই আমি।।"
—(চৈঃ ভাঃ আদি ১০।৬৫)

আমার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কাল আপনি যে প্রস্তাব করেছিলেন, তাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। শ্রীশচী মাতার এই কথা শুনে ঘটক বনমালী আচার্য্য তৎক্ষণাৎ বল্লভ আচার্য্য ভবনে চললেন। বনমালী ঘটকের প্রসন্ন বদন দেখে বল্লভ আচার্য্য অনুমান করলেন কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে। শ্রীবল্লভের মন আনন্দে ভরে উঠল। খুব সম্মান প্রদর্শন করে ঘটক বনমালীকে বল্লভ আচার্য্য আসনে

বসালেন এবং সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন।

ঘটক বললেন— সমাচার শুভ, শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে কন্যার বিবাহের আয়োজন করুন। এ রকম পুত্রকে কন্যাদান করা পরম সৌভাগ্য। একথা শুনে শ্রীবল্লভের পরিবারের আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীবল্লভ বললেন—

কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্টা কন্যারে।।
তবে সে সেহেন আসি মিলিবে জামাতা।
অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সর্ব্বথা।।

—(চৈঃ ভাঃ আদি ১০।৭২-৭৩)

বনমালী ভাই! আমার প্রতি যদি কৃষ্ণের দয়া থাকে, আর কন্যার প্রতি যদি গৌরী সন্তুষ্ট থাকেন, তবে এমন সুন্দর জামাতা পাবো। তুমি শীঘ্র সব ঠিক কর। তবে যৌতুকাদি দিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

কন্যা-মাত্র দিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়া।
সবে এই আজ্ঞা তুমি আনিবে মাগিয়া।।

—(চৈঃ ভাঃ আদি ১০।৭৫)

বল্লভাচার্য্য জানাতে চাইলেন যে জামাতা ও কন্যাকে বেশী কিছু দিতে পারবেন না। শ্রীবনমালী শ্রীশচীদেবীর কাছে এলেন এবং শ্রীবল্লভাচার্য্যের দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে বললেন। শ্রীশচী দেবী বললেন—কন্যা যখন ভাল, আমাদের কোন দাবী-দাওয়া নাই। তিনি যা দিবেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব। শ্রীশচীর মত জেনে, বনমালী বল্লভাচার্য্যের কাছে ফিরে এসে কার্য্য সিদ্ধির কথা বললেন। শুনে শ্রীআচার্য্যের আত্মীয়-স্বজনগণের সুখের সীমা রইল না। এদিকে শ্রীশচীদেবী, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈত আদি ভক্তগণকে

পুত্রের বিবাহ-কথা জ্ঞাপন করলেন। শুনে সকলে বড় আনন্দিত হলেন। শ্রীশচীদেবীকে শীঘ্রই এ কার্য্য সম্পন্ন করতে নির্দ্দেশ দিলেন। শ্রীশচী মাতা ভট্টাচার্য্যগণকে ডেকে বিবাহ লগ্ন নির্ণয় করতে লাগলেন। শ্রীবল্লভ আচার্য্যও তদ্রূপ করলেন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়ে বিবাহের দিন ঠিক হল।

শুভ-অধিবাস উৎসবের নিমন্ত্রণ করবার জন্য শ্রীশচী ঠাকুরাণী অতি হর্ষিত মনে নগরে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের কাছে লোক পাঠালেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হচ্ছে শুনে স্বজনগণের আনন্দের সীমা রইল না। অধিবাসের দিন প্রাতঃকাল থেকে নট ও বাদকগণ নৃত্য-গীত ও বিবিধ বাজনা আরম্ভ করল। অধিবাস মণ্ডপ তৈরী করা হল। তাতে কদলী-স্তম্ভ, আম্রসার, আলিপনা, বন্দনামাল্য প্রভৃতি শোভা পাচ্ছিল। ভট্টাচার্য্যগণ বেদ-মন্ত্র ধ্বনি করতে লাগলেন। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যথার্বিধানে সম্পন্ন হতে লাগল। অতঃপর শুভ অধিবাস কার্য্য আরম্ভ হল। জামাতা বরণের জন্য শ্রীবল্লভাচার্য্য বহু দ্রব্য সম্ভারসহ এলেন এবং যথাবিধি বরণ কার্য্য করলেন। অধিবাসের যাবতীয় কার্য্য হল। অধিবাস মুহূর্ত্তে বাদ্যকারগণের বাদ্যঘটায় আকাশ-বাতাস পূর্ণ হল। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের শুভ বিবাহ হচ্ছে দেখতে বহু লোক সমাগম হল। শ্রীশচী ঠাকুরাণী সকলকে প্রচুর মিষ্টি, বাটা-বাটা তাম্বুল প্রভৃতি দিয়ে সৎকার করলেন। এইরূপ আনন্দ উৎসবে অধিবাস দিবস সমাপ্ত হল। পরদিন বিবাহ মহোৎসব আয়োজন পুরোদমে চলতে লাগল। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের যাবতীয় কুটুম্ব আগমন করতে লাগলেন। শ্রীশচীদেবী আত্মীয়-বধূগণের শিরে তৈলাদি দিয়ে স্নান করাতে লাগলেন। তাঁদের কেশ বিন্যাসাদি করে ললাটে সিন্দুর বিন্দু দিলেন। বস্ত্রাভরণ আদি দিয়ে খই, কলা, মিষ্টি প্রভৃতি দ্বারা সকলকে সুখী করলেন।

শ্রীশচী মাতার আপ্যায়নে সকলে সুখ-সিন্ধুতে যেন ভাসতে লাগলেন।

ঈশ্বরের বিবাহ দর্শন করবার এবং সে উপলক্ষ্যে পান ভোজন করার অধিকার শুধু ভাগ্যবান্‌দের আছে। এঁরা শ্রীভগবানের নিত্য পরিকর।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গা স্নান করে নিত্য শ্রীবিষ্ণু-পূজাদি সমাপ্ত করলেন। তারপর পিতৃগণের পূজাদি করলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গল ধ্বনি হতে লাগল। নৃত্য, গীত, বিবিধ বাদ্য ধ্বনিতে গগন পবন পূর্ণ হল। চারিদিকে শুধু লেহ লেহ দেহ দেহ শব্দই শুনা যাচ্ছিল। ঈশ্বর-বিবাহ দেখবার জন্য দেবগণ, দেববধূগণ নর-নারীরূপ ধারণ করে যোগদান করেছেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্য বিধি অনুসারে কন্যার অধিবাস ক্রিয়া সমাপ্ত করলেন এবং পিতৃগণের পূজাদি করলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গলবাদ্য ধ্বনি হতে লাগল।

অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর গোধূলি-লগ্নে বিবাহ করতে যাত্রা করলেন। সঙ্গে বহু মিত্র লোকগণ ও বাদ্যকারগণ বিবিধ বাজনা নৃত্য-গীতাদি করতে করতে চললেন। যাত্রা করবার আগে লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর জননী ও গুরুজনের চরণ-বন্দনা ও আশীর্ব্বাদ আদি নিয়ে যাত্রা করেন। তারপর বাহির হয়ে গঙ্গাতটে আসেন এবং দোলা থেকে নেমে শ্রীগঙ্গাদেবীকে প্রণাম করেন। অতঃপর গঙ্গাতট দিয়ে চলতে থাকেন। ক্রমে শ্রীবল্লভ মিশ্রের গৃহ সন্নিকটবর্ত্তী হলেন। শ্রীবল্লভ মিশ্র হর্ষিত হৃদয়ে জামাতাকে যথাবিধি স্বাগত জানালেন। অতি সমাদর করে নিয়ে বিবাহ বেদীতে বসালেন। অতঃপর কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সন্নিধানে আনয়ন করা হল। কুলবধূরা উলু উলু ধ্বনি করতে লাগলেন এবং বাদ্যকারগণ বিবিধ বাদ্যধ্বনি করতে লাগল। তারপর লক্ষ্মীকে এক পিঁড়িতে বসিয়ে পিঁড়িসহ উঠিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরকে সাত বার প্রদক্ষিণ করান হল। শ্রীলক্ষীদেবী প্রভুর শ্রীচরণে জল প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করলেন। তারপর শ্রীগৌরসুন্দর ও লক্ষ্মীদেবী পরস্পরের গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করে বিবিধ কৌতুক করলেন। লক্ষ্মীদেবী প্রভুর গলায় মালা দিতেই প্রভু নিজ গলার মালা লক্ষ্মীর গলায় দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করলেন।

এইরূপে লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন হলে চতুর্দ্দিক মহা জয় জয় ধ্বনি ও বাদ্য ধ্বনিতে মুখরিত হল। মুখচন্দ্রিকা করবার পর প্রভু লক্ষ্মীকে বাম পাশে বসালেন।

প্রথম বয়স প্রভু জিনিঞা মদন।
বাম পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ।।
কি শোভা, কি সুখ সে হইল মিশ্র-ঘরে।
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে।।
—(চৈঃ ভাঃ আদি ১০।১০০-১০১)

যথাবিধি কন্যাদান করে শ্রীবল্লভ মিশ্র সুখ সাগরে যেন ভাসতে লাগলেন। বধূগণ কুলাচার লোকাচার প্রভৃতি করতে লাগলেন। এ রকমের বিবিধ আনন্দে রাত্রি প্রায় শেষ হল। অনন্তর ভগবান্ লক্ষ্মীসহ পুষ্প শয্যায় নিদ্রিত হলেন।

প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করে যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদি করতে লাগলেন। দিবসভরে শ্রীবল্লভ মিশ্র গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর অবস্থান করার পর গোধূলি লগ্নে লক্ষ্মীর সহিত গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। কন্যা ও জামাতাকে বিদায় দিবার সময় বল্লভ মিশ্র স্বজনসহ বিহ্বল হয়ে পড়লেন। গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, মুকুট, চন্দন, কজ্জ্বলসহ বরবধূ দোলা মধ্যে পরম শোভা পেতে লাগলেন। পথিপার্শ্বে দর্শকেরা কত সুখ অনুভব করতে লাগলেন।

"কতকাল এ কন্যা হর-গৌরী সেবা করেছিল তাই এমন সুন্দর বর পেয়েছে"— নারীগণ পরস্পরের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন করতে লাগল। বিবিধ বাদ্য ও আনন্দ কোলাহলের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর নিজগৃহে প্রবেশ করলেন। "নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে।।" তখন শ্রীশচীদেবী বিপ্র পত্নীগণসহ পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে আনলেন। শ্রীশচী মাতার গৃহে আনন্দের সীমা রইল না। গীত বাদ্য ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

এইভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হল। জগৎ আনন্দময় হল। শ্রীগৌরসুন্দর নাট, ভাট, বাদক, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে যথাবিধি অর্থ, বস্ত্র, অন্নাদি দিয়ে সৎকার ও বিদায় করলেন। শ্রীশচীদেবীর বাসনা পূর্ণ হল। সর্ব্বদা আনন্দ সিন্ধুতে যেন ভাসতে লাগলেন। শ্রীলক্ষ্মীর অঙ্গ-জ্যোতিতে গৃহ সর্ব্বদা যেন আলোকিত এবং পদ্মগন্ধময় হয়েছিল। তাতে অনুমানে শ্রীশচী-মাতা বুঝলেন এ কন্যাতে সাক্ষাৎ কমলার অধিষ্ঠান আছে। বধূ লক্ষ্মীকে শ্রীশচী মাতা প্রাণের প্রাণ স্বরূপ স্নেহ করতে লাগলেন। লক্ষ্মীদেবী অতিশয় সুচরিতা ছিলেন। ইঙ্গিতেই সমস্ত কার্য্য করতেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশচীমাতাকে সুখী করবার আশায় কোন কোন দিবস লক্ষ্মীকে নিয়ে তাঁর কাছে বসতেন।

লক্ষ্মীদেবী প্রাতঃকালে শ্রীবিষ্ণু গৃহ মার্জ্জন, আলপনা, পুষ্প তুলসী চয়ন প্রভৃতি কার্য্য করতেন। অনন্তর রন্ধন করতেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন বৈষ্ণব অতিথি ডেকে গৃহে সেবা করাতেন।

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূলকর্ম।।
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তা'রে।।
যা'র বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে।।
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।২১-২৩)

ভগবান্ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই অবতীর্ণ হন। তিনি ভক্তবৎসল। ভক্তের সুখের জন্য কত বিচিত্র লীলা করেন। তিনি যেমন লীলা করেন লক্ষ্মী তদ্রূপ আচরণ করে থাকেন।

নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোঽধিক শচীর সেবায় তাঁ'র মন।।
লক্ষ্মীর চরিত্র শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
মুখে কিছু না বলেন, সন্তোষ অন্তর।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৪৩-৪৪)

গৃহস্থ হবার পর, গৃহস্থের অর্থ উপার্জ্জন, গুরুসজ্জন-পালন করা একটী ধর্ম্ম। তাই যেন শ্রীগৌরসুন্দর কিছুদিন বঙ্গদেশে গিয়ে অধ্যাপক রূপে বিদ্যাদানাদি করতে ইচ্ছা করলেন। জননীর চরণে নিবেদন জানালেন কিছুদিন তিনি বঙ্গদেশে প্রবাসে যাবেন। পত্নীর প্রতি বললেন— "তুমি এই সময় আইর উত্তম রূপে সেবা কর।" তারপর শ্রীনিমাই পণ্ডিত শুভদিন দেখে কতিপয় শিষ্যসহ বঙ্গদেশের প্রতি যাত্রা করলেন। প্রভুর শ্রীচরণরেণুতে বঙ্গদেশ ধন্য হল। ক্রমে প্রভু পদ্মাবতীর নদীর তটে এলেন। মহাপ্রভুর শুভ আগমন বার্ত্তা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচারিত হল। কোন মহান্ সৌভাগ্যবানের গৃহে প্রভু অবস্থান করে মহাবিদ্যা গোষ্ঠী করলেন। সহস্র সহস্র ছাত্র প্রভুর কাছে পড়বার জন্য আসতে লাগল। মহাপ্রভুর দিব্য-মূর্ত্তি দর্শনে বঙ্গবাসী ধন্যাতিধন্য হলেন। সে ভাগ্যে বঙ্গদেশে শ্রীহরিকীর্ত্তন অদ্যাপি বিদ্যমান।

মহা—বিদ্যাগোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু বুলিলেন রঙ্গে।।

* * *

বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ।।
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে।।

—(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৯৩, ৬৬, ৮১)

এইমতে বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যা-রসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি।।
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৯৮)

এদিকে নবদ্বীপে, যেদিন মহাপ্রভু বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন, সেদিন থেকে তাঁর বিরহে লক্ষ্মীদেবী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন। স্বজন বন্ধুগণ কত তাঁকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি কিন্তু কিছুতেই সুস্থ হলেন না। নামে মাত্র দু এক গ্রাস অন্ন মুখে দিতেন। সমস্ত রাত্রি বসে বসে ক্রন্দন করতেন। ঈশ্বরের বিচ্ছেদ সইতে পারলেন না।

নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই' পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভু-পার্শ্বে অতি অলক্ষিতে।।
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১০৪)

তিনি মহালক্ষ্মী অনন্ত বিভূতি সম্পন্না। অতএব তাঁর পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই। নিজ প্রতিকৃতি একটী দেহ ধরাতলে রেখে দিব্য দেহে নিজ প্রভুর নিকট গমন করলেন। তাঁর দেহ ত্যাগ প্রাকৃত লোকের ন্যায় নহে। তিনি বৈকুণ্ঠের ঈশ্বরী মহালক্ষ্মী। প্রভুর বিরহ তাঁর পক্ষে অসহনীয়, মহাবিষতুল্য। অতএব বিরহ যেন সর্পতুল্য দংশন করল এবং বেদনা রূপী বিষে তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন।

প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল।।
—(চৈঃ চঃ আদি ১৬।২১)

বাস্তবিক পক্ষে প্রপঞ্চ জীবের ন্যায় লক্ষ্মীদেবীর দেহ ত্যাগ হয় নাই।

এই ভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের বিরহে শ্রীলক্ষ্মীদেবী দেহত্যাগ করলেন। লক্ষ্মীর দেহত্যাগে স্বজন-বন্ধু-বান্ধবগণের শোকের সীমা রইল না। শ্রীশচীমাতা শোক সমুদ্রে ডুবে গেলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু সব জানতে পারলেন। বহু শিষ্য ও দ্রব্যাদি সঙ্গে তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপে ফিরে এলেন এবং দেখলেন বধূ পরলোক যাত্রা করেছেন। ভগবান্ লোকানুকরণে কিছুক্ষণ শোক প্রকাশ করতঃ জননীকে বিবিধ তত্ত্ব উপদেশ করতে লাগলেন।

জননী শ্রীশচী অনেক কষ্টে দুঃখ সম্বরণ করলেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর পুনঃ বিদ্যার বিলাস করতে লাগলেন। প্রাতঃকালে বিদ্যালয়ে গিয়ে আগে বসতেন। কোন দিবস যদি কোন ছাত্রের ললাটে তিলক না দেখতেন তখন তাকে গৃহে প্রেরণ করতেন।

তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান-সদৃশ—বেদে বলে।।
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ—১৫।১২)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী

'শ্রী', 'ভূ', 'নীলা' নামে ভগবানের তিনটি শক্তি আছে; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হলেন 'ভূ' শক্তি-স্বরূপিণী। তিনি 'সত্যভামা' বলেও কথিত হন। শ্রীগৌর-অবতারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী শ্রীনাম প্রচারের সহায়রূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ ধামে সনাতন মিশ্র নামে এক পরম বিষ্ণু-ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি বহু লোকের ভরণ- পোষণ করতেন। রাজ -পণ্ডিতবলে সর্ব্বত্র তাঁর খ্যাতি ছিল। ইনি দ্বাপরে সত্রাজিত রাজা ছিলেন। বিপ্রশ্রেষ্ঠ সনাতন মিশ্র বিষ্ণু আরাধনার ফলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নামে সদ্‌গুণ সম্পন্না এক পরমা সুন্দরী কন্যারত্ন লাভ করেন। অতি শিশুকাল থেকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দিনে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান করতেন এবং বড়দের অনুকরণ করে যাবতীয় পূজা, অর্চ্চনা, তুলসী সেবা, ব্রত প্রভৃতি করতেন। গঙ্গাঘাটে যখন শ্রীশচীমাতাকে দেখতেন অতি নম্রভাবে তাঁকে নমস্কার করতেন। শচীমাতাও 'যোগ্য পতি হউক' বলে আশীর্ব্বাদ করতেন। শচীমাতা মনে মনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধূরূপে কামনা করতেন।

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দরের লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী প্রথমা পত্নী পরলোক গমন করেন। মা শচীর হৃদয়ে বড় দুঃখ হল। কিছুদিন কেটে গেল। পুনঃর্বার পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য মা শচীদেবী বড় উদ্‌গ্রীব হলেন। আত্মীয়-স্বজনগণও শীঘ্র একার্য্য সম্পন্ন করতে বললেন। গৌরসুন্দর জননীর মতের বিরোধিতা করলেন

না। বিবাহ করতে সম্মত হলেন। শচীমাতা এক ভৃত্যকে ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিতের বাড়ী পাঠালেন। মা শচীর আহ্বান পাওয়া-মাত্র পণ্ডিত তাঁর গৃহে এলেন শচীমাতা গৌরসুন্দরের বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন। কাশীনাথ পণ্ডিত বললেন ইহা উত্তম প্রস্তাব, এ কার্য্য শীঘ্র হউক। পাত্রীর কথা উত্থাপন করে শচীমাতা সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম বললেন। ঘটক সহাস্য বদনে বললে —"ঠাকুরাণী! আমিও ঐ কন্যার নাম উল্লেখ করব ভাবছিলাম।" শচীমাতা বললেন— "আমি ত গরীব, সনাতন মিশ্র আমার ঘরে কন্যা দিবে কি? আপনি এ-বিষয় নিয়ে শীঘ্র আলাপ করুন। কাশীনাথ পণ্ডিত বললেন— "ঠাকুরাণী, আপনার নিমাইয়ের ন্যায় এত সুন্দর পুত্রকে সনাতন যদি কন্যা না দেয়, কাকে দিবে?" এ কথা বলে পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহ অভিমুখে চললেন।

কন্যার বয়স দেখে সনাতন মিশ্রও একটি উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করছিলেন। নদীয়াতে উত্তম পাত্র বলতে একমাত্র নিমাই পণ্ডিত। রূপে-গুণে অতুলনীয়, বয়সও কম। এমন পাত্রকে কন্যা দেওয়া বড় ভাগ্যের কথা। এসব কথা কাকে বলতেও সনাতনের লজ্জা বোধ হচ্ছিল। মনে মনে শুধু ভগবানের কাছে জানাতেন, হে হরি! পূর্ব্ব জন্মে যদি সুকৃতি করে থাকি আমার কন্যার জন্য যেন নিমাই পণ্ডিতকে বররূপে পাই।

ঐ দিন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বসে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ করছেন, ঠিক এমন সময় ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিত উপস্থিত হলেন। সনাতন মিশ্র ব্যস্তসমস্ত হয়ে পণ্ডিতকে স্বাগত জানিয়ে বসতে আসন দিলেন। মিষ্ট জলাদি দিয়া সৎকার করলেন। সনাতন মিশ্র ভাবলেন উত্তম পাত্রের সংবাদ নিশ্চয় এসেছে। মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন— "পণ্ডিত! খবর কি?" পণ্ডিত হাস্য করতে করতে বললেন—

"বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতের তোমার দুহিতা।
দান কর'—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা।।
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্য পতি।
তাহার উচিত এই কন্যা মহা-সতী।।
যেন কৃষ্ণ রুক্মিণীতে অন্যোহন্য-উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞি পণ্ডিত।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৫।৫৭-৫৯)

ঘটক কাশীনাথের এই প্রস্তাব শুনে সনাতন মিশ্র ও তাঁহার পত্নী আনন্দে আত্মহারা হলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান ভাবনানুরূপ ফল মিলিয়ে দিয়েছেন। সনাতন মিশ্র বললেন—"কাশীনাথ, এ বিষয়ে আর কি বল ? যদি আমার গোষ্ঠীর সৌভাগ্য থাকে এ হেন জামাতা পাব।" অন্যান্য স্বজনগণ বলতে লাগলেন —"সৌভাগ্য ছাড়া এরকম ছেলে পাওয়া যায় না। তোমার কন্যার ভাগ্যে থাকলে উত্তম বর পাবেই।" তারপর কাশীনাথ পণ্ডিতের সঙ্গে আবশ্যকীয় অন্যান্য বিষয় মিশ্র মহোদয় আলোচনা করলেন। এরূপে কাশীনাথ পণ্ডিত সব ঠিক করে শচীমাতার ঘরে ফিরে এলেন এবং তাঁকে সব কথা জানালেন। শচী বললেন— "আমার তো আর কেউ নাই, একমাত্র হরিই আছেন।"

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হবে শুনে সকলে বড় আনন্দিত হলেন। শিষ্যগণ বলতে লাগলেন— "পণ্ডিতের বিবাহে আমরা যথাসাধ্য কিছু কিছু দান করব।" ধনাঢ্য বুদ্ধিমন্ত খান বললেন —"সমস্ত খরচ আমি বহন করব।" মিত্র মুকুন্দ-সঞ্জয় বললেন —"ভাই , খরচের ভার কিছুটা আমাদের উপরও দাও। এ বিবাহের আয়োজন এমন করতে হবে যাহা কোন রাজকুমারের বিবাহেও হয় নাই।"

সমস্ত নবদ্বীপে সাড়া পড়ে গেল। নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ। বিবাহের

আয়োজন হতে লাগল। বিবাহ মণ্ডপের উপর বড় বড় চন্দ্রাতপ খাটান হল। ভূমিতে আলিপনা দেওয়া হল এবং স্থানটি কদলীবৃক্ষ, পূর্ণঘট, আম্রসার, দীপ, ধান্য, দধি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হল। নবদ্বীপে তখন যত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সজ্জন বাস করতেন সকলে অধিবাস উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হলেন। সন্ধ্যায় অধিবাসের সময় বাদ্যকরগণ আনন্দে নানাবিধ বাদ্য বাজাতে লাগল। শচীর অঙ্গন ক্রমে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবে পূর্ণ হতে লাগল। ভগবদ্-পূজা, আরাত্রিক, ভোগরাগ মহা সমারোহের সহিত হল এবং গৌরসুন্দরের অধিবাস-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হল। অন্দর মহলে নারীগণ আনন্দভরে ঘন ঘন উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করছিলেন। বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করতে লাগলেন। ঈশ্বরের বিবাহ, চতুর্দ্দিকে সুখসিন্ধু যেন উথলে উঠল। অধিবাসে মিষ্টি পান ও সুপারির আয়োজন করা হয়েছিল। যে যত চায়, পানের বিটীকা দেওয়া হচ্ছিল। যত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব এসেছিলেন তাঁদের গলায় গৌরসুন্দর চন্দন ও সুগন্ধ ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। প্রফুল্ল মনে সকলে শুভাশীষ অর্পণ করলেন। এমন সুন্দর সুখময় বিবাহ-অধিবাস কেহ কখনও দেখেনি। নদীয়া-পুরী সুখসিন্ধু মাঝে ভাসতে লাগল।

পরদিন বিবাহ উৎসবের বিপুল আয়োজন হল। অপরাহ্নে গৌরসুন্দর বরোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ পরে জননী এবং গুরুজনের চরণ বন্দনা করে এক সুসজ্জিত দোলায় আরোহন করলেন। প্রথমে গঙ্গাতটে এলেন, শ্রীগৌরসুন্দর দোলা থেকে নেমে গঙ্গাদেবীকে নমস্কার করে আবার দোলায় আরোহণ করলেন। 'জয় জয়' মঙ্গল ধ্বনি ও বিবিধ বাদ্যধ্বনির দ্বারা চতুর্দ্দিক মুখরিত করে গঙ্গাতট দিয়ে বরযাত্রা আরম্ভ হল। সহস্র সহস্র দীপ জ্বলছিল, নানা রকম বাজী পোড়ান হচ্ছিল, নৃত্যগীত হচ্ছিল। গোধূলি লগ্নে বর ও বরযাত্রীরা শ্রীসনাতন মিশ্রের গৃহে প্রবেশ করলেন। শ্রীসনাতন মিশ্র ও তাঁর পত্নী জামাতাকে বরণ ও আশীর্ব্বাদ করলেন।

অতঃপর বিষ্ণুপ্রিয়াকে নানা আভরণে ভূষিত করে বিবাহ স্থানে আনয়ন করা হল। মহালক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বীয় নিত্যকান্ত গৌর-নারায়ণকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে তাঁর শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য প্রিয়াকে বাম অঙ্গে স্থাপন করলেন। অনন্তর পরস্পরের গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করলেন।

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্মসমর্পণে।।
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া।।
তবে লক্ষ্মী- নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা হই মহা কুতূহলী।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৫।১৭৬-১৭৮)

শ্রীসনাতন মিশ্র শ্রীগৌরসুন্দরকে বহু যৌতুকের সহিত কন্যা সম্প্রদান করলেন। তিনি গৌর-নারায়ণকে কন্যাদান করে কৃত-কৃত্য হলেন। জনক রাজা যেমন রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করেছিলেন, ভীষ্মক রাজা যেমন কৃষ্ণকে রুক্মিণী সম্প্রদান করেছিলেন, সনাতন মিশ্রও সেরূপ গৌরসুন্দরকে বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদান করলেন। বিবাহের পর শুভ রাত্রিতে বাসর-গৃহে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ পুষ্পশয্যায় অবস্থান করিলেন। শ্রীসনাতন মিশ্রের গৃহে বৈকুণ্ঠানন্দ অবতরণ করল।

প্রায় সমস্ত রাত্রি সনাতন মিশ্রের গৃহ নৃত্য-গীত ও বাদ্য-ধ্বনিতে মুখরিত হল। প্রাতে গৌরসুন্দর পত্নী লক্ষ্মীসহ শয্যা ত্যাগ করলেন। হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করবার পর নিত্য কৃত্য জপাদি সমাপ্ত করলেন। সনাতন মিশ্র মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর স্বজনবর্গ গৌর-নারায়ণকে দর্শন করে কৃতার্থ হলেন।

সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল তাহা কে পারে কহিতে।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৫।১৯৪)

অপরাহ্নে শ্রীগৌরসুন্দর নব বধূকে নিয়ে নৃত্য-গীত-বাদ্যসহ স্বীয় গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। নগর পরিক্রমা করে গঙ্গাতট দিয়ে যখন বরযাত্রীরা চলছিলেন তখন নগরবাসীগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও গৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম দিব্য রূপ দর্শন করে আনন্দভরে বলাবলি করতে লাগলেন—

এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্ব্বতী।।
কেহ বলে,—"এই হেন বুঝি হরগৌরী।"
কেহ বলে,—"হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি।।"
কেহ বলে,—"এই দুই কামদেব রতি।"
কেহ বলে,—"ইন্দ্র শচী লয় মোর মতি।।"
কেহ বলে,—"হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"
এই মত বলে যত সুকৃতি-বনিতা।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৫।২০৫-২০৮)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ দৃষ্টিপাতে সমস্ত নবদ্বীপ সুখময় হয়ে উঠল। নৃত্য-গীত-বাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টিসহ পরম আনন্দ কোলাহলের মধ্যে সর্ব্ব শুভক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন। শচীমাতা অন্যান্য কুলবধূসহ প্রসন্ন বদনে পুত্রবধূকে বরণ করলেন। নবদম্পতি দোলা থেকে অবতরণ করে প্রথমে শ্রীশচীর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। স্নেহভরে সকলে বর-বধূর চিবুক ঘ্রাণ ও আশীর্ব্বাদ করলেন এবং বিবিধ যৌতুক প্রদান করলেন।

গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হইল সকল ভুবন।।
কি আনন্দ হইল সে অকথ্য কথন।
সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন।।

তারপর বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় ভগবানের বিবাহ দর্শনের মহিমা বর্ণন করেছেন।

যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
পাপমুক্ত হই যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে।।
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাৎ।
তেঞি তান নাম 'দয়াময়' দীননাথ।।
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৫।২১৬-২১৭)

ভগবানের এই দিব্য লীলা বহু সাধন করেও যোগিগণ পর্য্যন্ত দর্শন করতে পারেন না। কিন্তু সে লীলা নবদ্বীপবাসী আপামর জনসাধারণ দেখতে পেল। দয়াময় ভগবানের অশেষ কৃপা— তাই তাঁর এক নাম দীননাথ।

বিবাহে যত নট, ভাট, ভিক্ষুক এসেছিল শ্রীগৌরসুন্দর তাদের অর্থ ও বস্ত্র দিয়ে তুষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় স্বজনকে মূল্যবান্ বস্ত্র দান করলেন। বুদ্ধিমন্ত খানকে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। তিনিই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আর বিশেষ বর্ণনা দেন নাই। কোন প্রসঙ্গে কদাচিৎ নাম উল্লেখমাত্র করেছেন। গয়াধাম হতে গৃহে এলে—

"লক্ষ্মীর জনক কুলে আনন্দ উঠিল।
পতি-মুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ দূরে গেল।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৯)

মহাপ্রভু গয়াধাম থেকে গৃহে ফিরে এলেন এবং অনন্তর কৃষ্ণ প্রেম প্রকাশ করতে লাগলেন প্রভুর দিব্যভাব-সকল দেখে শচী মাতা ভাবতেন পুত্রের কোন কঠিন রোগ হয়েছে না কি? পুত্রের মঙ্গল কামনায় গঙ্গা-বিষ্ণুর পূজা দিতেন এবং —

"লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়।।"
— (শ্রীচৈ ভাঃ মধ্যঃ ১।১৩৭)

প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখেও দেখেন না। "কৃষ্ণ"—কৃষ্ণ" বলে নিয়ত রোদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী-অন্নের থালা পুত্রের সম্মুখে দিয়ে শচীমাতা তথায় বসলেন। "ঘরের ভিতর দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা।" —(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১।১৯১)—বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহের ভিতর থেকে সব দেখতে লাগলেন। প্রভু সব সময় কৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকেন। কোনদিন পাষণ্ডগণের অত্যাচারের কথা শুনে 'আমি সংহার করব, সংহার করব' বলে হুঙ্কার দেন। শচীমাতা কিছুই বুঝতে পারেন না। বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রভুর কাছে গিয়ে বসতে বলেন। "লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়।।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২।৮৭) বাহ্যদশা শূন্য প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকেই প্রহার করবার জন্য উদ্যত হন। পুনঃ বাহ্যদশা ফিরে এলে লজ্জিত হন। একদিন শচীমাতা ও গৌরসুন্দর গৃহমধ্যে বসে আলাপ করছিলেন। কপাটের আড়ালে বসে বিষ্ণুপ্রিয়া শুনছিলেন। শচীমাতা বললেন— "আজ রাত্রি শেষে স্বপ্ন দেখেছি আমাদের ঘরে যে রাম ও কৃষ্ণ মূর্ত্তি আছেন, তাঁদের সঙ্গে তুমি ও নিত্যানন্দ খেলছ। তাঁদের সঙ্গে খেতে খেতে মারামারি করছ। এরূপ আরও কত রঙ্গ করছ।" গৌরসুন্দর বললেন— "বড় ভাল স্বপ্ন, মা! কাকেও বল না। আমাদের গৃহে সাক্ষাৎ রাম-কৃষ্ণ বিরাজ করছেন। অনেকদিন দেখি পূজার নৈবেদ্য কে খেয়ে যায়। আমার সন্দেহ হত তোমার পুত্রবধু খায়। কিন্তু আজ আমার সে সন্দেহ ঘুচল।"

"তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৮।৪৯)

শচীমাতা বললেন, "বাবা, অমন কথা বলতে নাই।" স্বামীর নর্মালাপ শুনে বিষ্ণুপ্রিয়া হাসতে লাগলেন।

"একদিন নিজ গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরম সুন্দর।।
যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি দিশে।।
যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সনে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর।।"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১১।৬৫-৬৭)

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌরসুন্দরের মধুর বিহারের কথা বর্ণনা করেছেন। এ হচ্ছে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য বিলাস। ভগবান্ গৌর নারায়ণ রূপে লক্ষ্মীসহ নবদ্বীপে নিত্যবিহার করছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে তাম্বুল দিচ্ছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রদত্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করতে করতে মহাপ্রভু আনন্দ প্রকট করছেন। মহাপ্রভুর আনন্দ দর্শনে বিষ্ণুপ্রিয়ারও আনন্দে দিবানিশি জ্ঞান নাই। 'যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী'—এ হচ্ছে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য উপাসক ভক্তের ধ্যানের বিষয়।

জননীবৎসল প্রভু জননীকে সুখী করার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বসে থাকতেন।

মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া।।
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১১।৬৮)

চন্দ্রশেখর-ভবনে যখন মহাপ্রভু রুক্মিণী ভাবে নৃত্যাভিনয় করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াও শচীমাতার সঙ্গে সে অভিনয় দর্শন করতে গিয়েছিলেন— "আই চলিলেন নিজ বধূ সহিতে।।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৮।২৯)

এরপরে গৌরসুন্দর যে সন্ন্যাস-লীলা করেছেন তা বর্ণন করতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কোন স্থানে বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম উল্লেখ করেন নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আদি পঞ্চদশ অধ্যায়ে কেবল বিবাহ-লীলা বর্ণন করেছেন।

যেদিন মহাপ্রভু সন্ন্যাসে গিয়েছিলেন সেদিন রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে যে তত্ত্বোপদেশ দিয়েছিলেন তার এরূপ বর্ণনা শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে আছে—

জগতে যতেক দেখ মিছা করি সব লেখ
সত্য এক সবে ভগবান।
সত্য আর বৈষ্ণব তা বিনে যতেক সব
মিছা করি করহ গেয়ান।।

— (চৈঃ মঃ মধ্যঃ)

"পুত্র, পতি, সখা, স্বজন-সম্বন্ধ সব মিথ্যা। পরিণামে কেহ কারও নয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণ ছাড়া আমাদের অন্য গতি নাই। কৃষ্ণ সকলের পতি, আর সব কিছু শক্তি—এ কথা কেহ বুঝে না। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি বিষ্ণু ভজন করে তোমার নাম সার্থক কর। মিথ্যা শোক কর না, আমি তোমায় এই যথার্থ কথা বলে যাচ্ছি। তুমি কৃষ্ণ চরণে মনোনিবেশ কর।"

বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন—"তুমি ঈশ্বর, তুমি নিজ মায়া দূর কর। তাহলে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রসন্ন হবে।" বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ শোক দূর হল। আনন্দে হৃদয় ভরে উঠল। "চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত"— এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শন করলেন। কিন্তু তাঁর পতি-বুদ্ধি গেল না, অতঃপর বিষ্ণুপ্রিয়া

মহাপ্রভুর চরণ তলে প্রণত হয়ে বললেন—"এক নিবেদন শুন প্রভু। মে
অতি অধম ছার, জনমিল ও সংসার, তুমি মোর প্রিয় প্রাণ পতি। এ হে
সম্পদ মোর, দাসী হৈয়াছিলুঁ তোর, কি লাগিয়া ভেল অধোগতি।।"

তখন শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলতে লাগলেন—

শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এ তোর কহিল হিয়া
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই আছিয়ে তোমার ঠাঁই
সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ়।।

অনন্তর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বললেন—

কৃষ্ণ আজ্ঞা বাণী শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণি
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি প্রভু।
নিজ সুখে কর কাজ কে দিবে তাহাতে বাধ
প্রত্যুত্তর না দিলেক তবু।।

—(চৈঃ মঃ মধ্যঃ)

অতঃপর রাত্রিকালে নিদ্রিত বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে মহাপ্রভু জন
শচীদেবীর দ্বারে এসে তাঁকে বন্দনা করলেন। কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকট পূর্ব্ব
কথোপকথনে শচীমাতাকে মোহিত করে সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়া
দিকে যাত্রা করলেন।

নিশান্তে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতা জেগে উঠে কি করলেন তার বিশ
বিবরণ দিয়েছেন বাসু ঘোষ ঠাকুর। নিশান্তে নিদ্রাভঙ্গ হলে বিষ্ণুপ্রিয়া খাটে
উপর মহাপ্রভু শয়ন করে আছেন মনে করে হাত দিয়ে দেখলেন খাট শূ
পড়ে আছে, প্রভু নাই। "শূন্য খাটে দিল হাত, বজ্র পড়িল মাথাত, বুঝি বি
মোরে বিড়ম্বিল। করুণা করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে, শচীর মন্দি
কাছে গেল।।"

মহাপ্রভুর বিয়োগে অসহ্য বেদনায় বিষ্ণুপ্রিয়া যে করুণ ক্রন্দন করেছিলেন তার কিছু বর্ণনা শ্রীলোচনদাস চৈতন্য মঙ্গলে দিয়েছেন—

বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনেতে পৃথিবী বিদরে।
পশু পক্ষী লতা তরু এ পাষাণ ঝুরে।।
পাপিষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায়।
ভূমিতে লোটাঞা দেবী করে হায় হায়।।
বিরহ অনল শ্বাস বহে অনিবার।
অধর শুকায়—কম্প হয় কলেবর।।

—(চৈঃ মঃ মধ্যঃ)

মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কিভাবে দিনযাপন ও নিত্যকৃত্যাদি করতেন ভক্তি রত্নাকরে শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী তার অপূর্ব্ব বর্ণনা দিয়েছেন—

প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ত্যজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হইলে শয়ন ভূমিতে।।
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ।।
হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয়।।
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন।।

—(ভঃ রঃ ৪।৪৮-৫১)

শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায় আছে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী সর্ব্বপ্রথম শ্রীগৌরমূর্ত্তি প্রকাশ ও পূজা করেন।

প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ
সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্ত্তিম্।
বিধায় তস্যাং স্থিত এষঃ কৃষ্ণঃ
সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্।।
—(৪র্থ প্রঃ;১৪শ সঃ ৮ম শ্লোক)

'প্রকাশরূপেণ নিজাং হি মূর্ত্তিম বিধায়'—নিজেই নিজের প্রকাশরূপী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়ে 'সমীপমাসাদ্য নিজপ্রিয়ায়াঃ'— নিজপ্রিয়া লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার সমীপে অবস্থান কালে (তাঁকে বলেছিলেন) 'স্থিত এষঃ কৃষ্ণঃ'— ইহাতে কৃষ্ণ অবস্থান করেন। 'সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্' (মহাপ্রভুর এ বাক্য অনুসারে) লক্ষ্মীরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর সে মূর্ত্তিটির সেবা করতেথাকেন।

মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করে যাবার পর ভৃত্য ঈশান ঠাকুর তাঁদের দেখাশুনা করতেন। শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সন্নিধানে সর্ব্বদা অবস্থান করতেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কৃপাভাজন হয়েছিলেন। পদকর্ত্তা বংশীবদন একটি গৌর-বিরহ গীত লিখেছেন—

"আর না হেরিব ও চাঁদ কপালে নয়ন খঞ্জর নাচ" —

ইত্যাদি— (পদকল্পতরু)

শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন মায়াপুরে এসেছিলেন বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। বংশীবদন ঠাকুর তাঁকে বহু কৃপা করেছিলেন।

শ্রীবিষ্ণু ঠাকুরাণী সাক্ষাৎ ভূ-শক্তি-স্বরূপিণী। তাঁর শ্রীচরণ কৃপা প্রার্থনা পূর্ব্বক এ প্রবন্ধ শেষ করছি। (সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ২০শ খণ্ড ২৬।২৭ সংখ্যা)

শ্রীমধু পণ্ডিত

যস্তেন সুপ্রকটিতো গোপীনাথ দয়াম্বুধিঃ।
বংশীবট তটে শ্রীমদ্ যমুনোপতটে শুভে।।
—(শ্রীসাধন দীপিকা)

জয় জয় মধু পণ্ডিত সুজন।
গৌর-নিত্যানন্দ যাঁর হয় প্রাণধন।।
বংশীবটে যাঁরে কৃপা কৈল গোপীনাথ।
শ্রীচরণ সেবা দিয়ে যাঁরে কৈল আত্মসাৎ।।

শ্রীমধু পণ্ডিতের সবিশেষ পরিচয় চৈতন্য চরিতামৃতে পাওয়া যায় না। শ্রীভক্তিরত্নাকরে কেবল শ্রীগোপীনাথ তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছেন এ কথা পাওয়া যায় মাত্র।

শ্রীমধু পণ্ডিত অতিশয় সরল, ভক্তিরসে বিহ্বল, অকিঞ্চন ভাবে দিন যাপন ও বংশীবটে অবস্থান করতেন। অষ্টপ্রহর কাল স্মরণ কীর্ত্তনে দিন যাপন এবং মাধুকরী করে জীবন ধারণ করতেন। তাঁর প্রিয় সঙ্গী ছিলেন শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য। দোঁহে কৃষ্ণ কথা রসে কালাতিপাত করতেন।

একদিন মধু পণ্ডিত বংশীবট তলে অকস্মাৎ অলৌকিক কিছু লীলা দেখতে লাগলেন। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সখাগণ সঙ্গে বড়ই মধুর লীলা করছেন। বলরাম সখাগণের অগ্রণী। কৃষ্ণ বিবিধ ক্রীড়া করতে করতে কখন সুবলের স্কন্ধে আরোহণ করছেন, পুনঃ সুবল কৃষ্ণ-স্কন্ধে আরোহণ করছেন।

অন্যান্য সখাগণও তাদৃশ ক্রীড়া সকল করছেন।

কৃষ্ণ কতক্ষণ পরে কন্দুক খেলতে লাগলেন। সব সখাগণও তখন কন্দুক ক্রীড়ায় মত্ত হলেন। কৃষ্ণ সকলকে পরাভূত করবার জন্য খুব চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ কন্দুক খেলার পর মল্লক্রীড়া আরম্ভ করলেন। কৃষ্ণের শরীর হতে দর দর ধারে ঘর্ম পড়ছে। ক্রীড়ারসে এমন মত্ত, অরাতি ভাবের ন্যায় প্রকাশ পাচ্ছে। পরস্পরের পদাঘাতে ধূলি সমূহে চতুর্দ্দিক অন্ধকার করছে। রামকৃষ্ণের চরণাঘাতে যেন ধরিত্রী কম্পমান হচ্ছে।

এরূপ কিছুক্ষণ মল্লযুদ্ধের পরে বিশ্রামের জন্য সকলে বংশীবটের তলে বসলেন এবং অশোকতরুর নবদল এনে তদ্দ্বারা শয্যা নির্ম্মাণ করে তাতে শ্রীকৃষ্ণকে শুইয়ে দিলেন, তখন কোন সখা শিশু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে নব পত্রদলে ব্যজন, কোন সখা শ্রীকৃষ্ণের মস্তক ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক সেবা করতে লাগলেন। এদিকে অন্যান্য সখাগণ আনন্দ ভরে নৃত্য, গীত ও বংশী শৃঙ্গাদি বাজাতে লাগলেন, কি অপূর্ব্ব আনন্দ উৎসব তা অবর্ণনীয়।

মধু পণ্ডিত এসব দিব্য লীলা অকস্মাৎ দর্শন করে আনন্দে পুলকিত রোমাঞ্চিত শরীরে ধরাতলে মূর্চ্ছা পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর আনন্দ মূর্চ্ছা ভাঙ্গল, তখন আর কিছু দেখতে পেলেন না, দেখলেন তথায় শ্রীগোপীনাথের এক অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি।

তিনি শ্রীমূর্ত্তির পাদপদ্মমূলে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে বহু স্তব স্তুতি করলেন। এ সংবাদ তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবগণের নিকট প্রেরণ করলেন। আনন্দে প্রেমস্রবণ নেত্রে বৈষ্ণবগণ তথায় এলেন এবং শ্রীমূর্ত্তির অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করে দণ্ডবৎ স্তুতি প্রভৃতি করলেন, শীঘ্রই অভিষেক মহাপূজার আয়োজন হল। অন্যদিকে নৈবেদ্য রন্ধন আরম্ভ হল। গোপগণ ভারে ভারে দই দুধ আনতে লাগলেন।

অতঃপর অভিষেকানন্তর বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করালেন। ভোগ

আরম্ভ হল, বৈষ্ণবগণ ভোগারতি কীর্ত্তন করতে লাগলেন। অনন্তর মধ্যাহ্ন মহানিরাজনের পর গোপীনাথের শয়ন দিলেন। সমাগত সহস্র সহস্র ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করলেন। এরূপে গোপীনাথের প্রকট উৎসব সমাপ্ত হল।

গোপীনাথের সেবাধিকারী হলেন—শ্রীমধু পণ্ডিত ও শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে আছে—

পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
শ্রীমধু পণ্ডিত অতি গুণের আলয়।।
দোঁহা প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
পরম দুর্গম চেষ্টা কহি সাধ্য কার।।
বংশীবট নিকটে পরম রম্য হয়।
তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয়।।

—(ভঃ রঃ ২।৪৭২)

শ্রীমধু পণ্ডিত, শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ও শ্রীগোস্বামিগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

শ্রীভাগবতাচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য বরাহনগরে অবস্থান করতেন। মহাপ্রভু নীলাচলে যাবার পথে কুমার হট্ট, পানিহাটি হয়ে বরাহনগরে এলেন।

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।।
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে।।
শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।।
'বল বল' বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়।।

— (চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।১১০-১১৩ শ্লোক)

বরাহনগরে শ্রীরঘুনাথ পণ্ডিতের গৃহে প্রভু উপস্থিত হলেন, রঘুনাথ প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভাগবত পাঠে মগ্ন, ভাগবতে তাঁর এ রকম মনোনিবেশ দেখে প্রভু আনন্দ ভরে বলতে লাগলেন 'পড় পড়'। প্রভু পরম সুখী হয়ে তাঁর নাম দিলেন ভাগবতাচার্য।

"প্রভু বলে,—ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে।।

এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য।।"

—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।১১৯-১২০)

প্রভুর আশীর্ব্বাদ শুনে ব্রাহ্মণ বড় সুখী হলেন। তিনি প্রভুকে দণ্ডবৎ করতেই প্রভু তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। একরাত্র প্রভু পরম সুখে ব্রাহ্মণের গৃহে যাপন করলেন।

শ্রীভাগবতাচার্য্য নিজেকে শ্রীগদাধর গোস্বামীর শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন—

"বন্দে নিত্যমনন্ত ভক্তিনিরতং ভক্তিপ্রিয়ং সদ্গুরুম্।
মদীশ্বর গদাধরং দ্বিজবরং ভৃত্যৈরূপাকৃতিম্।।

—(শ্রীকৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিণী)

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীল গদাধর নামে।
যাঁহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে।।
ক্ষিতিতলে কৃপায় করিলা অবতার।
অশেষ পাতকী জীবে করিতে উদ্ধার।।
বৈকুণ্ঠ নায়ক কৃষ্ণ চৈতন্য মূরতি।
তাঁহার অভিন্ন তেঁহ সহজে শকতি।।
মোর ইষ্ট দেব গুরু সেই দুই চরণ।
দেহ মন বাক্যে মোর সেই সে শরণ।।

— (শ্রীকৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিণী উপসংহার)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন।।

শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী।।
—(চৈঃ চঃ আদি ১২।৭৯-৮০)

শ্রীভাগবতাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণীতে মাঝে মাঝে শ্রীগৌর সুন্দরের অপূর্ব্ব মহিমা বলেছেন—

জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্র-বিহার।
জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার।।
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্য মূরতি।
প্রেম-ভক্তিদাতা প্রভু ভকতের গতি।।

—(কৃঃ প্রেঃ ১০।১।৩১)

কলিযুগ-অবতার শুন, সাবধানে।
কলিযুগে কেবল ভজিবে সংকীর্ত্তনে।।
'কৃষ্ণ' পদে 'কৃষ্ণ' বলি বর্ণ পদে নাম।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম জানিবে বিধান।।
'তিষাকৃষ্ণ'—অকৃষ্ণ 'গৌরাঙ্গ' নিজ-ধাম।
গৌরচন্দ্র-অবতার বিদিত বাখান।।
অঙ্গ-উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে।
গৌরচন্দ্র-অবতার সংকীর্ত্তন-রঙ্গে।।
—(কৃঃ প্রেঃ ১১।৫।৭৩)

জয় জয় গৌরচন্দ্র চৈতন্য-বিহার।
ভক্তকুল-প্রাণধন ভক্ত-অবতার।।
শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীনিবাস-হরিদাস-সঙ্গ।
নিত্যানন্দ-বলরাম-সহ নিত্য রঙ্গ।।

গদাধর প্রাণনাথ ভক্তকুলপতি।
ভক্তরূপ অবতার ত্রিজগৎ পতি।।

—(কৃঃ প্রেঃ ১।১৩৪)

শ্রীমদ্ ভাগবতাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী মহাপ্রভুর দর্শন লাভের পরেই লিখেছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন ভাগবতাচার্য্যের প্রথম মিলন হয়, তখন গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ চলছিল ও কিছু কিছু প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল।

বর্ত্তমান কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে গঙ্গার তীরে বরাহনগরের মালী পাড়া পল্লীতে শ্রীভাগবতাচার্য্য শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীপাটে শ্রীভাগবতাচার্য্যের হস্তলিখিত পুঁথিখানি দর্শন করান হয়ে থাকে।

চৈত্র কৃষ্ণ-দ্বাদশীতে শ্রীগৌরসুন্দর বরাহনগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করেছিলেন।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর

কাটোয়া থেকে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জন্মস্থান। শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীনরহরি দাস তিন ভাই। শ্রীমুকুন্দ দাসের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণকে প্রেমকল্পতরুর মহাশাখা বলে বর্ণন করেছেন।

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব সুলোচন।।
এই সব মহাশাখা—চৈতন্য, কৃপাধাম।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাহাঁ তাঁহা দান।।

— (চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৮-৭৯)

মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলায় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর যোগদান করেছিলেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখেছেন—

শ্রীসরকার ঠাকুর অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজের মধুমতী যে গুণের নাহি সীমা।।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামক গ্রন্থে স্বীয় গুরুদেবের পরিচয় সম্বন্ধে লিখেছেন—

শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুল মহাকুল-প্রভাব যাঁহার।।

অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জনে না বুঝান প্রেম বিনু।।

*　　　*　　　*

বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যাঁর।
রাধা প্রিয় সখী তিহোঁ মধুর ভাণ্ডার।।
এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহরি।
রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের ভাণ্ডারে অধিকারী।।
— (শ্রীচৈতন্য মঙ্গল সূত্র খণ্ড)

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের আরতি-কীর্ত্তনে গেয়েছেন—

নরহরি আদি করি চামর ঢুলায়।
সঞ্জয় মুকুন্দ বাসুঘোষ আদি গায়।।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর যেমন গায়ক ছিলেন তেমনি কবি ছিলেন। তিনি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের লীলা সম্বন্ধে বহু গীত লিখেছেন। তিনি "শ্রীভজনামৃত" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থও লিখেছেন দেখা যায়। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নামে আরোপিত গৌর-বিরহ গীত পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আওর গৌর,　　　পুনহি নদীয়া পুর,
হোয়ত মনহি উল্লাস।
ঐছে আনন্দ কন্দ,　　　কিয়ে হেরব,
করবহি কীর্ত্তন-বিলাস।।
হরি হরি কব হাম হেরব সো মুখ চাঁদ।
বিরহ পয়োধি কবহু,　　　দিন পঙ রব,
টুটব হৃদয়ক বাঁধ।

কুন্দন কনক পাঁতি, কব হেরব,
যজ্ঞ কি সূত্র বিরাজ।
বাহু যুগল তুলি, 'হরি' 'হরি' বোলব,
নটন ভকতগণ মাঝ।।
এত কহি নয়ন মুদি, রহু সব জন,
গৌর প্রেম ভেল ভোর।
নরহরি দাস আশ, কব পূরব,
হেরব গৌরকিশোর।।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের গীতগুলি প্রায় ভক্তিরত্নাকর রচয়িতা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তি পদের সহিত মিলে গেছে। তজ্জন্য ঠিক ঠিক সরকার ঠাকুরের কোন্‌টা গৌর-লীলা গীত তা বুঝা কঠিন।

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর লিখেছেন—

" গৌরাঙ্গ জন্মের আগে, বিবিধ রাগিণী রাগে,
ব্রজরস করিলেন গান।"

সরকার ঠাকুর গৌর পদ গীতি লিখবার আগে কৃষ্ণ-লীলাপদ গীতি বহু রচনা করেছিলেন।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ-একাদশীতে অপ্রকট হন।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী

করুণাময় শ্রীগৌরহরি প্রেম বিতরণ করতে করতে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ দেশের প্রতি নগরে নগরে শ্রীনাম-প্রেম বিতরণ করছেন। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত হরিনামামৃত পান করে সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণ শীতল হয়। দীন হীন পতিত জনগণ কৃষ্ণ নামামৃত পান করে জীবন ধন্যাতিধন্য করল। শ্রীমহাপ্রভু নাম-প্রেম বর্ষণ করতে করতে মহাতীর্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। শ্রীরঙ্গনাথ দেবের সুবিশাল গগনভেদী চূড়াযুক্ত শ্রীমন্দির। তার সাতটি প্রকার। দিন রাত লক্ষ লক্ষ দর্শকের সমাগম। ব্রাহ্মণগণ দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্রধ্বনিতে মন্দিরটী সর্ব্বদা মুখরিত। শ্রীগৌরসুন্দর যখন সে মন্দিরে কোটী গন্ধর্ব্ব বিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" নামকীর্ত্তন ধরলেন, সকলে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে উঠলেন। কি অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তিখানি, যার কাছে তপ্ত সোনার কান্তিও নিষ্প্রভ হয়। তাতে প্রস্ফুটিত কমল তুল্য দীর্ঘ নয়নযুগল দিয়ে দরদর করে প্রেমবারি ঝরছে। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষমা যেন মদনের মন হরণ করছে। ব্রাহ্মণগণ ভাবতে লাগলেন—এ কি কোন দেব? মনুষ্যের শরীরে কি এত অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হতে পারে? পুনঃ 'হরিবোল' 'হরিবোল' করে নেত্র-নীরে ভাসতে ভাসতে যখন শ্রীবিগ্রহের সামনে বাতাহত তরুর ন্যায় পতিত হলেন, তখন মনে হল,— যেন কনকগিরি ভূতলে লুটাচ্ছে। শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট দিব্য পুরুষটিকে দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে উঠে লোকজনকে সরিয়ে তিনি প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তনের সুবিধা করে দিতে লাগলেন। তারপর প্রভু যখন একটু স্থির হলেন, তখন ব্যেঙ্কট তাঁর শ্রীচরণ রজঃ গ্রহণ

করলেন। প্রভু তাঁর দিকে তাকিয়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট প্রভুকে আমন্ত্রণ করে স্বীয় গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁর শ্রীচরণ ধৌত করে সে উদক সপরিবারে পান করলেন। ভট্টের গৃহ আনন্দময় হল।

মহাপ্রভু ১৫১১ খৃষ্টাব্দে ব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে আগমন করেছিলেন। ভট্টের ত্রিমল্ল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে আরও দু'টি ভাই ছিলেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ছিলেন শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট ও ত্রিমল্লভট্ট রামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট। ইনি তখন শিশু। মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণাম করতে প্রভু তাঁকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। প্রভু ভোজনান্তর অবশেষ গোপালকে ডেকে দিলেন। এভাবে প্রসাদ দিয়ে তাঁকে ভবিষ্যৎ আচার্য্য পদবীতে অভিষিক্ত করলেন।

প্রভু যখন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এলেন তখন চাতুর্ম্মাস্য কাল। এ সময়টী প্রভু ভট্টের গৃহে যাপন করবার জন্য রইলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বহু 'শ্রী' সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের বাস, প্রভুর দিব্য-ভাব দেখে সকলে তাঁর প্রেমে আবিষ্ট হলেন। প্রতিদিন এক এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ প্রভুকে ভোজন করাতেন। চার মাস কাল এরূপে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও অনেক বৈষ্ণব গৃহস্থ আমন্ত্রণ করবার সুযোগ পেলেন না।

প্রভু ভট্ট গৃহে অবস্থান করতেন। শ্রীগোপাল প্রতিদিন প্রভুর পরিচর্য্যা করতেন। ভট্ট শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা করতেন। প্রভু তাঁদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসাদি করতেন।

প্রভু বললেন—ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী সাধ্বী শিরোমণি। আমার কৃষ্ণ গোপ, গো-চারক। তাঁর সঙ্গ কেন চান?

ব্যেঙ্কট ভট্ট বললেন—কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই স্বরূপ। কৃষ্ণেতে অধিক

লীলা বৈদগ্ধিতাদি গুণ আছে। তাঁর স্পর্শে পতিব্রতা ধর্ম যায় না, কৌতুক করে লক্ষ্মী তাঁর স্পর্শ করতে চান। এতে আপনি পরিহাস করছেন কেন?

প্রভু— লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করে কৃষ্ণকে পেলেন না। শ্রুতিগণ তপস্যা করে কৃষ্ণ পেলেন কি করে?

ভট্ট— এ বিষয়ে আমি কিছু বুঝতে পারি না।

"তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ, জান নিজ কর্ম।
যারে জানাহ, সেই জানে তোমার লীলা-মর্ম্ম।।"

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৯।১২৬)

প্রভু— কৃষ্ণের ইহাই বিশেষ লক্ষণ। স্বমাধুর্য্য দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। কৃষ্ণকে একমাত্র ব্রজগোপীর ভাবে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ নিত্য গোপরাজ-নন্দন। নিজেকে সতত গোপ অভিমান করেন। গোপীভিন্ন অন্য কাকেও তিনি স্পর্শ করেন না। লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠেশ্বরী। তিনি কদাপি গোপীর আনুগত্য স্বীকার করতে চান না। শ্রুতিগণ গোপীর আনুগত্যের জন্য তপস্যা করে গোপগৃহে গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করবার পর শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন। লক্ষ্মীদেবী সে দেহে শ্রীনন্দ নন্দনের সঙ্গ চান। সেজন্য তপস্যা করেও তিনি পান নি। ব্রজবাসীগণ জানেন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন। কেহ পুত্র জ্ঞানে, কেহ মিত্র জ্ঞানে ও কেহ কান্ত জ্ঞানে হৃদয়ভরে স্নেহ করে। যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্য, তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখলেও মুগ্ধ হন না। তাতে তাঁর বাৎসল্য-প্রীতি আরও বেড়ে যায়। দেবকীর ঐশ্বর্য্য-মিশ্র বাৎসল্য, ঐশ্বর্য্য মুগ্ধ হয়ে স্তুতি করেন। ভগবান্ কেবল বাৎসল্যভাবে যত প্রীত হন ঐশ্বর্য্যমিশ্র ভাবে তত প্রীত হন না।

ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হন না, তাঁকে ভগবান্ বলে মানেন না। এভাবে ভগবান্ বড়ই প্রীত হন। শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ। সেজন্য লক্ষ্মী প্রভৃতির মন হরণ করতে পারেন। কিন্তু শ্রীনারায়ণ গোপীগণের মন হরণ করতে পারেন না। এক সময় কৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে বিলাস করতে করতে অন্তর্ধান হলেন। গোপীগণ কাতরভাবে কুঞ্জে কুঞ্জে অন্বেষণ করতে লাগলেন। কোথাও পেলেন না। কৃষ্ণ গোপীগণকে বঞ্চনা করবার জন্য এক কুঞ্জের মধ্যে চতুর্ভুজরূপে অবস্থান করতে লাগলেন। গোপীগণ অনেক খোঁজ করতে করতে সে কুঞ্জে এলেন। চতুর্ভুজধারীকে দেখলেন, নারায়ণ জ্ঞান করে নমস্কার করলেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন— হে নারায়ণ! কৃপা করে নন্দনন্দনকে মিলিয়ে দাও। এ বলে গোপীগণ অন্যত্র কৃষ্ণ অন্বেষণ করতে লাগলেন। অবশেষে শ্রীরাধা ঠাকুরাণী অনুসন্ধান করতে করতে সেখানে এলেন এবং মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তখন কৃষ্ণ আর চতুর্ভুজ রাখতে পারলেন না, দ্বিভূজ হলেন।

শ্রীরাধা বললেন—হে সখি ললিতে! শীঘ্র এস বংশীধারীকে পেয়েছি।

ললিতা—বংশীধারী কোথায়?

শ্রীরাধা—এই তো বংশীধারী।

ললিতা—উনি ত' নারায়ণ?

বিশাখা—আমরা ত দেখে এলাম।

শ্রীরাধা— তোমরা কি চোখের মাথা খেয়েছ?

তখন সখিগণ সকলে সমবেত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ হাস্য করতে লাগলেন।

গোপীগণ কখন নারায়ণ স্বরূপ দেখে মুগ্ধ হন না।

ভট্ট-পরিবার প্রভুর শ্রীমুখে এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ করে যেন আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন। ব্যেঙ্কট ভট্ট প্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু তাঁকে তুলে আলিঙ্গন করলেন ও অনেক প্রশংসা করলেন।

ভট্টের গৃহে চার মাস প্রভু এরূপে কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে অতিবাহিত করলেন। তারপর বিদায় চাইলেন। ভট্ট-গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠল। ভট্ট পুত্র শ্রীগোপাল কেঁদে প্রভুর শ্রীচরণ তলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। প্রভু আর কয়েক দিন থেকে প্রবোধ দিয়ে গোপালকে বললেন,—তুমি এখন গৃহে মাতা-পিতার সেবা কর। পরে বৃন্দাবনে এস। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন কর। প্রভু সকলকে এরূপ উপদেশ করে তীর্থ যাত্রা করলেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার ও বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে পারদর্শী হলেন। তাঁর পিতৃব্য শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বিশেষ করে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগলেন। "পিতৃব্য কৃপায় সর্ব্ব-শাস্ত্রে হৈল জ্ঞান। গোপালের সম এথা নাই বিদ্যাবান্।।" (ভক্তিরত্নাকর প্রথম তরঙ্গ)

প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের পর হতে শ্রীগোপাল ভট্টের মন নিয়ত প্রভুর চরণ চিন্তায় মগ্ন হল। কবে পুনঃ প্রভুর দর্শন পাব? সর্ব্বদা এ চিন্তায় দিনাতিপাত করতেন। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে যেতে পারেন না। এরূপে কিছুদিন কেটে গেল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর অন্তিম সময় উপস্থিত হল। গোপালকে ডেকে বললেন—বৎস! আমার অন্তর্ধানের পর তুমি শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে বৃন্দাবনে চলে যাও। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এরূপ আদেশ করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করতে করতে স্বধামে প্রবেশ করলেন।

বৃন্দাবনে যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া।
দোঁহে সঙ্গোপন হৈলা প্রভু সোঙরিয়া।।
— (ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ-১৬৪ শ্লোক)

বৈষ্ণব পিতা-মাতার অপ্রকটের পর শ্রীগোপল ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে শ্রীগোপাল ভট্ট এলে শ্রীরূপ গোস্বামী পুরীতে প্রভুর নিকট তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণ পূর্ব্বক সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন।

প্রভু শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে পূর্ব্বেই জানিয়ে রেখেছিলেন বৃন্দাবনে শ্রীগোপল ভট্ট আগমন করবেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁকে আপন ভ্রাতার ন্যায় আদর-যত্ন করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে অনবদ্য প্রেম-মৈত্রী, ভাব প্রকট হল।

শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রেরিত লোক পত্রসহ পুরীতে মহাপ্রভুর সন্নিকট উপস্থিত হলেন। প্রভু পত্রখানি দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীগোপাল ভট্টের বিবরণ বলতে লাগলেন। প্রভু বৃন্দাবন থেকে শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রেরিত লোকের দ্বারা শ্রীরূপের নিকট পত্র ও শ্রীগোপাল ভট্টের জন্য ডোর কৌপীন ও বহির্বাস প্রেরণ করলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী সে লোকের মাধ্যমে প্রভুর পত্র ও শ্রীগোপাল ভট্টের জন্য কৌপীন বহির্বাসাদি পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হলেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু-দত্ত ডোর-কৌপীন পেয়ে বড়ই সুখী হলেন এবং উহা প্রভুর-কৃপা-প্রসাদ জ্ঞানে ধারণ করলেন। শ্রীরূপের পত্রে কি কি করণীয় তাও জ্ঞাত হলেন। সেইভাবে তিনি চলতে লাগলেন। তিনিও শ্রীরূপ-সনাতনের ন্যায় অনিকেত ছিলেন। কুঞ্জে কুঞ্জে রাত্রি যাপন করতেন এবং ভক্তি-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন লিখনাদি কাজ করতেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী দ্বাদশটী শালগ্রাম সেবা করতেন। যেখানে যেতেন ঝোলায় করে নিয়ে যেতেন। তাঁর মনে শ্রীবিগ্রহ সেবার ইচ্ছা হল। এ সময় একজন ধনী ব্যবসায়ী শ্রীভট্ট গোস্বামীর দর্শনের জন্য এলেন। শেঠ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে দর্শন সম্ভাষণ করে বড়ই সুখী হলেন। শ্রীভগবানের

সেবার জন্য বহু উপকরণ বস্ত্রালঙ্কার অর্পণ করলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সমস্ত দ্রব্য শালগ্রামের সামনে রেখে দিলেন।

শেঠজী শ্রীগোস্বামিপাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী সন্ধ্যাকালে শালগ্রামের আরতি করলেন এবং ভোগাদি অর্পণ করে শালগ্রামগণকে শয়ণ দিলেন। উপরে একখানি ঝুড়ি চাপা দিলেন। শ্রীগোস্বামিপাদ কিছু রাত্র পর্য্যন্ত ভজনাদি করবার পর কিছু সামান্য প্রসাদ নিয়ে শয়ন করলেন। প্রাতঃকালে যমুনা স্নান করে যখন শালগ্রাম জাগরণ করতে গেলেন, ঝুড়ি তুলে দেখলেন, শালগ্রামগুলির মধ্যে একটী শালগ্রাম দিব্য বংশীধারণ করে ত্রিভঙ্গরূপে অবস্থান করছেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী সে অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে বিবিধ স্তব ও স্তুতি করতে লাগলেন। এ শুভ সংবাদ শুনে শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী ও অন্যান্য বৈষ্ণব গোস্বামিগণ শীঘ্র তথায় উপস্থিত হলেন এবং ভুবনমোহন রূপ দর্শন করে প্রেমাশ্রু ধারায় সিক্ত হতে লাগলেন। সম্বৎ ১৫৯৯, খৃষ্টাব্দ ১৫৪২ বৈশাখী পূর্ণিমাতে এ শ্রীবিগ্রহ প্রকট হন। গোস্বামিগণ নামকরণ করলেন—"শ্রীরাধারমণ দেব।"

কোন সময় শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী হরিদ্বারের নিকট সাহারণ পুরে দেববন্দ্য গ্রামে শুভ বিজয় করেন। একদিন গ্রামান্তরে এক ভক্ত-গৃহে শুভ বিজয় করছেন। অপরাহ্ন কাল হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হল। পথে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিলেন। ব্রাহ্মণটি পরম ভক্তিমান। শ্রীভট্ট গোস্বামীকে খুব আদর যত্ন করতে লাগলেন। গোস্বামিপাদ তাতে খুব সুখী হলেন। ব্রাহ্মণটী অপুত্রক ছিলেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন, তোমার হরি-ভক্তিপরায়ণ পুত্র হবে। ব্রাহ্মণ বললেন—প্রথম পুত্র আপনার সেবার জন্য দিব।

শ্রীভট্ট গোস্বামী কিছুদিন সাহারণপুরে হরিনাম প্রচার করে বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। আসবার সময় গণ্ডকী নদী থেকে বারটী শালগ্রাম এনেছিলেন।

সে বারটী শালগ্রামের মধ্যে একটী মূর্ত্তি প্রকট করে শ্রীরাধারমণদেব নাম ধারণ করেন।

প্রায় দশ বছর পরের কথা। একদিন শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী মধ্যাহ্নকালে যমুনা স্নান করে ভজন কুটিরে ফিরছেন। দূর থেকে দেখলেন একটী শিশু দরজায় বসে আছে। শিশুটী শ্রীগোস্বামিপাদকে দেখে গাত্রোত্থান করলেন, তাঁকে দণ্ডবৎ করলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে? কুমারটি উত্তর করল আমি সাহারণপুর দেববন্দ্য গ্রাম থেকে এসেছি।

শ্রীভট্ট গোস্বামী— তোমার পিতার নাম কি? কেন আমার কাছে এসেছ? কুমার বললে—আপনার সেবা করবার জন্য পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার নাম গোপীনাথ। তখন শ্রীভট্ট গোস্বামী পূর্ব্ব কথাসমূহ মনে পড়ল। বালকটিকে সেবক করে রেখে দিলেন। গোপীনাথ অতি সাবধানে শ্রীভট্ট গোস্বামীর সেবা করতে লাগলেন।

পরবর্ত্তীকালে শ্রীগোপীনাথ পূজারী গোস্বামী নামে পরিচিত হন। ব্রহ্মচারীরূপে ইনি আজীবন শ্রীরাধারমণ দেবের সেবা করেছিলেন। এঁর ছোট ভাই শ্রীদামোদর দাস স-পরিবার শ্রীগোপীনাথজীর নিকট থেকে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শ্রীরাধারমণ দেবের সেবায় নিযুক্ত হন। শ্রীদামোদর দাসের তিন পুত্র হরিনাথ, মথুরানাথ ও হরিরাম।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীরাধারমণ দেবের সেবা করতে করতে মহাপ্রভুর কথা স্মরণে বিহ্বল হতেন। শ্রীভট্টের দু'নয়ন দিয়ে অশ্রুধারা ঝরত। তখন শ্রীরাধারমণ দেব শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে শ্রীভট্টকে দর্শন দিতেন।

গোপালের প্রেমাধীন শ্রীরাধারমণ।
শ্রীগৌরসুন্দর মূর্ত্তি হৈলা সেইক্ষণ।।
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৪র্থ তরঙ্গ—৩৪৫ শ্লোক)

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যকে মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীমদ্ সনাতন গোস্বামী শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনা করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর ষট্ সন্দর্ভের কারিকা, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, সৎ ক্রিয়াসার দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

অনঙ্গমঞ্জরী সাদ্য গোপাল ভট্টকঃ।
ভট্ট গোস্বামিনাং কোচিদাহুঃ শ্রীগুণ মঞ্জরী।।

যিনি পূর্ব্বে ব্রজে অনঙ্গ মঞ্জরী ছিলেন, তিনিই বর্ত্তমানে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী। কেহ কেহ বলেন ভট্ট গোস্বামী শ্রীগুণ মঞ্জরী ছিলেন। জন্ম শকাব্দ ১৪২৫, খৃষ্টাব্দ ১৫০৩ পৌষ কৃষ্ণ-তৃতীয়া।

শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী ৭৫ বছর প্রকট ছিলেন। শকাব্দ ১৫০০, খৃষ্টাব্দ ১৫৭৮ শ্রাবণ কৃষ্ণ-ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ অপ্রকট হন।

শ্রীগোপাল ভট্টের রচিত শ্লোক—

ভাণ্ডীরেশ শিখন্ডমন্ডন বর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে!
বৃন্দারণ্য পুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবর-শ্যামল।।
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ।
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়।।

(পদ্যাবলী)

“শ্রীগোপাল ভট্ট আশ,
বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস,
শয়ন স্বপন নয়নে হেরি’
ভুলল মন আপ হেঁ।

শাঙ্গর চীত উনতে নাগিও
পলকন নারে আঁখি।
যুথ যুথ, মন মথ ঝুলত,
গোপাল ভট্ট ইথে সাখি।।
ঐছে হট পুনঃ উলটি বৈঠলি,
কানুক বদন নিতান্ত না হেরলি,
গোপাল ভট্ট ভনয়ে,
ভামিনী পীরিতি টুটলো গো।।”

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিজ পরিচয় কিছু প্রদান করেছেন—ঝামটপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঝামটপুর বর্দ্ধমান জেলায় নৈহাটী গ্রামের নিকটবর্ত্তী। বর্ত্তমানে তথায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা আছে। পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয় স্বজন কেহ নাই।

আনন্দ-রত্নাবলী নামক গ্রন্থে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্ব পরিচয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে—"পিতার নাম শ্রীভগীরথ। মাতার নাম— শ্রীসুনন্দা, ছোট ভাইয়ের নাম—শ্যামদাস। বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চিকিৎসক ছিলেন।"

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী স্বীয় গৃহত্যাগের কারণ এরূপে বর্ণন করেছেন—এক সময় তাঁর গৃহে অহোরাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হচ্ছিল। তাতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভৃত্য শ্রীমীনকেতন রামদাস আগমন করেছিলেন। মহান্তগণ শ্রীমীনকেতন রামদাসকে দেখে আনন্দে তাঁকে স্বাগত সৎকার ও দণ্ডবৎ করেন এবং কীর্ত্তন মণ্ডপে নিয়ে বসান। তিনি তথায় আনন্দে উপবেশন করলেন। ভাগবতগণ সকলে—সম্ভাষণ করতে লাগলেন। সে সময় তিনি প্রেমাবেশে কাকেও গাঢ় আলিঙ্গন, কারও পৃষ্ঠে চাপড় মেরে ক্রোধে ধারণ, কারও শিরে হস্ত দিয়ে আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি করতে লাগলেন। তাঁর শুভাগমনে সকলে শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতি উদয় হল। খুব নৃত্য-গীত হতে লাগল। তিনিও প্রেমে মত্ত করীন্দ্রবৎ

ভ্রমণ করতে লাগলেন। এভাবে কিছুক্ষণ অতীত হল। তিনি ভক্তগণসহ বিশ্রাম করলেন।

গুণার্ণব মিশ্র নামে একজন ব্রাহ্মণ শ্রীমূর্ত্তি সেবা করছিলেন। তিনি শ্রীমীনকেতন রামদাসকে কোন প্রকার সম্ভাষণ করলেন না। তা দেখে শ্রীমীনকেতন রামদাস বললেন—

'এই ত দ্বিতীয় সুত রোমহর্ষণ।'
বলদেব দেখি, যে না কৈল প্রত্যুদ্গাম।।
—(চৈঃ চঃ আদি ৫।১৭০)

শ্রীমীনকেতন রামদাস একথা বলে পুনঃ নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। ভাগবতগণ অজ্ঞের অপরাধ গ্রহণ করেন না। এভাবে উৎসব সমাপ্ত হল। শ্রীমীনকেতন রামদাস সকলকে কৃপা আশীর্ব্বাদ দিয়ে বিদায় হলেন।

একদিবস শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের ছোটভাই শ্যামদাসের সঙ্গে শ্রীমীনকেতন শ্রীরামদাসের বাদ-বিতণ্ডা হচ্ছিল। শ্যামদাস শ্রীগৌরসুন্দরকে পূর্ণ ভক্তি করেন কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তাঁর তত ভক্তি নাই। শ্রীরামদাস বললেন দু'জন অভিন্ন দুজন ঈশ্বর। তুমি একজনকে মান, অন্যকে মান না—এতে তোমার সর্ব্বনাশ হবে। এ বলে ক্রোধভরে বংশী ভেঙ্গে চলে গেলেন। শ্রীশ্যামদাসের মহা অপরাধ হল।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ছোট ভায়ের প্রতি রুষ্ট হলেন। তাঁর সঙ্গ থেকে চির বিদায় নিয়ে তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। রাত্রে স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দর্শন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণদাসকে বলছেন—

আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ,—তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়।।
—(চৈঃ চঃ আদি ৫।১৯৫)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণমূলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বীয় অভয় শ্রীচরণযুগল তাঁর মস্তকে ধারণ করে বললেন—তুই শীঘ্র বৃন্দাবনে যা। সেখানে তোর সমস্ত আশা পূর্ণ হবে। স্বপ্নে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করে আনন্দে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে চলতে লাগলেন।

শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু—

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম।।
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়।।
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়।।
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত।।
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ।।
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।।
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়।।
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে।।
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার।।

যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার।।
মো পাপিষ্ঠে আনি শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিল শ্রীরূপ চরণ।।
—(চৈঃ চঃ আদি ৫।২০০-২১০)

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীগোপাল ভট্ট এই ছয়জন গোস্বামীকে তিনি শিক্ষাগুরু রূপে বরণ করেছেন। তিনি গোস্বামিগণের আজ্ঞায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখবার জন্য শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর নিকট কৃপাশীষ প্রার্থনা করতে যান। তখন তাঁরা ঐ গ্রন্থে তাঁদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করতে নিষেধ করেন। তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর রচিত গ্রন্থাবলী—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গ-রঙ্গদা টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। আর অন্যান্য লিখিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

তাঁর আবির্ভাব ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ, তিরোভাবের কাল পাওয়া যায় না। আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশীতে তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে অপ্রকট হন।

শ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুর

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর লিখেছেন—

রামদাস, কবিচন্দ্র, শ্রীগোপালদাস।
ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গদাস।।

—(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১০।১১৩)

শ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুরকে কেহ শ্রীসার্ঙ্গ ঠাকুর কেহ শ্রীসার্ঙ্গপাণি ও কেহ সার্ঙ্গধর বলেন। তিনি নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুম দ্বীপে (মামগাছিতে) অবস্থান করতেন। তথায় অদ্যাপি তাঁর সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ বিদ্যমান। মন্দির আঙ্গিনায় প্রাচীন একটি বকুল বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটি সেই সময়কার বলে অনুমিত হয়।

কথিত আছে শ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুর শিষ্য করবেন না বলে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু মহাপ্রভু শিষ্য করবার জন্য বার বার তাঁকে প্রেরণা দান করেন। অবশেষে তিনি শিষ্য করতে রাজি হলেন এবং বললেন—তাঁর সঙ্গে পরদিন প্রাতে সর্ব্বপ্রথম যার দেখা হবে তাকেই শিষ্য করে মন্ত্র দিবেন।

পরদিন প্রাতে স্নান করতে গঙ্গায় চললেন। ঘটনাক্রমে গঙ্গাঘাটে একটি মৃতদেহে তাঁর পদস্পর্শ হল। তিনি দেহটাকে তুলে বললেন—তুমি কে? গাত্রোত্থান কর। আশ্চর্য্য যে মৃত দেহটি তাঁর আদেশে গাত্রোত্থান করল এবং তাঁকে নমস্কার করে সম্মুখে বসল। বললে—আমার নাম মুরারি। আমি আপনার দাস। আমাকে কৃপা করুন। শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর তাঁকে মন্ত্র দীক্ষা দিয়ে

শিষ্য করলেন। তখন শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের নাম হল সারঙ্গ মুরারি। মুরারি একান্তভাবে শ্রীগুরুসেবা করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর তাঁকে শ্রীরাধা গোপীনাথের সেবাধিকারী করলেন। তিনি শ্রীমুরারি ঠাকুর নামে খ্যাত হলেন।

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—"যিনি পূর্ব্বে ব্রজলীলায় শ্রীনান্দীমুখী ছিলেন তিনি অধুনা শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর নামে খ্যাত।"

তাঁর আবির্ভাব আষাঢ় কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী তিথিতে ও তিরোভাব অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী তিথিতে।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তাঁরে নাহি ভায়।।
—(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ৬।১৩৬)

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা-সম পত্নীকে ত্যাগ করে এলেন শ্রীপুরীধামে। শ্রীগৌরসুন্দরের কোটি চন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণ-ছায়ায় তাঁর সংসারতপ্ত হৃদয় শীতল হল।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীগোবর্দ্ধন দাস। জ্যেঠার নাম—শ্রীহরিণ্য দাস। তাঁরা কায়স্থ কুলোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁদের রাজপ্রদত্ত উপাধি ছিল 'মজুমদার'। বিশ লক্ষ মুদ্রা তাঁদের বাৎসরিক আয় ছিল।

শ্রীরঘুনাথ দাস শৈশবে পুরোহিত আচার্য্য শ্রীবলরাম দাসের গৃহে অধ্যয়ন করতেন। শ্রীবলরাম দাস শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপা পাত্র ছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে মাঝে তাঁর গৃহে শুভাগমন করতেন। এসময় তিনি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্তির ও তত্ত্বোপদেশ প্রভৃতি শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁর আদর যত্নের সীমা ছিল না। রাজপুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হতেন, সৎসঙ্গ প্রভাবে অল্প বয়সে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করতে পারলেন। এ সংসারের ধন,

জন, পিতা-মাতা ও স্বজনাদির প্রতি অনাসক্তি ভাবের উদয় হ'ল। ক্রমে ভক্ত পরম্পরায় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহিমা শ্রবণ-পূর্ব্বক তাঁদের শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্য উৎকণ্ঠাযুক্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি যখন শুনলেন শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করে নদীয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চলেছেন দেশান্তরে তখন তিনি পাগল প্রায় হয়ে ছুটে এলেন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে। সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করলেন। লুটিয়ে পড়লেন শ্রীরঘুনাথ প্রভুর শ্রীচরণ যুগলে। প্রভু দেখে বুঝতে পেরেছেন এ তাঁর নিত্য প্রিয়জন। আনন্দে শ্রীরঘুনাথকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। শ্রী রঘুনাথ কাঁদতে কাঁদতে বললেন আপনার সঙ্গে আমিও যাব। তখন প্রভু বললেন—

"স্থির হৈয়া ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল।।

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।।
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।।
বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে।।
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে।।
এত কহি' মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি' মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৬।২৩৭-২৪২)

প্রভুর—এ আদেশ শুনে শ্রীরঘুনাথ ঘরে ফিরে গেলেন এবং বিষয়ী-প্রায় অবস্থান করে সংসারে কার্য্য করতে লাগলেন। ইহাতে পিতা-মাতা অতিশয়

সুখী হলেন। শ্রীরঘুনাথের মন প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে আছে। একরাতে পালিয়ে তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর পিতা দশ জন লোক পাঠিয়ে তাঁকে ধরে আনলেন। এরূপে যতবার রঘুনাথ পালায় ততবার তাঁকে ধরে আনা হয়। বংশের একমাত্র সন্তান রঘুনাথ। তাঁকে কড়া পাহারা দিয়ে রাখা হল। পিতা-মাতা চিন্তা করলেন রঘুনাথের যদি বিবাহ্ দেওয়া যায় তবে আর পালাতে পারবে না। রঘুনাথকে অল্প বয়সে বিবাহ্ দিলেন এক বড় জমিদারের কন্যার সঙ্গে। পত্নী দেখতে অপ্সরার ন্যায়। শ্রীরঘুনাথের মন তাতে কি মোহিত হয়? তাঁর মন কোটি কন্দর্পের দর্পহারী শ্রীহরির পাদপদ্মে।

অর্থ হলে শত্রুও হয়। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের জমিদারীর মোট আয় বিশ লক্ষ। নবাবকে দিতে হত বার লক্ষ। এ ঐশ্বর্য্য দেখে মুসলমান চৌধুরীর সহ্য হল না। চৌধুরী নবাবের সেরেস্তায় গিয়ে মিথ্যা নালিশ করল। হুজুর ঘরের খবর রাখেন না? হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের জমিদারীতে বর্ত্তমান আয় বিশ লক্ষ কিন্তু আপনাকে দিচ্ছে বার লক্ষ মাত্র। আদায় যদি বেশী হয় আপনাদের করও তাকে বেশী দিতে হবে। নবাব বললেন,— তুমি ঠিক বলছ, তলব কর। রাজাকে কম দিয়ে নিজে বেশী নিচ্ছে এ কেমনতর কথা? হিরণ্য-গোবর্দ্ধনকে বন্দী কর। হিরণ্য-গোবর্দ্ধন একথা শুনে পালালেন। নবাবের সৈন্য বাড়ী ঘিরল। তাঁদের না পেয়ে শ্রীরঘুনাথ দাসকে বেঁধে নিয়ে গেল। তাঁকে কারাগারে রাখল। উজির ধমক দিয়ে বলে—তোমার বাপ জ্যেঠা কোথায়?

আমি জানি না।

তুমি জান, কিন্তু মিথ্যা বলছ।

আমি কি করে জানব তাঁরা কোথায় গেছেন? উজির তখন খুব তর্জ্জন-গর্জ্জন করতে করতে মারবার ভয় দেখাতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস কিন্তু নির্ভীক। উজির রঘুনাথের সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রসন্ন বদন দেখে ভুলে গেলেন।

"মারিতে আসিয়া যদি দেখে রঘুনাথ। মন ফিরে যায় তবে না পারে মারিতে।।" —(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬।২২) মুসলমান উজির মনে মনে ভয় পেলেন। কায়স্থ জাতি। তাদের বুদ্ধি-বিদ্যার কাছে সকলে নত হয়। শ্রীরঘুনাথের মিষ্ট বাক্যে ক্রমে উজিরের মন নরম হল, বলতে লাগলেন— তোমার বাপ-জ্যেঠা এত টাকা পাচ্ছে, আমাদের বেশী দিচ্ছে না। শ্রীরঘুনাথ বললেন—আমার বাপ-জ্যেঠা ত আপনার ভায়ের মত। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হয় আবার সহজে মিলনও হয়। আমি যেমন পিতার পুত্র, তেমনি আপনারও পুত্র। আমি আপনার পাল্য, আপনি আমার পালক। পালক হয়ে পাল্যকে তাড়ন করা উচিত নয়। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, জিন্দাপীরের ন্যায় ব্যক্তি। অধিক আর কি বলব? এ কথা শুনে ম্লেচ্ছ অধিকারীর মন আর্দ্র হল। দাড়ি বেয়ে অশ্রু পড়তে লাগল। বললেন—আজ থেকে তুমি আমার পুত্র। অধিকারী এ কথা বলে শ্রীরঘুনাথকে মুক্ত করে দিলেন। শ্রীরঘুনাথ ঘরে ফিরে এলেন এবং বাপ-জ্যেঠাকে বলে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করালেন। মীমাংসা সহজেই হয়ে গেল। শ্রীরঘুনাথকে সকলে প্রশংসা করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দাসের এক বছর এভাবে কেটে গেল। শ্রীরঘুনাথ দাস আবার সংসার ছেড়ে পালাবার জন্য উদ্যত হলেন। পিতা জানতে পেরে কড়া পাহারা দিয়ে রাখতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ নিরুপায় হলেন। ভাবতে লাগলেন কেন শ্রীগৌরসুন্দর নিজ পাদপদ্মে আমাকে স্থান দিচ্ছেন না? তাঁর জননী বলতে লাগলেন—পুত্র পাগল হয়েছে, বেঁধে রাখ। পিতা বললেন— বেঁধে রাখলেই বা কি হবে?

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন।।
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে।।

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে।
চৈতন্য প্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে?
—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬।৩৯-৪১)

গোবর্দ্ধন দাস একথা বলে পত্নীকে প্রবোধ দিলেন। একদিন শ্রীরঘুনাথ চিন্তা করলেন, করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ছাড়া বোধ হয় শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাওয়া যাবে না। আগে তাঁর শ্রীচরণ একবার দর্শন করি। শ্রীরঘুনাথ একদিন বাপ-মাকে বললেন—আমি পানিহাটিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঘরে কীর্ত্তন-মহোৎসব দর্শন করতে যাব। এবার বাপ-মা বাধা দিলেন না, যাবার অনুমতি দিলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে কয়েকজন ভৃত্য দিলেন ও অর্থ-কড়ি দিলেন।

পানিহাটি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভাবে আনন্দময়। গৃহে-গৃহে শ্রীহরি সংকীর্ত্তন মহোৎসব। শ্রীরঘুনাথ দাস পানিহাটিতে এসে পরম সুখী হলেন। ক্রমে তিনি গঙ্গাতটে যেখানে ভক্ত সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসে আছেন সে স্থানে উপস্থিত হলেন। দূর থেকে শ্রীরঘুনাথ দেখলেন, গঙ্গাতট আলোকিত করে একটা বৃক্ষমূলে ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসে আছেন। শ্রীরঘুনাথ দেখেই দূর থেকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

শ্রীহিরণ্য-গোবর্দ্ধন প্রসিদ্ধ জমিদার। সর্ব্বত্র তাঁদের খ্যাতি। তাঁরা ব্রাহ্মণ- বৈষ্ণবের সেবা-পরায়ণ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি নবদ্বীপ শান্তিপুরাদি নিবাসী পণ্ডিতগণেকে বহু অর্থ-কড়ি দানাদি করে সাহায্য করেন। তাঁদের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস এসেছেন সর্ব্বত্র সাড়া পড়ে গেল। শ্রীরঘুনাথ দাসের কথা ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসের নাম শুনেই বললেন — রে রে চোরা! আয়, তোকে আজ দণ্ড দিব। ভক্তগণ শ্রীরঘুনাথ দাসকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিয়ে এলেন। শ্রীচরণ মূলে রঘুনাথ দাস লুটিয়ে পড়লেন। করুণাময় নিত্যানন্দ

অভয় চরণ তাঁর শিরে ধারণ করলেন, শ্রীরঘুনাথের সেই শ্রীচরণ-স্পর্শ মাত্র যেন সব বন্ধন কেটে গেল। সহাস্য বদনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলতে লাগলেন— তুমি আমার ভক্তগণকে চিড়া-দধি ভোজন করাও। এ তোমার দণ্ড। এ কথা শুনে শ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। তখনই দই-চিড়া মহোৎসবের আয়োজন আরম্ভ হল। চারিদিকে লোক প্রেরণ করে দই-চিড়া আনতে লাগলেন। উৎসবের নাম শুনে পসারিগণ দই চিড়া পাকা কলাদি নিয়ে পসার বসাল। শ্রীরঘুনাথ দাস মুল্য দিয়ে সমস্ত দ্রব্য খরিদপূর্ব্বক নিতে লাগলেন। এদিকে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ভক্তগণ সজ্জন ব্রাহ্মণগণ আসতে লাগলেন। বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকার মধ্যে পাঁচ-সাত জন ব্রাহ্মণ চিড়া ভিজাতে লাগলেন। একজন ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্য চিড়া ভিজাতে লাগলেন। অর্দ্ধেক চিড়া দই কলা দিয়ে, আর অর্দ্ধেক ঘন দুধ, চিনি চাঁপা কলা দিয়ে মাখতে লাগলেন। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপর উপবেশন করলেন। তখন তাঁর সামনে চিড়া-দইপূর্ণ সাতটী মৃৎকুণ্ডিকা রাখা হল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চারি পার্শ্বে রামদাস, সুন্দরানন্দ দাস, গদাধর, শ্রীমুরারি, কমলাকর, শ্রীপুরন্দর, ধনঞ্জয়, শ্রীজগদীশ, শ্রীপরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত, শ্রীগৌরীদাস, হোড়কৃষ্ণ দাস, ও উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণ উপবেশন করলেন। নীচে বসলেন অভ্যাগত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যগণ। গঙ্গাতটে স্থান না পেয়ে কেহ কেহ গঙ্গায় নেমে চিড়া-দই নিচ্ছেন। সে দিন শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঘরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আমন্ত্রণ ছিল। বিলম্ব দেখে শ্রীরাঘব পণ্ডিত স্বয়ং এলেন। দেখলেন—বিরাট মহোৎসবের ঘটা, ঠিক যেন সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বন্য-ভোজন লীলা। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন—রাঘব! তোমার ঘরের প্রসাদ রাত্রে গ্রহণ করব। এখন রঘুনাথ দাসের উৎসব হউক। তুমিও বস। এ বলে তাঁকে নিকটে বসালেন এবং দই চিড়া ও দুধ-চিড়াপূর্ণ দুটা মৃৎকুণ্ডিকা এনে দিলেন। সকলের চিড়া দেওয়া শেষ হলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর ধ্যানে বসলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর ধ্যানে জানতে পেরে তথায় এলেন।

"মহাপ্রভু আইল দেখি নিতাই উঠিলা। তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা।।" (চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হাস্য করতে করতে সবাকার হোলনা থেকে এক এক গ্রাস নিয়ে মহাপ্রভুর মুখে দিতে লাগলেন। এ রূপ লীলাপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিছুক্ষণ ভ্রমণ করতে লাগলেন। তারপর নিজ আসনে তিনি বসলেন ও ভক্তগণকে ভোজন করতে আদেশ দিলেন। মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনিতে ভক্তগণ দশদিক মুখরিত করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভোজন করছেন না দেখে কেহই ভোজন করছেন না। ভক্তগণ অগ্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভোজন করবার প্রার্থনা জানালেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভোজন আরম্ভ করলেন। সমস্ত ভক্তগণ আনন্দভরে ভোজন করতে লাগলেন। সকলের পুলিন ভোজনের কথা মনে হতে লাগল। ভোজন শেষ হলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাসকে ডেকে অবশেষ প্রদান করলেন। এবার শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা-প্রসাদে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাবেন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন। তারপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁর শিরে হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন— "অচিরাৎ প্রভু তোমাকে কৃপা করবেন।"

অতঃপর শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভু ভক্তগণের সেবার্থে কিছু কিছু মুদ্রাদি দিয়ে গৃহে যাবার জন্য বিদায় চাইলেন। ভক্তগণ সকলেই কৃপা আশীর্ব্বাদ করলেন। শ্রীরঘুনাথ এ রূপে গৃহে ফিরে এলেন। শ্রীরঘুনাথকে দেখে পিতা-মাতা সুখী হলেন। শ্রীরঘুনাথ বাহ্য ব্যবহার ঠিক মত করতে লাগলেন। এবার বাহিরে দুর্গামণ্ডপে শয়ন করতে লাগলেন। পাহারাদারগণ তাঁকে ঠিক ঠিক পাহারা দিতে লাগল।

একদিন প্রায় চার দণ্ড রাত থাকতে তাঁদের গুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য রঘুনাথের গৃহে এলেন। তিনি এসে দাঁড়াতেই শ্রীরঘুনাথ শয্যা থেকে উঠে দণ্ডবৎ করলেন ও এত রাত্রে আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি

বললেন—বিগ্রহ সেবকটি সেবা ত্যাগ করে গৃহে চলে গেছে, তুমি তাকে বুঝিয়ে পুনর্ব্বার সেবায় নিযুক্ত করার ব্যবস্থা কর। শ্রীরঘুনাথ দাস বললেন—চলুন, আমি তাকে বুঝিয়ে বিগ্রহের সেবায় পুনঃ নিযুক্ত করে দিব। এ বলে শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের সঙ্গে চললেন। পাহারাদারগণ ঘুমন্ত অবস্থায় মনে করল রঘুনাথ গুরুদেবের সঙ্গে তার গৃহে যাচ্ছে। শ্রীরঘুনাথ কিছু দূর শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে গিয়ে বললেন—গুরুদেব! আপনি গৃহে ফিরে যান আমি সেবকটিকে বুঝিয়ে শীঘ্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য বললেন—আচ্ছা তুমি যাও। শ্রীরঘুনাথ দাস ভাবলেন প্রভু ভাল সময় উপস্থিত করেছেন। কৌশলে তিনি শ্রীগুরুদেবের আদেশ নিয়ে শ্রীপুরী ধামের দিকে যাত্রা করলেন। গ্রামের প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে বন পথে চলতে লাগলেন। এক দিনে পনর ক্রোশ রাস্তা হেঁটে সন্ধ্যার সময় এক গোপ পল্লীতে উপস্থিত হলেন এবং গোয়ালাদের থেকে কিছু দুধ মেগে পান করে রাত কাটালেন। সকাল বেলা আবার চলতে লাগলেন।

এদিকে সকাল বেলা শ্রীরঘুনাথের খোঁজ আরম্ভ হল। গোবর্দ্ধন দাস তাড়াতাড়ি গুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের গৃহে এলেন। রঘুনাথ কোথায়? যদুনন্দন দাস সব ঘটনা বললেন। এবার গোবর্দ্ধন দাস বুঝতে পারলেন, রঘুনাথ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠল। তৎক্ষণাৎ চারিদিকে অনুসন্ধানের জন্য লোকজন ছুটল। বহু অনুসন্ধান করেও রঘুনাথকে পাওয়া গেল না। গোবর্দ্ধন দাস গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলের দিকে রঘুনাথ যাচ্ছে কিনা সন্ধান নেওয়ার জন্য কয়েকজন লোককে পত্র লিখে শ্রীশিবানন্দ সেনের নিকট প্রেরণ করলেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের লোক শ্রীশিবানন্দ সেনকে নীলাচলের পথে গিয়ে ধরল এবং সব কথা বলল ও পত্র দিল। শ্রীশিবানন্দ সেন সব কথা বুঝলে পারলেন। তিনি জানালেন তাঁদের সঙ্গে রঘুনাথ আসে নাই। হয় ত অন্য পথে নীলাচলে গিয়েছে লোক এসে হিরণ্য-গোবর্দ্ধন দাসকে

এ সংবাদ জানাল।

শ্রীরঘুনাথ দাস ছত্রভোগের পথে পুরীর দিকে চললেন।

ভক্ষণ অপেক্ষা নাহি, সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্য-চরণ প্রাপ্ত্যে মন।।
কভু চর্ব্বন, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে, তাহে রাখে নিজ প্রাণ।।
— (চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬।১৮৬-১৮৭)

এ ভাবে এক মাসের পথ বার দিনে অতিক্রম করে পুরীতে পৌছলেন। এর মধ্যে তিন দিন মাত্র ভোজন করেছিলেন। পুরীতে পৌছে লোক-পরম্পরা জেনে মহাপ্রভুর নিকট এলেন। দূর থেকে শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভুকে বন্দনা করতেই মুকুন্দ দেখলেন ও বুঝতে পারলেন। প্রভুকে বললেন—রঘুনাথ দাস দণ্ডবৎ করছে। ইহা শুনে প্রভু বললেন, রঘুনাথ! রঘুনাথ! এস, এস। রঘুনাথ নম্রভাবে নিকটে আসলেই প্রভু উঠে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভুর স্নেহ-আলিঙ্গনে রঘুনাথের সমস্ত দুঃখ দূর হল। আনন্দে তাঁর দু-নয়ন দিয়ে প্রেম অশ্রু পড়তে লাগল। প্রভু বললেন—রঘুনাথ! কৃষ্ণ বড় করুণাময়। তোমাকে বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্ত থেকে উদ্ধার করেছেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস বললেন—প্রভো! আমি কৃষ্ণ কৃপা জানি না। তোমার কৃপায় উদ্ধার হয়েছি এ মাত্র জানি। তখন প্রভু হাস্য করতে করতে বললেন—তোমার বাপ জ্যেঠা বিষয়টাকে সুখ বলে মনে করে। ব্রাহ্মণের সেবা করে ও পুণ্য করে। অভিমান করে আমি বড় দানী। তারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নন, বৈষ্ণবপ্রায়। বিষয় বাড়ান তাদের যাবতীয় সৎকার্য্যের মূলে। বিষয়বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কিরূপে তার সন্ধান রাখে না। বিষয়ের এমন স্বভাব মনুষ্যের মন্দ প্রবৃত্তি এনে দেবেই। রঘুনাথ! এমন বিষয় থেকে তুমি মুক্তি লাভ করেছ। তোমার বাপ-জ্যেঠাকে আমার মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ভায়ের মত দেখেন।

সে সম্বন্ধে তোমার বাপ জ্যেঠা আমার আজা হন। তাই পরিহাস করে তোমাকে এ সব কথা বললাম।

অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে সম্বোধন করে বললেন রঘুনাথকে তোমায় দিলাম। পুত্র বা ভৃত্য জ্ঞানে একে অঙ্গীকার কর। 'স্বরূপের রঘু' বলে এর খ্যাতি হবে। তারপর প্রভু তাঁকে শীঘ্র সমুদ্র-স্নান ও জগন্নাথ দর্শন করে এসে প্রসাদ গ্রহণ করতে বললেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস সমুদ্র-স্নান ও জগন্নাথ দর্শন করে এলে শ্রীগোবিন্দ প্রভুর ভোজন অবশেষ পাত্রটি তাঁকে দিলেন। শ্রীরঘুনাথ মহানন্দে প্রভুর অবশেষ পেয়ে সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হলেন। নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করলেন। পাঁচ দিন শ্রীরঘুনাথ প্রভুর নিকট ভোজন করলেন। অনন্তর সারা দিন ভজন করতেন। রাত্রে সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে মেগে খেতেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তা জানতে পেরে একদিন সেবক গোবিন্দকে ভঙ্গী করে জিজ্ঞাসা করলেন রঘুনাথ প্রসাদ নিচ্ছে কি? গোবিন্দ বললেন—এখানে প্রসাদ নেওয়া বন্ধ করে রাত্রে সিংহদ্বারে মেগে খায়। প্রভু তা শুনে বললেন—

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ।।
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।।
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ।।
বৈরাগীর কৃত্য-সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ।।
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।

—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬।২২৩-২২৭)

প্রভু জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীরঘুনাথ দাসকে লক্ষ্য করে এ সমস্ত কথা বললেন। শ্রীরঘুনাথ দাস বাস্তবতঃ সর্ব্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ।

শ্রীরঘুনাথ দাস সামনা সামনি প্রভুর কাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেন না। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী দ্বারা বা অন্য কারও দ্বারা জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। প্রভু তার উত্তরে বলতে লাগলেন—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যকথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।।

—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬।২৩৬-২৩৭)

প্রভুর শ্রীমুখ থেকে শ্রীরঘুনাথ দাস এই অমৃতময় উপদেশ শুনে প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ বন্দনা করলেন। প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাসকে স্নেহে আলিঙ্গন করলেন।

একদিন শিবানন্দ সেন শ্রীরঘুনাথ দাসের কাছে তাঁর পিতার যাবতীয় চেষ্টার কথা বললেন। রথযাত্রা উৎসব শেষ হলে গৌড়দেশের ভক্তগণ মহাপ্রভুর অনুজ্ঞা নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। শ্রীগোবর্দ্ধন দাস মজুমদার প্রেরিত লোক শ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহে এসে তাঁর নিকট শ্রীরঘুনাথের সম্বন্ধে যাবতীয় কথা শ্রবণ করলেন। অতঃপর শ্রীগোবর্দ্ধনদাস শ্রীরঘুনাথের নিকট একজন ব্রাহ্মণ ও এক ভৃত্য এবং চারশত মুদ্রা প্রেরণ করলেন। শ্রীরঘুনাথ সে-অর্থ স্বয়ং গ্রহণ না করে প্রভুর সেবার জন্য কিছু কিছু গ্রহণ করতে লাগলেন। মাসে দুদিন মহাপ্রভুকে আমন্ত্রণ করে ভোজন করাতে লাগলেন। দু বছর এভাবে কেটে গেল। তারপর প্রভুর নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিলেন। একদিন শ্রীস্বরূপ

দামোদর গোস্বামী শ্রীরঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন - প্রভুর ভোজন আমন্ত্রণ বন্ধ করলে কেন? শ্রীরঘুনাথ দাস বললেন—বিষয়ীর অন্নে প্রভুর মন প্রসন্ন হয় না। আমার অনুরোধে তিনি নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন মাত্র। এ নিমন্ত্রণে মাত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া কিছু নাই। প্রভু এ কথা শুনে সুখী হয়ে বললেন—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।।

— (চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬।২৭৮)

আমি রঘুনাথের আগ্রহে কেবল আমন্ত্রণ স্বীকার করতাম।

শ্রীরঘুনাথ দাস কিছুদিন সিংহদ্বারে মেগে খাওয়ার পর ছত্রে গিয়ে মেগে খেতে লাগলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তা বুঝতে পেরে ছলপূর্ব্বক সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন এখন রঘুনাথ কি সিংহদ্বারে মেগে খায়? সেবক বললেন—রঘুনাথ সিংহদ্বারে মেগে খাওয়া বন্ধ করে ছত্রে গিয়ে মেগে খায়। তা শুনে প্রভু বললেন—

"প্রভু কহে,—ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি – বেশ্যার আচার।।"

— (চৈঃ চঃ ৬।২৮৪)

শ্রীরঘুনাথের আচরণে প্রভু পরম সুখী হলেন। অন্য একদিবস শ্রীরঘুনাথকে ডেকে প্রভু গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা দিয়ে বললেন—

"প্রভু কহে,—"এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ।।"

— (চৈঃ চঃ ৬।২৯৪)

এই গোবর্দ্ধন শিলাটী প্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জ্ঞানে কখন হৃদয়ে ধারণ, কখন অঙ্গ আঘ্রাণ করতেন, কখন বা নেত্র জলে স্নান করাতেন। তিন বছর

প্রভু এ শিলা সেবার পর প্রিয় শ্রীরঘুনাথ দাসকে অর্পন করলেন। পূর্ব্বে শ্রীশঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক একজন সন্ন্যাসী বৃন্দাবন ধাম থেকে এ শিলা ও গুঞ্জামালা নিয়ে প্রভুকে বহু আগ্রহ করে ভেট দিয়েছিলেন। প্রভু স্মরণের সময় গুঞ্জামালাটি কণ্ঠে ধারণ করতেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস জল তুলসী দিয়ে সেই গোবর্দ্ধন শিলার সাত্ত্বিক সেবা করতে লাগলেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু জলের জন্য একটী কুঁজা দিলেন। শ্রীরঘুনাথ কিছুদিন এরূপ সাত্ত্বিক সেবা করতে থাকলে, একদিন স্বরূপ দামোদর প্রভু বললেন— রঘুনাথ গিরিধারীকে কমপক্ষে আটটি কড়ির খাজা সন্দেশ প্রদান কর। সেদিন থেকে শ্রীরঘুনাথ আট কড়ির খাজা সন্দেশ গিরিধারীকে ভোগ দিতে লাগলেন। তিনি খুব নিয়মের সহিত ভজন করতেন। সাড়ে সাত প্রহর ভজন-কীর্ত্তনে অতিবাহিত করতেন। চার দণ্ড মাত্র আহারের জন্য দিতেন। জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করতেন। গাত্র-আবরণ ছিল এক ছেঁড়া কাথা।.

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কিছুদিন ছত্রে মেগে খাওয়ার পর তা বন্ধ করে বাজারে পরিত্যক্ত পচা অন্ন-প্রসাদ এনে জলে ধুয়ে লবণ দিয়ে সে প্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন। একদিন শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু শ্রীরঘুনাথের ভজন কুটীরে এসে সেই প্রসাদ এক মুষ্টি মেগে খেলেন। খুব তৃপ্তি পেলেন। তিনি মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং প্রভুর কাছে সে প্রসাদের স্বাদের কথা বললেন। তা শুনে রঘুনাথের সে প্রসাদের প্রতি প্রভুর মনে বড় লোভ হল। একদিন গোপনে প্রভু শ্রীরঘুনাথের ভজন-কুটীরে এসে সে-অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দেখে হায় হায় করে ছুটে এলেন এবং প্রভুর হাত থেকে সে প্রসাদ কেড়ে নিয়ে বললেন— হে প্রভো! এ সব আপনার খাবার যোগ্য নয়। প্রভু বললেন—"খাসা বস্তু খাও সবে মোরে না দেহ কেনে?" (চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬।৩২২) প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে শ্রীরঘুনাথ কাঁদতে লাগলেন। প্রভু বার বার শ্রীরঘুনাথকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথের

বৈরাগ্য দেখে প্রভু অন্তরে বড়ই সুখ লাভ করলেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর করুণা-ধারায় নিত্য স্নান করতে করতে যেন পরম সুখে প্রভুর শ্রীচরণে কালাতিপাত করতে লাগলেন। অনন্তর অকস্মাৎ পৃথিবী অন্ধকার করে শ্রীগৌরসুন্দর অন্তর্ধান হলেন। প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্তগণের হৃদয়ে দারুণ বিরহ-অনল জ্বলে উঠল। শ্রীরঘুনাথ দাস সে বিরহ-অনলে দগ্ধ হতে হতে প্রভুর নির্দ্দেশ মাথায় করে এলেন শ্রীব্রজধামে। পূর্ব্বেই শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীলোকনাথ, শ্রীকাশীশ্বর ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রভুর নির্দ্দেশমত অবস্থান করছিলেন। প্রভুর অন্তর্ধানে সকলে বিরহ-দাবানলে দগ্ধীভূত হতে লাগলেন। তথাপি বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সকলে সমবেতভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সিদ্ধান্ত বাণী প্রচারে ব্রতী হয়ে গ্রন্থাদি লিখতে লাগলেন। এঁরা সকলে মহান পণ্ডিত ছিলেন। এঁদের গুণ-মহিমাতে আকৃষ্ট হয়ে তদানীন্তন ভারতের বড় বড় সাহিত্যিক কবি ও রাজন্যবর্গ ব্রজধামে আগমন করতে লাগলেন। ব্রজধামে এক মহান সুবর্ণ-যুগের উদয় হল। ঠিক এ সময় পশ্চিম ভারতের একজন মহান আচার্য্য শ্রীবল্লভাচার্য্য বৃন্দাবনে আগমন করলেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করতেন। তখন শ্রীরাধাকুণ্ড অসংস্কার অবস্থায় ছিল। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কুণ্ডটি সুন্দরভাবে সংস্কারের কথা মাঝে মাঝে চিন্তা করতেন। এক সময় এক বড় শেঠ বহু কষ্টে পদব্রজে শ্রীবদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন। তিনি শ্রীবদরিনারায়ণ দেবকে বহু ভক্তিপুরঃসর পূজাদি করেন এবং বহু অর্থ অর্পণ করেন। সেদিন শ্রীবদরিকা আশ্রমে রাত্র বাস করলেন। স্বপ্নে শ্রীবদরিনারায়ণ শেঠকে দর্শন দিয়ে বললেন—তুই এ সব অর্থ নিয়ে ব্রজে আরিট গ্রামে যা এবং তথায় রঘুনাথ দাস নামে একজন আমার পরম ভক্ত আছে তাঁকে দে। যদি সে না নিতে চায় আমার কথা বলিস এবং কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারের কথা মনে করিয়ে দিস্। স্বপ্ন দেখে শেঠ বড় সুখী

হলেন। সুখে গৃহে ফিরে এলেন ও শ্রীনারায়ণের আজ্ঞা পালনে তৎপর হয়ে ব্রজধামে আরিট গ্রামে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সন্নিকট এলেন। অতঃপর শেঠ শ্রীদাস গোস্বামীকে দণ্ডবতাদি করবার পর সমস্ত কথা নিবেদন করলেন। কথা শুনে শ্রীদাস গোস্বামী একটু চমৎকৃত হলেন। তিনি শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড সংস্কারের অনুমতি প্রদান করলেন। শেঠ পরম আনন্দিত মনে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করলেন।

"শুনি মহাজন মহা আনন্দ হইল।
সেই ক্ষণে বহুলোক নিযুক্ত করিল।।
শীঘ্রই কুণ্ডদ্বয় খোদাইল যত্নমতে।।"
—(শ্রীভক্তি রত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চবৃক্ষরূপ অবস্থান করছেন। তাদের কাটবার কথা হল, সে রাত্রে পাণ্ডবগণ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দর্শন দিয়ে বৃক্ষ কাটতে নিষেধ করলেন। অদ্যাপি বৃক্ষগুলি কুণ্ডতীরে শোভা পাচ্ছে। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সংস্কার হলে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। কুণ্ডের আশে পাশে অষ্ট সখীর কুণ্ডাদি ও অষ্ট সখীর কুঞ্জাদি নির্ম্মাণ করা হল। এসব দেখে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আনন্দে আত্মহারা হলেন।

শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ড তটে অনিকেত বাস করতেন। মাঝে মাঝে মানস গঙ্গাতটেও এরূপে বাস করতেন। তখন সেখানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল। তাতে হিংস্র ব্যাঘ্রাদি বাস করত। একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী মানস-গঙ্গাতটে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটিরে এলেন। সেখানে তিনি মধ্যাহ্ন ভোজন করবেন। মানস-গঙ্গার পাবন ঘাটে স্নান করতে গেলেন। কিছু দূরে দেখলেন একটি ব্যাঘ্র জল পান করে চলে গেল। তার কিছু দূরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজন আবেশে বৃক্ষতলে অবস্থান করছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী দেখে বিস্মিত হলেন। অনন্তর তিনি শ্রীদাস গোস্বামীকে কুটীরের

মধ্যে ভজন করবার অনুরোধ জানালেন। সে দিন থেকে তিনি কুটীরে ভজন করতেন।

ব্রজধামে পরকীয়াভাবে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী শ্রীগোবিন্দের সেবা করতেন। এ দুজনার অনন্ত সখী ছিল। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজেকে শ্রীরাধার সখীগণের দাসী বলে অভিমান করতেন। তিনি কখনও চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যেতেন না এবং চন্দ্রাবলীর সখীদের সঙ্গে বার্ত্তালাপ করতেন না। এরূপে মানস-ভজনে দিনাতিপাত করতেন। শ্রীদাস ব্রজবাসী নামক এক ভক্ত রোজ শ্রীদাস গোস্বামীকে এক দোনা মাঠা দিতেন। তিনি সেটুকু পান করে সারাদিন ভজন করতেন। একদিন শ্রীদাস ব্রজবাসী চন্দ্রাবলীর স্থান সখীস্থলীতে গোচারণ করতে গিয়ে ছিলেন। সেখানে বড় বড় পলাশ পাতা দেখতে পেলেন। তিনি কয়েকটি পলাশ পাতা ভেঙ্গে নিলেন। ঘরে এসে সে পাতার দোনা তৈরী করে মাঠা নিয়ে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছে এলেন এবং মাঠার দোনাটি দিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী দোনা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — শ্রীদাসজী! এ সুন্দর পলাশ পাতা কোথায় পেলেন? শ্রীদাস বললেন গোচারণ করতে সখীস্থলীতে গিয়ে এ সুন্দর পলাশ পাতা এনেছি।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সখীস্থলীর নাম শুনেই রোষভরে মাঠাসহ দোনাটি ফেলে দিলেন। বললেন—শ্রীরাধার অনুগত যারা তারা সখী স্থলীর জিনিষ গ্রহণ করেন না। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীরাধা-নিষ্ঠা দেখে শ্রীদাস ব্রজবাসী বিস্মিত হলেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্ব্বদা শ্রীরাধা গোবিন্দের মানস সেবা করতেন। একদিন মানসে পরমান্ন রন্ধন করে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভোগ লাগালেন। তাঁরা সুখে ভোজন করলেন, অন্যান্য সখীগণও ভোজন করলেন। অতঃপর সেই অবশেষ প্রসাদ স্বয়ং ভোজন করলেন। প্রেমভরে ভোজন করতে করতে একটু বেশী পরিমাণে ভোজন হল। শ্রীদাস গোস্বামী সকাল হতে প্রায় অপরাহ্ন

কাল পর্য্যন্ত দরজা খুললেন না। ভক্তগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অনেক ডাকাডাকি করার পর দরজা খুললেন। ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কুটীর বন্ধ করে শুয়ে আছেন কেন? শ্রীদাস গোস্বামী বললেন—শরীর অসুস্থ। ভক্তগণ শুনে দুঃখিত হলেন। তখনই মথুরায় শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট সংবাদ পাঠালেন। সে সময় শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীবল্লভাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করছিলেন। খবর পেয়ে শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীবিঠ্‌ঠল নাথজী দু'জন বৈদ্য রাধাকুণ্ডে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন।

নাড়ী দেখি চিকিৎসক কহে বার বার।
দুগ্ধ অন্ন খাইলা ইহো ইথে দেহ ভার।।

—(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

বৈদ্যের কথা শুনে সকলে অবাক হলেন। অতঃপর ভক্তগণ রহস্য বুঝতে পারলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন কথা অদ্ভুত তাঁর সম্বন্ধে শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

দাস শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্য রস মঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষতে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্।।
ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নাম ভেদতঃ।।

—(শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা)

শ্রীদাস গোস্বামী পূর্ব্বে কৃষ্ণ-লীলায় রস মঞ্জরী ছিলেন; কেহ বলেন রতি মঞ্জরী ছিলেন। আবার কেহ ভানুমতী ছিলেন বলেন।

তাঁহার রচিত স্তবাবলী, দানচরিত, মুক্তাচরিত প্রভৃতি গ্রন্থাবলী ও অনেক গীত আছে।

তাঁহার জন্ম—১৪২৮ শকাব্দে, অপ্রকট—১৫০৪ শকাব্দ, আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে; স্থিতি—৭৫ বছর।

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর

'চৈত্রী পূর্ণিমায়' শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর আবির্ভূত হন।

চৌদ্দশত ষোল শকে মধু পূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব সর্ব্বলোকে গায়।।

—(বংশী শিক্ষা)

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুরের বংশীবদন, বংশীদাস, বংশী ও শ্রীবদন প্রভৃতি পাঁচটী নাম শ্রুত হয়। কুলিয়ার মধ্যবর্ত্তী—তেঘরি, বেঁচিআড়া, বেদড়াপাড়া ও চিনেডাঙ্গা গ্রাম। প্রসিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রগণ বিল্বগ্রাম বা পাটুলী হতে কুলিয়া বেঁচিআড়া গ্রামে এসে বসবাস করেন। শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর শ্রীযুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায়। তাঁর শ্রীমাধব দাস চট্টোপাধ্যায় (ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়) শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় (তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়) ও শ্রীকৃষ্ণ সম্পত্তি চট্টোপাধ্যায় (দুইকড়ি চট্টোপাধ্যায়) নামে তিন পুত্র ছিলেন। শ্রীপুরী ধাম হতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্য নবদ্বীপে কুলিয়াতে এসেছিলেন তখন শ্রীমাধব দাস চট্টোপাধ্যায়ের (ছকরি চট্টোপাধ্যায়ের) গৃহে সাতদিন অবস্থান করেছিলেন এবং দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতিকে উপদেশ দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্রীমাধব দাসের (ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়) গৃহে বংশীবদন ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবংশীবদনের মায়ের নাম শ্রীমতী চন্দ্রকলা দেবী। বংশীবদন ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের বংশী অবতার। বংশীবদন ঠাকুর যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সেদিন

মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যও ছিলেন। ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রভুর পরম অনুরাগী ছিলেন। তাঁর পুত্র বংশীকেও প্রভু অতিশয় স্নেহ করতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বংশীবদন ঠাকুর সম্বন্ধে কোন কথা নাই। শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ৯ম অঙ্কে ৩৩শ সংখ্যায়— "নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাস বাট্যামুত্তীর্ণবান্। নবদ্বীপলোকানুগ্রহ হেতোঃ সপ্ত দিনানি তত্র স্থিতবান্।।" শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহ হতে মহাপ্রভু গঙ্গা পার হয়ে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাস চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে নবদ্বীপ-বাসিগণকে কৃপা করবার জন্য সাতদিন অবস্থান করেছিলেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে লিখেছেন যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য নবদ্বীপ মায়াপুরে মহাপ্রভুর গৃহে এসেছিলেন, তখন বংশীবদন ঠাকুর শ্রীনিবাসকে অনুগ্রহ করেন ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচরণ দর্শন করান। "শ্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে। শ্রীনিবাস সিক্ত কৈল নিজ নেত্রজলে।" (ভঃ রঃ ৪।২৩) মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর শ্রীবংশীবদন ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবায় নিযুক্ত হন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একান্ত কৃপা পাত্র বলে বংশীবদন ঠাকুর বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্তর্ধানের পর শ্রীমূর্ত্তি সেবা মায়াপুর হতে কুলিয়া পাহাড়পুরে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাঁর বংশধরগণ যে সময় শ্রীজাহ্নবা মাতার কৃপাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীপাট বাঘনাপাড়া আশ্রয় করেন, তখন মালঞ্চবাসী সেবায়েতদিগের হাতে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা কুলিয়া গ্রামেই ছিল।

কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রামে শ্রীবংশীবদনের পূর্ব্ব পুরুষগণের সেবিত শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন। তথায় প্রাণবল্লভ নামে এক বিগ্রহ শ্রীবংশীবদন ঠাকুর নিজে স্থাপিত করেন। উত্তর কালে শ্রীবংশীবদন ঠাকুর বিল্বগ্রামে গিয়ে বাস করেন। ঐ বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁর জ্ঞাতি ছিলেন। শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য দাস ও শ্রীনিতাই দাস নামে দুই পুত্র ছিলেন। শ্রীচৈতন্য দাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীশচীনন্দন। "শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা

এই রামচন্দ্রকে ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন এবং দীক্ষাদান করে খড়দহ গ্রামে রেখে বৈষ্ণব-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন।" (গৌড়ীয় ২২।৩০-৩৭ সংখ্যা) শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী ব্রহ্মচারী ছিলেন, বাঘনা পাড়ার শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ছোট ভাই শ্রীশচীনন্দনের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। শ্রীশচীনন্দন গোস্বামীর পুত্রগণ হচ্ছেন বাঘনা পাড়ার গোস্বামিগণ।

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁর গীতি সমূহ অতি সরস ও মধুর। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তাঁর বিরহে শ্রীশচীমাতা যে বিলাপ করেছিলেন তা অবলম্বনে শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর এ গানটী রচনা করেন—

তথাহি গীত

আর না হেরিব, প্রসব কপালে, অলকা কাচ।
আর না হেরিব, সোনার কমলে, নয়ন খঞ্জন নাচ।।
আর না নাচিবে, শ্রীবাস মন্দিরে, ভকত চাতক লৈয়া।
আর না নাচিবে, আপনার ঘরে, আমরা দেখিব চাইয়া।।
আর কি দু'ভাই, নিমাই নিতাই, নাচিবে এক ঠাঞি।
নিমাই করিয়া, ফুকরি সদাই নিমাই কোথাও নাই।।
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া, মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গসুন্দর, না দেখি কেমনে, রহিব নদীয়া মাঝ।।
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর, রোদন শুনিয়া বংশী গড়াগড়ি যায়।।

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের দান-লীলা, নৌকাবিলাস ও বনবিহার লীলাদি বহু বর্ণন করেছেন।

শ্রীপরমানন্দপুরী

ত্রিহুতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্র বিলাস।।

— (চৈঃ ভাঃ আদি ২।৪৩)

ত্রিহুত দেশে বিপ্রকুলে শ্রীপরমানন্দ পুরী জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও ছাপরা প্রভৃতি জিলাগুলি ত্রিহুতের অন্তর্গত। শ্রীপরমানন্দ পুরী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

"মাধব পুরীর প্রিয়-শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমানন্দপুরী প্রেম—রসময়।।"

— (চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩।১৭৮)

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণে ঋষভ পর্ব্বতে গমন করেন, সে সময় তথায় তাঁর সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম শ্রীপরমানন্দ পুরীর মিলন হয়।

ঋষভ পর্ব্বতে চলি, আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখিলা তাঁহা নতি স্তুতি করি।।
পরমানন্দ পুরী তাহাঁ রহে চতুর্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী-গোসাঞির পাশ।।
পুরী গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।।
তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণ-কথা রঙ্গে।
সেই বিপ্র ঘরে দোঁহে রহে এক সঙ্গে।।

পুরী গোসাঞি বলে,— আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে।।
প্রভু কহে,—তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে।।
তোমার নিকটে রহি,— হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হঞা সদয়।।
এত বলি তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা।।
পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৯।১৬৬-১৭৪)

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় ১১৮ শ্লোকে –"পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা।" যিনি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণাবতারে উদ্ধব ছিলেন অধুনা তিনি শ্রীপরমানন্দ পুরী। "পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী। ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী।।" (চৈঃ চঃ আদি ৯।১৩) ভক্তি কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী। পরমানন্দ পুরী ও কেশব ভারতী আদি নয় জন ভক্তিকল্পতরুর নয়টি মূল স্বরূপ।

শ্রীপরমানন্দ পুরী ঋষভ পর্ব্বতে মহাপ্রভুর নিকট থেকে নীলাচলে চলে এলেন এবং কয়েকদিন তথায় থাকার পর তিনি গৌড় দেশে গঙ্গা-তীর্থে স্নানের জন্য শ্রীনবদ্বীপে আগমন করলেন।

আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিলা করিয়া সম্মান।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।৯২)

নবদ্বীপে পরমানন্দ পুরী মহাপ্রভুর গৃহে এলেন। তাঁকে শ্রীশচী মাতা বহু যত্ন করে ভোজন করালেন। শ্রীপরমানন্দ পুরী একদিন তথায় রইলেন।

পুরী গোস্বামী গৌড়দেশে এসে যখন শুনলেন প্রভু নীলাচলে আগমন করছেন। তা শুনে পুরী গোস্বামী আর কাল বিলম্ব না করে পুনঃ নীলাচলের দিকে দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন। পুরী নীলাচলে পৌঁছিলে প্রভুর সঙ্গে মিলন হল। মহাপ্রভু তাঁর চরণ বন্দনা করলে পুরী তাঁকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করলেন। উভয়ে পরমানন্দিত হলেন। প্রভু পুরীকে নীলাচলে থাকবার জন্য প্রার্থনা করলেন। পুরী বললেন—

"তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি আইলাঙ নীলাচল—পুরী।।"

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।৯৮)

তোমার সঙ্গে থাকবার জন্য শীঘ্র গৌড় দেশ থেকে এলাম। অতঃপর পুরী গোস্বামী গৌড়বাসী ভক্তগণের ও শচীমাতার কুশল বার্ত্তা বললেন। তিনি আরও বললেন— গৌড় দেশের ভক্তগণ তোমাকে দেখবার জন্য শীঘ্র নীলাচলে আসছেন।

মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের ভবনে একটী নির্জ্জন গৃহে পুরীর থাকবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর সেবার জন্য একটী ভৃত্যেরও ব্যবস্থা করলেন। পুরী গোস্বামী প্রভুকে বাৎসল্যভাবে স্নেহ করতেন। প্রভুও পুরীর প্রতি পরমপূজ্য গুরুভাব রাখতেন। তাঁর যেখানে আমন্ত্রণ হত সেখানে পুরী গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

পূর্ব্বে পুরী গোস্বামী কাশীমিশ্র ভবনে থাকতেন, পরে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমে একটী মঠে থাকতেন। একদিন গদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে করে মহাপ্রভু পুরী গোস্বামীর মঠে এলেন। পুরী এক কূপ খনন করেছিলেন, কিন্তু তার জল

ভাল হয় নি। তজ্জন্য তিনি বড় দুঃখী ছিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তা জানতে পেরে ভঙ্গি করে পুরীকে জিজ্ঞাসা কলেন—কূপের জল কেমন হয়েছে? পুরী বললেন—

"পুরী বলে—"সেহ বড় অভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোর কর্দ্দমের রূপ।।"
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩।২৩৭)

প্রভু এ কথা শুনে দুঃখী হলেন। উঠে বাহুযুগল ঊর্দ্ধ করে শ্রীজগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন—

"জগন্নাথ মহাপ্রভু, এই মোর বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর।।"
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩।২৪২)

এ রূপ প্রার্থনা করে মহাপ্রভু স্বীয় কুটীরে এলেন। প্রভুর সে প্রার্থনায় ভগবতী গঙ্গা অলক্ষ্যে সেই কূপে প্রবেশ করলেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণ দেখলেন কূপ নির্মল জলে পরিপূর্ণ।

"সেইক্ষণে গঙ্গা দেবী আজ্ঞা করি শিরে।
পূর্ণ হই প্রবেশিলা কূপের ভিতরে।।"
—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩।২৪৬)

ভক্তগণ বুঝতে পারলেন প্রভুর প্রার্থনায় গঙ্গাদেবী আগমন করেছে। কূপটীকে ভক্তগণ নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করলেন। এ কথা শুনে প্রভু শীঘ্র তথায় এলেন, কূপের নির্মল জল দেখে বলতে লাগলেন—"শুনহ সকল ভক্তগণ। এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান। সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গা-স্নান ফল। কৃষ্ণ ভক্তি হৈব তার পরম নির্মল।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩।২৫২)

পুরী গোস্বামী যেমন প্রভুপ্রাণ ছিলেন, তেমনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাণ পুরী গোঁসাই ছিলেন। পুরী গোস্বামী প্রতিদিন সর্ব্বপ্রথম প্রভু দর্শনে আসতেন, তবে অন্য কৃত্যাদি ও করতেন। প্রভুও সর্ব্বক্ষণ পুরী গোঁসাইয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। প্রভু বলতেন—

"আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরী গোসাঞির প্রীতে।।
পুরী গোসাঞির আমি—নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা।।
সকৃৎ যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র।
সেহ হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পাত্র।।"

—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩।২৫৫-২৫৬)

শ্রীঅচ্যুতানন্দ

শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য্যের প্রথম পুত্র। এঁর জন্ম আনুমানিক শকাব্দ১৪২৮, (চৈঃ চঃ আদি ১২।১৩ অনুভাষ্য) ইনি শ্রীগৌরসুন্দরের পরম প্রিয়জন ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন নীলাচল থেকে শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে আগমন করেছিলেন, তখন শ্রীঅচ্যুতানন্দ পাঁচ বছরের শিশু ছিলেন। "দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত তনয়।। আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র পদতলে। ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে।। প্রভু বলে অচ্যুত! আচার্য্য মোর পিতা। সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১।২১৬-২১৭) ১৪৩১ শকাব্দ শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে আগমন করেন।

শ্রীকবিকর্ণপুর গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীঅচ্যুতানন্দকে কার্ত্তিকের অবতার বলেছেন। কেহ বা 'অচ্যুত' নাম্নী গোপিকা বলেছেন। অদ্বৈত আচার্য্যের দুটী পত্নী। প্রথম 'শ্রী' দেবীর গর্ভে তিন পুত্র ও দ্বিতীয় সীতা দেবীর গর্ভে তিন পুত্র—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল দাস। "অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপাল দাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাব্ধিসম্ভবম্।।" (অদ্বৈত চরিত) বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ 'শ্রী'দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা তিন জনই গৌর-বিমুখ স্মার্ত্ত মায়াবাদী ছিলেন। (চৈঃ চঃ আদি ১২।৩৬ অনুভাষ্য) শ্রীযদুনন্দন দাস কৃত "শাখানির্ণয়ামৃত" নামক গ্রন্থে বলেছেন—"মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দ-নামকম্। গদাধর প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্।।" ভক্তিরসামৃত আনন্দে বিভোর শ্রীঅদ্বৈতনন্দন অচ্যুতানন্দ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ - মহাপ্রভুর প্রকট কাল পর্য্যন্ত

শ্রীনীলাচলে অবস্থান করেছিলেন— "অচ্যুতানন্দ–অদ্বৈত আচার্য্য তনয়। নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয়।।" (চৈঃ চঃ আদি ১০।১৫০) শ্রীজগন্নাথ রথাগ্রে নৃত্যাদির সময় শান্তিপুর নিবাসী শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দ নৃত্য ও কীর্ত্তন করতেন। "শান্তিপুর আচার্য্যের এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তাহা আর সব গায়।।"

শৈশবকাল হতে শ্রীঅদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দ গৌরাঙ্গে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। কোন সময় অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তাঁকে বিশেষ সম্মান করে আচার্য্য বসতে আসন প্রদান করলেন। সন্ন্যাসী বললেন—আমার একটী প্রশ্ন আছে। কেশব ভারতী চৈতন্যের কি হন?

আচার্য্য বললেন—কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যের গুরু হন। শিশু অচ্যুতানন্দ শুনে পিতার নিকট ছুটে এলেন এবং ক্রোধভরে বলতে লাগলেন— "চৈতন্যের গুরু আছে বলিলা যখনে। মায়াবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্য ইচ্ছায়। সব চৈতন্যের লোম কূপেতে মিশায়।। যাহা হইতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার। তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর।। বাপ তুমি, তোমা হৈতে শিখিবাঙ্ কোথা। শিক্ষাগুরু হই কেন বলহ অন্যথা।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৪।১৬১-১৬২, ১৭০-১৭১) এ সমস্ত কথার উত্তরে অদ্বৈত আচার্য্য বলতে লাগলেন—"তুমি সে জনক বাপ, মুই সে তনয়। শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয়।।" (তত্রৈব)

শ্রীঅচ্যুতানন্দ বিবাহ করেন নাই। সীতা ঠাকুরাণীর গর্ভে নন্দিনী নাম্নী একটি কন্যা হয়েছিল। অচ্যুতানন্দের ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের দুই পুত্র—রঘুনাথ ও দোল গোবিন্দ। রঘুনাথের বংশ শান্তিপুরে মদনগোপাল পাড়ায় এখনও বিদ্যমান। দোল গোবিন্দের তিন পুত্র। এঁরা মালদহ গিয়ে বাস করতেন। কয়েক পুরুষ পরে এ-বংশে বীরচন্দ্র গোস্বামী নামে এক পরম সাধক ব্যক্তি

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে কাটোয়ায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন।

শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের উদ্যোগে খেতরি গ্রামে যে মহোৎসব হয়েছিল তাতে শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু গিয়েছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। শেষকালে শান্তিপুরের বাটীতে বাস করেছিলেন।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর

শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তিন ভাই এঁরা শ্রীখণ্ডে বাস করতেন। শ্রীমুকুন্দ দাস ঠাকুরের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। শ্রীমুকুন্দ দাস ঠাকুর রাজবৈদ্য ছিলেন। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে কাজ করতেন।

বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজ-সেবা।
অন্তরে কৃষ্ণ-প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা।।
—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৫।১২০)

একদিন শ্রীমুকুন্দ দাস বাদশাকে চিকিৎসা করবার জন্য রাজভবনে গমন করলেন। বাদশা উচ্চ আসনে বসে আছেন। শ্রীমুকুন্দ দাস পাশে বসে চিকিৎসার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। সে-সময় এক ভৃত্য ময়ুরের পুচ্ছের বৃহৎ পাখা নিয়ে বাদশাকে হাওয়া করতে লাগল। ময়ুরের পুচ্ছ দেখে শ্রীমুকুন্দ দাসের কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্দীপনা হল। অমনি বিবশ হয়ে ভূমিতে পড়লেন। বাদশা শ্রীমুকুন্দ দাসকে অচৈতন্য দেখে মনে করলেন—তিনি প্রাণত্যাগ করলেন না কি? তাড়াতাড়ি নীচে নেমে তাঁকে ধরে উঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কোন ব্যথা পেয়েছেন কি না? শ্রীমুকুন্দ দাস বললেন—কোন ব্যথা পাই নি। বাদশা পড়বার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মৃগী ব্যাধি আছে বলে বাদশার কাছে গোপন করলেন। মহাসিদ্ধ পুরুষ বলে বাদশা অনুমানে বুঝতে পারলেন। বহু সম্মান সহ তাঁকে গৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীনরহরি সরকার—এঁরা প্রতি বছর

নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর দর্শন ও রথযাত্রায় নৃত্যকীর্ত্তনাদি করতেন। শ্রীমুকুন্দ দাসকে প্রভু এক দিবস স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, মুকুন্দ! তুমি ও রঘুনন্দন দুজনের মধ্যে কে পিতা? কে পুত্র বল? শ্রীমুকুন্দ বললেন—রঘুনন্দনই আমার পিতা। যাঁর থেকে কৃষ্ণ-ভক্তি পাওয়া যায় তিনিই প্রকৃত পক্ষে পিতা। প্রভু বললেন— তোমার বিচারই ঠিক।

"যাঁহা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তি সেই গুরু হয়।।"

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৫।১১৭)

প্রভু শ্রীরঘুনন্দনকে বিগ্রহ সেবা করতে আদেশ দিলেন।

"রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইঁহার অন্যে নাহি মন।।"

— (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৩১)

শিশুকালে শ্রীরঘুনন্দন শ্রীমূর্ত্তিকে লাড়ু খাইয়ে ছিলেন। পদকর্ত্তা শ্রীউদ্ধব দাস অতি সুন্দরভাবে এ বিষয় বর্ণন করেছেন।

(তথাহি গীত)

প্রকট শ্রীখণ্ডবাস, নাম শ্রীমুকুন্দ দাস,
ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।
গেলা কোন কার্য্যান্তরে, সেবা করিবার তরে,
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি।।
ঘরে আছে কৃষ্ণ-সেবা, যত্ন করে খাওয়াইবা,
এত বলি মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাঞা, সেবার সামগ্রী লৈয়া,
গোপীনাথের সম্মুখে আইলা।।

শ্রীরঘুনন্দন অতি, বয়ঃক্রম শিশুমতি,
খাও বলে কান্দিতে কান্দিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে, না রাখিয়া অবশেষে,
সকল খাইলা অলক্ষিতে।।
আসিয়া মুকুন্দ দাস, কহে বালকের পাশ,
প্রসাদ নৈবেদ্য আন দেখি।
শিশু কহে বাপ শুন, সকলি খাইল পুনঃ,
অবশেষ কিছুই না রাখি।।
শুনি অপরূপ হেন, বিস্মিত হৃদয়ে পুনঃ,
আর দিনে বালকে কহিয়া।
সেবা অনুমতি দিয়া, বাড়ীর বাহির হৈয়া,
পুনঃ আসি রহে লুকাইয়া।।
শ্রীরঘুনন্দন অতি, হইয়া হরিষ মতি,
গোপীনাথে লাড়ু দিয়া করে।
খাও খাও বলে ঘন, অর্দ্ধেক খাইতে হেন,
সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে।।
যে খাইল রহে হেন, আর না খাইলা পুনঃ,
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে, গদ্‌গদ্ স্বরে বলে—
নয়নে বরিষে ঘন লোর।
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে, অর্দ্ধ লাড়ু আছে করে,
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই,
এ উদ্ধব দাস রস ভনে।।

শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস খেতরি গ্রামে যে মহোৎসব করেছিলেন সে উৎসবে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর এসেছিলেন এবং কীর্ত্তন করেছিলেন।

শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর বড় ডাঙ্গিতে কোন ভক্তগৃহে নৃত্য করেছিলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের পায়ের নূপুর নৃত্যকালে খুলে আকাই হাটে এক পুষ্করিণীতে গিয়ে পড়ে। ইহার থেকে পুষ্করিণীর নাম নূপুর কুণ্ড হয়। বর্ত্তমানে আকাই হাটের দক্ষিণে বড়ুই গ্রামের মহান্তবাড়ীতে সে নূপুর আছে।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ব্রজলীলায় কন্দর্প মঞ্জরী ছিলেন। দ্বারকা লীলাতে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কন্দর্প।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের পুত্র কানাই ঠাকুর। শ্রীখণ্ডে অদ্যাপি তাঁর বংশধরগণ আছেন। শ্রীখণ্ডবাসী পঞ্চানন কবিরাজ এঁর বংশে জন্মেছিলেন।

শ্রীরঘুনন্দনের জন্ম শকাব্দ ১৪৩২।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কোগ্রামে রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সে গৌরভক্তগণের সঙ্গ পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর গুরু শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন।

ঠাকুর শ্রীনরহরি, দাস প্রাণ অধিকারী,
যাঁর পদ প্রতি আশে আশ।
অধমেহ সাধ করে, গোরা গুণ গাহিবারে,
সে ভরসা এ লোচন দাস।।

—(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল সূত্র খণ্ড)

আমার ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস।
প্রণতি বিনতি করোঁ পুর মোর আশ।।

—(চৈঃ মঃ সূত্র খণ্ড)

পূর্ব্ববঙ্গে লক্ষ্মীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ও মনসা ভাসান প্রভৃতি কবিগণ গান করতেন। সেই পাঁচালী অনুকরণে শ্রীলোচনদাস ঠাকুর চৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন। পাঁচালী হচ্ছে পাঁচ প্রকার গীতিছন্দে রচিত গ্রন্থ।

শ্রীলোচনদাসের পিতার নাম—শ্রীকমলাকর দাস। মায়ের নাম—শ্রীসদানন্দী। লোচন দাস পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন বলে আদরের দুলাল ছিলেন। তিনি মাতামহ-গৃহে বেশীর ভাগ সময় অবস্থান করতেন এবং তথায়

পড়াশুনা করতেন। অতি অল্প বয়সে শ্রীলোচন দাসের বিবাহ হয়েছিল।

শিশু কাল থেকে শ্রীলোচন দাস গৌর-অনুরক্ত এবং বিষয়ে বিরক্ত ছিলেন। যৌবনে অধিক সময় তিনি শ্রীখণ্ডে শ্রীগুরুদেব—নরহরি সরকার ঠাকুরের পাদপদ্মে অবস্থান করতেন। সে স্থানে তাঁর কীর্ত্তন শিক্ষা হয়।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্য মঙ্গলের প্রধান উপাদান গ্রন্থ হল, শ্রীমুরারি গুপ্তে বিরচিত—"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্" কাব্য। তিনি স্বয়ং একথা লিখেছেন—

"সেই সে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায়।।
শ্লোক বন্ধে হৈল পুঁথি গৌরাঙ্গ চরিত।
দামোদর সংবাদ—মুরারিমুখোদিত।।
শুনিঞা আমার মনে বাড়িল পিরীত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত।।"

(চৈঃ মঃ সূত্রখণ্ড)

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লেখার আগে শ্রীলোচনদাস শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে বন্দনা করেছেন।

বৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে।।

(চৈঃ মঃ সূত্র খণ্ড)

শ্রীবৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের নাম পূবের্ব 'চৈতন্য মঙ্গল' ছিল। শ্রীলোচনদাস ঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বোধ হয় 'চৈতন্য ভাগবত' নামকরণ করেন। এস্থলে "ভাগবত গীতে" এ কথাকে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে চৈতন্যভাগবতের গানে জগৎ মোহিত।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

কৃষ্ণ-লীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।।

এ পয়ারে চৈতন্য মঙ্গলের নাম "চৈতন্য ভাগবত" হল এ ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অনেক লীলা স্পষ্ট করে বর্ণন করেন নাই, শ্রীলোচন দাস চৈতন্য মঙ্গলে বর্ণনা করেছেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয়েছিল, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তা বর্ণন করেন নাই। শ্রীলোচন দাস কিন্তু বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

"প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী,
কহে কিছু গদ্‌গদ্ স্বরে।।
কহ কহ প্রাণনাথ, মোর শিরে দিয়া হাত,
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা, বিদরিতে চাহে হিয়া,
আগুনিতে প্রবেশিব আমি।।
তো লাগি জীবনধন, রূপ নব যৌবন,
বেশ বিলাস ভাব-কলা।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে,
হিয়া পোড়ে যেন বিষ জ্বালা।।"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এরূপ করুণ বিলাপ-বাণী শুনে মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

এ বোল শুনিয়া পহুঁ, মুচকি হাসিয়া লহু,
কহে শুন মোর প্রাণপ্রিয়া।
কিছু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে তোর হিতে
সাবধানে শুন মন দিয়া।।
জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ,
সত্য এক সবে ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে যতেক সব,
মিছা করি করহ গেয়ান।।
মিছা সুত পতি নারী, পিতা-মাতা আদি করি,
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ সব মায়া তাঁর।।
কি নারী পুরুষ দেখ, আত্মা সে সবার এক,
মিছা মায়াবন্ধে ভাবে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এ কথা না বুঝয়ে কোই।।
রক্তরেত সম্মিলনে, জন্ম বিষ্ঠা মূত্র স্থানে,
ভূমে পড়ি হয় অগেয়ান।
বাল যুবা বৃদ্ধ হৈয়া, নানা দুঃখ কষ্ট পাইয়া,
দেহে-গেহে করে অভিমান।।
বন্ধু করি যারে পালি, তারা সবে দেই গালি,
অভিমানে বৃদ্ধত্র কাল বঞ্চে।
শ্রবণ নয়ান অন্ধে, বিষাদ ভাবিয়া কান্দে,
তবু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে।।

কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে,
মায়া বন্ধে পাসরি আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিজ প্রভু পাসরিয়া,
শেষে পায় নরক-যন্ত্রণা।।
তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করহ চিতে।
এ তোর কহিলুঁ কথা, দূর কর আন চিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে।।

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি এ সমস্ত উপদেশ দিয়ে, নিজ স্বরূপ চতুর্ভুজ মূর্তি দেখালেন।

আপনে ঈশ্বর হৈয়া, দূর করে নিজ মায়া,
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত।
দূরে গেলে দুঃখ- শোক, আনন্দে ভরল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত।।

শ্রীগৌরসুন্দর যদিও উপদেশ বলে ও স্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন দিয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মোহ দূর করলেন, কিন্তু পতি-বুদ্ধি বিষ্ণুপ্রিয়ার অটুট রইল।

তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া,
পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তবু।
পড়িয়া চরণ তলে, কাকুতি মিনতি করে,
এক নিবেদন শুন প্রভু।।
মো অতি অধম ছার, জনমিল এ সংসার,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণ-পতি।

এ হেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়াছিলুঁ তোর,
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি।।
ইহা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, কান্দে উতরোলী হৈয়া,
অধিক বাড়িল পরমাদ।
প্রিয়জনে আর্ত্তি দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
কোলে করি করিলা প্রসাদ।।
শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা,
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাঁই,
এই সত্য কহিলাম দঢ়।।
প্রভু আজ্ঞা বাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মন গুণি,
স্বতন্ত্র ঈশ্বর এই প্রভু।
নিজ সুখে কর কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ,
প্রত্যুত্তর না দিলেন তবু।।
বিষ্ণুপ্রিয়া হেট মুখী, ছল ছল করে আঁখি,
দেখি প্রভু সরস সম্ভাষে।।
প্রভুর আচরণ কথা শুনিতে লাগয়ে ব্যথা
গুণ গায় এ লোচন দাসে।।
(চৈঃ মঃ মধ্যঃ ৫৬৯ গীত)

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের গুণ মহিমা অতি সরল সুন্দর ভাষায় গান করেছেন—

পরম করুণ, পহুঁ দুই জন,
নিতাই গৌরচন্দ্র।

সব অবতার, সার শিরোমণি,
কেবল আনন্দ কন্দ।।
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই,
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া,
মুখে বল 'হরি হরি'।।
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই,
এমন দয়াল দাতা।
পশু-পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে,
শুনি যাঁর গুণ-গাঁথা।।
সংসারে মজিয়া, রহিলে পড়িয়া,
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন,
কহয়ে লোচন দাস।।

— o —

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী।।
প্রেমের বন্যা লৈঞা নিতাই আইলা গৌড়দেশ।
ডুবিল ভকতগণ দীন-হীন ভাসে।।
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে।।
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু নিতাই কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান।।
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হল।।

শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-বিষয়ক বর্ণনাও শ্রীলোচন দাস ঠাকুর অতি সুন্দরভাবে করেছেন—

আরে নিকুঞ্জ বনে, শ্যামের সনে, কিরূপ দেখিলুঁ রাই।
কেমন বিধাতা, গড়ল মুরতি, লখই নাহিক যাই।।
সজল জলদ, কানুর বরণ, চম্প বরণী রাই।
মণি মরকত, কাঞ্চনে জড়িত, ঐছন রহল ঠাই।।
কিয়ে অপরূপ, রাস মণ্ডল, রমণী মণ্ডল ঘটা।
মনমথ মন, পাইল অচেতন, দেখিয়া ও অঙ্গ ছটা।।
বদনে মধুর, হাস অধরে, হৃদয়ে হৃদয়ে সঙ্গ।
কোন রসবতী, রসের আবেশে, কুসুম শয়নে অঙ্গ।।
নবীন মেঘের, নিবিড় আভা, তাহে বিজুরি উজোই।
দাস লোচনের, রাই সরবস ও-রস আবেশে সোই।।

বিশ্বকোষ মতে শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের জন্ম শকাব্দ ১৪৪৫, তিরোভাব—শকাব্দ ১৫৩০।

তাঁর শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ছাড়াও 'দুর্লভসার' নামক একখানি গ্রন্থ আছে।

শ্রীভবানন্দ রায়

শ্রীভবানন্দ রায়—রামানন্দ রায়ের পিতা। পুরী হতে পশ্চিমে ছয় ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি বা আলালনাথের নিকট ইঁহার বাসস্থান। ইনি জাতিতে শৌক্র বর্ণ। তাঁর পাঁচ পুত্র—রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ পট্টনায়ক।

মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়কে বলেছেন—

"এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয় পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র।।"

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৪)

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশ থেকে পুরীতে ফিরে এলেন তখন পুরীর ভক্তগণ ক্রমে প্রভুর চরণ দর্শনে আসতে লাগলেন—

হেনকালে আইলা তথা ভবানন্দ রায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়।।
সার্ব্বভৌম কহে,—এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।৪৯-৫০)

শ্রীভবানন্দ রায় চার পুত্র সঙ্গে প্রভুর চরণে এলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত প্রভুকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রভু উঠে ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন

করে বলতে লাগলেন—

সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্রমহামতি।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।৫২)

প্রভুর কথা শুনে ভবানন্দ রায় বলতে লাগলেন—

রায় কহে,—আমি শূদ্র, বিষয়ী অধম।
তবু তুমি স্পর্শ—এই ঈশ্বর লক্ষণ।।
—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।৫৪)

অতঃপর ভবানন্দ রায় আরও বললেন—পঞ্চ পুত্র সঙ্গে গৃহ ভৃত্য-বিত্তাদি সমস্ত কিছুই তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করলাম।

এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা, তাহা করিবে সেবনে।।
আত্মীয় জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা, তবে সেই আজ্ঞা দিবে।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।৫৭)

ভবানন্দ রায়ের এ কথা শুনে প্রভু বললেন—সঙ্কোচ করব কেন? আপনাকে ত আমি পর ভাবি না। জন্মে জন্মে আপনারা আমার সেবক। পাঁচ দিনের মধ্যে রামানন্দ রায় বোধ হয় আসবেন। তাঁর সনে কথা বলে আমি পরম তৃপ্ত হয়েছি। প্রভু এই পর্য্যন্ত বলে ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করে বিদায় করলেন এবং বাণীনাথ পট্টনায়ককে কাছে রাখলেন।

শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক

শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন। পিতার নাম ভবানন্দ রায়। ভ্রাতার নাম—শ্রীরামানন্দ রায়। ইঁনি দক্ষিণ গোদাবরীর রাজ্যপাল ছিলেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ককে মালজাঠ্যা দণ্ডপাট নামক স্থানের অধিকারী করেছিলেন। দণ্ডপাটপুরের জন্য গোপীনাথ পট্টনায়ক বছর বছর রাজাকে কর দিতেন। একবার দু লাখ কাহন কড়ি পট্টনায়কের বাকী পড়ে। রাজকুমারগণ পট্টনায়কের নিকট সে কর চাইলে, তিনি কড়ির পরিবর্ত্তে কিছু ঘোড়া দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। রাজকুমারগণ তাতেই রাজি হন।

একদিন রাজকুমারগণ ঘোড়ার মূল্য নির্ণয় করতে এলেন, গোপীনাথ পট্টনায়ক ঘোড়া শালে গিয়ে ঘোড়ার দর দাম করতে লাগলেন। এক রাজকুমার ঘোড়ার মূল্য কমাতে চাইলেন, পট্টনায়ক ক্রুদ্ধ হলেন। রাজকুমারের কথা বলবার সময় গ্রীবা ফিরিয়ে ঊর্দ্ধ দিকে দেখবার একটী স্বভাব ছিল। পট্টনায়ক বললেন—আমার ঘোড়া তোমার মত গ্রীবা ফিরিয়ে ঊর্দ্ধ দিকে তাকায় না। রাজকুমার পট্টনায়কের পরিহাসে খুব রুষ্ট হলেন। গৃহে এসে পট্টনায়কের দুর্ব্যবহারের কথা রাজাকে অতিরঞ্জন করে জানালেন। বিচারে বড়জানা (রাজার বড় পুত্র) গোপীনাথ পট্টনায়ককে চাঙ্গে চড়াবার আদেশ দিলেন। গোপীনাথ পট্টনায়ককে বন্দী করে নিয়ে এলেন। এ সব কথা শুনে ভক্তগণের বড় চিন্তার বিষয় হল।

ভক্তগণ শীঘ্র এসে প্রভুর চরণে নিবেদন করলেন—বড়জানা গোপীনাথকে চাঙ্গ থেকে খড়োর উপর ফেলে হত্যা করছে।

মহাপ্রভু বললেন—রাজা তাকে শাস্তি দিচ্ছে কেন? ভক্তগণ মহাপ্রভুর কাছে সমস্ত কথা বললেন।

প্রভু বললেন—এতে রাজার কি দোষ? রাজা তাঁর প্রাপ্য অংশ চাচ্ছেন। রাজার ধন গোপীনাথ অযথা খরচ করছে। রাজার ধন রাজাকে দিতে হবে। বিচার যখন সে করে না তখন তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যারা বুদ্ধিমান, তারা আগে রাজার ঋণ শোধ করে, পরে নিজের ব্যয় করে।

এমন সময় আর একজন ভক্ত এসে বললেন— হে প্রভো! গোপীনাথের সঙ্গে বাণীনাথ প্রভৃতিকেও বেঁধে নিয়ে গেছে। প্রভু বললেন—রাজা তাঁর প্রাপ্য নেবেন। তাঁকে আমি কি করব? আমি ত সন্ন্যাসী। যদি তাকে রক্ষা করতে চাও তবে সকলে মিলে শ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণে নিবেদন কর। তিনি ঈশ্বর—সর্ব্ব সামর্থ্যবান্। বাণীনাথকে যখন রাজা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে কি করছিল?

"বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় কৃষ্ণ-নাম।
'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম।।
সংখ্যা লাগি' দুই-হাতে অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে, অঙ্গে কাটে রেখা।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৯।৫৬-৫৭)

ভক্তটির কথা শুনে ভক্তবৎসল প্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হল, বললেন—আমি কি করব? এই বলে লোকটিকে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করতে পাঠালেন। এমন সময় রাজ পুরোহিত শ্রীকাশীমিশ্র প্রভু স্থানে এলেন। তিনি প্রতিদিন একবার প্রভুর দর্শনে আসতেন। শ্রীকাশীমিশ্র প্রভুর কুশল প্রশ্ন করলেন। প্রভু বললেন—এখানে নানা উপদ্রব, চিত্তে স্বস্তি পাচ্ছি না।

কাশীমিশ্র বললেন— হে প্রভো! কি উপদ্রব বলুন।

প্রভু বললেন—ভবানন্দের পরিবার নানা অসদুপায়ে রাজস্ব লুটে খাচ্ছে। গোপীনাথ রাজার বহু ধন অপব্যয় করেছে, রাজা এখন সে অর্থ চান। গোপীনাথ কিন্তু দিতে চায় না। তজ্জন্য রাজা তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। চারবার লোক এসে আমাকে এ সংবাদ দিল। এখন আমি কি করতে পারি? আমি ত সন্ন্যাসী! এ সব বিষয় কথা বলে লোকে আমায় দুঃখ দিচ্ছে, তাই এখান থেকে চলে গিয়ে কোন নির্জ্জন স্থানে বসে ভজন করতে চাই।

কাশীমিশ্র শীঘ্র উঠে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরে বলতে লাগলেন— হে প্রভো! আমি প্রার্থনা করছি তুমি ক্ষেত্র ছেড়ে যেয়ো না। আজ থেকে এরূপ কথা নিয়ে কাকেও তোমার কাছে আসতে দেব না। যারা তোমার কাছে বিষয় কথা নিয়ে আসে তারা অজ্ঞ। শ্রীকাশী মিশ্র প্রভুর শ্রীচরণে অনেক অনুনয়-বিনয়াদি করে নিজ গৃহে ফিরে এলেন। ঠিক এমন সময় তাঁর কাছে রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব এলেন এবং দণ্ডবৎ করে গুরু কাশী মিশ্রের পাদ সম্বাহন করতে লাগলেন। যত দিন রাজা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে থাকেন ততদিন দিবসে একবার করে গুরু স্থানে আসেন।

অতঃপর কাশী মিশ্র ভঙ্গীপূর্ব্বক রাজাকে বলতে লাগলেন— দেব! এক অপূর্ব্ব কথা শুনুন। মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছেড়ে আলালনাথ চলে যাচ্ছেন। এ কথা শুনে রাজা দুঃখিত হয়ে বললেন— কেন মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? তখন কাশী মিশ্র রাজার কাছে সমস্ত বিবরণ বললেন—

গোপীনাথ-পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা।
তার সেবক সব আসি প্রভুরে কহিলা।।
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈলা বহুত ভর্ৎসন।।

অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজ বিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজ দ্রব্য ব্যয়।।

*　　　　*　　　　*

রাজ কড়িনা দেয় আমারে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ ইঁহা কে সহিতে পারে।।
আলালনাথ যাই তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিমু।
বিষয়ীর ভাল-মন্দ বার্ত্তা না শুনিমু।।
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়োঁ যদি প্রভু রহেন এথা।।
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম।।
কোন ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন?
প্রাণ-রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্মঞ্ছন।।

—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৯।৮৬-৯৬)

রাজার এ সমস্ত কথা শুনে কাশীমিশ্র বললেন তুমি কড়ি ছেড়ে দিবে প্রভুর এ ইচ্ছা নয়। তিনি তাদের দুঃখ সইতে পারেন না।

রাজা বললেন—আমি ত গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ায়ে খড়্গে কাটবার ব্যাপার কিছুই জানি না। সে পুরুষোত্তম জানাকে পরিহাস করেছিল, তাই সে মিথ্যা ভয় দেখিয়েছে। আপনি শীঘ্র প্রভুর কাছে যান এবং প্রভুকে রাখবার যত্ন করুন। আমি গোপীনাথের যাবতীয় বাকি কড়ি ছেড়ে দিলাম। কাশী মিশ্র বললেন—এতে প্রভু সুখী হবেন না। রাজা বললেন—তবে আপনি বলবেন—"ভবানন্দ রায় রাজার পূজ্য মান্য পাত্র, তাঁর প্রতি ও তাঁর পুত্রগণের প্রতি রাজা সহজেই প্রীতি করে থাকেন।"

রাজা এ সব কথা বলে গৃহে এলেন এবং পুরুষোত্তম জানাকে ডেকে

গোপীনাথের কড়ি ছাড়বার কথা বলে দিলেন। পুরুষোত্তম জানা শীঘ্র এসে গোপীনাথ পট্টনায়ককে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র গোপীনাথকে ডেকে বললেন —

রাজা কহে "সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িলুঁ।
সেই মালজ্যাঠা দণ্ডপাট তোমারে ত' দিলুঁ।।
আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিলুঁ তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন।।"
এত বলি, 'নেতধটী' তারে পরাইল।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা যাহ, বিদায় তোমা দিল।।"
— (চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৯।১০৫-১০৭)

এথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈলা নিবেদনে।।
প্রভু কহে,—"কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা?
রাজ-প্রতিগ্রহ তুমি আমা করাইলা?"
মিশ্র কহে,—'শুন' প্রভু রাজার বচনে।
অকপটে রাজা এই কৈলা নিবেদনে।।
— (চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৯।১১৬-১১৮)

রাজার বিনয় ব্যবহার শুনে প্রভু পরিতুষ্ট হলেন। এ সময় শ্রীভবানন্দ রায় পাঁচ পুত্র সঙ্গে প্রভুর কাছে এলেন এবং প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে বলতে লাগলেন—

তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপদে রাখি প্রভু, পুনঃ নিলা মূল।।
ভক্ত-বাৎসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডবে বিপদে তারিলা।।

নেতধটী মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার কৃপা বৃত্তান্ত সকল কহিলা।।
বাকী-কৌড়ী বাদ আর দ্বিগুণ বর্ত্তন কৈলা।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইলা।।
কাহাঁ চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রমাদ।
কাহা নেতধটী পুনঃ—এ সব প্রসাদ।।
চাঙ্গের উপর তোমার চরণ ধ্যান কৈলুঁ।
চরণ-স্মরণ প্রভাবে এই ফল পাইলুঁ।।
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাঞা।।
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এ মুখ্যফল।
'ফলাভাস' এই,—যাতে 'বিষয়' চঞ্চল।।
রাম-রায়ে বাণীনাথে কৈলা নির্ব্বিষয়।
সেই কৃপা মোতে নাহি যাতে ঐছে হয়।।
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি ঘুচাহ 'বিষয়'।
নির্ব্বিন্ন হইনু মোতে 'বিষয়' না হয়।।

—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৯।১৩০-১৩৯)

গোপীনাথের কথা শুনে প্রভু বললেন—তুমি যদি সন্ন্যাসী হও তোমার কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণ কে করবে? তুমি মহাবিষয় ভোগ কর কিংবা বিরক্ত হও, জন্মে জন্মে তোমরা পঞ্চ ভাই আমার নিজ দাস। কিন্তু আমার একটি আজ্ঞা পালন কর, রাজার মূলধন কখনও ব্যয় করো না। রাজার প্রাপ্য ভাগ দিয়ে যে অর্থ পাবে তা ধর্ম-কর্ম্মাদিতে ব্যয় করবে। প্রভু একথা বলে সবাইকে আলিঙ্গন করে বিদায় করলেন।

সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা।।

—(চৈঃ চঃ অন্তঃ ৯।১৪৬)

—০—

শ্রীমাধবী দেবী

উৎকলবাসী দেউলকরণ শ্রীশিখিমাহিতির কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমাধবী দেবী। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মাধবী-দেবী—শিখিমাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যাঁর নাম গণি।।

(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৭)

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—শ্রীমাধবী দেবী অতিশয় শুদ্ধ-বুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। ইহারই গুণে শ্রীশিখি মাইতি ও শ্রীমুরারি শ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

শ্রীমাধবী দেবী গৌর-ভক্তগণের মধ্যে কিরূপ পরম ভাগ্যবতী ছিলেন, তা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মাহিতির ভগিনী সেই নাম—মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী--আর পরমা বৈষ্ণবী।।
প্রভু লেখা করে যারে—রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন।।
স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি-মাহিতি— তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজন।।

—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২।১০৪-১০৬)

আলালনাথের নিকট বেণ্টপুর গ্রামে শ্রীভবানন্দ রায়ের গৃহ-সন্নিধানে শ্রীমাধবী দেবী শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকট করেছিলেন। অদ্যাপি তথায়—সেই মূর্তি সেবিত হচ্ছেন। ভবানন্দ রায়ের ভাতুষ্পুত্র হলেন শ্রীশিখি মাহিতি। শুনা যায়—শ্রীমাধবী দেবী 'শ্রীপুরুষোত্তম দেব' নামে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। কেহ কেহ বলেন—শ্রীমাধবী দেবী মহারাজ প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পাঞ্জিয়া অর্থাৎ মাদলা পাঞ্জীর লেখিকা নিযুক্তা হয়েছিলেন।

শ্রীছোট হরিদাস মহাপ্রভুর সেবার জন্য শ্রীমাধবী দেবীর নিকট থেকে সরু চাল চেয়ে এনেছিলেন।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় আছে পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় মাধবী দেবী 'কলাকেলী' নাম্নী শ্রীরাধার কিঙ্করী ছিলেন।

কুষ্ঠী বাসুদেব বিপ্র

'দক্ষিণ দেশে তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে মহাপ্রভু কূর্মক্ষেত্রে এলেন। তথায় শ্রীকূর্ম-বিষ্ণু দর্শন করলেন এবং বহু নৃত্য-গীত করলেন। সেখানে কূর্মনামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। মহাপ্রভুকে দর্শন করে তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং হাব-ভাবে অতিমর্ত্ত বলে জানলেন। তিনি নম্রভাবে প্রভুকে আমন্ত্রণ করে স্বগৃহে নিয়ে এলেন। পাদ ধৌত করিয়ে সেই জল শিরে ধারণ করলেন। বিপ্র সগোষ্ঠী মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করলেন। তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু দুই দিবস তথায় অবস্থান করলেন।

মহাপ্রভুর প্রভাবে সেখানকার বহু লোক বৈষ্ণব হলেন। কূর্ম বিপ্রের একজন মিত্র ছিলেন। নাম শ্রীবাসুদেব। তাঁর অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ রোগ কিন্তু তাঁর ভক্তির কথা অত্যদ্ভুত। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ-কীর্ত্তনে দিন যাপন করত। শরীরের কোন ভান নাই, অভ্যাসে কাজ করছেন।

অঙ্গ হতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাঞা সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঞা।।

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ৭।১৩৭)

জীবের দুঃখে করুণ হৃদয়, শরীর থেকে কীড়ী পড়ে গেলে তাকে তুলে সেখানে রাখেন। মহাভাগবত বিপ্র যখন শুনতে পেলেন কূর্মবিপ্র গৃহে একজন মহান্ত এসেছেন, তিনি বড় কৃপাময়, সকলকে কৃপা করছেন, তখন বাসুদেব বিপ্র মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্য পরম উৎকণ্ঠা ভরে ছুটে

এলেন। ঠিক সেই সময় মহাপ্রভুও কূর্ম বিপ্র থেকে বিদায় নিয়ে চলতে উদ্যত হয়েছেন। এমন সময় বাসুদেব এসে মহাপ্রভুর শ্রীচরণমূলে লুটিয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এলেন। বাসুদেব বললেন— হে প্রভো! আমি মহাপাপী, তদুপরি কুষ্ঠ রোগে পীড়িত, আমাকে স্পর্শ করবেন না।

মহাপ্রভু— যে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ নাম স্মরণ কীর্ত্তন আদি করে সে পরম পবিত্র। সে আমার প্রাণ-তুল্য।

বাসুদেব— হে দেব! আপনি পরম পবিত্র। আমি অপবিত্র, সকলের ঘৃণার পাত্র।

মহাপ্রভু— তুমি অপবিত্র নহ। তোমা স্পর্শে অপবিত্র পবিত্র হয়। এই বলে মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হ'লেন। বিপ্র একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন দেব! তুমি আমাকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। এই বলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু জোর করে তুলে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রভুস্পর্শে দুঃখ সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিত অঙ্গ সুন্দর হইল।।

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৭।১৪২)

শ্রীবাসুদেব বিপ্রের কুষ্ঠ রোগ প্রভুর স্পর্শমাত্রই দুর হল। সুবর্ণের প্রতিমার ন্যায় দেহটি সুন্দর হল। মহাপ্রভুর এ কৃপা, এরূপ প্রভাব দেখে লোক চমৎকৃত হলেন। তখন বাসুদেব বিপ্র ভাগবতের একটা শ্লোক গদ্‌গদ্ কণ্ঠে পাঠ করে স্তব করতে লাগলেন।

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ।।

(ভাঃ ১০।৮১।১৬)

হে দীনবন্ধো! আমি পাপী অপরাধী ব্রাহ্মণাধম, তুমি পবিত্রের পবিত্রস্বরূপ সৌন্দর্য্যের ধাম শ্রীলক্ষ্মীপতি, আমাকে বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করলে।

হে প্রভো! আমার রোগ দূর করলেন কেন!

মহাপ্রভু— তুমি আমার একান্ত শরণাগত ভক্ত, তোমার কোন ক্লেশ আমি সইতে পারি না।

বাসুদেব— হে ঠাকুর! তুমি আমাকে কৃপা করলে না, বঞ্চনাই করলে।

মহাপ্রভু— এর চেয়ে বেশী কৃপা আর কি চাও।

বাসুদেব— প্রভো! এ সব কৃপা না, বঞ্চনা। এখন শরীরের অহঙ্কার হবে। কষ্টে যেরূপ তোমার স্মরণ হয় সুখ-সময়ে সেরূপ হয় না।

মহাপ্রভু— তোমার কখনও অভিমান হবে না। নিরন্তর তুমি কৃষ্ণ-নাম কর।

কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৭।১৪৮)

মহাপ্রভু বাসুদেব বিপ্রকে এই সমস্ত উপদেশ করে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে চললেন রামেশ্বরের দিকে।

শ্রীদময়ন্তী

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভগিনী দময়ন্তী দেবী। তিনি মহাপ্রভুর বার মাসের ভোগ্যসামগ্রী তৈরী করে দিতেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শাখা-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

রাঘব-পণ্ডিত প্রভুর আদ্য-অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য-এক মকরধ্বজ কর।।
তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসি।।
সে-সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া।।
বার মাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি' প্রসিদ্ধি যাহার।।

(চৈঃ চঃ আদি ১০।২৪-২৭)

শ্রীরাঘব পণ্ডিত পানিহাটি গ্রামে বাস করতেন। অদ্যাপি পানিহাটিতে তাঁর সেবিত শ্রীবিগ্রহ আছেন। কবিকর্ণপুর গোস্বামী গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে লিখেছেন যিনি পূর্ব্বে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ-সামগ্রী তৈরী করতেন এবং ধনিষ্ঠা নামে খ্যাত ছিলেন, তিনিই গৌর অবতারে শ্রীরাঘব পণ্ডিত নামে খ্যাত। যিনি কৃষ্ণ অবতারে "গুণমালা" নামে গোপী ছিলেন তিনি অধুনা গৌর অবতারে দময়ন্তী রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

গৌড়দেশের ভক্তগণ আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য পুরীধামে যেতেন। প্রভুর সেবার জন্য প্রত্যেকে কিছু না কিছু তৈরী করে নিতেন। পানিহাটি থেকে শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর বার মাসের খাবার তৈরী করে নিতেন।

মানুষ স্বভাবতঃ প্রিয় পাত্রকে সুখ দেবার চেষ্টা করে থাকে। মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ ভগবান্ রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তী জানতেন। তথাপি তাঁর প্রতি তাঁদের প্রীতি এত প্রবল ছিল যে, কোন্ সময় কোন্ জিনিসটি খেলে শরীর ভাল থাকে, বিচার করে দময়ন্তী দেবী সারা বৎসর বসে বসে জিনিস পত্র তৈরি করতেন, তা সব ঝালি সাজিয়ে পুরীধামে নিয়ে যেতেন এবং মহাপ্রভুর নিকট অর্পণ করতেন।

মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ এ-সব যত্ন করে রেখে দিতেন এবং তাঁর ভোজনের সময় প্রতিদিন কিছু কিছু দিতেন। দময়ন্তী কি কি জিনিস তৈরী করে দিতেন তার একটা তালিকা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে দিয়েছেন। এখানে তা উদ্ধৃত হল।

আম্র-কাশন্দি, আদা ঝাল কাশন্দি নাম।
নেম্বু আদা আম্রকোলি বিবিধ বিধান।
আম্‌সি আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমসত্ত্বা।
যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ সুকুতা।।
সুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুকুতায় যে সুখ তাহা নহে পঞ্চামৃতে।।
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
সুকুতা পাতা কাশন্দিতে মহাসুখ হয়।।

'মনুষ্য' বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু-ভোজনে উদরে কভু 'আম' হঞা যায়।
সুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস।।
ধনিয়া মৌহরীর তণ্ডুল গুণ্ডা করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি-পাক করিয়া।।
শুঠীখণ্ড নাড়ু আর আম পিত্তহর।
পৃথক পৃথক বান্ধি, বস্ত্রের কুথলী ভিতর।।
কোলি শুণ্ঠি, কোলি চূর্ণ, কোলি খণ্ড আর।
কত নাম লইব শত প্রকার আচার।।
নারিকেল খণ্ড নাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিলা সকল।।
চিরস্থায়ী ক্ষীর সার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার।।
শালিকা চুটি ধান্যের আতপ চিঁড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি।।
কতেক চিড়া হুডুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া।।
শালি-ধান্যের তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈলা চিনি পাক দিয়া।।
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈলা পরম সুবাস।।
শালি ধান্যের খই পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাক উখড়া কৈলা কর্পূরাদি দিয়া।।

ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনি পাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল।।
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার।।
রাঘবের আজ্ঞা, আর করেন দময়ন্তী।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম ভকতি।।
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া দিলা গন্ধ দ্রব্য দিয়া।।
পাতল মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০।১৫-৩৬)

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের আদেশে দময়ন্তী এত সব জিনিস প্রভুর জন্য তৈরি করতেন। ছোট ছোট ঝুলিতে এ সব রাখা হত ; পরেএকটা বড় থলিতে ভরে সাবধানে থলির মুখটি শেলাই করে দেওয়া হত। এত বড় থলি বহন করে নেবার জন্য তিন জন মুটিয়া নিযুক্ত করা হত। থলি সাবধানে পুরী পর্য্যন্ত পৌঁছবার ভার থাকত মকরধ্বজ করের উপর। এরূপে রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তী দেবী মহাপ্রভুর সেবা করতেন। তাঁদের শুদ্ধ-বাৎসল্য প্রীতিতে তুষ্ট হয়ে ভগবান সব দ্রব্য হরষিত মনে অঙ্গীকার করতেন। এ সব হচ্ছে ভক্তবৎসল ভগবানের লীলা। এ পরম মধুর আখ্যান শ্রবণ করলে জীবের অজ্ঞান-বন্ধন টুটে যায় এবং কৃষ্ণ পদে রতি হয়। জয় শ্রীরাঘব পণ্ডিত কী জয়। শ্রীদময়ন্তী কী জয়।

ছোট হরিদাস ঠাকুর

শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ আচার্য্যের ঘরে ভোজন করে গম্ভীরাতে ফিরে এলেন এবং বললেন—আজ থেকে ছোট হরিদাস যেন আমার এখানে না আসে। এ কথা শুনে দুঃখে হরিদাস তিন দিন অনশনে রইলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর আদি ভক্তগণ তাঁর জন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অনেক অনুনয়-বিনয় আদি করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু বললেন—

বৈরাগী হৈয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন।।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।।
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া।।

—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২।১২০)

এ সব কথা বলে প্রভু মৌন হলেন। স্বরূপাদি ভক্তগণ আর কিছুই না বলে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।

একদিন শ্রীভগবান্ আচার্য্য মহাপ্রভুকে ভোজন করাতে ইচ্ছা করলেন। তাই হরিদাসকে বললেন—আমার নাম করে মহাপ্রভুর সেবার জন্য ভাল

শালীধান্যের চাল শ্রীমাধবী দেবীর কাছ থেকে চেয়ে আন। শ্রীহরিদাস তাই মাধবী দেবীর কাছ থেকে চাল এনেছেন। মহাপ্রভু সে চালের অন্ন ভোজন করেছেন। তাঁর গভীর আশয় বুঝবার সাধ্য কার আছে? তিনি ঈশ্বর অচিন্ত্য অগম্য তত্ত্ব স্বরূপ। শ্রীমাধবী দেবী শ্রীরাধিকার অংশ রূপা। তিনি বৃদ্ধা নিরন্তর ভজনশীলা।

লোক-শিক্ষক প্রভুর এই এক লীলা। তিনি ঠাকুর বড় শ্রীহরিদাসের দ্বারা জগতে শ্রীহরিনাম গ্রহণকারী সাধু ও শ্রীনামের মহিমা প্রচার করেছেন। ছোট হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা জগতে শ্রীহরিনাম গ্রহণকারী সাধু ও অসাধুর স্বরূপ প্রচার করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ছোট হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি পরম শুদ্ধ-স্বরূপ ছিলেন। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়াদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

আর একদিন শ্রীস্বরূপ দামোদর আদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এসে হরিদাসের জন্য অনুনয় ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। তদুত্তরে মহাপ্রভু বললেন—

"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন।।"

—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১২৪)

আমার মন আমার বশ নয়। অতএব আমি কি করব? মন প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর দর্শন করতে চায় না তোমরা নিজ নিজ কার্য্যে গমন কর। যদি পুনঃ কিছু বল অন্যত্র চলে যাব। প্রভুর কথা শুনে ভক্তগণ নীরব হলেন এবং নিজ নিজ কার্য্যে চলে গেলেন।

ছোট হরিদাসের অপরাধ কিছু ভক্তগণ বুঝতে পারলেন না। ইহা প্রভুর একটী অগম্য লীলা। ভক্তকে লক্ষ্য করে জগৎকে শিক্ষা দেন। এ লীলা

দেখে বৈরাগীগণ ত সাবধান হ'লৈন, গৃহস্থগণও সাবধান হলেন।

দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে।।
(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২।১৪৪)

হরিদাসের জন্য কিছু বলতে একদিন স্বরূপাদি ভক্তগণ শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদকে মহাপ্রভুর কাছে প্রেরণ করলেন। পুরীপাদ মহাপ্রভুর কাছে এলেন। মহাপ্রভু বহু সমাদর করে পুরীকে বসালেন। পুরী গোস্বামী বলতে লাগলেন নিজ পুত্র প্রতি কি ক্ষমা করতে হয় না? সেইরূপ হরিদাসকে ক্ষমা কর।

পুরী গোস্বামীর এই কথা শুনে মহাপ্রভু যেন রোষভরে বললেন— শ্রীপাদ! ঠিক কথা। হরিদাসকে নিয়ে আপনি এখানে থাকুন। আমি আলালনাথে চলে যাচ্ছি। এ কথা বলে গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে তখনই চলে যেতে উদ্যত হলেন। অমনি তাড়াতাড়ি পুরী গোস্বামী সামনে এসে হাতে ধরে অনুনয়-বিনয় করে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন। পুরী গোস্বামী বললেন— তোমার যা ইচ্ছা তা কর, তোমাকে আর কেউ কিছু বলবে না।

পুরী গোস্বামী হরিদাসের কাছে এলেন এবং বলতে লাগলেন—সকলে তোমার হিত কামনা করছেন। প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কৃপা নিশ্চয় করবেন, তুমি বাড়াবাড়ি করলে তিনিও জিদ্ করবেন। তুমি উঠে স্নান ভোজন কর। এভাবে তাঁকে ভক্তগণ অনেক বুঝিয়ে স্নান ভোজনাদি করালেন। মহাপ্রভু যখন জগন্নাথে যান তখন দূর হতে হরিদাস তাঁকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করেন। এ ভাবে বছর কেটে গেল কিন্তু মহাপ্রভু হরিদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না।

হরিদাস বড়ই দুঃখিত হলেন, একদিন রাত্র শেষে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রয়াগ ধামের দিকে যাত্রা করলেন। হরিদাস প্রয়াগ ধামে

পৌঁছিয়ে কয়েকদিন থাকার পর, একদিন মহাপ্রভুর শ্রীচরণ চিন্তা করতে করতে জলে সমাধি গ্রহণ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দিব্য-দেহ প্রাপ্ত হলেন। সে দেহে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এলেন। এবার প্রভুর কৃপা হল।

"প্রভু কৃপা পাঞা অন্তর্দ্ধানেই রহিলা।।
গন্ধর্ব্ব দেহে গান করে অন্তর্দ্ধানে।
রাত্র্যে প্রভুরে শুনায় গীতঅন্য নাহি জানে।।"
—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২।১৪৯)

বৈকুণ্ঠস্থ গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হয়ে হরিদাস শ্রীমহাপ্রভুর সন্নিধানে অবস্থান পূর্ব্বক রাত্রকালে কীর্ত্তন শুনাতে লাগলেন। লীলাময় প্রভুর লীলা কে বুঝবে? একদিন হঠাৎ ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করলেন—হরিদাস কোথায়? তাঁকে এখানে নিয়ে এস। ভক্তগণ বললেন— হে প্রভো! তোমার কৃপার আশায় এক বছর কাল থাকার পর হঠাৎ কোথায় গেছে তা আমরা কেউ জানি না। এ কথা শুনে মহাপ্রভু মৃদু হাস্য করলেন। মহাপ্রভুর হাস্য দেখে ভক্তগণের মনে সন্দেহ হল।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণসহ সমুদ্রস্নান করছেন। এমন সময় সমুদ্রের মাঝখান থেকে হরিদাসের কণ্ঠের মধুর কীর্ত্তন ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। সকলে অবাক। কাকেও দেখা যায় না, কিন্তু হরিদাসের মধুর কণ্ঠের কীর্ত্তন ধ্বনি শুনা যায়। গোবিন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ বললেন এতো হরিদাসের কণ্ঠস্বর। হরিদাস আত্মঘাতী হয়ে ব্রহ্মরাক্ষস রূপে গান করছে।

স্বরূপ দামোদর প্রভু বললেন এ সব অনুমান ঠিক নয়। যে আজীবন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর সেবা ও ক্ষেত্রে বাস করল সে কখনও ব্রহ্মরাক্ষস হতে পারে না। বৈকুণ্ঠে অবস্থান পূর্ব্বক গন্ধর্ব্ব দেহে সে মহাপ্রভুকে কীর্ত্তন শুনাচ্ছে। সব কিছুই পরে জানতে পারবেন।

এমন সময় প্রয়াগ হতে একজন বৈষ্ণব এলেন। তাঁর মুখে সকলে ছোট হরিদাসের সমস্ত কথা শুনতে পেলেন।

পর বছর যখন গৌড় ভক্তগণ রথযাত্রার সময় পুরীতে এলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন— হরিদাস কোথায়? মহাপ্রভু বললেন—"স্বকর্ম ফলভুক্ পুমান্।"

এ লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

আপন কারুণ্য লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ।।
তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তে আত্মসাৎ।
এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।।

—(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২।১৬৯)

শ্রীরঙ্গ পুরী

শ্রীরঙ্গ পুরী বললেন—না, এমন সুন্দর সন্ন্যাসী ত কখনও দেখিনি! ওঁর অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবসমূহ দেখছি! এই বলে শ্রীরঙ্গ পুরী ধরে মহাপ্রভুকে ভূমি থেকে উঠালেন। মহাপ্রভু পুরীর পদ ধূলি নিলেন।

শ্রীরঙ্গ পুরী— কে তুমি? তোমার মধ্যে দিব্য কৃষ্ণ-প্রেম দেখে আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম মাধবেন্দ্র পুরীর কথা মনে পড়ছে। এমন প্রেম তাঁর ছাড়া আর কারও শরীরে দুর্লভ।

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে মহাপ্রভু মহীশূরে উড়ুপীতে এলেন। সেখান থেকে এলেন মহারাষ্ট্র দেশে ভীমা নদীর তীরে পাণ্ডারপুরে এসে উপস্থিত হলেন। তথায় শ্রীবিঠ্ঠাল দেবকে দর্শন করে প্রেমাবিষ্ট হলেন। বহু নৃত্য-গীত করলেন। বিঠ্ঠল দেবকে দর্শন করবার পর মধ্যাহ্ন কালে কোন এক পুজারী ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। তাঁর মুখে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরীর কথা মহাপ্রভু শুনতে পেলেন। অনন্তর শ্রীমহাপ্রভু রঙ্গ-পুরীকে দেখতে চললেন। গিয়ে দেখলেন—শ্রীরঙ্গ পুরী ঘরের মধ্যে বসে "নাম" করছেন। পুরীকে দর্শন করেই স্বীয় গুরু শ্রীঈশ্বর পুরী পাদের কথা মনে পড়ল। মহাপ্রভু অঙ্গন থেকেই শ্রীরঙ্গ পুরীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম ও বন্দনা করলেন। শ্রীরঙ্গ পুরী তাড়াতাড়ি এসে প্রভুকে ধরে তুললেন।

শ্রীরঙ্গ পুরী—শ্রীপাদ, তোমার পরিচয় কি?

মহাপ্রভু—আমি শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরী পাদের অধম ভৃত্য। ঈশ্বরপুরীর নাম

শুনে রঙ্গ পুরীর দু'নয়ন দিয়ে জল ধারা পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ নীরবে কাঁদার পর দুহাত দিয়ে প্রভুর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন—আহা, শ্রীঈশ্বর পুরী ত আমাদের ছেড়ে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেছেন। বাবা! তোমায় দেখে বড় শান্তি পেলাম! মহাপ্রভু—(সজল নয়নে বললেন) হে গোঁসাই, কত ভাগ্যে আপনার দর্শন পেলাম।

শ্রীরঙ্গপুরী—শ্রীপাদ— তোমার পূর্ব্ব আশ্রমের পরিচয় শুনতে চাই। মহাপ্রভু—বঙ্গদেশে গঙ্গাতটস্থিত নবদ্বীপ নগরীতে আমার জন্মস্থান। পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র। বর্ত্তমানে তিনি বৈকুণ্ঠবাসী। মাতার নাম শ্রীশচীদেবী। আর এক পুত্র ছিলেন, তাঁর নাম ছিল বিশ্বরূপ। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তিনি দেশান্তরী হয়েছিলেন। এখন আমিও সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর অনুসন্ধান করছি।

রঙ্গপুরী—বাবা বহুদিনের কথা মনে পড়ল। আমি একবার শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে নবদ্বীপ গিয়েছিলাম। তোমার পিতা জগন্নাথ মিশ্র বহু সমাদর করে শ্রীগুরুদেবকে গৃহে নিয়ে পূজা করেছিলেন এবং ভোজন করিয়েছিলেন। তোমার মাতৃদেবীর রান্নার স্বাদ এখনও ভুলতে পারি নি। তিনি যে শাক রান্না করেছিলেন—তা অপূর্ব্ব। আহা, তুমি সেই জগন্নাথ শচীর পুত্র। এই বলে রঙ্গ পুরী মহাপ্রভুকে আবার জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন—বাবা, একটা কথা। বলতেপ্রাণ ফেটে যায়।

মহাপ্রভু— গোসাঞিও, কি কথা বলুন। আমি কি শুনবার যোগ্য নই?

রঙ্গপুরী— দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলে অনেক কষ্ট হয়! আবার দেখাও যায় অনেক কিছু।

মহা প্রভু—কষ্ট কি? দেখা যায় কি?

রঙ্গপুরী— তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীশঙ্করারণ্য

নাম ধারণ করেছিল। এই পাণ্ডারপুরেই থাকতো তারপর আর কি বলব! (মূর্চ্ছা)

মহাপ্রভু দুঃখভরে পুরীকে ধরে বসালেন এবং বললেন— গোসাঞি, তারপর বলুন। আহা কি মধুর কথা শুনছি! বিশ্বরূপের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করছি। জননীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি—বিশ্বরূপের সন্ধান যে কোন রকমে সংগ্রহ করব।

রঙ্গপুরী—(কাঁদতে কাঁদতে) ও-কথা মুখে আনতে প্রাণ ফেটে যায়। আহা, ক'মাস হল - - - - - -(নীরব)

মহাপ্রভু— গোসাঞি, আপনি কাঁদছেন কেন? তারপর কি হল বলুন।

রঙ্গ পুরী—বাবা, আমি কেন বেঁচে আছি জানি না! এই ক্ষেত্রেই তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

বিশ্বরূপের অপ্রকট-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রই ভূতলে মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। শোকাশ্রুতে ভূতল সিক্ত হতে লাগল। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করে মহাপ্রভু প্রায় সারাদিন অচৈতন্য অবস্থায় রইলেন। শ্রীরঙ্গ পুরী প্রভুর কণ্ঠ ধরে কত কাঁদলেন।

তিন-চার দিন রঙ্গ পুরীর আশ্রমে থেকে মহাপ্রভু বিবিধ কথা প্রসঙ্গে সময় কাটালেন। পুনঃ তীর্থভ্রমণে যাত্রা করলেন। শ্রীরঙ্গ পুরীও দ্বারকা অভিমুখে চলে গেলেন।

মহাপ্রভু যখন ক্ষেত্রধামে ফিরে এলেন, শ্রীরঙ্গ পুরীও তথায় এলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন। মহাপ্রভু তাকে শ্রীগুরুর ন্যায় ভক্তি করতেন। শ্রীরঙ্গ পুরীও তাঁকে প্রাণের প্রাণ মনে করতেন।

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র

যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা।।
মিলিলা প্রদ্যুম্ন মিশ্র— প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ, রামানন্দ—দুই মহাধীর।।
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩।১৮৩)

নীলাচলে জন্মিলা যতেক অনুচর।
সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর।।
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র—কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর।
আত্ম-পদ যাঁরে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর।।
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।২১০-২১১)

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র উৎকলবাসী ভক্ত ব্রাহ্মণ। প্রভুর অতি কৃপা পাত্র। তিনি একদিন প্রভুর কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাইলেন। প্রভু বললেন—আমি কৃষ্ণ-কথা জানি না। রামানন্দ রায় জানেন। আমি তাঁর মুখে শুনি। আপনি তাঁর কাছে যান। আপনার কৃষ্ণ কথা শ্রবণে যে রুচি হয়েছে তা বড় ভাগ্য।

মিশ্র কৃষ্ণ-কথা শুনতে রামানন্দের স্থানে এলেন। সেবক তাঁকে যত্ন করে বসালেন। মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন—রায় কোথায়? সেবক বললেন—এখন তাঁর দর্শন পাবেন না। তিনি দু'জন দেবদাসীকে স্ব-রচিত নাটক অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। মিশ্র অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দেবদাসীদের কিছুক্ষণ শিক্ষা দেবার পর তাদের গৃহে বিদায় দিয়ে রামানন্দ রায় বাইরে এলেন। দেখলেন প্রদ্যুম্ন মিশ্র বসে আছেন। রায় নমস্কার করতেই মিশ্র উঠে নমস্কার করলেন। রায় বললেন—এসেছেন বোধ হয় অনেকক্ষণ হল। কেউ ত' আমায় বলেনি। আপনার চরণে অপরাধ হল। আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হয়েছে। কি সেবা করব বলুন? মিশ্র বললেন—আজ অনেক বেলা হয়েছে, আপনার কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে এসেছিলাম। শ্রীরামানন্দ রায় বললেন—কৃপা পূর্ব্বক কাল আসুন। দ্বিতীয় দিবস সময়মত মিশ্রজী এলেন। রামানন্দ রায় উঠে মিশ্রকে নমস্কারপূর্ব্বক গৃহের মধ্যে নিলেন এবং উভয়ে উপবেশন করলেন।

রামানন্দ রায় বললেন—কাল ত কিছু কথা হয় নি। বলুন কি আদেশ। মিশ্র বললেন—আপনার কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনতে এসেছি। রায় বললেন—আমি কৃষ্ণ-কথা জানি, কে বললেন? মিশ্র—স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন। রামারায় বললেন—আপনি তাঁর মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাইলেন না কেন? মিশ্র—আমি তাঁর কাছে শুনতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন আমি কৃষ্ণ-কথা জানি না। রামানন্দ জানে। তাঁর কাছ থেকে আমি শুনি। আপনি তাঁর কাছে যান। রায় বললেন—প্রভু আপনাকে বঞ্চনা করেছেন। আমি অধম কৃষ্ণ কথার কি জানি? আচ্ছা বলুন কি কথা শুনতে চান। মিশ্র—বিদ্যানগরে প্রভুকে যে সমস্ত কথা শুনিয়েছিলেন, সে সব কথা কিছু বলুন। শ্রীরামানন্দ রায় কৃষ্ণ কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কৃষ্ণ-কথায় প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হল। সেবক এসে রায় রামানন্দকে অপরাহ্ন কালের সূচনার কথা জানালেন। তখন রায় কথা বন্ধ করলেন। মিশ্র বললেন—রায়! আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এমন মধুর কৃষ্ণ-কথা শুনে আমার জীবন ধন্য হল। রায় বললেন—আমি কিছুই বলিনি। মহাপ্রভু যেমন বলালেন তেমনি বললাম। তিনি সূত্রধার। যেমন নাচান, তেমনি নাচি। মিশ্রজী বিদ্যায় নিয়ে গৃহে এলেন এবং সন্ধ্যাকালে মহাপ্রভুর কাছে এলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করলে সব কথা বললেন।

অতঃপর প্রভু বলতে লাগলেন—রামারায় নিত্য সিদ্ধ। রাগানুগ মার্গে গোপীভাবের অনুসরণে কৃষ্ণ-ভজন করেন। তাঁর মনের ভাব তিনি মাত্র জানেন। দেবদাসী স্পর্শেও মন কাষ্ঠপাষাণের মত বিকার শূন্য। দেবদাসীগণকে রাধার সখী মনে করেন এবং নিজেকে তাঁদের সেবিকা মনে করে সেব্য বুদ্ধিতে তাঁদের সেবা করেন।

সেব্য-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করেন আরোপণ।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫।২০)

শ্রীগৌরসুন্দর রামানন্দ রায় সম্বন্ধে এ-সমস্ত কথা বলে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রকে বিদায় দিলেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দ্বারা শ্রীহরি নামের মহিমা ও শ্রীরামানন্দের দ্বারা প্রেমভক্তি মহিমা জগতে প্রচার করেছেন।

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় মিথিলার ত্রিহুতবাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। তিনি প্রয়াগের 'আড়াইল' গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্য্য ভবনে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। তিনি একজন মহাভাগবত পুরুষ ছিলেন। রঘুপতি মহাপ্রভুকে বন্দনা করলেন। প্রভু বললেন,— তোমার মুখে কৃষ্ণের বর্ণনা শুনতে চাই। রঘুপতি বলতে লাগলেন—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তি ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।।

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।৯৬ পদ্যাবলীধৃত)

ভবযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় কেহ শ্রুতির কেহ স্মৃতির কেহ বা মহাভারতের উপাসনা করে। আমি কিন্তু অন্য কারও উপাসনা করি না। যাঁর গৃহ বারান্দায় দোলনা মধ্যে শ্রীবালকৃষ্ণ আনন্দে দুলছেন, একমাত্র সেই শ্রীনন্দ মহারাজকে বন্দনা করি, ভজনা করি। প্রভু বললেন—আরও বল।

রঘুপতি বললেন—

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম।।

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।৯৮)

কাকেই বা বলতে পারি, এখন কেই বা তা বিশ্বাস করবে যে সূর্য্যতনয়া কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরমব্রহ্ম লীলা করে।

প্রভু বলতে লাগলেন—আরও বল, আরও বল।

রঘুপতি প্রভুর প্রেম দেখে চমৎকৃত হলেন—"মনুষ্য নহে ইহো,—কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার।।"

প্রভু বললেন— শ্রেষ্ঠ উপাসনা কি?

রঘুপতি—শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

প্রভু—তার বাসস্থান কোথায়?

রঘুপতি—মথুরা ও দ্বারকা।

প্রভু—রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রস কোনটী?

রঘুপতি—আদ্যরস মধুর রসই শ্রেষ্ঠ।

প্রভু রঘুপতির মুখে এ সব কথা শুনে উঠে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন।।

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।১০৭)

শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য বা বল্লভ ভট্ট

শ্রীবল্লভাচার্য্য ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে বৈশাখী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে চম্পারণ্য নামক বনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম—শ্রীলক্ষ্মণ ভট্ট। মাতার নাম—শ্রীযল্লমাগারু। ভরদ্বাজ গোত্রীয় আন্ধ্রব্রাহ্মণ। শ্রীলক্ষ্মণ ভট্ট কাশীতে বসবাস করতেন। সেখানে বল্লভাচার্য্য অধ্যয়ন করেন। অল্পকালে সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গত হন এবং দিগ্বিজয় করেন। বিবাহের পর তিনি প্রয়াগে আড়াইল গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাবার পথে মহাপ্রভু প্রয়াগ ধামে উপস্থিত হলেন। প্রয়াগ ধামে তিনি অপূর্ব্ব প্রেম বিকার প্রকাশ করলেন। তাঁর সে দিব্য ভাব দর্শনে সমস্ত লোক প্রেমময় হলেন। গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ ধামকে প্লাবিত করতে পারেনি, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমজলে সকলকে প্লাবিত করলেন। মহাপ্রভুর সে প্রভাবের কথা শুনে একদিন শ্রীবল্লভাচার্য্য তাঁকে দেখতে এলেন। বল্লভাচার্য্য দূর থেকে প্রভুর অলৌকিক দিব্য মূর্ত্তি দেখে বুঝতে পারলেন, তিনি এক মহাপুরুষ হবেন। নিকটে এসে প্রণাম করলেন, প্রভু তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে হাসতে হাসতে তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। প্রভু বুঝতে পারলেন ইনি মহাভাগবত। অনন্তর উভয়ে কৃষ্ণকথা আরম্ভ করলেন। উভয়ের মনে প্রেম উথলে উঠল। বাৎসল্য-ভাবের উপাসক বল্লভাচার্য্য। প্রভু তা বুঝতে পেরে প্রেম সঙ্কোচ করলেন। মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেম বিকার দেখে বল্লভাচার্য্য চমৎকৃত হলেন। ঠিক এ সময় শ্রীরূপ ও অনুপম প্রভুর শ্রীচরণে এলেন এবং প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। বল্লভাচার্য্যের নিকট মহাপ্রভু দু'ভায়ের পরিচয় করিয়ে

দিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম বল্লভাচার্য্যকে বন্দনা করলেন। তাঁদের বৈষ্ণবভাব দেখে বল্লভাচার্য্য উঠে তাঁদের আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন। দু'ভাই দৈন্য ভরে বললেন—"অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুহঁহ মোরে।।" (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।৬৭) আমরা অস্পৃশ্য পামর ; আমাদের ছোঁবেন না। তাঁদের এরূপ দৈন্য দেখে আচার্য্য অবাক হলেন। বললেন তোমরা সর্ব্বোত্তম, তোমাদের মুখে কৃষ্ণ-নাম নৃত্য করছে। তখন আচার্য্যকে পরীক্ষা করবার জন্য প্রভু ভঙ্গী করে বলতে লাগলেন—আপনি বৈদিক যাজ্ঞিক ও কুলীন। এঁরা হীন জাতি। এঁদের স্পর্শ করবেন না। আচার্য্য বললেন—

দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই 'অধম' নহে, হয় 'সর্ব্বোত্তম'।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।৭১)

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।
(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্যের মুখে এ সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনে পরম সুখী হলেন। স-পার্ষদ মহাপ্রভুকে নিজগৃহে নিবার জন্য বল্লভাচার্য্য নিমন্ত্রণ করলেন। প্রভু আচার্য্যের নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন ও সপার্ষদ তাঁর গৃহে চললেন।

সগণে প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চড়াঞা।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লঞা।।
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল।।

হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবের মনে হৈল ভয় কাঁপ।।
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভুরে উঠাইল।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল।।
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিলা নৌকা, ঝলকে ভরে জল।।
যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ।।
দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈল।
আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিল।।

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।৭৭-৮৩)

তারপর বল্লভাচার্য্য সাবধানে প্রভুকে যমুনায় স্নানাদি করিয়ে নিজ গৃহে নিয়ে এলেন।

আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিলা প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন।।
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল।।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল।।
ভিক্ষা করাইল প্রভুরে সস্নেহ যতনে।
রূপ গোসাঞি দুই ভাইয়ে করাইল ভোজনে।।
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ।।
মুখবাস দিয়া প্রভুরে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন।।

প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।৮৫-৯১)

শ্রীবল্লভ ভট্ট শীঘ্র ভোজন করে পুনঃ প্রভুর চরণে এলেন। এমন সময় রঘুপতি উপাধ্যায় এলেন। প্রভু তাঁর কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাইলেন। রঘুপতি উপাধ্যায় ত্রিহুত পণ্ডিত, মহাভাগবত। তিনি কৃষ্ণের বর্ণনা করতে লাগলেন। তাঁর মুখে কৃষ্ণ-নাম শুনে প্রভু প্রেম উথলে উছ্‌ল। প্রভু প্রেমাবেশে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

দেখি বল্লভ ভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল।।
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভু দরশনে সবে কৃষ্ণ-ভক্ত হইল।।
ব্রাহ্মণ সকল, করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভ ভট্ট তাঁ সবারে করেন নিবারণ।
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাইব ইঁহা না দিব রহিতে।।
যাঁর ইচ্ছা প্রয়াগে যাঞা করিবে নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লৈঞা করিল গমন।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।১০৮-১১২)

প্রভু সপার্ষদ প্রয়াগে এলেন।

এই মত বিলাস প্রভু ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ ভট্ট মিলিল আসিয়া।।
(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭।৪)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বছরের ন্যায় রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়দেশের ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে সব নীলাচলে এলেন। এমন সময় শ্রীবল্লভ ভট্টও নীলাচলে এলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। বল্লভাচার্য্য বন্দনা করলে প্রভু ভাগবত বুদ্ধিতে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভু মান্য করে তাঁকে নিকটে বসালেন, তখন বল্লভ ভট্ট বিনয় করে বলতে লাগলেন—

বহু দিন মনোরথ তোমা, দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈলা, দেখিলুঁ তোমারে।।
তোমার দর্শন যে পায় সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্।।
তোমারে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হবে,—ইথে কি বিচিত্র।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।৭-৯)

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শ পাদশৌচাসনাদিভিঃ।।

(ভাঃ ১।১৯।৩৩)

কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন।।
তাহা প্রবর্ত্তাইলা তুমি,—এই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণ-শক্তি ধর তুমি,—ইথে নাহি আন।।
জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে।।
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
'কৃষ্ণ'—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র প্রমাণে।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭।১১-১৪)

বল্লভ ভট্ট সমস্ত বলে মহাপ্রভুকে প্রশংসা করলে প্রভু বললেন—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী! কৃষ্ণ-ভক্তি কি জানিনা। এ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। এঁর সঙ্গ-প্রভাবে আমার মন নির্মল হয়েছে। এঁর কৃপায় ম্লেচ্ছগণও কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করেছে। তারপর প্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়ে বললেন—ইনি শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত। সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবোন্মাদে সর্বদা কৃষ্ণ-প্রেম সাগরে ডুবে থাকেন। ইনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। ষড় দর্শনের অধ্যাপক জগদ্‌গুরু ও ভাগবতোত্তম। ইনি আমাকে ভক্তিযোগ কি তা দেখিয়েছেন। ইনি রামানন্দ রায়। কৃষ্ণ-ভক্তি রসের নিধান। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ তা তিনি আমাকে জানিয়েছেন। ভঙ্গী করে প্রভু বল্লভ ভট্টের নিকট এ ভাবে নিজ পার্ষদগণের পরিচয় দিতে লাগলেন।

ভট্টের হৃদয় দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী।।
আমি সে বৈষ্ণব,—ভক্তিসিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি।।
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি সে হইল খর্ব্ব।।
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল সবারে দেখিবার।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭।৫৩-৫৬)

বল্লভ ভট্ট জিজ্ঞাসা করলেন এ-সমস্ত বৈষ্ণব কোথায় থাকেন? প্রভু বললেন— কেহ গৌড়দেশে, কেহ উৎকলে, কেহ বা দেশান্তরে। বর্ত্তমানে সকলেই রথযাত্রা দর্শনের জন্য আগমন করেছেন। আপনি এখানে সবার দর্শন পাবেন। অতঃপর বল্লভ ভট্ট বহু অনুনয় করে প্রভুকে নিজ গৃহে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করলেন।

অন্য দিবস মহাপ্রভু যখন অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত ও শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভৃতি পার্ষদবৃন্দসহ উপবিষ্ট ছিলেন, ঠিক সে সময় শ্রীবল্লভ আচার্য্য তথায় উপস্থিত হলেন এবং তিনি বৈষ্ণবগণকে দেখে চমৎকৃত হলেন।

তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল।
গণ সহ মহাপ্রভুরে ভোজন করাইল।।
(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭।৬৩)

রথযাত্রা দিবসে সাত সম্প্রদায় চৌদ্দমাদল বাদ্য, তার মধ্যে প্রভুর অদ্ভুত নৃত্য-কীর্ত্তন দেখে বল্লভ ভট্টের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি পরম বিস্ময়ান্বিত হলেন। রথযাত্রা হয়ে গেল। গৌড়ের ভক্তগণও বিদায় হলেন। বল্লভ ভট্ট পুরীতে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন তিনি প্রভুস্থানে ভাগবত শাস্ত্রে স্ব-কৃত টীকা শুনাতে ইচ্ছা করলেন। প্রভু বললেন—আমার ভাগবত অর্থ শুনবার অধিকার নাই বলে, আমি বসে কৃষ্ণনাম জপ করি। রাত্র-দিনে সংখ্যা পূর্ণ হয় না। কখন ভাগবত আদি শাস্ত্র শুনব?

বল্লভ ভট্ট বললেন—আমি কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ করেছি। প্রভু বললেন—"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি। 'শ্যামসুন্দর' 'যশোদানন্দন'—এই মাত্র জানি।"

বল্লভ ভট্টের প্রয়াস ব্যর্থ হল। তিনি বিমর্ষ হলেন। সে দিবস গৃহে এলেন, মনে মনে চিন্তা করলেন, অন্যান্য ভক্তদিগকে ইহা শুনাবেন। তারপর তিনি ভক্তদের কাছে এ কথা প্রস্তাব করলে প্রভুর উপেক্ষা হেতু কেহ শুনতে রাজি হলেন না। ভট্ট বড়ই লজ্জিত হলেন। পরিশেষে দুঃখিত চিত্তে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কাছে এলেন এবং বহু অনুনয়-বিনয় করে কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা শুনাতে লাগলেন। অতিশয় সরল শ্রীগদাধর পণ্ডিত যেন সঙ্কটে পড়লেন। বল্লভাচার্য্য

একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বাইরে তাঁকে কিছু বলতে পারছেন না। অথচ প্রভু উপেক্ষা করেছেন শুনে নিজের শুনবার ইচ্ছাও নাই। মনে মনে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ স্মরণ করতে লাগলেন। প্রভুকে ত' ভয় করি না। তাঁর যে ভক্তগণ আছেন তাঁরা বিষম। তাঁদের ভয় করি।

প্রত্যহ বল্লভ ভট্ট প্রভু স্থানে আসেন এবং বিবিধ তর্ক উত্থাপন করেন। অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি তা খণ্ডন করেন। কোন সিদ্ধান্ত প্রভুর ভক্তগণের আগে বল্লভ ভট্ট স্থাপন করতে পারেন না। তজ্জন্য বড় বিষণ্ণ হলেন।

একদিন বল্লভ ভট্ট অদ্বৈত আচার্য্যকে প্রশ্ন করলেন—জীব প্রকৃতি, কৃষ্ণ পতি। পতিব্রতা স্বামীর নাম উচ্চ করে বলে না। কিন্তু আপনারা বলেন কেন?

অদ্বৈতাচার্য্য বললেন—আমাদের সামনে সাক্ষাৎ ধর্ম-স্বরূপ প্রভু বসে আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রভু কহেন,—তুমি না জান ধর্ম্মমর্ম।
স্বামী আজ্ঞা পালে—এই পতিব্রতাধর্ম।।
পতির আজ্ঞা—নিরন্তর তাঁর নাম লইতে।
পতির আজ্ঞা—পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে।।
অতএব নাম লয় নামের 'ফল' পায়।
নামে ফলে কৃষ্ণপদে 'প্রেম' উপজয়।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭।১০৬-১০৮)

এ সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনে বল্লভ ভট্ট নির্ব্বাক হলেন। ঘরে এসে চিন্তা করতে লাগলেন।

"নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত।
একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত্।।

তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায়।
স্ব-বচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়।।

(তত্রৈব ৭।১১০-১১১)

আর একদিন বল্লভভট্ট বৈষ্ণব সভায় এলেন ও প্রভুকে নমস্কার করে আসনে বসলেন। অনন্তর গর্ব্বভরে কিছু বলতে লাগলেন—

"ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান কৈরাছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন।।

*　　*　　*

প্রভু হাসি কহে,—স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন।।
এত কহি মহাপ্রভু মৌন ধরিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা।।
জগতের হিত লাগি গৌর-অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাহার।।
নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান্।
কৃষ্ণে যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রে অভিমান।।
অজ্ঞ জীব নিজ 'হিতে' অহিত করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে।।
ঘরে আসি রাত্র্যে ভট্ট চিন্তিতে লাগিল।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈল।।
স্বগণ সহিতে মোর মানিলা নিমন্ত্রণ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি' গেল মন।।
আমি জিতি—এই গর্ব্ব শূন্য হউক ইঁহার চিত।।
ঈশ্বর স্বভাব,— করেন সবাকার হিতে।।

আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাতে মোর করেন অপমান।।
আমার 'হিত' করেন,—ইহো আমি মানি 'দুঃখ'।
কৃষ্ণের উপরে কৈল যেন ইন্দ্র মহা মূর্খ।।
এত চিন্তি, প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে।।
আমি অজ্ঞ জীব,—অজ্ঞোচিত কর্ম কৈলুঁ।
তোমার আগে মূর্খ আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ।।
তুমি—ঈশ্বর, নিজোচিত কৃপা যে করিলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা।।

* * *

প্রভু কহে—তুমি পণ্ডিত 'মহাভাগবত'।
দুইগুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব পর্ব্বত।।
শ্রীধর স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর!
শ্রীধর স্বামী নাহি মান,—এত গর্ব্ব ধর!
শ্রীধর স্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধর স্বামী 'গুরু' করি' মানি।।
শ্রীধর-উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
'অর্থ ব্যস্ত' লিখন সেই লোকে না মানিবে।।
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ।।
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি, ভজ কৃষ্ণ ভগবান্।।

অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।।
ভট্ট কহে—'যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
একদিন পুনঃ মোর মান' নিমন্ত্রণ।।

—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১।১১৩-১৩৮)

জগদ্ হিতার্থে অবতীর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁকে দণ্ড দিয়ে শোধন করলেন ও সমস্ত জগদ্‌কে তাঁকে লক্ষ্য করে শিক্ষা দিলেন। যোগ্য প্রিয়জনের মাধ্যমে ছাড়া জগতকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। অতঃপর মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন এবং সপার্ষদ তাঁর গৃহে ভোজন করলেন। শ্রীবল্লভ ভট্টের মন পরম আনন্দিত হল। শ্রীমদ্ বল্লভ ভট্ট বাল গোপালের উপাসনা করতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর কিশোর গোপালের উপাসনা করবার ইচ্ছা হল। অনন্তর তিনি প্রভুর আজ্ঞা নিয়ে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট থেকে কিশোর কৃষ্ণ উপাসনা মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

তাঁহাই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্ব প্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭।১৭১)

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে আষাঢ়ী শুক্ল পক্ষে শ্রীবল্লভাচার্য্য অপ্রকট হন।

পাঠান বৈষ্ণব—বিজলি খাঁন

বিজলি খাঁন নয়জন পাঠান সৈন্যসহ ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে দেখলেন, গাছের তলায় এক সন্ন্যাসী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর আশে-পাশে চারজন লোক বসে আছে। বিজলি খাঁন অশ্ব থামিয়ে বিচার করলেন—সন্ন্যাসীর সঙ্গে সোনার মোহর প্রভৃতি ছিল, এ চার ঠগ্ তাঁকে ধুতুরা খাইয়ে তাঁর কাছ থেকে সমস্ত অর্থ-কড়ি লুঠ করেছে। চারজনকে বন্দী করতে বিজলি খাঁন আদেশ করলেন। পাঠান সৈন্যগণ তাঁদের বন্দী করল।

কৃষ্ণদাস রাজপুত বললেন— তোমাদের বাদশার দোহাই। এ-সন্ন্যাসী আমাদের গুরু। এঁর মূর্চ্ছা রোগ আছে। মাঝে মাঝে এ অবস্থা হয়। আমরা সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষা করি। এখনি চৈতন্য লাভ করবেন, তোমরা বস—দেখতে পাবে।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন করে যমুনা পার হয়ে মহাবনের পথ দিয়ে মহাপ্রভু প্রয়াগের দিকে চলেছেন। পথে এক বৃক্ষ মূলে বসে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় রাখাল বালকদের বংশী ধ্বনি শুনে বৃক্ষমূলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন এবং মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে লাগল। এমন সময়ে পাঠান সৈন্যগণ তথায় এল।

অতঃপর কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু 'হরি' 'হরি' বলে হুঙ্কার করে উঠলেন।

"হুঙ্কার করিয়া উঠে বলে 'হরি' 'হরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধ বাহু করি।।"

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৮।১৭৭)

সেই মধুর 'হরি' 'হরি' ধ্বনি শুনে ম্লেচ্ছগণ চমৎকৃত হল। ভীত হয়ে ভক্তগণকে সত্বর মুক্ত করে দিল। তারপর বিজলি খাঁন প্রভুকে নমস্কার করে বললেন—যতিবর! এ চার ঠগ্ আপনাকে ধুতুরা খাইয়ে সব হরণ করে নিয়েছে। প্রভু বললেন—আমি সন্ন্যাসী, আমার কোন অর্থ-কড়ি নাই। মৃগী ব্যাধিতে কোন কোন সময় অচৈতন্য হলে এঁরা আমায় রক্ষা করেন।

বিজলি খাঁনের সঙ্গে একজন মৌলবী ছিলেন। তিনি হিন্দু ও ইসলাম শাস্ত্রে পারঙ্গত ছিলেন। তিনি বললেন—আপনাকে পেয়ে আমরা বড় প্রীত হয়েছি। আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই। প্রভু বললেন—স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন। মৌলবী বললেন—নির্ব্বিশেষ-বাদ ও সবিশেষ-বাদ কি? আমাদের শাস্ত্রেও অদ্বৈতবাদের কথা আছে। দুই বাদের তাৎপর্য্য ভাল ভাবে শুনতে ইচ্ছা করি।

মহাপ্রভু বললেন—আপনাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে নির্ব্বিশেষ বলেছেন। আবার সবিশেষও বলেছেন। আপনাদের শাস্ত্রে ঈশ্বর এক—তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়, পূর্ণ। তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ।

তোমার শাস্ত্রে কহে—শেষে 'একই ঈশ্বর'।
"সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেহোঁ—শ্যাম কলেবর।।"
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৮।১৯০)

সেই ভগবানের সেবার দ্বারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। তাঁর চরণ সেবাই বা প্রীতিই পরম পুরুষার্থ।

মহাপ্রভুর মুখে এরূপ তত্ত্বকথা শুনে মৌলবী এবং বিজলি খাঁন পরম সুখী হলেন। মৌলবী প্রভুর চরণ বন্দনা করে বলতে লাগলেন—

সেইত 'গোসাঞি' তুমি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুঞি—অযোগ্য পামর।।

অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
'সাধ্য-সাধন বস্তু' নারি নির্দ্ধারিতে।।
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণ-নাম।
আমি-বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান।।
কৃপা করি বল মোরে 'সাধ্য-সাধনে'।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে।।
প্রভু কহে,—উঠ কৃষ্ণ নাম তুমি লইলা
কোটী জন্মের পাপ গেল, 'পবিত্র' হৈলা।।
'কৃষ্ণ' কহ 'কৃষ্ণ' কহ কৈলা উপদেশ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৮।২০১-২০৬)

পরিশেষে মহাপ্রভু মৌলবী সাহেবের নাম দিলেন রামদাস। এ সমস্ত তত্ত্ব সিদ্ধান্ত শুনে রাজকুমার বিজলি খাঁন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে প্রভুর চরণে পড়লেন। প্রভু তাঁকে অনেক উপদেশ করলেন। প্রভুর কৃপায় পাঠানগণ বৈষ্ণব হলেন।

"সেইত পাঠান সব 'বৈরাগী' হইলা।।
'পাঠান' বৈষ্ণব বলি হৈল তাঁর খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি।।
সেই বিজুলি খাঁন হইল 'মহাভাগবত'।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৮ পরিচ্ছেদ ২১০-২১২)

শ্রীসনোড়িয়া ব্রাহ্মণ

শ্রীসনোড়িয়া ব্রাহ্মণ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর মথুরায় আদি কেশব দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্থানে প্রেম-ভরে নৃত্য-কীর্ত্তন করতে লাগলেন। সেই কালে শ্রীসনোড়িয়া ব্রাহ্মণও তথায় এসে মহাপ্রভুর চরণে নমস্কার করে নৃত্য-কীর্ত্তন করতে লাগলেন।

মথুরা আসিয়া কৈলা 'বিশ্রান্তি তীর্থে' স্নান।
'জন্ম-স্থানে' 'কেশব' দেখি করিলা প্রণাম।।
প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার।।
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।।
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
'হরি' 'কৃষ্ণ' কহে দুঁহে বলে বাহু তুলি।।

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭।১৫৬-১৫৯)

এরূপে কিছুক্ষণ নৃত্যাদি করবার পর প্রভু বিশ্রাম করলেন। তারপর নিভৃতে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"আর্য্য, সরল, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন?।"

—(চৈঃ চঃ ম ১৭।১৬৫)

এরূপ অদ্ভুত প্রেম আপনি কোথা হতে পেলেন? ব্রাহ্মণ বললেন—

পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ভ্রমণ করতে করতে মথুরানগরে এসেছিলেন। তিনি কৃপাপুর্ব্বক আমার গৃহে শুভাগমন করেন এবং আমায় মন্ত্র-দীক্ষা দিয়ে আমার হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন।

"কৃপা করি তেহোঁ মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে 'ভিক্ষা' কৈলা।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৬৭)

প্রভু একথা শুনে গাত্রোত্থান পূর্বক গুরুজ্ঞানে ব্রাহ্মণের চরণ বন্দনা করলেন। ভয় পেয়ে ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি উঠে প্রভুর চরণে পড়লেন। প্রভু বললেন—

" প্রভু কহে,—তুমি গুরু! আমি 'শিষ্য' প্রায়।
গুরু হঞা 'শিষ্যে' নমস্কার না যুয়ায়।।
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৭০)

নিত্য গুরু-সাধু-বিপ্র-মর্য্যাদা দাতা শ্রীমহাপ্রভুর এ কথা শুনে ব্রাহ্মণ বিস্মিত ও ভীত হয়ে বললেন—আপনি সন্ন্যাসী। আমি অধম গৃহস্থ। আমার প্রতি এ সমস্ত কথা বলা কখনও উচিত হয় না। তবে আপনার প্রেম দেখে অনুমানে আপনাকে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে। যেখানে কৃষ্ণ-প্রেম সেখানে তাঁর সম্বন্ধ। তা ছাড়া এরূপ অন্যত্র দুর্ল্লভ;অন্য স্থানে এ প্রেমের গন্ধও নাই।

অতঃপর বলভদ্র ভট্টাচার্য্য (মহাপ্রভুর সঙ্গী সেবক ব্রাহ্মণ) মহাপ্রভুর গুরু-পরিচয় প্রদান করলেন। শুনে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ নাচতে লাগলেন। অনন্তর প্রভুকে নিয়ে ব্রাহ্মণ আপনার গৃহে এলেন এবং প্রভুর বিবিধ পরিচর্য্যা করতে লাগলেন। রন্ধনের যোগাড় করে দিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করতে লাগলেন।

ভাগবত-ধর্ম মর্য্যাদা-রক্ষক প্রভু হাস্য করতে করতে বিপ্রের প্রতি বললেন—

"পুরী গোসাঞি তোমার ঘরে কর্য়াছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ,—এই মোর 'শিক্ষা'।।"

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭।১৭৭)

সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ—সুবর্ণ-বণিক জাতির যাজক ব্রাহ্মণ, এরা নীচ ব্রাহ্মণ! এঁদের ঘরে সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। তথাপি মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব সদাচার দেখে তাঁর গৃহে ভোজন করেছিলেন। ভাগবত সাধুগণ বাহ্য জাতির অপেক্ষা রাখেন না। তাঁদের বিচার—যে কৃষ্ণ-ভজন করে সে বড়।

মহাপ্রভু যখন সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের হাতে প্রসাদ পেতে চাইলেন তখন ব্রাহ্মণ অতিশয় দৈন্য ভরে বলতে লাগলেন—

"তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি—ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার।।
মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিমু সেই 'দুষ্টের' বচন।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৮২-১৮৩)

সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের এ কথা শুনে প্রভু বললেন—শ্রুতি, স্মৃতি ও মুনিগণ কেহ এক মত নহে। সাধুগণের ব্যবহার ধর্ম সংস্থাপন হেতু। শ্রীপুরী গোস্বামী যে আচরণ করেছেন, সেই আচরণই ধর্মসার স্বরূপ। অতঃপর সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রভুকে বহু যত্ন করে ভোজন করালেন। মহাপ্রভু জগতে শ্রীগুরু মর্য্যাদা-ধর্ম স্থাপন করলেন—তাঁর হাতে ভোজন করে।

অতঃপর মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে মথুরার চব্বিশ ঘাট দর্শনাদি করলেন। যাবৎকাল প্রভু বৃন্দাবনাদিতে ভ্রমণ করেছিলেন, তাবৎকাল এ ব্রাহ্মণটী তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব ভট্ট

যে সময় শ্রীনিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপক শিরোমণি বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, সে সময় এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চারিদিক জয় করে তথায় এলেন। সাধন করে তিনি সরস্বতী দেবীর সাক্ষাৎকার করেছেন। দেবীই তাঁকে বর দিয়েছেন। সমস্ত শাস্ত্র যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে। তখন নবদ্বীপে বড় সাড়া পড়ে গেল। পণ্ডিতদের বিদ্যা প্রতিভা যেন স্তিমিত হয়ে পড়ল। সকলে মহাচিন্তায় পড়লেন। উপায় কি? এ কথা ছাত্র পরম্পরায় শ্রীনিমাই পণ্ডিতের কানে গেল। তিনি বললেন—

শুন, ভাই সব কহি তত্ত্ব কথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা।।
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার।।
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাঁহার স্বভাব অনুক্ষণ।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩।৪৩-৪৫)

প্রাচীনকালে হৈহয়, নহুষ, বেণ ও রাবণ প্রভৃতি মহাবীর ছিল—দিগ্বিজয়ী ছিল। কিন্তু ঈশ্বর কি তাদের অহংকার সয়েছেন? তাদের দমন করেছেন। সেরূপে এ দিগ্বিজয়ীও পরাভূত হবে দেখতে পাবে।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত চিন্তা করতে লাগলেন—এ ব্রাহ্মণের মহা অহঙ্কার হয়েছে। একে যদি সভাতে পরাস্ত করি সকলে একে অসম্মান করবে। এর

সমস্ত ধন সম্পত্তি লুঠ করে নেবে। ব্রাহ্মণের বড় কষ্ট হবে। তাকে এমন জায়গায় পরাস্ত করব, অন্যে না জানতে পারে।

অপরাহ্নে প্রভু ছাত্রগণকে নিয়ে গঙ্গাতটে বসে বিবিধ শাস্ত্রালাপ করছেন। সন্ধ্যা সমাগমে পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রোদয় হল। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাশি গঙ্গার জলে পড়ে মুক্তাদামের ন্যায় ঝল্‌মল্ করছে। বসন্তের মলয় পবনে প্রাণ শীতল হচ্ছে। গঙ্গার লহরী কলকল তানে বেলা ভূমি স্পর্শ করছে। চতুর্দিক নিঝুম। ঠিক এমন সময় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গা দর্শন করতে আসছেন, আর মনে মনে নিমাই পণ্ডিতের কখন দেখা হবে ভাবছেন। ব্রাহ্মণ ক্রমে গঙ্গাঘাটে এলেন। দেখলেন ঘাটের এক পার্শ্বে এক বৃক্ষতলে তারাগণ বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় ছাত্রগণ বেষ্টিত এক পুরুষ বসে আছেন। দূর থেকে দিগ্বিজয়ী অনুমানে বুঝলেন ইনিই শ্রীনিমাই পণ্ডিত। অনন্তর তিনি গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে প্রভুর সন্নিকটে এলেন। প্রভু তাঁকে দেখা মাত্রই গাত্রোত্থান করে স্বাগত করলেন এবং মৃদু হাস্য করতে করতে খুব স্নেহভরে সভা মধ্যে বসালেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রভুর ঐশ্বরিক প্রভাব দেখে সম্ভ্রমযুক্ত হলেন।

প্রভু বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ মহাপণ্ডিত। আপনার দর্শনে আমরা ধন্য, পবিত্র হলাম। তখন দিগ্বিজয়ী প্রভুর পরিচয় শুনতে চাইলেন। ছাত্রগণ পরিচয় দিলেন। প্রভু হাস্য করতে করতে বললেন—আমি শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়াই মাত্র। লোকে পরিহাস করে পণ্ডিত বলে। প্রভুর মধুর আলাপে ব্রাহ্মণের প্রাণ শীতল হল। তিনি খুব সুখী হলেন। বললেন—বেশ আপনার আলাপে সুখী হলাম। আপনি শিশু শাস্ত্র ব্যাকরণে পণ্ডিত।

প্রভু বললেন—এ পবিত্র সময়ে আপনি আমাদিগকে গঙ্গার স্তোত্র কিছু শ্রবণ করান। আমরা শুনে পবিত্র হই। ব্রাহ্মণ গঙ্গার স্তোত্র রচনা করে অনর্গল পাঠ করতে লাগলেন। সরস্বতী দেবী তাঁর কণ্ঠদেশে বিরাজমান।

শুনে প্রভু ও ছাত্রগণ ধন্য ধন্য বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। বললেন—জয়দেব, ভবভূতি ও কালিদাস প্রভৃতি আপনার কবিত্ব প্রতিভায় হার মানেন। আপনার শ্লোকের যে গূঢ় অভিপ্রায় আপনিই জানেন। তাই আপনি যদি দু' একটী শ্লোকের অর্থ শুনান তবে আমরা কিছু বুঝতে পারি।

দিগ্বিজয়ী বললেন—আমি ত বহু শ্লোক বলেছি, তার মধ্যে কোন্ শ্লোকের অর্থ শুনতে চান? মহাপ্রভুর দিগ্বীজয়ীর রচিত একটা শ্লোক পড়লেন। দিগ্বীজয়ী শুনে অবাক।—বললেন—আপনি কি করে কণ্ঠস্থ করলেন?

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং।
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।।
দ্বিতীয়—শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈররর্চ্চ্যরণ।
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা।।

(চৈঃ চঃ আদি ১৬।৪১)

মহাপ্রভু বললেন—

"প্রভু কহে দেবের বরে তুমি—'কবিবর'।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয়—শ্রুতিধর।।"

(চৈঃ চঃ আদি ১৬।৪৪)

তারপর দিগ্বিজয়ী শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করলেন। প্রভু বললেন—এতে কিছু দোষ গুণ নাই ত? ব্রাহ্মণ বললেন দোষের লেশ নাই। অধিকন্তু উপমালঙ্কারাদি গুণ ও অনুপ্রাস প্রভৃতিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।

প্রভু বললেন—আমি অলঙ্কার পড়ি নাই। তথাপি এ শ্লোকে যে সব দোষ দেখছি আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন তবে বলতে পারি।

ব্রাহ্মণ বললেন— কেন অসন্তুষ্ট হব। আপনি নিশ্চয় বলুন।

তখন প্রভু বলতে লাগলেন শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কারে পঞ্চদোষ আছে। দু'টী অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ, তিনটী বিরুদ্ধমতি, পুনরুক্তি ও ভগ্নক্রম দোষ আছে।

শুনিয়া প্রভুর বাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত।।
(চৈঃ চঃ আদি ১৬।৮৭)

প্রভুর কথা শুনে দিগ্বিজয়ী একেবারেই বিস্মিত হলেন। কিছু পুনঃ বলতে চাইলেন কিন্তু জিহ্বাতে বাক্য সরল না।

কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁফর।।
পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ।
জানি —সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ।।
(চৈঃ চঃ আদি ১৬।৮৮-৮৯)

শ্রীনিমাই পণ্ডিত যে ব্যাখ্যা করলেন এরূপ সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা মনুষ্য করতে পারে না। নিমাই পণ্ডিতের মুখে সরস্বতী দেবী এ ব্যাখ্যা করেছেন।

দিগ্বিজয়ী বললেন—পণ্ডিত, আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। অলঙ্কার শাস্ত্র পড়েন নাই। তথাপি এ রূপ ব্যাখ্যা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

মহাপ্রভু বললেন—শাস্ত্রের বিচার ভাল-মন্দ জানি না। সবস্বতী যা বলালেন তা বললাম।

শিষ্যগণ হাস্য করতে লাগলে প্রভু নিষেধ করলেন। ব্রাহ্মণের প্রতি বলতে লাগলেন—আপনি মহা পণ্ডিত শিরোমণি, আপনার কবিত্ব গঙ্গা-

ধারার ন্যায়। এত বড় কবি ‘কোথাও দেখি না। ভবভূতি, কালিদাসাদি কবিত্বে দোষ গুণ আছে। দোষ গুণের বিচার ত বড় কথা নয়, কবিত্ব শ বিশেষ কথা।

শৈশব চাপল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হঞ তোমার।।
আজি বাসা, যাহ , কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার।।
(চৈঃ চঃ আদিঃ ১৬।১০৩-১০৪

মহাপ্রভু অতিশয় বিনয় বাক্যে ব্রাহ্মণকে নিজ বাসায় প্রেরণ করলে ব্রাহ্মণ রাত্রে সরস্বতী মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। সরস্বতী দর্শন দিয়ে বল লাগলেন—

যাঁর ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত ব্রহ্মান্ড নাথ সেই সুনিশ্চয়।।
আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি।।
(চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৩।১২৯-১৩০

হে বিপ্র। শীঘ্র নিমাই পণ্ডিতের চরণে শরণ গ্রহণ কর। এ সব ক যেন স্বপ্ন বলে মনে কর না। ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ হল, শীঘ্র একাকী গঙ্গা স করতে চললেন। গঙ্গা স্নান করে ব্রাহ্মণ শ্রীনিমাই পণ্ডিতের গৃহে এলেন এ তাঁর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

প্রভু বললেন—আপনি এ কি করছেন? আমি শিশু আমাকে ব করছেন কেন? ব্রাহ্মণ বললেন—দেবীর কৃপায় এবার আপনাকে জান পেরেছি, আপনাকে ভজনা করলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয়। আপনিই বৈকুণ্ঠ

শ্রীনারায়ণ। তা আজ প্রত্যক্ষভাবে শ্রীসরস্বতী দেবী বলেছেন।

তখন মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

শুন দ্বিজবর তুমি—মহাভাগ্যবান্।
সরস্বতী যাঁহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান।।
দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে।।
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে।।
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বর সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি।।
এতেকে ছাড়িয়া, বিপ্র, সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজহ সকাল।।
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়।।
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়।।
মহা উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে।
সবে বিষ্ণু-ভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে।।
এত বলি, মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া।।
পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩।১৭২-১৮১)

এ সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করে দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ সেই দিবস সব সঙ্গরহিত হয়ে কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হলেন।

এ দিগ্বিজয়ী সম্বন্ধে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলেন—"ইনি—"ক্রমদীপিকা" নামক স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনা সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণন আছে।

শ্রীপুরুষোত্তম (দাস) ঠাকুর

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর শিশুকাল থেকে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ ধ্যান পরায়ণ ছিলেন।

শ্রীসদাশিব কবিরাজ—বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস—তাঁহার তনয়।।
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে।।
(শ্রীচৈঃ চঃ আদিঃ ১১।৩৮-৩৯)

সদাশিব কবিরাজ—মহাভাগ্যবান্।
যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদাস নাম।।
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তমদাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে।।
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।৭৪১-৭৪২)

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রধান চারজন শিষ্য ছিলেন। শ্রীমাধবাচার্য্য, শ্রীযাদবাচার্য্য, দেবকীনন্দন দাস প্রভৃতি। এঁরা কুলীন ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন। শ্রীমাধবাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী, শ্রীদেবকীনন্দন দাস 'শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা' গ্রন্থের লেখক। শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহগণ পূর্ব্বে তাঁর শ্রীপাট চাকদহ ও শিমুরালি ষ্টেশন হতে কিছু দূরে সুখ-সাগরে ছিলেন। সুখসাগর গ্রাম ধ্বংসের পর শ্রীবিগ্রহগণ চান্দুড়িয়ায় আনীত হন। বর্ত্তমানে

জিরাটের গঙ্গা-বংশগণের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বিগ্রহগণসহ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহগণ সেবিত হচ্ছেন। পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট "বসু জাহ্নবার" পাট নামে অভিহিত। তথাকার বর্ত্তমান বৃদ্ধ সেবায়েতের নাম—শ্রীসীতানাথ দাস, (চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৮-৩৯ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের পুত্র শ্রীকানু ঠাকুর।
তাঁর পুত্র—মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃতপূর।।
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪০)

শ্রীসদাশিব কবিরাজের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঠাকুর। তাঁর পুত্র শ্রীকানু ঠাকুর। শ্রীকানু ঠাকুরের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের পত্নীর নাম জাহ্নবা ছিল। ঠাকুর কানাইর আবির্ভাবের পরেই জাহ্নবা অপ্রকট হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এ কথা জানতে পেরে তাঁর গৃহে শুভাগমন করেন এবং শিশু কানুকে নিয়ে খড়দহ গ্রামে আসেন। শ্রীকানু ঠাকুরের জন্ম শকাব্দ ১৪৫৭, বাংলা ৯৪২ সাল আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া রথযাত্রা বাসরে। শ্রীকানু বা কানাই ঠাকুরের কৃষ্ণভক্তি পরায়ণতা দেখে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁর এক নাম দিয়েছিলেন—শিশু কৃষ্ণদাস।

শ্রীকানাই ঠাকুর পাঁচ বছর বয়সে শ্রীঈশ্বরী জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ আচার্য্যগণ তার নাম রাখেন 'ঠাকুর কানাই'। জনশ্রুতি আছে যে, বৃন্দাবনে ঠাকুর কানাই কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হয়ে, যখন নৃত্য করছিলেন তখন তাঁর দক্ষিণ পদের একটী নূপুর পদ হতে অন্তর্হিত হয়ে যায়। ঠাকুর কানাই তখন বলেন— যে স্থানে এ নূপুর পড়েছে, আমি সে স্থানে বাস করব। যশোহর জেলায় খানা নামক গ্রামে ঐ নূপুর পতিত হয়। তদবধি ঠাকুর শ্রীকানাই বোধখানা এসে বাস করতে থাকেন।

প্রেমবিলাস গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে শ্রীকানাই ঠাকুর খেতরির উৎসবে শ্রীজাহ্নবা মাতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের যেমন বহু শৌক্র ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন, তেমনি শ্রীকানাই ঠাকুরেরও বহু শৌক্র ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন।

বর্গীর হাঙ্গামার সময় শ্রীকানাই ঠাকুরের বংশধরগণ শ্রীবিগ্রহসহ বোধখানা ত্যাগ পূর্ব্বক নদীয়া জেলার অন্তর্গত 'ভাজন ঘাট' নামক গ্রামে এসে বসবাস করেন। অতঃপর বর্গীর হাঙ্গামা মিটবার পর কানাই ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধর হরিকৃষ্ণ গোস্বামী পুনঃ বোধখানাতে এসে বাস করেন এবং প্রাণবল্লভ নামক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান বরাহনগরে বোধখানা গোস্বামীর বংশধর শ্রীহরিপদ গোস্বামী এম, এ, কাব্য সাংখ্য ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় বাস করছেন। সামবেদীয় কৌমুদী শাখায় রাঢ়ীশ্রেণীর শ্রীরাম নামক একজন ব্রাহ্মণ শ্রীকানাই ঠাকুরের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় শিলাবতী নদীর তীরে গড়বেতা নামক গ্রামে শ্রীকানাই ঠাকুরের শিষ্যগণ বাস করতেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন

শ্রীচন্দ্রশেখর দেব বা চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন ছিলেন শ্রীগৌরসুন্দরের মেসোমশায়। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা মতে তিনি ছিলেন নব নিধির অন্যতম। তাঁর পূর্ব্ব বাস ছিল শ্রীহট্টে। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভৃতি সকলে শ্রীহট্ট বাসী। এই ভক্তগণ পৃথিবী কৃষ্ণ-ভক্তিশূন্য দেখে দুঃখে শ্রীকৃষ্ণের কাছে জীব উদ্ধারের উপায় উদ্‌ভাবন করবার জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁদের প্রার্থনা শুনে শ্রীহরি করুণা করে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অবতীর্ণ হন। শ্রীচন্দ্রশেখর, শ্রীবাস আদি ভক্তগণ তা বুঝতে পারলেন। মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহোদয়ের গৃহের সন্নিকটে তাঁরা বসবাস করতে লাগলেন।

১৪০৭ শকে ফাল্গুন পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে ভগবান্ অবতীর্ণ হন। সন্ধ্যার সময় চন্দ্রগ্রহণ। হরিধ্বনি করতে করতে সকলে আনন্দে গঙ্গা-স্নান করছেন। শ্রীপ্রভু যেন নামের সহিত অবতীর্ণ হলেন। চন্দ্রগ্রহণের সময় এক অপূর্ব্ব আনন্দময় সংকীর্ত্তন ধ্বনি শুনে ভক্তগণ বুঝতে পারলেন ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েছেন। চন্দ্রগ্রহণ ত' প্রতি বৎসর হয়। কিন্তু এত আনন্দ হয় কি? এমন হরি-সংকীর্ত্তন ধ্বনি শুনা যায় কি? আচার্য্যরত্ন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে সতর্ক করে দিলেন। ইঙ্গিতে বললেন— তোমার গৃহে ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েছেন। তৎক্ষণাৎ আচার্য্যরত্নের গৃহিণী শচীগৃহে এলেন। পুত্ররত্ন দেখে আনন্দে বিহ্বল হলেন। বললেন—দিদি এ কি? এ যে সোনার পুতুল। প্রতিবেশিনীগণও পুত্র এবং প্রসূতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তারপর চন্দ্রশেখরের গৃহিণী অন্যান্য কার্য্য সকল করতে লাগলেন।

আচার্যরত্ন ও তাঁর পত্নী সর্ব্বদা মিশ্রগৃহে আসতেন ও শিশুর তত্ত্বাবধান করতেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন একটু চলতে শিখলেন তখন মাসীমার সঙ্গে কোন কোন দিন তাঁর গৃহে আসতেন। আচার্য্যরত্নের কোন পুত্র-কন্যা না থাকায় এঁকেই পুত্র-সম আদর করতেন।

অতঃপর শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যখন বৈকুণ্ঠ গমন করলেন, তাঁর সংসারের সমস্ত ভার চন্দ্রশেখরের উপর পড়ল। আচার্যরত্নকে জিজ্ঞাসা না করে শ্রীশচীমাতা কিছুই করতেন না। ক্রমে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে বিচিত্র লীলা করতে লাগলেন। সারা বঙ্গ দেশে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের (শ্রীগৌরসুন্দরের) খ্যাতি হল। তিনি বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করে মহান প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। অনন্তর অবতার কার্য্যে মন দিলেন। গয়াধামে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। সর্ব্বদা শ্রীহরিনামে মত্ত থাকতেন। তখন পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধত্য একেবারে চলে গেল। কি এক অভিনব বৈষ্ণবোচিত গুণে তিনি যেন দীক্ষিত হলেন। কত দৈন্য ভরে বৈষ্ণবগণকে তখন সেবা করতে লাগলেন। ক্রমে তিনি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। সংকীর্ত্তন পীঠ হল শ্রীবাস অঙ্গন ও শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন। মহাপ্রভু একদিন লীলাভিনয় করতে ইচ্ছা করলেন। অভিনয় কোথায় হবে? তিনি বললেন—চন্দ্রশেখর ভবনে। তখন বড় বড় চন্দ্রাতপ অঙ্গনে টাঙ্গান হল, অভিনয়ের যাবতীয় দ্রব্য-নতুন শাড়ি, ধুতি, শাখা ও পরচুলা প্রভৃতি শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য সংগ্রহ করলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভক্তগণ আচার্য্যরত্নের গৃহে সমবেত হলেন। অপূর্ব্ব আনন্দ, এমন অভিনয় উৎসব কেহ কখনও দেখেনি। অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন মহাপ্রভুর সঙ্গে মঞ্চে এক এক বেশ নিয়ে অভিনয়ার্থ অবতীর্ণ হলেন। এ অভিনয় বৈষ্ণব গৃহিণীগণ দেখতে এলেন। শচীমাতাও বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। অভিনয় আরম্ভ হল। শ্রীগৌরসুন্দর মহালক্ষ্মীর বেশে প্রবেশ করলেন। যেন স্বয়ং

মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ নগরী থেকে অবতরণ করেছেন। দেখে সকলে মুগ্ধ হলেন। শ্রীশচীমাতাও আচার্য্যরত্নের গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন এ কি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী? না না তুমি চিন্‌তে পারছ না? এ ত' নিমাই, আচার্য্যাণী বললেন। আমার নিমাই বেশ করে এসেছে আমি ত বুঝতে পারছি না শচীমাতা বললেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিয়ে কয়েকদিন অভিনয় উৎসব করলেন, সকলের খুব আনন্দ হল।

এ দিকে পাষণ্ডিগণ দিনের পর দিন হরিকীর্ত্তনের বাধা দিতে লাগল। তখন মহাপ্রভু আত্ম ঐশ্বর্য্য প্রকট করে নগরে নগরে মহা হরি-সংকীর্ত্তন করতে ইচ্ছা করলেন। একদিন ভক্তগণকে আহ্বান করে বললেন, আজ সন্ধ্যাকালে নগরে নগরে মহাসংকীর্ত্তন করব, দেখি যবন পাষণ্ডিগণ কি করতে পারে। তাদেরও নাম বন্যায় ভাসাব।

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে নিয়ে নগরে-নগরে নাচবেন গাইবেন শুনে ভক্তগণের কি আনন্দ! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, শ্রীমুকুন্দ, মুরারী গুপ্ত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর আদি ভক্তগণ সন্ধ্যার সময় প্রভুর বাড়ীতে সমবেত হলেন। সমস্ত নগরে মহা সাড়া পড়ে গেল। সকলের দ্বারে-দ্বারে কদলী বৃক্ষ, পূর্ণ ঘট, বন্দনা মালা, আম্রশাখা, প্রদীপ ও স্বস্তিকাদি শোভা পেতে লাগল। প্রভু স্বহস্তে শ্রীঅদ্বৈত আদি ভক্তগণকে চন্দন মালা পরিয়ে দিলেন। ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। "হরি ও রাম রাম" এই নাম পদকীর্ত্তনের সঙ্গে বাজতে লাগল। সহস্র সহস্র খোল-করতাল ধ্বনিতে ভূলোক ও গোলোক পূর্ণ হল। সংকীর্ত্তন-বন্যায় নবদ্বীপ নগরী যেন ডুবে গেল। প্রভু এইভাবে গোকুলের গূঢ় সম্পদ নাম-সংকীর্ত্তন বিশ্বের সর্ব্বত্র বিতরণ কবার বিপুল আয়োজন করলেন।

মহাভারতে শ্রীব্যাসদেব সহস্র-নাম স্তোত্রে লিখেছিলেন—

"সন্ন্যাস কৃৎশমঃ নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ"। প্রভু এবার সেই বাক্য সত্য করতে উদ্যত হলেন। বললেন—আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব। অমৃতের সাগরে যেন হলাহল ঢেলে দেওয়া হল। ভাবী বিরহ বেদনা ভক্তগণের হৃদয়কে উদ্বেলিত করতে লাগল। শুনে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন জ্ঞানশূন্য হয়ে ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁর নয়নজলে মেদিনী সিক্ত হতে লাগল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আচার্য্যরত্নকে প্রবোধ দিয়ে বললেন—যদি প্রভুর আরও অনেক দিব্যলীলা দেখতে চান, তবে ধৈর্য্য ধারণ করুন। আপনাদের প্রেমে প্রভু আপনাদের কাছে বাঁধা থাকবেন।

সন্ধ্যাকালে আচার্য্যরত্ন প্রভু-গৃহে এলেন। নিদারুণ ভাবী বিরহ বেদনা চেপে রাখতে পারলেন না। প্রভুর অমল বদন কমলের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সব বুঝতে পেরে অমনি উঠে আচার্য্যরত্নকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। আচার্য্য রত্ন কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তুমি নদীয়া পুরী অন্ধকার করে চলে যাবে?

প্রভু হাসতে হাসতে বললেন—আচার্য্যরত্ন, ধৈর্য্য ধারণ করুন। আমি ত' আপনাদের প্রেম ডোরে চিরকাল বাঁধা আছি। কত যত্ন করে আমাকে লালন-পালন করেছেন। আপনাদের এ প্রেমসেবা ঋণ কি আমি কোন জন্মেও শোধ করতে পারব? বলতে বলতে মহাপ্রভু নয়নের জলে ভাসতে লাগলেন। আচার্য্যরত্ন দুই বাহু দিয়ে প্রভুকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন। উভয়ে নীরবে কিছুক্ষণ ক্রন্দন করলেন। পরে প্রভু বললেন—আমার এই লীলা সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্য। যদিও আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব, তথাপি আপনাদের প্রেম ডোরে আপনাদের হৃদয়-মন্দিরে চিরদিন বাঁধা থাকব। আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন। আমার সন্ন্যাসের যাবতীয় কার্য্য আপনাকেই করতে হবে। প্রভুর কথায় আচার্য্যরত্ন কতকটা আশ্বস্ত হলেন।

যে দিন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন সে দিন সন্ধ্যাকালে পর পর অদ্বৈত

আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীধর আদি ভক্তগণ আসতে লাগলেন। প্রভুকে কেহ ফুলের মালা, কেহ ফলাদি দিচ্ছেন, প্রভু নিজ কণ্ঠমালা খুলে খুলে ভক্তগণের গলায় পরাচ্ছেন। আজ কত আনন্দ, প্রভুর শ্রীবদনে কি অপূর্ব্ব মধুর হাসি। দেখে ভক্তগণের মন-প্রাণ আনন্দে ভরে উঠছে। এইরূপ আনন্দরসে কিছু রাত্র কাটিয়ে, প্রভু বললেন—আমার প্রতি ভক্তি বিশ্বাস যদি কারও থাকে, সে যেন কৃষ্ণ-নাম ছাড়া আর কিছু না বলে। কৃষ্ণ নামে সবার বদন পরিপূর্ণ হউক। তারপর প্রভু ভক্তগণকে বিদায় দিয়ে শয়ন করতে গেলেন।

মাঘের রজনী। শীতের প্রকোপে অবরুদ্ধ গৃহে সকলে নিদ্রা ক্রোড়ে অভিভূত। জেগে আছেন শুধু শচী ঠাকুরাণী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নিমাই সেদিন নদে ছেড়ে চলে যাবে। নয়নের জলে তাঁর বক্ষ সিক্ত হচ্ছে। তিনি যে দারুণ কষ্টে বেঁচে আছেন শুধু ভগবানের ইচ্ছায়। শেষ নিশায় প্রভু সন্ন্যাসে যাবার উপক্রম করে প্রথমে শ্রীশচীমাতার চরণ বন্দনা করতে এলেন। শচীর ঘরে একটী ক্ষুদ্র দীপ জ্বলছে। জননীর শ্রীচরণ স্পর্শ করতে তিনি নেত্র খুলে দেখলেন নিমাই। অমনি কেঁদে উঠে কোলে তুলে নিলেন। নয়নের জলে তাঁকে স্নান করাতে লাগলেন।

বললেন বাপধন—নিমাই! তুমি কি সত্য সত্যই চলে যাচ্ছ? এই অভাগিনী কার মুখ দেখে দিনপাত করবে? পরাণের পরাণ তুমিই ত আমার সর্ব্বস্ব। আমি কেমনে বেঁচে থাকব?

জননী। অস্থির হয়ো না। শুন। শুধু এই অবতারে তুমি আমার জননী নও। প্রতি অবতারে তুমি আমার জননী ছিলে। বামন অবতারে তুমি ছিলে অদিতি। রাম অবতারে ছিলে কৌশল্যা ও কৃষ্ণ অবতারে দেবকী। এবার আমি নাম প্রেম বিতরণ করতে অবতীর্ণ হয়েছি। জননী, তুমি স্বয়ং বেদরূপা। তুমি সত্য, তুমি দয়া, তুমি ক্ষমা, তুমি পৃথিবী, তুমি বিশ্বজননী। চিরকাল

তোমার প্রেমডোরে আমি বাঁধা। তুমি আমার সব লীলা জান। তোমাকে আর কি বলব? যদিও লোকলোচনে মনে হচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি, তোমার প্রেমে তোমার গৃহে চিরদিনের জন্য রইলাম। এই বলে বিশ্বমোহনকারী হরি অনেক অনেক দিব্য দিব্য রূপ দেখালেন। তা দেখে ও শুনে শচীমাতা শুধু বললেন—তুমি ঈশ্বর তা' আমি জানি। অতএব তোমার যা ইচ্ছা, তা কর। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি আমার কি সাধ্য? বলতে বলতে শচীমাতা ধ্যানাবিষ্ট হলেন। জননীকে চারবার প্রদক্ষিণ করে তাঁর চরণধূলি নিয়ে মহাপ্রভু সন্ন্যাসে চললেন। নিশার শেষ, চারিদিক নিস্তব্ধ। বৃক্ষপত্র থেকে শিশির বিন্দুপাতের শব্দ শুনা যাচ্ছে মাত্র। মনে হচ্ছে, প্রভুর চির-বিচ্ছেদ ব্যথায় ব্যথিত হয়ে বৃক্ষরাজি অশ্রু বর্ষণ করছে। সাঁতরিয়ে গঙ্গা পার হলেন। মা গঙ্গা যেন কোলে করে তাঁকে পার করে দিলেন। যে ঘাটে প্রভু পার হলেন, তার নাম হল নিদয়ার ঘাট। কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর আশ্রমে এলেন, তখন প্রভাত হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে কেশব ভারতীকে তাঁর তথায় গমনের আভাস দিয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে সকলের বড় দুঃখ হবে, তাই কেশব ভারতী কিছু আপত্তি জানালেন। এ সব চিন্তা করতে নিষেধ করে প্রভু কেশব ভারতীকে সময়োচিত কার্য্য করতে বললেন।

রজনী প্রভাত হল। দুঃখরূপী মহা অজগর এসে যেন নবদ্বীপ পুরীকে গ্রাস করল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কাঁদতে কাঁদতে শ্রীশচীমাতার গৃহদ্বারে এসে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। শচীমাতার ধ্যান ভাঙল। নিমাই কোথায় বলে তিনিও কেঁদে উঠলেন। ছুটে এলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। নিমাইকে না দেখে তিনিও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এলেন অদ্বৈত আচার্য্য। তিনি গৌর অদর্শনে হা গৌর, হা গৌর বলে মূর্চ্ছিত হলেন। কি দারুণ প্রভাত কাল। ক্ষণকালের মধ্যে নবদ্বীপ পুরী যেন গৌরবিরহ অনলে জ্বলে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গেলে গোপগোপিগণের যে রকম বিরহ অবস্থা হয়েছিল ঠিক তাই হল।

প্রভুর নির্দ্দেশ মত শ্রীআচার্য্যরত্ন শীঘ্র কাটোয়ায় ভারতীর আশ্রমে এলেন তাঁর অভিভাবক রূপে সন্ন্যাসের কার্য্যাদি করতে লাগলেন। যদ্যপি আচার্য্যরত্নের কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল তথাপি প্রভুর আজ্ঞা মনে করে কার্য্য করলেন।

ক্ষৌর কর্ম্মের সময় চতুর্দ্দিকে রোদনের ধ্বনি উঠল। মধু নাপিত ক্ষৌর কর্ম্ম করল।

নিত্যানন্দ-আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন।।
— (চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২৮।১৪২)

অতঃপর অরুণ বস্ত্র, দণ্ড ও মন্ত্র গ্রহণ করে প্রভু সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। পরে আচার্য্যরত্নকে সবকিছু বুঝিয়ে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিলেন।

তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা।

* * *

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখে শুনি ভক্তগণ।
আর্ত্তনাদ করি সবে করেন ক্রন্দন।।
— (চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১।৩৩-৩৪)

আচার্য্যরত্ন সকলকে প্রবোধ দিলেন। ভবিষ্যতে প্রভু কি কি লীলা করবেন তাও বললেন।

প্রভু তিন দিন রাঢ় দেশ ভ্রমণ করে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে এলেন। এবার সীতা ঠাকুরাণীর ও অদ্বৈত আচার্য্যের প্রাণ ফিরে এলো। সমস্ত নদীয়াপুরে সাড়া পড়ে গেল। যাঁর অদর্শনে সকলে মৃত প্রায় হয়ে অবস্থান করছিল, শান্তিপুরে তাঁর শুভ বিজয়ে সকলে যেন প্রাণ ফিরে পেল।

মায়াপুর থেকে পালকি করে শ্রীশচীমাতাকে নিয়ে শ্রীচন্দ্রশেখর, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, মুরারি গুপ্তাদি ভক্তগণ সপরিবার শান্তিপুর এলেন।

দূর থেকে শচীমাতাকে ও বৈষ্ণবগণকে দেখে প্রভু ভূতলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। পালকি থেকে নেমে শ্রীশচীমাতা বৈষ্ণব গৃহিণীদের সঙ্গে শ্রীনিমাইকে ভূমি থেকে উঠিয়ে কোলে করলেন। প্রভুর শিরে সুন্দর চাঁচর চিকুর না দেখে শচীমাতা ও বৈষ্ণব গৃহিণীগণ কাঁদতে লাগলেন।

প্রভুর সঙ্গে পুনঃ সকলের মিলন হল। ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। কয়েকদিন তিনি ভক্তগণকে খুব আনন্দ প্রদান করলেন। শেষে জননী ও বৈষ্ণবগণের থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীনীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত ছিলেন। ক্রমে শ্রীজগন্নাথ ধামে পৌছলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ অতিকষ্টে কয়েকমাস কাটালেন। বর্ষাকাল এল, প্রভুর দর্শনের জন্য সকলে পুরীধামে চললেন।

চলিল আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর।
দেবীভাবে যাঁ'র গৃহে নাচিলা ঈশ্বর।।

—(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।৮)

শ্রীচন্দ্রশেখর, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীধর, শ্রীমুকুন্দ দত্ত, শ্রীবাসুদেব ঘোষ আদি ভক্তগণ স্ব-স্ব পরিবারসহ ক্রমে চলতে চলতে শ্রীপুরীধামের সন্নিকটবর্ত্তী হলেন। আঠার নালা থেকে ভক্তগণ পুরীতে প্রভুর নিকট লোক প্রেরণ করলেন। শুনে প্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁদের আনবার জন্য গমন করলেন। নরেন্দ্রসরোবরের তীরে ভক্তগণের সঙ্গে প্রথম মিলন হল। গৌরসুন্দর ভক্তগণকে দেখেই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। অদ্বৈত আচার্য্য আদি ভক্তগণও দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু প্রথমে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী

মালা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রশেখর আদি ভক্তগণকে প্রদান করলেন। তখন সকলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন ও প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

বৈষ্ণব গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি, করেন ক্রন্দন।।
— (চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।৯৬)

কতদিন পরে প্রভুকে পেয়ে ভক্তগণ আনন্দ-সাগরে-ভাসতে লাগলেন। বৈষ্ণবগণের থাকবার ব্যবস্থা প্রভু করে দিলেন। বৈষ্ণব গৃহিণীগণ স্ব-স্ব প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতে লাগলেন। প্রথমে এল সীতা ঠাকুরাণীর পালা। তারপর মালিনী দেবীর, শেষে এল আচার্য্যরত্নের গৃহিণীর পালা। মহাপ্রভু তাঁকে শচীমাতা থেকে অভিন্ন মনে করতেন। তিনি কত প্রকারের রন্ধন করলেন। আর শচীমাতা যে সমস্ত জিনিস পাঠিয়েছিলেন তা সব প্রভুকে আদর করে ভোজন করালেন। ভোজনকালে জননীর কথা স্মরণ করে প্রভু অশ্রুপাত করতে লাগলেন। বললেন—মাসীমা! আমি তোমাদের প্রেমে তোমাদের কাছে বাঁধা আছি। আইকে আমার দণ্ডবৎ জানিয়ে বলো প্রতিদিন আমি তাঁর কাছে যাই, তিনি আমাকে দেখে স্বপ্ন বলে মনে করেন।

ভক্তগণ বর্ষার চার মাস পুরীতে অবস্থান করে প্রতিদিন প্রভুর সেবা করলেন। প্রভু তাঁদের খুব আনন্দ দিলেন। অনন্তর ভক্তগণ বিদায় নিয়ে গৌড় দেশে ফিরে এলেন।

শ্রীঈশান ঠাকুর

শ্রীঈশান ঠাকুর ছিলেন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ ভৃত্য। মনে হয় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্র-কন্যাদি জন্মাবার পূর্ব্ব থেকে ঈশান তাঁর গৃহে আছেন। ক্রমে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আট কন্যা ও দুই পুত্র হয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিশ্বরূপ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবিশ্বম্ভর। আট কন্যা পর পর পরলোক গমন করেন। ষোল বর্ষ বয়সে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন। অনন্তর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রও নিত্যধামে বিজয় করেন।

এই সময় শ্রীঈশান ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সংসার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তিনি শচীদেবীকে মায়ের ন্যায় দেখতেন, শ্রীশচীদেবীও তাঁকে পুত্র-প্রায় স্নেহ করতেন। গঙ্গা থেকে জল এনে গৃহ বাগিচায় তরিতরকারী উৎপাদন, যজমান গৃহ থেকে বার্ষিক ধান-চাল আদায়, বাজার করা ও অতিথি অভ্যাগত এলে তাঁদের পাদধৌত করে দেওয়া প্রভৃতি শচীমাতার গৃহের যাবতীয় কাজ ঈশান ঠাকুর করতেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শচীমাতা গৃহে এলে শ্রীঈশান তাঁর শ্রীচরণ ধৌত করে দিতেন। "ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।" (চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৮।৫৯) "ঈশান করিল সব গৃহ উপস্কার।। (চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৮।৭৩) ভোজনের পর গৃহ সংস্কার ঈশান ঠাকুর করতেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বাল্যকালে অতি চঞ্চল ছিলেন। যা পাবার জন্য জিদ্ করতেন, তা ঈশান ঠাকুর এনে দিতেন।

বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়।
যে আখুটী করে তা' ঈশান সমাধায়।।
(ভক্তিরত্নাকর ১২।৯৭)

শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি যদি কখনও কোথাও যেতেন, সঙ্গে থাকতেন ঈশান ঠাকুর।

ঈশানের প্রাণ শচী-নন্দন নিমাই।
ঈশান-বিহনে না যায়েন কুন ঠাই।।
(ভঃ রঃ ১২।৯৬)

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীঈশান ঠাকুরের মহিমা এইভাবে বর্ণন করেছেন—

সর্ব্বকালে সেবিলেন আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোকমধ্যে মহা ভাগ্যবান্।।
শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল।
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাৎ দেখিল।।
(চৈতন্য ভাগবত)

শ্রীদেবকীনন্দন দাস বৈষ্ণব-বন্দনায় বলেছেন—

বন্দিব ঈশান দাস করযোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি।।

শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসে যাবার পর তাঁর গৃহ, মা ও পত্নীকে দেখাশুনার ভার পড়েছিল শ্রীঈশান ঠাকুরের উপর।

পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভু পুরী থেকে শ্রীদামোদরর পণ্ডিতকে নবদ্বীপে মায়াপুরে জননীর তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরণ করেন।

প্রভু কহে, দামোদর—চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩।২১)

শ্রীদামোদর পণ্ডিত নদীয়াবাসী ছিলেন। তিনি প্রভুর আদেশে শচীমাতার কাছে থেকে তাঁকে বহু প্রকারে সান্ত্বনা দিতেন এবং মহাপ্রভুর বিবিধ চরিত কথা শুনাতেন। তিনি মাঝে মাঝে পুরীধামে যেতেন এবং প্রভুর সংবাদ নিয়ে শীঘ্র নদীয়ায় শ্রীশচীমাতার কাছে আসতেন।

ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখেছেন— মহাপ্রভুর ও শ্রীশচীমাতার অন্তর্ধানের পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে ও ঈশান ঠাকুরকে শ্রীবংশীবদনানন্দ সেবা করতেন।

যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য নবদ্বীপ মায়াপুর আগমন করেন, তখন শ্রীবংশীবদনানন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে শ্রীঈশান ঠাকুরের ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কাছে নিয়েছিলেন।

শ্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে।
শ্রীনিবাসে সিক্ত কৈল নিজ-নেত্র-জলে।।

(ভঃ রঃ ৪।২২)

মহাপ্রভুর গৃহে শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত প্রথমেই শ্রীবংশীবদনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। তারপর শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্যকে নিয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজীর শ্রীচরণ দর্শন করালেন।

হেনকালে শ্রীবংশীবদন জানাইলা।
নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা আইলা।।
শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে।
শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী সাক্ষাতে।।

(ভঃ রঃ ৪।৩৯-৪০)

পুনঃ কয়েক বছর পরে যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ এসেছিলেন তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অপ্রকট হয়েছিলেন। তাঁর দর্শন তাঁদের হয় নাই। অতি বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুরের দর্শন হয়।

* * *

দেখেন ঈশানে সূর্য্যসম তেজ তাঁ'র।।
বসিয়া আছেন একা পরম নির্জ্জনে।
কি অদ্ভুত চেষ্টা অশ্রু মুদ্রিত নয়নে।।

(ভঃ রঃ ১২।১১২-১১৩)

শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ তিনজন শ্রীঈশান ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করার পর আত্ম পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীঈশান ঠাকুর তাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত জেনে অতি স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। এই সময় শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের কথা ভক্তি-রত্নাকরে উল্লেখ নাই। অতঃপর তিনজন শ্রীঈশান ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভুর লীলাস্থান নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করলেন। নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা অন্তে ঈশান ঠাকুরের থেকে তিন জন বিদায় নিচ্ছেন, তার বর্ণনা ভক্তিরত্নাকরে এরূপ আছে।

শ্রীঈশান ঠাকুরের চরণ বন্দিয়া।
হইতে বিদায় বিদারিয়া যায় হিয়া।।

(ভঃ রঃ ১৩।৮)

তিন জন শ্রীঈশান ঠাকুরের থেকে বিদায় হয়ে শ্রীখণ্ডাভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, তিন জনের শীঘ্রই আগমন হবে অনুমানে বুঝতে পেরে, তাঁদের দর্শন উৎকণ্ঠায় বসেছিলেন ; ঠিক এই সময় তিনজন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের ভবনে প্রবেশ করলেন এবং ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে তিনজনকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

সকলে বসলেন, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর নবদ্বীপ মায়াপুরের কথা, ভক্ত শ্রীঈশান ঠাকুরের কুশল প্রশ্নাদি করতে লাগলেন। ঠিক এই সময় নবদ্বীপ মায়াপুর হতে সংবাদ এল শ্রীঈশান ঠাকুর অপ্রকট হয়েছেন।

* * *

"ঈশান ঠাকুর হইল সংগোপন।।"

(ভঃ রঃ ১৩।২১)

জয় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রিয় ভৃত্য শ্রীঈশান ঠাকুর কি জয়।

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ

জয় জগদানন্দ শ্রীগর্ভ জীবন।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রাণধন।।
— শ্রীচৈতন্য ভাগবত

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রভুর সহচর। অতি প্রিয়জন।

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ।।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।২১)

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় আছে যথা—"সত্যভামা প্রকাশোঽপি জগদানন্দ পণ্ডিতঃ।।" শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত সত্যভামার প্রকাশ-স্বরূপ। নবদ্বীপে কাজী-দলন, জগাই-মাধাই উদ্ধার ও নগর সংকীর্ত্তন প্রভৃতি লীলায় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রভু যখন পুরীধামে চলেন তখন শ্রীজগদানন্দ সঙ্গে ছিলেন।

নিত্যানন্দ গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৩।২০৯)

এই চারজন সঙ্গে নিয়ে প্রভু শান্তিপুর থেকে পুরীর দিকে চলতে লাগলেন। উড়িষ্যায় প্রবেশ করে একদিন প্রভু শ্রীজগদানন্দের কাছে দণ্ডটি

রেখে ভিক্ষা করতে গেলেন। শ্রীজগদানন্দ দণ্ডখানি পুনঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হাতে দিয়ে কার্য্যান্তরে গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে দণ্ডখানি ভেঙ্গে তিন খণ্ড করে ফেলে রাখলেন। তা দেখে প্রভু দুঃখিত হলেন। সেই স্থান থেকে তিনি কোন ভক্ত সঙ্গে না নিয়ে একা পুরী প্রবেশ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীদামোদর আদি ভক্তগণ শ্রীসার্ব্বভৌম গৃহে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন।

মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হল। সঙ্গে কাকে নেবেন সে বিষয়ে বিচার হতে লাগল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে নেবার কথা ভক্তগণ বললেন। প্রভু স্বীকার করলেন না। জগদানন্দ পণ্ডিতের কথা বলা হল। তদুত্তরে প্রভু বললেন—জগদানন্দ আমার সন্ন্যাস বৈরাগ্য পছন্দ করে না। সে যা বলে তা আমাকে করতে হয়। যদি না করি সে তিনদিন উপোস করে। প্রভু পরিশেষে সঙ্গে নিলেন কৃষ্ণদাস নামক এক সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণকে। প্রভু দক্ষিণ দেশ অভিমুখে যখন যাত্রা করলেন বিরহে জগদানন্দ পণ্ডিত অচৈতন্যবৎ ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। কয়েক মাস প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করলেন। শ্রীজগদানন্দ আদি ভক্তগণ তাঁর পুনঃ দর্শন প্রতীক্ষায় পুরীতে অবস্থান করতে লাগলেন। প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে আলালনাথে ফিরে এলেন। ভক্তগণকে এ সংবাদ দেবার জন্য আলালনাথ থেকে কৃষ্ণদাস পুরীতে এলেন।

জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দোঁহে না ধরে আনন্দ।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৯।৩৪০)

প্রাণের প্রাণ ফিরে এসেছেন, তাই জগদানন্দ আদি ভক্তগণ আনন্দে আলালনাথের দিকে ছুটলেন। তারপর প্রভুর সঙ্গে মিলন হল। ভক্তগণ পরম সুখী হলেন, ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু পুরীতে ফিরে এলেন। ভক্তগণের কাছে প্রভু

তীর্থ প্রসঙ্গ বলতে লাগলেন। দক্ষিণ দেশে ভট্টথারিদিগের কথা বললনে। তারা এক প্রকার বাঁদিয়া জাতি। বিদেশী লোক দেখলে তারা স্ত্রীলোক দেখিয়ে ভুলাবার চেষ্টা করে। সরল ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে ভট্টথারিগণ নানা প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের ঘরে গিয়ে প্রভু কৃষ্ণদাসকে তাঁর কেশে ধরে টেনে বের করে আনেন। ভট্টথারিগণ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রভুকে মারতে উঠেছিল। পুরীতে এসে ভক্তগণের কাছে এসব কথা বলে প্রভু তাঁকে বিদায় করতে চাইলেন। কৃষ্ণদাস প্রভুর চরণতলে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে ভক্তগণ মন্ত্রণা করে তাঁকে গৌড়দেশের ভক্তগণের কাছে প্রভুর আগমন সংবাদ জানানোর জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা মার্জ্জন উৎসবের দিন মার্জ্জনলীলা সমাপ্ত করে প্রভু ভক্তগণসহ জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এই সময় শ্রীকাশী মিশ্র, তুলসী পড়িছা ও বাণীনাথ প্রচুর প্রসাদ নিয়ে এলেন। প্রভু ভক্তগণ সহ মন্ডলী করে বসে মহানন্দে প্রসাদ সেবা করতে লাগলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু ও শ্রীগোবিন্দ পরিবেশন করতে লাগলেন। ভক্তগণকে পিঠা মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিতে আদেশ দিয়ে মহাপ্রভু স্বয়ং লাফরা ব্যঞ্জন মেগে খেতে লাগলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত পরিবেশন করতে করতে হঠাৎ প্রভুর পাতে ভাল মিষ্টান্ন প্রসাদ দিয়ে যান। প্রভু ভাল জিনিস খেতেন না। পাতে জগদানন্দ প্রদত্ত মিষ্টান্নের দিকে তাকাতে লাগলেন। যদি না খান জগদানন্দ রাগ করে উপোস করবেন, তাই ভয়ে ভয়ে খেতে লাগলেন।

ভাল ভাল দ্রব্য এনে স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুকে বলতে থাকেন এটার স্বাদ কেমন জগন্নাথদেব দেখেছেন, তুমিও একটু একটু আস্বাদন করে দেখ। প্রভু তা শুনে একটু একটু নিয়ে মুখে দিতে লাগলেন।

দুই ভক্তের এই স্নেহ ব্যবহার পরম বিচিত্র, সার্ব্বভৌম পণ্ডিত বসেছিলেন প্রভুর বামে। তিনি এ সব দেখে হাস্য করতে লাগলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী পুরী ধামে এলেন। তিনি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে রইলেন। সেখানে গিয়ে মহাপ্রভু ও ভক্তগণ মিলিত হতেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতও প্রায় তাঁদের দর্শনে যেতেন। একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী খেদ করে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের কাছে বলতে লাগলেন—আমি হিতের জন্য এসে অনেক অপরাধ করে গেলাম। প্রভু আমায় ধরে বার বার আলিঙ্গন করেন, আমার অঙ্গের ক্লেদ তাঁর অঙ্গে লাগে। তাতে কত যে অপরাধ হচ্ছে তা কে বললে? পণ্ডিত! আপনি কিছু সৎ পরামর্শ দিন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বললেন—প্রভু ত আপনাকে বৃন্দাবন ধামে স্থান দিয়েছেন। রথযাত্রা দর্শন করে সেখানে চলে যান। জগদানন্দ পণ্ডিত এই সমস্ত উপদেশ দিয়ে নিজ স্থানে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মহাপ্রভু তথায় এলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে দেখে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু তাড়াতাড়ি গিয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করতে চাইলেন, শ্রীসনাতন গোস্বামী পেছনে সরলেন। তথাপি প্রভু গিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তখন শ্রীসনাতন গোস্বামী নির্ব্বিন্ন ভাবে বললেন—আমি হিতের জন্য এসেছিলাম কিন্তু বিপরীত হল। আমি জাতিতে নীচ, অধম। তদুপরি অঙ্গে কণ্ডুরসা। তথাপি জোর করে আপনি আমায় আলিঙ্গন করেন। এই অপরাধে আমার সর্ব্বনাশ হবে। অতএব পুরী ধামে আর থাকবার ইচ্ছা আমার মোটেই নাই। আপনি আজ্ঞা করুন রথযাত্রা দর্শন করে বৃন্দাবনে চলে যাই। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করতে তিনিও আমাকে শ্রীবৃন্দাবন ধামে যেতে উপদেশ দিয়েছেন—

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কথা শুনে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন।

কালিকার বটুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল।।

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৫৮)

জগদানন্দ কালকার ছেলে। সে কি জানে? আপনার প্রতি উপদেশ করতে যায়? ব্যবহারে পরমার্থে আপনি তার গুরুতুল্য। আপনাকে উপদেশ দেয় নিজের ওজন বুঝে না। আপনি আমারও উপদেষ্টা।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী উঠে প্রভুর শ্রীচরণ যুগল ধরে বলতে লাগলেন—শ্রীজগদানন্দের যে কত সৌভাগ্য তা আজ প্রত্যক্ষ করলাম। আমি যে কত ভাগ্যহীন তাও বুঝতে পারলাম।

শ্রীজগদানন্দকে আপনি আত্মীয় সুধারস পান করাচ্ছেন, আর আমাকে স্তুতিচ্ছলে নিম্ব নিশিন্দার রস পান করাচ্ছেন। এখন পর্য্যন্ত আমার প্রতি আত্মীয়তা ভাব প্রকাশ করছেন না। এ আমার দুর্ভাগ্য। এই বলে শ্রীসনাতন গোস্বামী শির নত করে দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। প্রভু বড় লজ্জিত হলেন। বলতে লাগলেন—আপনি দুঃখ করবেন না। আমি কখনও আপনাকে বহিরঙ্গ মনে করি না। আপনার গুণে আকৃষ্ট হয়ে এ সব কথা বলেছি। জগদানন্দ কেবল আমার প্রিয় আপন এইরূপ মনে করবেন না। আপনিও আমার পরম প্রিয়। আপনি প্রামাণিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, আমাকে বুদ্ধি দিতে পারেন। আপনাকে উপদেশ দেয় এইরূপ মর্য্যাদা হানিকর ব্যাপার আমি সইতে পারি না। মমতাস্পদ বহু ব্যক্তি থাকলেও পাত্র বিশেষে প্রীতির তারতম্য হয়। আপনাকে কখনও বহিরঙ্গ জ্ঞান করি না। এইভাবে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে অনেক বুঝিয়ে প্রভু গম্ভীরায় ফিরে এলেন।

জননীকে দেখবার জন্য মহাপ্রভু একবার শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে যাবার আদেশ করলেন। জননীর জন্য শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ জগদানন্দের হাতে দিলেন। মায়ের শ্রীচরণে শত শত দণ্ডবৎ জানালেন।

জগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপে এলেন এবং প্রভুর দেওয়া সব জিনিস

শ্রীশচীমাতার হাতে অর্পণ করলেন। শ্রীশচীমাতা সে সব দেখে আনন্দে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। জিনিসগুলো সাক্ষাৎ গৌরসুন্দর জ্ঞান করে জননী স্বহস্তে ধরে কত আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রসাদী বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ মস্তকে ঠেকিয়ে সতর্কতার সহিত উত্তম স্থানে রাখলেন। তারপর যাবতীয় সংবাদ শুনতে লাগলেন। কয়েকদিন জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীশচীমাতার কাছে থেকে সর্ব্বক্ষণ প্রভুর কথা শুনিয়ে তাঁকে সুখী করলেন। অনন্তর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে এলেন। প্রভুর দেওয়া মহাপ্রসাদ আদি আচার্য্যকে দিলেন। আচার্য্যের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি জগদানন্দকে খুব যত্ন করে কয়েকদিন রাখলেন এবং নিয়ত প্রভুর প্রসঙ্গ শুনতে লাগলেন। ক্রমে শ্রীজগদানন্দ অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত মিলিত হলেন। এইরূপে কয়েক মাস গৌড়দেশে অবস্থান করবার পর তিনি পুরীতে ফিরে যাবার উদ্যোগ করলেন। ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে পানিহাটীতে শ্রীশিবানন্দ সেন মহোদয়ের গৃহে এলেন। মহাপ্রভুর জন্য সুগন্ধি চন্দন তৈল সংগ্রহ করে সেখান থেকে পুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন। তেলের কলসী মাথায় করে শ্রীজগদানন্দ পুরীধামে এলেন। তারপর মহাপ্রভুর সহিত ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত মিলিত হলেন। ক্রমে গৌড়বাসী ভক্তগণের কথা সব প্রভুকে বললেন। জগদানন্দকে পণ্ডিতকে প্রভু স্নেহে আলিঙ্গন করলেন।

একদিন তেলের কলসীটি জগদানন্দ পণ্ডিত গোবিন্দের হাতে দিয়ে বললেন—এই তেল প্রভু শিরে লাগান যেন। প্রভুর সেবক গোবিন্দ তেলের কলসী যত্ন করে রাখলেন। সময়ান্তরে প্রভুকে গোবিন্দ বলতে লাগলেন—আপনার জন্য পণ্ডিত গৌড়দেশ থেকে মাথায় করে চন্দন তৈল এনেছেন। এ তৈল ব্যবহার করলে পিত্ত বায়ু প্রভৃতি ঠাণ্ডা থাকে। তৈল গ্রহণ না করলে পণ্ডিত দুঃখিত হবেন।

প্রভু বললেন—তা বেশ কথা। কিন্তু সন্ন্যাসীর সুগন্ধি তৈল ব্যবহার

করবার বিধি নাই। শ্রীজগদীশের প্রদীপের জন্য এ সুগন্ধ তৈল দিয়ে দাও। জগদানন্দের পরিশ্রম সার্থক হবে।

আর একদিন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত এসে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রভু তৈল ব্যবহার করছেন ত? প্রভু যা বলেছিলেন গোবিন্দ তা বললেন। শুনে পণ্ডিত ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে তৈলের কলসী নিয়ে অঙ্গনে ভেঙ্গে নিজ স্থানে চলে এলেন। কুটিরের দরজা বন্ধ করে অনাহারে তিন দিন শুয়ে রইলেন। চতুর্থ দিন প্রাতে এই সংবাদ পেয়ে প্রভু তাড়াতাড়ি পণ্ডিতের কুটির দ্বারে এলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁকে ডাকতে লাগলেন। প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনে শ্রীজগদানন্দ সত্বর উঠে দরজা খুলে প্রভুকে দণ্ডবৎ করলেন। অতি স্নেহভরে প্রভু বললেন—আজ তোমার হাতে প্রসাদ পেতে চাই। এ কথা বলে প্রভু সমুদ্রে স্নান করতে চলে এলেন স্বর্গদ্বারে। প্রভু প্রসাদ পেতে চান। পণ্ডিত তাড়াতাড়ি স্নান করে অনেক প্রকারের শাক ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করলেন। প্রভু মধ্যাহ্নকালে এসে ভোজন করতে বসলেন। পণ্ডিত সুগন্ধি অন্ন ব্যঞ্জনাদি থালিতে সাজিয়ে প্রভুর সামনে এনে দিলেন। প্রভু প্রসাদের প্রশংসা করতে করতে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে ভোজন করতে ডাকলেন। পণ্ডিত বললেন আমার কিছু কৃত্য আছে, তুমি খেয়ে নাও। আমি পরে খাব। খেতে খেতে প্রভু বলতে লাগলেন, ক্রোধ নিয়ে রন্ধন। কি সুন্দর হয়েছে! এমন স্বাদিষ্ট তরকারী কোনদিন খাইনি। কৃষ্ণ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এইরূপ অনেক প্রশংসা করতে করতে প্রভু ভোজন সমাপ্ত করলেন। তারপর বললেন—জগদানন্দ! তোমার ভোজন দেখে বাসায় ফিরে যাব। পণ্ডিত বললেন—তুমি বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করলে করগে। আমি ভোজন করছি। প্রভু যাবার সময় গোবিন্দকে রেখে গেলেন। শ্রীজগদানন্দ ও গোবিন্দ একত্রে ভোজন করলেন। পণ্ডিতের ভোজন সংবাদ পেয়ে প্রভু বিশ্রাম করলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেম-বিবর্ত্ত অত্যদ্ভুত।

মহাপ্রভু কলার শরলাতে শয়ন করতেন, তা দেখে ভক্তগণের বড় দুঃখ হত। জগদানন্দ পণ্ডিত এ দুঃখ আর সইতে পারলেন না। শিমুল তুলা দিয়ে এক বালিশ তৈরী করে গোবিন্দের হাতে দিয়ে বললেন—আমার নাম করে প্রভুকে বলবে, তিনি যেন এই বালিশ মাথায় দিয়ে শয়ন করেন।

শয়নের সময় বালিশ দেখে প্রভু রেগে জিজ্ঞাসা করলেন কে বালিশ করে দিল? গোবিন্দ বললেন—জগদানন্দ পণ্ডিত। প্রভু একটু নরম হলেন। বললেন বালিশ নিয়ে যাও। প্রভু এই বলে বালিশ সরিয়ে কলার শরলাতে শয়ন করলেন। তা দেখে শ্রীস্বরূপ দামোদর বললেন—বালিশ ব্যবহার না করলে পণ্ডিত বড় দুঃখিত হবেন।

প্রভু বললেন এক খানা খাট নিয়ে আসুন। আমায় জগদানন্দ বিষয় ভোগ করাতে চায়। আমি সন্ন্যাসী। ভূমিতে শয়ন আমার ধর্ম। খাট বালিশ আর মুণ্ডিত মস্তক এ সব দেখলে লোকে পরিহাস করবে।

পরিশেষে নখ দ্বারা শুষ্ক কলা পাতা চিরে শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভুর এক বস্ত্র মধ্যে পুরে শয্যা তৈরী করে দিলেন। অনেক অনুনয় বিনয় করার পর প্রভু তা ব্যবহার করতে লাগলেন। মহাপ্রভুর বৈরাগ্য দেখে জগদানন্দ পণ্ডিত বড় দুঃখিত হলেন।

অনেক দিন থেকে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের বৃন্দাবন ধামে যাবার ইচ্ছা। মহাপ্রভু অনুমতি দেন না বলে যেতে পারেন না। পুনঃ অনুমতি চাইলেন। এবার প্রভু বাধা দিলেন না। বললেন আমার উপর রাগ করে মথুরা যাচ্ছ না কি? আমাকে দোষী করে তুমি ভিখারী সাজবে?

তোমাকে দোষী করব কেন? শ্রীজগদানন্দ বললেন। অনেক দিনের বাসনা মথুরা ধাম দর্শন করব। তোমার আজ্ঞা পাই না বলে যেতে পারি নাই।

প্রভু বললেন তোমার যখন একান্ত ইচ্ছা তুমি যাও। মথুরা যাবার সময় পথে বড় সাবধানে যেয়ো। বারাণসী পর্য্যন্ত পথে কোন ভয় নাই ; তারপর যাত্রিগণের সঙ্গে সঙ্গে যেয়ো। রাস্তায় গৌড় দেশের যাত্রী দেখলে বাটপাড়েরা বড় উৎপাত করে। সঙ্গে বহু লোক থাকলে কিছু করতে পারে না।

শ্রীমথুরা ধামে পৌঁছিয়ে শ্রীসনাতনের সঙ্গে থাকবে। মথুরাবাসী স্বামীদের চরণ বন্দনা করবে। তাঁদের আচরণ দেখবে না। তাঁদের ব্যবহার হয়ত তোমার পছন্দ হবে না। সনাতনকে সঙ্গে নিয়ে বন ভ্রমণ করবে। সনাতনের সঙ্গ ছাড়বে না। সেখানে বেশী দিন থেক না। গোবর্দ্ধনে উঠে গোপাল দর্শন করবে না। গোপাল ও গোবর্দ্ধন অভিন্ন। আমি শীঘ্রই আসছি সনাতন ও রূপকে বলবে। এই সব বলে মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করলেন। পণ্ডিত প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। ভক্তগণের নিকট বিদায় নিলেন। অনন্তর শ্রীমথুরার দিকে যাত্রা করলেন। ক্রমে বারাণসী এলেন। চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র ও অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে মিলিত হলেন। পণ্ডিত সকলের নিকট প্রভুর সমাচার প্রদান করলেন। ভক্তগণ পণ্ডিতের মুখে প্রভুর সমাচার পেয়ে অতি হর্ষিত হলেন। কয়েকদিন পণ্ডিত বারাণসীতে থাকার পর তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং মথুরার দিকে চলতে লাগলেন। ক্রমে শ্রীমথুরা ধামে এলেন। মথুরায় শ্রীবিশ্রাম ঘাটে লোক মুখে শ্রীসনাতন গোস্বামীর বাস স্থানের ঠিকানা জানতে পারলেন এবং শীঘ্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী পণ্ডিতকে দেখে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ উভয় উভয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম এবং দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী পণ্ডিতের ভোজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর মহাপ্রভুর কথা শুনতে বসলেন। তথায় ক্রমে অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সমবেত হলেন। সকলে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে দেখে অতি সুখী হলেন। পণ্ডিত প্রভুর নির্দ্দেশ মত শ্রীসনাতন

গোস্বামীর নিকট অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণ সকলে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রভুর প্রিয়তম জনকে পেয়ে তাঁরা যেন সুখ সাগরে ভাসতে লাগলেন। পণ্ডিত সকলের নিকট প্রভুর শুভ সমাচার বার্ত্তা বলতে লাগলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে নিয়ে দ্বাদশ বন ভ্রমণ করলেন। গোকুলে এসে কিছু দিন সুখে দুজন অবস্থান করতে লাগলেন। দুজনে কৃষ্ণ-কথা বলতে বলতে এত তন্ময় হতেন যে তাঁদের দিন-রাত্রি জ্ঞান থাকত না। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত স্ব-হস্তে রন্ধন করে খেতেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী দেবালয়ে প্রসাদ নিতেন।

একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। পণ্ডিত আনন্দের সহিত রন্ধন করতে লাগলেন। এমন সময় শ্রীসনাতন গোস্বামী পণ্ডিতের স্থানে এলেন। একখানা গেরুয়া বস্ত্র শ্রীসনাতন গোস্বামীর মস্তকে বাঁধা ছিল। বস্ত্রখানি মহাপ্রভুর মনে করে জগদানন্দ পণ্ডিতের মনে খুব আনন্দ হল। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সমাদর করে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এই রাতুল বস্ত্রখানি কোথায় পেলেন?

শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন—মুকুন্দ সরস্বতী নামে এক সন্ন্যাসী এই বস্ত্রখানি আমাকে দিয়েছেন। এই বস্ত্রখানি প্রভুর নয়। যখন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত এ কথা শুনলেন তখন ক্রোধে অন্নের হাঁড়ি নিয়ে তাঁকে মারতে এলেন। "ভাতের হান্ডি হাতে লঞা মারিতে আইলা।" শ্রীসনাতন গোস্বামী লজ্জিত হলেন। পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ নিষ্ঠা দেখে চমৎকৃত হলেন। তখন উঠে অতি বিনীতভাবে পণ্ডিতকে বলতে লাগলেন—

সনাতন করে সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
তোমা সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয়।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৩।৫৮)

যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৩।৬০)

যা দেখতে চেয়েছিলাম তা দেখলাম। মহাশয় আপনি যদি এবম্বিধ শ্রীচৈতন্য-নিষ্ঠা না দেখান আমরা শিখব কেমনে? এই বস্ত্রখানি কোন প্রবাসীকে দিয়ে দিব। রক্ত-বস্ত্র বৈষ্ণবের পরতে নাই।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শেষে লজ্জিত হলেন। রান্না শেষ করে মহাপ্রভুকে ভোগ দিলেন। তারপর দুজন কৃষ্ণ-কথা বলতে বলতে ভোজন করতে লাগলেন। দুজন মহাপ্রেমিক। কৃষ্ণ-কথায় দুজনার প্রেম উথলে উঠতে লাগল।

দুই মাস শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বৃন্দাবনে বাস করলেন। তারপর গোস্বামিবৃন্দের থেকে বিদায় নিয়ে পণ্ডিত পুরীর দিকে চলতে উদ্যত হলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের জন্য কিছু রাসস্থলীর ধূলি ও প্রসাদ তথা বৃন্দাবনীয় পীলু ফলাদি ভেট দিলেন। খুব যত্ন-সহকারে পণ্ডিত তা নিয়ে যাত্রা করলেন। যে পথে বারাণসী হয়ে মথুরায় গিয়েছিলেন, তিনি সেই পথে পুরীধামে ফিরে এলেন।

অতঃপর মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং গোস্বামিগণের দেওয়া ভেট প্রদান করলেন।

মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। পণ্ডিত

বৃন্দাবনীয় ভক্তগণের দণ্ডবৎ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে জানালেন। শ্রীরাসস্থলীর ধূলি প্রভু স্বয়ং রেখে প্রসাদ ও পীলু ফল ভক্তগণকে বেটে দিলেন। পীলু ফল যাঁরা চিবিয়ে খেলেন তাঁদের মুখে ঝাল লাগল। দেখে প্রভু হাসতে লাগলেন। বললেন—"বৃন্দাবনের পীলু খাবার এই এক মজা।"

প্রভু ক্রমে ক্রমে বৃন্দাবনের গোস্বামিদের যাবতীয় বার্ত্তা শুনতে লাগলেন।

প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের মধুর চরিত কথা আমরা এখানে সমাপ্ত করলাম। প্রভুর যেমন অনন্ত লীলা বিলাস তেমন তাঁর ভক্তগণেরও অনন্ত চরিত।

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং প্রিয় শিষ্য। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাণীনাথ মিশ্র। শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর মহাশয় শ্রীবাণীনাথ মিশ্রের পুত্র। ইনি দার পরিগ্রহ্ করেছিলেন। তাঁর বংশধরগণ অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদির নিকটবর্ত্তী শ্রীপাট ভরতপুর গ্রামে বাস করছেন। এই ভরতপুর গ্রামে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী-স্থাপিত শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত নীলাচলে যাবার সময় শ্রীনয়নানন্দকে এই শ্রীবিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করে যান।

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুরের অপর নাম শ্রীধ্রুবানন্দ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইনি 'মিশ্রনয়ন' নামে উল্লিখিত।

শ্রীনয়নানন্দ নামের কারণ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—নবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত ভাব ভরে যখন যে কীর্ত্তন করতেন শ্রীধ্রুবানন্দ শ্রবণ মাত্র তা লিখে ফেলতেন। তাতে শ্রীগৌর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নয়নানন্দ নাম প্রদান করেন।

পদসমুদ্র গ্রন্থে—

"পণ্ডিতের স্নেহপাত্র শ্রীনয়ন মিশ্র।
বাল্যকালে প্রভু যাঁরে করিলেন শিষ্য।।
ঐছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরষিত হৈলা।
নয়নানন্দ বলি নাম পশ্চাৎ থুইলা।।

নীলাচলে যাইতে প্রভু যবে ইচ্ছা কৈলা।
শ্রীনয়নানন্দ ভরতপুর নিয়োজিলা।”

শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের তত্ত্বাবধানে খেতরিতে যে মহোৎসব হয়েছিল তাতে শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁর পদকীর্ত্তন গ্রন্থ তেমন দেখা যায় না। পদকল্পতরু গ্রন্থে মাত্র কিছু কিছু পদ পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক গীত—

গোরা মোর গুণের সাগর।
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর।।
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী।
হরিনাম সুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি।।
গোরা মোর হিমাদ্রিশেখর।
তাহা হৈতে প্রেম বহে নিরন্তর।।
গোরা মোর প্রেমকল্পতরু।
যাঁর পদছায়ে জীব সুখে বাস করু।।
গোরা মোর নবজলধর।
বরষি শীতল যাহে করে নারী নর।।
গোরা মোর আনন্দের খনি।
নয়নানন্দে প্রাণ যাহার নিছনি।।

—ঃঃঃ—

কিবা সে সুখের সরোবরে।
প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে।।

নাচত পহুঁ বিশ্বম্ভরে।
প্রেমভরে পদধরে ধরণী না ধরে।।
বয়ান কনয়াচাঁদ ছাঁদে।
কত সুধা বরিষয়ে থির নাহি বাঁধে।।
রাজহংস প্রিয় সহচর।
কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোর।।
নব নব নটন লহরী।
প্রেম লছিমা নাচে নদীয়া নাগরী।।
নবনব ভকতি রতনে।
অযতনে পাইল সব দীন-হীন জনে।।
নয়নানন্দ কহে সুখসারে।
সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়া নগরে।।

— ঃঃ —

আওত পিরীতি, মুরতিময় সাগর,
অপরূপ পহুঁ দ্বিজরাজ।
নব নব ভকত, নব রস যাবত,
নবতনু রতন সমাজ।।
ভালি ভালি নদীয়াবিহার।
সকল বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন সম্পদ,
সকল সুখের সুখসার।।ধ্রু।।
ধনি ধনি অতিধনি, অবভেল সুরধনী,
আনন্দে বহয়ে রসধার।
স্নান পান অবগাহ, আলিঙ্গন সঙ্গম,
কত কত বার।।

প্রতি পুর মন্দির, প্রতি তরুকুল তল,
ফুল বিপিন বিলাস।
কহে নয়নানন্দ, প্রেমে বিশ্বম্ভর,
সবাকার পুরাইল আশ।।

— ঃঃ —

কলি ঘোর তিমির, গরাসল জগজন,
ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি,
গোরা বড় দয়াল ঠাকুর।।
ভাইরে ভাই গোরা গুণ কহনে না যায়।
কত শত আনন, কত চতুরানন,
বরণিয়া ওর নাহি পায়।।
চারিবেদ ষড়, দরশন পড়িয়া যে,
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার অধ্যয়ন, লোচনবিহীন যেন,
দরপণে কিবা তার কাজে।।
বেদ বিদ্যা দুই, কিছুই না জানত,
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভনে, সেই সে সকল জানে,
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার।।

— — —

কো কহুঁ আজুক আনন্দ ওর।
ফুল বনে দোলত গৌর-কিশোর।।

নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
শান্তিপুর নাথ গাওই রঙ্গে।।
সহচর ফাগু পেলই গোরা গায়।
ধায়ই শুনি সব লোক নদীয়ায়।।
খোল করতাল ধ্বনি হরি হরি বোল।
নয়নানন্দে আনন্দে বিভোর।।

— ০ —

আচার্য মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য।
পতিত পাতকী দুঃখী করিলেন ধন্য।।
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন।
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে অদ্বৈত জীবন।।
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চস্বরে।
নিতাই চৈতন্য নাচে অদ্বৈত মন্দিরে।।
আচার্য্য গোসাঞি নাচে দিয়া করতালি।
চিরদিনে মোর ঘরে গৌর বনমালী।।
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধর পাছে।
কিবা ছিল কিবা হৈল আর কিবা আছে।।

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুরের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কোন পদের উল্লেখ বিশেষভাবে পদকল্পতরুতে দেখা যায় না।

পণ্ডিত শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী

শ্রীদামোদর পণ্ডিত ছিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ জন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শাখা নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখেছেন—

দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচন্ড।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্য দণ্ড।।

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৩১)

ইনি ব্রজলীলায় "শৈব্যা বা চণ্ডী" নাম্নী গোপী ছিলেন। শ্রীদামোদর পণ্ডিতের ছোট ভাই শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত। ব্রজলীলায় "ভদ্রা নাম্নী গোপী ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রভু পুরীধামে চলে এলে, দামোদর ও শঙ্কর প্রভুর সঙ্গে পুরীতে অবস্থান করতেন।

শ্রীরূপ-সনাতনকে কৃপা করবার জন্য মহাপ্রভু যেবার পুরীর থেকে রামকেলিতে ছল করে আগমন করেন, সেবার শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং নবদ্বীপ মায়াপুর থেকে শচীমাতাকে শান্তিপুরে নিয়ে যান। কয়েকদিন জননীর হাতের রন্ধন খেয়ে তাঁকে সুখী করে পুনঃ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীদামোদর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে পুরীতে এলেন।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর।
দুইজন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল।।

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১।২৩৬)

শ্রীদামোদর পণ্ডিত নিরপেক্ষ ভক্ত ছিলেন। কেহ কিছু মাত্র ত্রুটি করলে তিনি সইতে পারতেন না। মহাপ্রভুর উপরেও সর্ব্বদা শিক্ষা দণ্ড ধরে থাকতেন। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে যাত্রা করবার প্রস্তাবনা করলেন, সঙ্গে সেবক কে যাবেন? ভক্তগণ শ্রীদামোদর পণ্ডিতের নাম করলেন। তা শুনে মহাপ্রভু বললেন—

আমি ত' সন্ন্যাসী-দামোদর,—ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা দণ্ডধরী।।
ইঁহার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইঁহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার।।
লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৭।২৫-২৭)

দামোদর ব্রহ্মচারী। আমি সন্ন্যাসী। কৃষ্ণ-কৃপায় তাঁর লোকাপেক্ষা নাই। আমি ত লোকাপেক্ষা ছাড়তে পারি না।

অবশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভু সরল বুদ্ধি সম্পন্ন কালা শ্রীকৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হলেন।

মহাপ্রভু কয়েক মাস ধরে দক্ষিণ দেশের তীর্থ সকল ভ্রমণ করে পুনঃ ফিরে এলেন আলালনাথে। তখন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য পুরী থেকে শ্রীজগদানন্দ, শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীদামোদর পণ্ডিত আনন্দভরে চললেন আলালনাথ। অন্যান্য ভক্তও সমবেত হলেন। সকলের পুনর্মিলন হল, তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না। ভক্তগণসহ প্রভু পুরীতে এলেন। তাঁর পুনরাগমন সংবাদ গৌড়ীয় দেশে প্রেরণ করবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীদামোদর পণ্ডিত মন্ত্রণা করে কালা কৃষ্ণদাসকে তথায় পাঠিয়ে দিলেন।

রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ এলেন। প্রভুর সঙ্গে তাঁদের মিলন হল। সকলে আনন্দ সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন। বর্ষার চার মাস থাকার পর গৌড়ীয় ভক্তগণ বিদায় হয়ে চলেছেন। এই সময় প্রভু অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে দামোদর পণ্ডিতকে প্রশংসাপূর্ব্বক বললেন।

"সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে।
শুদ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর উপরে।।"
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ একাদশ পরিচ্ছেদ)

দামোদর প্রতি আমার সগৌরব প্রীতি। দামোদরের ছোট ভাই শঙ্করের প্রতি শুদ্ধ কেবলা প্রীতি। প্রভুর কথা শুনে দামোদর পণ্ডিত বললেন— তোমার কৃপায় শঙ্কর এখন আমার বড় ভাই হল।

শঙ্কর পণ্ডিত শেষ-লীলাতে মহাপ্রভুর কাছে থাকতেন। তিনি রাত্রে মহাপ্রভুর নিকট শয়ন করতেন। কোন কোন দিন প্রভু শ্রীশঙ্কর পণ্ডিতের অঙ্গোপরি শ্রীচরণ রেখে নিদ্রিত হতেন।

উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যেই করে যেই বোলে সব,—উন্মাদ লক্ষণ।।
স্বরূপ গোসাঞি তবে চিন্তা পাইলা মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈলা আর দিনে।।
সব ভক্ত মেলি তবে প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর পণ্ডিতে প্রভুরে সঙ্গে শোয়াইল।।
প্রভুপাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তাঁর উপর করেন পাদ প্রসারণ।।
প্রভু 'পাদোপাধান' বলি তাঁর নাম হইল।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল।।

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন।
ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন।।
উঘড়অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাঁহারে জড়ায়।।
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন।
বসি পাদ চাপি, করে রাত্রি জাগরণ।।
তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে।
তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে।।
(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৯।৬৫-৭৪)

পুরীতে এক সুন্দর ব্রাহ্মণ কুমার রোজ প্রভুর কাছে আসত। সে পিতৃহীন। প্রভু তাকে প্রীতি করতেন। শ্রীদামোদর পণ্ডিত বালকটির নিত্য প্রভুস্থানে আসা পছন্দ করতেন না। তাকে বার বার নিষেধ করতেন। তবুও বালকটি আসত।

শ্রীদামোদর একদিন প্রভুকে বলতে লাগলেন—পণ্ডিত হয়ে মনে মনে বিচার কর না কেন? বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্রকে এত প্রীত করছ লোকে কি বলবে? সে বিধবা ব্রাহ্মণীটি পরমা সুন্দরী। তুমিও পরম সুন্দর, লোকের কানা-কানিকে প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন? এই বলে দামোদর পণ্ডিত নীরব হলেন। তাঁর স্পষ্ট কথা শুনে প্রভু পরম সুখী হ'লেন। বললেন—ইহাকে বলে বাস্তব শুদ্ধপ্রেম। দামোদরের ন্যায় আমার অন্তরঙ্গ মিত্র ত আর কাকেও দেখছিনা। এ সব চিন্তা করে প্রভু মধ্যাহ্ন ভোজন করতে চললেন।

একদিন দামোদর পণ্ডিতকে প্রভু নিকটে ডাকলেন এবং অনেক কথা বললেন। তারপর প্রভু চিন্তা করলেন, একান্ত নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তিকে গৌড়দেশে জননীর নিকট পাঠাতে চাই। কিন্তু দামোদরের ন্যায় ত কাকেও দেখছি না। সেও নদীয়াবাসী; আমার জননীর প্রতিবেশী। তাঁর প্রীতির পাত্র।

অতএব তাঁকে যদি জননীর কাছে রাখতে পারি আমার কোন চিন্তা থাকে না। তাঁর কাছে কারও যথেচ্ছ ব্যবহার চলে না। প্রভু প্রীতি সহকারে দামোদরকে বলতে লাগলেন—

প্রভু কহে,—দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা।।
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলা সাবধান।।
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর-গণে।
নিরপেক্ষ নহিলে 'ধর্ম' না যায় রক্ষণে।।
(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩।২১-২৩)

তুমি নবদ্বীপে জননীর কাছে গিয়ে থাক। তোমার সামনে কেহ স্বতন্ত্র আচরণ করতে পারবে না। মাঝে মাঝে আমাকে দেখবার জন্য এস।

প্রভুর আদেশ পেয়ে শ্রীদামোদর পণ্ডিত সুখী হলেন এবং গৌড়দেশে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। সকলের থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর নিকট এলেন। প্রভু বলতে লাগলেন— "জননীকে কোটি দণ্ডবৎ জানিয়ো, আমার সুখ সংবাদ তাঁকে দিও সর্ব্বক্ষণ আমার কথা শুনিয়ো।" জননীকে বলবে আমি বার বার তাঁর ভবনে গিয়ে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করি। তিনি সব কিছু দেখতে পান। তথাপি স্বপ্ন বলে মনে করেন। এক ঘটনা তাঁকে বলবে এই মাঘ-সংক্রান্তিতে তিনি নানা পিঠাপায়স ব্যঞ্জন ক্ষীর তৈরি করে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ লাগিয়েছিলেন। অতঃপর আমার স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। আমি গিয়ে তাঁর সামনে বসে সব খেলাম। দেখে তিনি সুখী হলেন। আমি চলে এলাম, তাঁর বাহ্যদশা হল। শূন্য পাত্র দেখে বলতে লাগলেন—আমি কি স্বপ্ন দেখলাম নিমাই খেয়ে গেল? না ভোগ দিতে ভুল করলাম? এই ভেবে জননী ঠাকুরকে পুনঃ ভোগ লাগালেন। জননীকে এ সব কথা বলবে। আরও

বলবে আমি যে নীলাচলে আছি শুধু তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য। তাঁর প্রেমে আমি সর্ব্বদা বাঁধা। এ সব কথা বলে প্রভু শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রসাদ আনিয়ে জননীর ও বৈষ্ণবগণের জন্য শ্রীদামোদর পণ্ডিতের হাতে দিলেন। এ ভাবে পণ্ডিতকে বিদায় করলেন। পণ্ডিতও প্রভুকে দণ্ডবৎ করে গৌড় দেশের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্রীদামোদর পণ্ডিত গৌড়দেশে এলেন এবং শ্রীশচী মাতার গৃহে এসে তাঁকে বন্দনা করলেন। প্রভুর দে ওয়া প্রসাদ প্রভৃতি শচী মাতার হাতে দিলেন। শচীমাতা প্রসাদ পেয়ে গৌরসুন্দরকে স্মরণ করে নেত্র-নীরে ভাসতে লাগলেন। শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী নিয়ত জননীর কাছে অবস্থান করে তাঁকে প্রভুর কথা শুনাতে লাগলেন।

ভক্ত চাঁদ কাজী

শ্রীগৌর সুন্দরের আদেশে ভক্তগণ গৃহে-গৃহে হরি সংকীর্ত্তন করতে লাগলেন। পাষণ্ডিগণের তা সহ্য হল না। বিধর্ম্মী কাজীকে তারা জানাল। কাজী শুনে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যার সময় নগরে-নগরে তিনি লোকজন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় মায়াপুরে এক গৃহস্থের বাড়ীতে কীর্ত্তন শুনতে পেলেন। সেই বাড়ীতে ঢুকে তাঁদের মৃদঙ্গ প্রভৃতি ভেঙ্গে দিলেন এবং বললেন—আবার যদি কীর্ত্তনের আওয়াজ শুনতে পাই তোমাদের প্রাণ নাশ করব।

যবনের অত্যাচারে ভক্তগণ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। পরদিন তাঁরা এই ব্যাপারটি মহাপ্রভুকে জানালেন। ভক্তদের দুঃখের কথায় প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন—আমার কীর্ত্তনে বাধা দেয় কাজীর এত বড় স্পর্দ্ধা। প্রভু ভক্তগণকে জানালেন, আজ সন্ধ্যায় নগরে -নগরে মহাসংকীর্ত্তন হবে। সন্ধ্যা হতে না হতে ভক্তগণ মহাপ্রভুর বাড়ীতে সমবেত হতে লাগলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীবাসুদেব ঘোষ প্রভৃতির এক একটি দল হল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রত্যেক দলের সঙ্গে নৃত্য-কীর্ত্তন করে ভ্রমণ করতে লাগলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে মহাপ্রভু প্রথমে চন্দন পুষ্পমালা প্রদান করলেন। অনন্তর অন্যান্য ভক্তগণকেও চন্দন মালায় ভূষিত করলেন। মহাপ্রভুর স্বহস্তের চন্দন-মালা পেয়ে ভক্তগণ মহানন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন। প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে আজ এক অভূতপূর্ব্ব তেজ ও প্রভাব অনুভব করতে লাগলেন। তারপর শত শত মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যের তালের সহিত উঠল মধুর শ্রীনাম-ধ্বনি—

"হরি ও রাম—হরি ও রাম—হরি ও রাম।"
"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
চরণে লাগহুঁরে সারঙ্গধার" ইত্যাদি সংকীর্ত্তন রোল—

"হেন মহারঙ্গে প্রতি নগরে-নগরে।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্বলোকের ঈশ্বরে।।
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে।।"

(চৈঃ ভাঃ ২৩।২৯৪-২৯৫)

এই মহা-সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সহস্র সহস্র ভক্তসহ মহাপ্রভু নগরের পথে পথে চলেছেন। অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রভাবে নবদ্বীপ নগর যেন বৈকুণ্ঠ পুরীর শোভা ধারণ করল। নগরবাসীর দ্বারে-দ্বারে কদলীবৃক্ষ, পূর্ণঘট, আম্রসার ও দীপাবলী শোভা পেতে লাগল।

"লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুর্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দিকে 'হরি' বলে।।
চন্দ্রের আলোকে অতি অপূর্ব্ব দেখিতে।
দিবা নিশি একো কেহো নারে নিশ্চয়িতে।।"

(চৈঃ ভাঃ ২৩।৩০১-৩০২)

অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গদেব গণ।
চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ।।

(চৈঃ ভাঃ ২৩।৩০৪)

এই মত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজীদ্বারে গেলা।।

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।১৩৯)

এইভাবে নগরে কীর্ত্তন করতে করতে মহাপ্রভু এলেন কাজী দ্বারে। লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে শ্রীনিমাই পণ্ডিত মহা-সংকীর্ত্তনের সঙ্গে আসছেন দেখে কাজী ভয়ে গৃহমধ্যে লুকিয়ে রইলেন। ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু কাজীর দরজায় বসে পড়লেন। কাজী কোথায়? কাজী অন্তঃপুরে লুকিয়ে আছেন। একজন বিশিষ্ট লোককে মহাপ্রভু কাজীকে ডাকতে পাঠালেন।

কাজী সাহেব অবনত মস্তকে বাইরে এলেন।

মহাপ্রভু বললেন—আমি আপনার অভ্যাগত। আপনি আমায় দেখে পালালেন। এ কি ধর্ম?

কাজী বললেন—পণ্ডিত! আপনি ক্রোধের ভাব নিয়ে এসেছেন। তাই ভাবলাম কিছুক্ষণ পরে দেখা করব। যাক্ আমার সৌভাগ্য যে আপনার মত অতিথি পেয়েছি। পণ্ডিতজি! আপনার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা। সে সম্বন্ধে আপনি আমার ভাগিনা। দেহ সম্বন্ধ অপেক্ষা গ্রাম সম্বন্ধ লোকে বড় বলে। আমার ভাগিনা হয়ে, আমার উপর রাগ করে এসেছেন। আমায় অবশ্য সইতে হবে। আর এক কথা বলছি। আমি হলাম আপনার মামা। মামার অপরাধ ভাগিনা কখনও গ্রহণ করে না। এ ভাবে কাজী মহাপ্রভুর সঙ্গে আকারে-ইঙ্গিতে নর্ম আলাপ করতে লাগলেন। ভিতরের নিগূঢ় অর্থ কেহ বুঝতে পারলেন না।

প্রভু—মামা! একটী প্রশ্ন করতে এলাম।

কাজী—পণ্ডিতজি! কি প্রশ্ন বলুন।

প্রভু— গো-দুগ্ধ খান। তাই গাভী হল মাতা। বৃষদ্বারা ক্ষেত চাষ করে অন্ন উৎপাদন করেন তাই বৃষ হল পিতা। পিতা-মাতাকে মেরে খান। এ আপনাদের কোন্ ধর্ম? কিসের ভরসায় আপনারা এত বড় পাপ কাজ করেন?

কাজী—পণ্ডিতজী। আপনাদের যেমন বেদপুরাণ, আমাদের তেমন কেতাব কোরাণ। উভয় শাস্ত্রেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের কথা আছে। নিবৃত্তি মার্গমতে প্রাণীমাত্র বধ নিষেধ। প্রবৃত্তি মার্গমতে বধ করা চলে। শাস্ত্র আজ্ঞা বলে করলে পাপ হয় না। আপনার বেদেও গোবধের কথা আছে। পুরা কালে হিন্দুদের কোন কোন মুনি গো-বধ করতেন।

প্রভু— বেদে গো-বধ নিষেধ। তাই কোন হিন্দু গো-বধ করে না। পুনরায় জীবন দিতে পারলে জীব হত্যা করা চলে। পুরাকালে জরদগবকে (বৃদ্ধ বৃষকে) যজ্ঞস্থলে বধ করে বেদ মন্ত্রের দ্বারা পুনর্ব্বার তাকে জীবন দান করা হত। তাতে তার উপকার হত, পুণ্য হত। কলিকালে ব্রাহ্মণদের এ প্রকার শক্তি নাই। এখন কেহ গো-বধ করে না। মামা! আপনারা বাঁচাতে পারেন না, কেবল বধ করতে পারেন। এ পাপের ফলে, নরক থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না।

কলিকালে গো বধ, বৈদিক সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ ও দেবের দ্বারা পুত্র উৎপাদন—এ পাঁচটী কার্য্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। (চৈঃ চঃ আদি ১৭।১৬৪)

গো-অঙ্গে যত লোম আছে গো হত্যাকারীর তত বৎসর মহা-রৌরব নরকে বাস করতে হয়। আপনাদের শাস্ত্রকর্ত্তা ভ্রান্তবুদ্ধি নিয়ে শাস্ত্রমর্ম না জেনে ঐ সব মত প্রকাশ করেছেন।

মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত শুনে কাজী সাহেব স্তব্ধ হলেন। বললেন—পণ্ডিত! আপনার সিদ্ধান্তই ঠিক সিদ্ধান্ত। আমাদের শাস্ত্র আধুনিক। তার বিচার সঙ্গতি নাই। সব কিছুই কল্পিত। আমি তা বুঝি। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে সব কিছু করছি। কাজী সাহেবের কথা শুনে মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন।

মহাপ্রভু—মামা! আর একটী প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। এখন

নগরে নগরে যে হরিনাম সংকীর্ত্তন হচ্ছে তাতে আপনি বাধা দিচ্ছেন না কেন? আপনি কাজী, হিন্দুধর্ম বিরোধ করাটা মুসলমানদের বিশেষ নিয়ম।

কাজী—সকলে আপনাকে গৌরহরি বলে। তাই আমিও গৌরহরি বলে সম্বোধন করছি। গৌরহরি! এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আপনাকে সব কিছু বলব যদি আপনি নিভৃতে শুনেন।

প্রভু— মামা! আপনি এঁদের সামনে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। এঁরা আমার অন্তরঙ্গ জন। কোন ভয় নাই। আপনি বলুন।

কাজী— যে দিন খোল ভেঙে কীর্ত্তন বন্ধ করি, সে রাত্রে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখি। এক ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্ত্তি বক্ষের উপর চড়ে আমাকে বধ করতে এলেন। আমি ভয়ে অর্দ্ধমৃত হই। দন্ত কড়মড় করতে করতে সেই মূর্ত্তি আমাকে বললেন—মৃদঙ্গের বদলে তোর বক্ষ বিদীর্ণ করব। আমার কীর্ত্তনে বাধা দিয়েছিস্। তোকে সংহার করব। চক্ষু বুজে কাঁপতে লাগলাম, মনে মনে তাঁর চরণে শরণ নিলাম। আমাকে ভীত দেখে দয়ার্দ্র হয়ে তিনি বললেন— "আজ তোকে ক্ষমা করলাম। আবার যদি কীর্ত্তনে বাধা দিস্, তোকে সবংশে বিনাশ করব।" এই কথা বলে নৃসিংহ অন্তর্ধান হলেন। দেখুন আমার বক্ষে তাঁর নখচিহ্ন এখনও রয়েছে।" এ বলে কাপড় সরিয়ে কাজী মহাপ্রভুকে বক্ষঃস্থল দেখালেন।

তারপর কাজী সাহেব বললেন—"হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ। সেই তুমি হও—হেন লয় মোর মন।।" (চৈঃ চঃ আদি ১৭।২১৫) আমার মনে হয় আপনি সেই ঈশ্বর।

আমি সেই দিন থেকে কীর্ত্তনে বাধা দিতে নিষেধ করেছি।

কাজীর কথা শুনে মহাপ্রভু বললেন—আপনার মুখে 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'রাম' 'নারায়ণ' নাম। ইহা বড় বিচিত্র; আপনি সমস্ত পাপ মুক্ত হলেন।

আপনি বড় ভাগ্যবান।

মহাপ্রভুর কথা শুনে কাজী সাহেবের হৃদয় বিগলিত হল। দুই নয়ন দিয়ে জল পড়তে লাগল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মহাপ্রভু কাজী সাহেবকে আলিঙ্গন করলেন। কাজী তখন মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়ে বললেন—

তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যেন তোমাতে রহুঁ মতি।।
(চৈঃ চঃ আদি ১ ।২২০)

তারপর প্রভু বললেন—মামা! আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা।

কাজী—আমি দীন-হীন কি ভিক্ষা দিব?

প্রভু—নবদ্বীপে যেন কেহ কীর্ত্তনে বাধা না দেয়।

কাজী—আমি শপথ করে বলে যাব আমার বংশধরগণ কেহ কীর্ত্তনে বাধা দেবে না।

কাজী সাহেবের কথা শুনে ভক্তগণ মহা হরি হরি ধ্বনি করে উঠলেন।

তারপর ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন করতে করতে চললেন। ভক্ত কাজী সাহেবও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে লাগলেন। প্রভু তাঁকে অনেক বুঝিয়ে গৃহে পাঠিয়ে ছিলেন।

মৌলানা সিরাজুদ্দিন সেদিন থেকে ভক্ত চাঁদকাজী নামে খ্যাত হলেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে বামন পুকুরে তাঁর পবিত্র সমাধি স্থানটি রয়েছে।

শ্রীজগাই ও মাধাই

শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পুর্ব্বাহ্নে কিভাবে হরিনাম প্রচার করেছেন তা অপরাহ্নকালে শ্রীমহাপ্রভুর কাছে বলতে লাগলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ বললেন আজ নগরে এক অপরূপ দৃশ্য দেখলাম।

প্রভু— কি অপরূপ দৃশ্য দেখ্‌লে?

নিত্যানন্দ—ভয়ঙ্কর দুই মাতাল, তারা নাকি জাতিতে ব্রাহ্মণ?

প্রভু— তারপর?

নিত্যানন্দ—তাদের কাছে বললাম 'হরে কৃষ্ণ রাম' বল।

প্রভু— তারপর?

নিত্যানন্দ—তারপর আর কি? ধেয়ে আসল মারবার জন্য, ভাগ্যক্রমে বেঁচে এলাম।

প্রভু— সে দুই বেটা কে?—

গঙ্গাদাস—প্রভো! তারা দুজনে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাদের পিতা-মাতা অতি শুদ্ধাচারী ছিলেন। এরা দুজন আগে নদীয়ায় কোতোয়ালের কাজ করতো। আগে ভাল ছিল। অধুনা এমন পাপ নাই যা তারা করে না। মদ্য-পান ও চুরি হল তাদের বড় কাজ। সে দুজনের নাম জগাই আর মাধাই।

মহাপ্রভু—চিনতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি। সে দু বেটা যদি এখানে আসে, খণ্ড খণ্ড করব।

নিত্যানন্দ—তাদের খণ্ড খণ্ড কর আর না কর, সে দুজন থাকতে আমি কোথাও যাব না। তাদের গোবিন্দ নাম বলাও দেখি। তবে ত তোমার মহিমা বুঝব। ভাল লোককে হরিনাম বলান সহজ। এদের যদি হরি বলাতে

পার , তবে ত বাহাদুরি।

প্রভু হাস্য করে বললেন—তারা উদ্ধার পেয়ে গেল।

নিত্যানন্দ—তারা উদ্ধার পেল! কি করে পেল?

প্রভু— তোমার দর্শন যখন পেয়েছে , তাদের উদ্ধার না হয়ে কি পারে? তুমি যখন তাদের কল্যাণ চিন্তা করছ তাদের উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী। প্রভুর কথা শুনে বৈষ্ণবগণ আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করলেন। সকলে বুঝলেন জগাই মাধাই উদ্ধার লাভ হবে।

শ্রীহরিদাস অদ্বৈত আচার্য্যের কাছে বলতে লাগলেন— হে আচার্য্য? প্রভু আমাকে এক মহা চঞ্চলের সহিত পাঠান। তিনি থাকেন কোথায়? আর আমি থাকি কোথায়? গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে চলেছেন, আমি ত ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যাই। বর্ষাকালে গঙ্গায় কুমীর ঘুরে বেড়ায়। আমার ত ভয় করে। বৃষ দেখলে 'আমি মহেশ" বলে তার উপরে চড়েন। গাভী দেখলে দোহন করে দুধ খেতে থাকেন। আমি যদি নিষেধ করি তখন বলেন " তোর ঠাকুর আমাকে কি করতে পারে?"

এইটি শ্রীনিত্যানন্দের অবধূত ভাবের বর্ণনা তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পাগল।

হরিদাস—আজ ত ভাগ্য গুণে বেঁচে এসেছি।

আচার্য্য— কেন? কি হয়েছিল?

হরিদাস— দুই বড় মাতাল রাস্তায় পড়ে আছে। তাদের কাছে গিয়ে বললাম—হরিনাম বল। এ উপদেশ শুনে দু মাতাল কুঁদে এলে মারতে। অবধূত পালিয়ে গেলেন। আমি বৃদ্ধ; দৌড়াতে পারি না। পেছন থেকে দাঁড়া দাঁড়া বলতে বলতে মদের নেশায় দুজন রাস্তায় পড়ে গেল। আপনার কৃপায় আজ বেঁচে এলাম।

আচার্য্য—হরিদাস। তুমি যা বলছ সব ঠিক। জগাই-মাধাই দুই মাতাল, অবধূত আর এক মাতাল। তিন মাতাল এক জায়গায় থাকা ঠিক হয়। হরিদাস! শুন এই অবধূত দু-তিন দিনের মধ্যে ঐ মাতালকে এখানে নিয়ে আসবে। দেখবে তাদের সঙ্গে নাচবে। চল তুমি ও আমি জাত-পাত নিয়ে পালাই।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীহরিদাস ব্যঙ্গ উক্তিচ্ছলে নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করছেন শুনে ভক্তগণ আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন।

জগাই-মাধাই মদ খেয়ে রাত্রে মহাপ্রভুর বাড়ীর কাছে পড়ে থাকে। কোন সময়ে কীর্ত্তনের তালে তালে নাচে। সকাল বেলা প্রভুকে দেখে বলে— বেশ কীর্ত্তন হয়েছে। বেশ কীর্ত্তন হয়েছে। গায়কদের একটু দেখতে চাই, তাদের ভাল ভাল জিনিস এনে দেব।

একদিন সন্ধ্যার সময় প্রেমরসে মত্ত হয়ে শ্রীনিত্যানন্দ সেখানে গেলেন। জগাই মাধাইকে জড়িয়ে ধরলেন।

জগাই মাধাই বলল— কে জড়িয়ে ধরল?

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন—আমি অবধূত।

'অবধূত' নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া।।

(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৩।১৭৮)

অবধূত নাম শুনে মাধাই মুটকী (ভাঙ্গা কলসীর কানা) তুলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিরে মারল। শির কেটে দর দর ধারে রক্ত পড়তে লাগল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমরসে উন্মত্ত, কেবল "হরি বোল" বলছিলেন।

মাধাই আবার মারতে উদ্যত হল। জগাই অমনি মাধাইর হাত চেপে ধরল। বলল দেশান্তরী সন্ন্যাসী মেরে লাভ কি?

ভক্তগণ তাড়াতাড়ি মহাপ্রভুর কাছে সংবাদ দিলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ছুটে এলেন। দেখলেন প্রেমরসে বাহ্যদশাশূন্য নিত্যানন্দের ললাট থেকে দর দর করে রক্ত পড়ছে। শ্রীনিত্যানন্দের উপর এই অত্যাচার মহাপ্রভু সইতে পারলেন না। ক্রোধে কেঁপে উঠলেন। সুদর্শন! সুদর্শন! বলে নিজ চক্রকে ডাকতে লাগলেন। অমনি ভয়ঙ্কর চক্র তথায় উপস্থিত হল। জগাই-মাধাই সেই ভয়ঙ্কর চক্র দেখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হয়ে পড়ল। চক্রের কি তেজ! কোটি ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ করতে পারে।

ভাগবত গণ বড় ভীত হয়ে পড়লেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও চাইলেন

না, জগাই মাধাইকে এ ভাবে বধ করা হউক। তিনি করজোড়ে বলতে লাগলেন—ঠাকুর! ক্রোধ সংবরণ কর। এ অবতারে ত অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা দৈত্য বধ করা হবে না। এই দুই পাপীর প্রাণ ভিক্ষা আমি চাই।

এদের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভু অহৈতুকী কৃপা দেখে মহাপ্রভু স্তম্ভিত হলেন। ভক্তগণ বিস্মিত হলেন। এত দয়া এত করুণা! এত প্রহার খেয়েও শ্রীনিত্যানন্দের বিন্দুমাত্র দ্বেষ নাই।

এদিকে জগাই-মাধাই সুদর্শন-চক্র দেখে ভীত হয়ে অমনি মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে লুটিয়ে পড়ল। মাধাই নিত্যানন্দকে মারতে জগাই ধরেছিল বলে, মহাপ্রভু জগাইকে বললেন—"কৃষ্ণ তোকে কৃপা করবেন। তোর প্রেমভক্তি হউক।" জগাইকে আশীর্ব্বাদ করা মাত্র সে প্রেমে মুর্চ্ছা প্রাপ্ত হল। তখন মহাপ্রভু বললেন—"জগাই! ওঠ! আমার দিব্যরূপ দর্শন কর। আমি সত্য সত্যও তোকে প্রেমভক্তি দিলাম।"

জগাই নেত্র খুলে উঠে দেখে মহাপ্রভু নিজে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

"চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্র, গদা-পদ্ম-ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর।।"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।১৯৬)

জগাই পুনর্বার মহাপ্রভুর শ্রীচরণ মূলে লুটিয়ে পড়ল। মহাপ্রভু তাকে শ্রীচরণ দিলেন। জগাই তা স্বীয় বক্ষ উপরে স্থাপন করল।

মহাপ্রভু জগাইকে কৃতার্থ করেছেন দেখে মাধাইও প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করে কৃপা ভিক্ষা করতে লাগল।

প্রভু— তোকে কৃপা করব না।

মাধাই—প্রভু! দুই ভাই একই প্রকার পাপ করেছি। এক জনকে কৃপা করলেন, আর একজনকে করবেন না কেন?

প্রভু— তুই নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে রক্তপাত করেছিস। নিত্যানন্দের ন্যায় প্রিয় আমার কেহ নাই। আমার দেহ থেকেও নিত্যানন্দকে অধিক মনে করি। নিত্যানন্দ যদি তোকে কৃপা করে তবে আমার কৃপা পাবি। মাধাই অমনি শ্রীনিত্যানন্দের চরণমূলে লুটিয়ে পড়ল। বলল—প্রভো! আমি তোমার রক্তপাত করেছি। তুমি যদি ক্ষমা না কর আমার নিস্তার নেই।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন—মাধাই! তোর সমস্ত অপরাধ দূর হল, প্রভুর দিব্যরূপ দর্শন কর। তোদের সমস্ত ভার আমি নিলাম। আর কোন পাপ করিস্ না।

মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হয়ে জগাই-মাধাই তাঁদের শ্রীচরণে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ দুই জনকে তুলে আলিঙ্গন করে বললেন— তোদের সমস্ত পাপ দূর হল। আজ থেকে তোরা পরম পবিত্র হলি ও আমাদের ভক্ত হলি। তোদের যারা ভোজন করাবে, তারা আমাকেই ভোজন করাবে।

তো দোহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার।।

(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৩।২২৮)

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মধুর লীলা দর্শন করে ভক্তগণ প্রেমভরে হরি হরি ধ্বনি করতে লাগলেন। সেই দিন থেকে জগাই-মাধাই প্রভুর ভক্তগণের অন্যতম হল। গঙ্গার ঘাটে বসে নিরন্তর হরিনাম করতে লাগল এবং সকলের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দুই ভাই যে করুণার অবতার তা সকলে বুঝতে পারলেন। জগাই-মাধাই পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় বিজয় ছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপে অসুর যোনি প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, ত্রেতা যুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, দ্বাপরে শিশুপাল ও দন্তবক্র, কলিযুগে জগাই ও মাধাই।

— o —

শ্রীশিবানন্দ সেন

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভুর শাখা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

শিবানন্দ সেন—প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ।।
প্রতিবর্ষে প্রভুগণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া।।

(চৈঃ চঃ আদি ১০।৫৪-৫৫)

ঐশ্বর্য্য বিত্ত প্রভৃতির সদ্ব্যবহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার দ্বারা হয়। শ্রীশিবানন্দ সেন মহোদয়ের ভূ-সম্পত্তির ব্যবহার এইভাবে হয়েছিল। তিনি যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর ভক্তগণের সেবার জন্য দিয়েছিলেন। তাঁর যাবতীয় পরিকর, পুত্র ও ভৃত্য সকলে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেনের তিন পুত্র (১) শ্রীচৈতন্য দাস, (২) শ্রীরাম দাস ও (৩) কর্ণপুর, মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁর ভাগিনেয় শ্রীবল্লভ সেন ও শ্রীকান্ত সেনও বড় ভক্ত ছিলেন।

শ্রীশিবানন্দ সেন বাস করতেন কুমারহট্টে বা হালি শহরে। তাঁর সেবিত গৌর-গোপাল বিগ্রহ বর্ত্তমান হালি সহর থেকে দেড় মাইল দূরে কাঁচড়া পাড়ায় সেবিত হচ্ছেন।

শ্রীকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে লিখেছেন—যিনি দ্বাপর যুগে

বৃন্দাবনে 'বীরা' নামে শ্রীরাধার দূতী গোপী ছিলেন, তিনিই অধুনা শ্রীশিবানন্দ সেন। প্রতি বছর শ্রীশিবানন্দ সেন গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ তত্ত্বাবধানে পুরীধামে নিয়ে যেতেন।

যাত্রার এক মাস আগে ভক্তগণের পুরীযাত্রা আরম্ভ হত। এক মাস পায়ে চলে সকলে পুরী পৌঁছাতেন।

একবার শুভদিন দেখে ভক্তগণ যাত্রা আরম্ভ করলেন। সর্ব্বপ্রথমে সকলে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ঘরে এলেন। সেখানে একদিন উৎসব করে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য তাঁর পত্নী ও পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তগণ এলেন নবদ্বীপ মায়াপুরে—প্রভুর জননী শ্রীশচীদেবীকে দর্শন করতে। প্রভুর বিরহে শচীমাতা বড় ব্যথিত চিত্তে দিন যাপন করছেন। ভক্তগণকে শচীমাতা নমস্কার করলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও সীতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ বন্দনা করে শ্রীগৌরসুন্দরের স্মরণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও সীতা ঠাকুরাণী শচীমাতাকে অনেক কথা বুঝিয়ে ভক্তগণের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মহাপ্রভু গৌড়দেশে থেকে নাম-প্রেম প্রচার করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। তথাপি তিনিও ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য যাত্রা করলেন।

ভক্তদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীআচার্য্যরত্ন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাস পণ্ডিত, তাঁর ভ্রাতৃবর্গ ও পত্নী, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত ওঝা, শ্রীরাঘব পণ্ডিত ও শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি, গুণরাজ খাঁন প্রভৃতি। শ্রীশিবানন্দ সেনের সঙ্গে ছিলেন পত্নী ও তিন পুত্র। ভক্তগণ মধ্যে অনেকে সপত্নীক চলেছেন। ঠাকুরাণীগণ মহাপ্রভুর রুচি অনুযায়ী নানা প্রকার দ্রব্য তৈরী করে নিচ্ছেন। ভক্তগণের ভোজনের ব্যবস্থা এবং ঘাটের পয়সা কড়ি চুকাবার ব্যবস্থা শ্রীশিবানন্দ সেন নিজে করছেন। যে জায়গায় ভক্তগণ রাত্রে

অবস্থান করতেন তথায় সংকীর্ত্তন নৃত্য প্রভৃতি হত।

শ্রীশিবানন্দ সেন উড়িষ্যার গ্রাম্য পথের সন্ধান জানতেন। একদিন তিনি এক ঘাটির পয়সা কড়ির হিসাব নিকাশ করবার জন্য ঘাটে রয়ে গেলেন। ভক্তগণ এগুতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে এক গাছের তলায় সকলে বসলেন। শিবানন্দ সেন না এলে ভোজনের ব্যবস্থা হয় না। পথ শ্রমে ভক্তগণ বড় ক্ষুধার্থ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধে অস্থির হয়ে শিবানন্দকে গালি ও অভিশাপ দিতে লাগালেন—কোথায় শিবা? ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ যায়;এখনও সে এল না, ভোজনের ব্যবস্থা করল ? মরুক শিবার পুত্রগণ। ঠিক এমন সময় শ্রীশিবানন্দ এলেন। তাঁর পত্নী কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তুমি এখন পর্য্যন্ত ভক্তগণের ভোজনের ব্যবস্থা কর নাই, তাই গোসাঞি রেগে অস্থির, তোমার পুত্রগণ মরুক বলে অভিশাপ দিচ্ছেন। শ্রীশিবানন্দ বললেন—পাগলামি কর না;বৃথা ক্রন্দন কর না, শান্ত হও। পত্নীকে এই সব বলে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্থানে এলেন এবং দণ্ডবৎ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধে তাঁকে পাদ দ্বারা প্রহার করলেন। শিবানন্দ সেন প্রভুর পাদ প্রহার পেয়ে আনন্দিত মনে শীঘ্রই এক গৌড়ীয়ার ঘরে গিয়ে ভক্তগণের ভোজনের ও বাসা ঘরের ব্যবস্থা করলেন ও শীঘ্রই নিত্যানন্দ প্রভুকে তথায় নিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও ভক্তগণের ভোজনাদি হল।

অনন্তর শ্রীশিবানন্দ সেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নমস্কার করে বলতে লাগলেন—

আজি মোরে ভৃত্য, করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা।।
শাস্তি ছলে কৃপা কর,—এ তোমার 'করুণা'।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা?।।

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ রেণু।
হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু।।
আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণ ভক্তি অর্থ কাম ধর্ম্ম।।
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈলা প্রেম আলিঙ্গন।।
(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১২।২৭-৩১)

এক বছর শ্রীশিবানন্দ সেন তাঁর প্রথম পুত্র চৈতন্যদাসকে নিয়ে পুরীতে এসেছিলেন। একদিন মহাপ্রভু শিশুটীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর নাম কি? শিশুটী বললে—চৈতন্যদাস। মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে বললেন—এ কি রকম নাম রেখেছ? শিবানন্দ সেন বললেন হৃদয়ে যেমন প্রেরণা পেয়েছি তেমনি রেখেছি।

একদিন শিবানন্দ সেন পুত্রকে শিখিয়ে দিলেন, মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কর। চৈতন্যদাস প্রভুকে স্বীয় বাসগৃহে ভোজনের আমন্ত্রণ করলেন, শিশুর আদরের আমন্ত্রণ মহাপ্রভু স্বীকার করলেন। স-পত্নীক শিবানন্দ সেন অতি-হর্ষিত চিত্তে অনেক কিছু রন্ধন করলেন। যথা সময় মহাপ্রভু শিবানন্দের বাসগৃহে এলেন। শিবানন্দ দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক প্রভুকে নিয়ে পাদ ধৌতাদি করিয়ে ভোজনে বসালেন। প্রভু বললেন আজকার আমন্ত্রণ চৈতন্যদাসের। চৈতন্যদাস প্রভুর সামনে দই, লেবু, আদা, ফুল-বড়া, লবণ প্রভৃতি পাত্রে পাত্রে এনে সুন্দর ভাবে রাখতে লাগল। মহাপ্রভু তা দেখে প্রসন্ন হয়ে বললেন—

*　　*　　এ বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি ইহার নিমন্ত্রণে।।
(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০।১৫০)

এই বলে মহাপ্রভু আনন্দে ভোজন করতে লাগলেন। ভোজন অন্তে অবশেষ পাত্রটী চৈতন্যদাসকে ডেকে প্রভু দিলেন।

চার মাস কাল প্রভু স্থানে গৌড়ীয় ভক্তগণ থাকার পর বিদায় নিচ্ছেন। প্রভু শিবানন্দ সেনকে ডেকে বললেন—এবার তোমার যে পুত্র হবে তার নাম হবে পুরীদাস। শিবানন্দ সেন প্রভুর আশার্ব্বাদ পেয়ে আনন্দে গৌড় দেশে ফিরে এলেন। কয়েক মাস পরে এক পুত্র হল। জ্যোতিষী বিচার করে নামকরণ করলেন—পরমানন্দদাস বলে।

অন্যান্য বছরের ন্যায় পর বছরও শ্রীশিবানন্দ ভক্তগণসহ পুরী ধামে এলেন। মহাপ্রভু সকলের যথাযথ বাসা ঘরের ব্যবস্থা করলেন। প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ-সীমা রইল না। শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে বহু নৃত্য-গীতাদি করলেন এবং ভক্তগণকেও নৃত্যাদি করালেন।

একদিন সপত্নীক শিবানন্দ মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং বালকটীকে নিয়ে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ করিয়ে শ্রীচরণ অগ্রে ছেড়ে দিলেন। বালকটী মহাপ্রভুর অরুণ বর্ণ চরণের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রভু হাস্য করতে করতে শ্রীচরণ অঙ্গুষ্ঠ বালকের সামনে ধরলেন। বালক তা আনন্দ ভরে দু হাত দিয়ে ধরে চুষতে লাগলেন, ভক্তগণ তা দেখে আনন্দে 'হরি হরি' ধ্বনি করতে লাগল। এই বালকই উত্তরকালে হয়েছিলেন কবি কর্ণপুর গোস্বামী।

এক বছর শ্রীশিবানন্দ সেনের ভাগিনা শ্রীকান্ত রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরীধামে গিয়েছিলেন। দুইমাস মহাপ্রভুর কাছে ছিলেন। গৌড়দেশে ফিরে যাবার সময় মহাপ্রভু শ্রীকান্তকে বললেন—এ বছর আমি গৌড়দেশে গিয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যাদি ভক্তগণের সহিত মিলিত হব। অতএব এবছর পুরীতে আমার সঙ্গে মিলবার জন্য যেন কেহ না আসে। তুমি শিবানন্দকে বলবে—আমি এই পৌষমাসে তাঁর গৃহে আগমন করব ও তাঁর সহিত মিলিত হব।

মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে শ্রীকান্ত গৌড়দেশে ফিরে এলেন। তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করলেন এ বছর মহাপ্রভু স্বয়ং গৌড়দেশে আসবেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যাদি ভক্তগণ পুরী যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শ্রীকান্তের কথা শুনে যাত্রা স্থগিত রাখলেন।

শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর পথ চেয়ে রইলেন। পৌষমাস এল। আনন্দে বহু জিনিস সংগ্রহ করে আজ আসবেন কাল আসবেন ভেবে ভেবে সারা পৌষ মাস কেটে গেল। তিনি এলেন না। অকস্মাৎ তথায় শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী এলেন। শ্রীশিবানন্দের ও জগদানন্দের দুঃখ দেখে তিনি বললেন—আমি ধ্যানে বসে মহাপ্রভুকে নিয়ে আসব। এই ব্রহ্মচারী পূর্ব্ব নাম শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ; মহাপ্রভু নাম দিয়ে ছিলেন শ্রীনৃসিংহানন্দ।

দুইদিন ধ্যান করবার পর ব্রহ্মচারী শিবানন্দ সেনকে বললেন—প্রভুকে পানিহাটি গ্রাম পর্য্যন্ত এনেছি। কাল মধ্যাহ্নে এখানে আসবেন। রান্না করবার সমস্ত সামগ্রী আমায় এনে দেন—রান্না করে তাঁকে খাওয়াব।

শ্রীশিবানন্দ সেন তৎক্ষণাৎ যাবতীয় রন্ধন-সামগ্রী যোগাড় করতে লাগলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রাতঃকাল থেকে রান্না আরম্ভ করলেন। বহু প্রকার ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন ও পিষ্টক তৈয়ারী করলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের জন্য, ঈষ্টদেব শ্রীনৃসিংহদেবের জন্য এবং শ্রীমন্নহাপ্রভুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন নৈবেদ্য পাত্র ব্রহ্মচারী সাজালেন। সমস্ত জিনিস সমান তিন ভাগ করে পাত্রে পাত্রে রাখলেন, বসবার তিনখানা আসন পেতে দিলেন। তিন পাত্রে জলও সামনে সাজায়ে রাখলেন। তারপর নিবেদন করে মন্দিরের বাহিরে ধ্যান করতে লাগলেন। দেখলেন মহাপ্রভু এসে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং সানন্দে আসনে বসে তিনজনের জিনিস খেতে আরম্ভ করলেন। তখন ব্রহ্মচারী হা হা করে উঠলেন। শ্রীজগন্নাথদেব ও আমার ইষ্ট-শ্রীনৃসিংহদেব কি খাবেন—তাঁদের উপবাস?

"তিন ভোগ খাইলা কিছু অবশিষ্ট নাই।।"

(চৈঃ চঃ অন্তঃ ২।৬২)

শ্রীশিবানন্দ সেন বললেন—আপনি হাহাকার করছেন কেন?

ব্রহ্মচারী—এই দেখুন মহাপ্রভুর কি ব্যবহার।

শিবানন্দ—মহাপ্রভু কি করছেন?

ব্রহ্মচারী—শিবানন্দ! কি বলব মহাপ্রভু তিনজনের নৈবেদ্য একা খেয়ে হাসতে হাসতে পানিহাটি চলে গেলেন। এখন জগন্নাথ ও নৃসিংহদেব উপবাসী রইলেন। ব্রহ্মচারীর কথা শুনে শিবানন্দ সেন ও জগদানন্দ পণ্ডিত মন্দিরের মধ্যে দেখলেন নৈবেদ্যর কিছু মাত্র নাই। সকলে অবাক এবং হর্ষান্বিত হলেন। শিবানন্দ সেন বললেন—আপনি খেদ্ করবেন না। আমি এখনি পুনঃ সামগ্রী এনে দিচ্ছি, রান্না করে দুই ঠাকুরকে ভোগ লাগান। ব্রহ্মচারী পুন রান্না করে দুই ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেন সুখী হলেন বটে কিন্তু সাক্ষাৎভাবে প্রভুকে দেখলেন না বলে মনে মনে খেদ করতে লাগলেন। অতঃপর পর বছর সমস্ত গৌড়ীয় ভক্ত নিয়ে শিবানন্দ সেন পুরী ধামে এলেন। রথযাত্রাদি দর্শন করলেন। মহাপ্রভুর জন্য শ্রীসীতা ঠাকুরাণী, শ্রীমালিনী দেবী ও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের পত্নী প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিস নিয়েছিলেন তা সকলে এক এক দিন আমন্ত্রণ করে তাঁকে ভোজন করালেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু একদিন শিবানন্দ সেনকে হঠাৎ বললেন— তোমার মনে আছে আমি পৌষ মাসে তোমার গৃহে ভোজন করেছিলাম। এই কথা শুনে শিবানন্দ সেন আনন্দে বিহ্বল হলেন। প্রভু আরও বললেন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী দুই বার রন্ধন করেছিল। তুমি আমার সাক্ষাৎ দর্শন পাও নাই বলে খেদ করেছিলে। এবার শিবানন্দ সেনের ও জগদানন্দ পণ্ডিতের সমস্ত কথা মনে পড়ল।

শ্রীশিবানন্দ সেন-প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত শেষ হল—জয় শ্রীশিবানন্দ সেন

কি জয়!

শ্রীশিবানন্দ সেন রচিত গীত ঃ—

দয়াময় গৌরহরি, নৈদ্যা-লীলা সাঙ্গ করি,
হায় হায় কি কপাল মন্দ।
গেলা নাথ নীলাচলে, এ-দাসেরে একা ফেলে,
না ঘুচিল মোর ভববন্ধ।।
আদেশ করিল যাহা, নিশ্চয় পালিব তাহা,
কিন্তু একা কি রূপে রহিব।
পুত্র পরিবার যত, লাগিবে বিষের মত,
তোমা বিনা কেমতে গোঙাব।।
গৌড়ীয় যাত্রিক সনে, বৎসরান্তে দরশনে,
কহিলা যাইতে নীলাচলে।
কিরূপে সহিয়া রব, সম্বৎসর কাটাইব,
যুগশত জ্ঞান করি তিলে।।
হও প্রভু কৃপাবান, কর অনুমতি দান,
নিতি নিতি হেরি পদদ্বন্দ্ব।
যদি না আদেশ কর, ওহে প্রভু বিশ্বম্ভর,
মৃতসম হবে শিবানন্দ।।

* * *

সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেম জলে ভাসাওল নগর নদীয়া।।
পরিসর বুক বহি পড়ে প্রেমধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা।।

গোবিন্দের অঙ্গে প্রভু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া।।
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মূরছিয়া।
শিবানন্দ কান্দে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া।।
(পদকল্পতরু ২১২৭ গীত)

— o —

জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি।
যাঁর কৃপা বলে সে চৈতন্য-গুণ গাই।।
হেন সে গৌরাঙ্গ চন্দ্রে যাহার পীরিতি।
গদাধর প্রাণনাথ যাহে নাম খ্যাতি।।
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্র বাস কৃষ্ণ সেবা যার লাগি ছাড়ে।।
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম-জানকী যেন এক কলেবর।।
যেন এক প্রাণ রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরঙ্গ।।
কহে শিবানন্দ পহু যাঁর অনুরাগে।
শ্যাম তনু গৌর হইয়া প্রেম মাগে।।
(পদকল্পতরু ২৩৫৫ গীত)

— o —

পদকর্ত্তা শিবানন্দ ও শিবাই দাস সম্বন্ধে— পদকল্পতরু ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় এম, এ, মহোদয় বলেছেন— "বলা বাহুল্য যে ইহা শ্রীমহাপ্রভুর বর্ণিত প্রেমার্ত্তির সাক্ষাৎ দ্রষ্টা শিবানন্দ সেনের রচনা ছাড়া অন্য কোন শিবানন্দের রচনা হইতে পারে না। মহাপ্রভুর সমসাময়িক অন্যান্য ভক্ত কুলীন গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ শিবানন্দ সেন ব্যতীত আর কোন শিবানন্দ বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লিখিত

হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। সুতরাং তাঁহাকেই শিবানন্দ ও শিবাই দাস ভনিতার পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া জানা যাইতেছে।" (পদকল্পতরু ভূমিকা পৃষ্ঠা ২১৩)

— ০ —

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন।।
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।।
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইঞা।
হাতে লড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া।।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ-দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল।।

(পদকল্পতরু ১১৩৩ গীত)

— ০ —

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী।
দেখিয়া যশোদা পুত্র নন্দগৃহে আসি।।
সবে সাবধান করি যশোদারে কহে।
বহু পুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে।।
বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা হরষিত হৈয়া।
রূপ নিরখয়ে সুখে একদিঠে চাইয়া।।
এ দাস শিবা বলে অপরূপ হেরি।
দেখিয়া বালক ঠাম যাঙ বলিহারি।।

(পদকল্পতরু ১১৩৫ গীত)

— ০ —

শিবানন্দ সেন ছাড়াও শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্ত্তী নামে আর একজন পদকর্ত্তা আছেন। শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্ত্তী গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন, তিনি পদে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের বন্দনা করেছেন। শিবানন্দ সেনের আর কয়েকটি পদ নিম্নে লিখিত হ'ল।

সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া।।
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধার।
নাহি জানি দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ার।।
গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরছিয়া।।
শিবানন্দ কান্দে পহুর ভাব না বুঝিয়া।

— —— —

শিবানন্দ সেনের শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ যাত্রার একটি সুন্দর গীত।

নন্দরাণি গো মনে না ভাবিহ কিছু ভয়।
বেলি অবসান কালে, গোপাল আনিয়া দিব,
তোর আগে কহিনু নিশ্চয়।।
সোপি দেহ মোর হাতে, আমি লৈয়া যাব সাথে,
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে, অধিক জানিয়ে গো,
জীবনের জীবন নীলমণি।।
সকালে আনিব ধেনু, বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু,
গোচারণ শিখাইব ভাইয়েরে।

গোপকুলে উতপতি, গোধন চারণ বৃত্তি,
বসি থাকিতে নাই ঘরে।।
শুনিয়া বলাই'র কথা, মরমে পাইয়া ব্যথা,
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বোলে, রাণী ভাসে প্রেমজলে,
হেরইতে কানাইর বয়ানে।।

শ্রীশিখি মাহিতি

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য পরিকর শ্রীশিখি মাহিতি। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় আছে—

"রাগলেখা কলাকল্যৌ রাধাদাসৌ পুরা, স্থিতে।
তে জ্ঞেয়ে শিখি মাহিতি তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ।।"

তিনি ও তাঁর ভগিনী উভয়ে প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি ১০।১৩৭ শ্লোকে—

"শ্রীশিখি মাহিতি আর মুরারি মাহিতি।।
মাধবী দেবী শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি"।।

শ্রীভগবান্ আচার্য্যের আদেশে শ্রীছোট হরিদাস শ্রীমাধবী দেবীর নিকট থেকে মহাপ্রভুর সেবার জন্য ভাল চাল চেয়ে এনেছিলেন।

শ্রীমুরারি মাহিতি ও শ্রীমাধবী দেবী উভয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু শিখি মাহিতি শ্রীজগন্নাথের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি প্রকাশ করতেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি করতেন না। মুরারি ও মাধবী তাঁকে অনেক বুঝাতেন। কিন্তু তিনি রাজি হতেন না। একদিন অনুজগণের কথা চিন্তা করতে করতে শিখি মাহিতি নিদ্রিত হলেন, রাত্র শেষে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে লাগলেন—কখনও মহাপ্রভু জগন্নাথে প্রবেশ করে

এক হচ্ছেন, আবার দুই মূর্ত্তি প্রকট করছেন। কখনও দেখছেন মহাপ্রভু হাত তুলে তাঁকে ডাকছেন, আবার দেখছেন—তাঁকে স্নেহে আলিঙ্গন করছেন।

এমন মধুর স্বপ্ন দেখে শিখি মাহিতির শরীরে পুলক ও নয়ন দিয়ে প্রেম-অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। প্রভাতে নিদ্রা ভাঙল, কিন্তু প্রেমাবেশ ভাঙল না। ঠিক এমন সময় মুরারি ও মাধবী তথায় এলেন। শিখি মাহিতি দু'জনকে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। তারপর বলতে লাগলেন—আজ আমি এক মধুর স্বপ্ন দেখেছি। তার বিবরণ তোমরা শ্রবণ কর। শ্রীগৌর সুন্দরের মহিমা অদ্ভুত। অদ্যই আমার তা বিশ্বাস হল। দেখলাম শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচল চন্দ্রকে দর্শন করে, ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করছেন ও বহির্গত হচ্ছেন। আমি জগন্নাথের সমীপাগত হলে, গৌরসুন্দর তাঁর দীর্ঘ বাহু উন্নত করে আমায় ডাকছেন ও আলিঙ্গন করছেন। সে আলিঙ্গনে আমি যেন প্রেম-সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি। হায়! সে অসীম কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দরে আমার আজও রতি-মতি হল না—এই বলে শিখি মাহিতি মুরারিকে জড়িয়ে ধরে এবং ভগিনী মাধবীর হাতে ধরে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

এইরূপে জ্যেষ্ঠ শিখি মাহিতি গৌরসুন্দরের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন জানতে পেরে মুরারি মাহিতি ও মাধবী প্রেমাশ্রুপাত করতে লাগলেন। তারপর সকলে মিলে জগন্নাথ দর্শন করতে চললেন। তিনজনে মন্দিরে প্রবেশ করে জগমোহনে মহাপ্রভুকে দর্শন পেলেন। স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমন শিখি মাহিতি দেখতে লাগলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কখনও জগন্নাথে লীন হচ্ছেন আবার বাহির হচ্ছেন। একেবারেই স্তম্ভিত পুলকিত ও বিস্মিত শিখি মাহিতি দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর শ্রীগৌরসুন্দর শিখি মাহিতির নিকবর্ত্তী হয়ে ভুজ যুগল তাঁর স্কন্ধে ধারণ করে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি মুরারির অগ্রজ শিখি মাহিতি? শ্রীগৌরসুন্দরের সেই স্নেহময় উক্তি শ্রবণ করে এবং তাঁর

ভুজস্পর্শ পেয়ে শিখি মাহিতি আনন্দভরে প্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়ে বললেন—"এ সে অধম"। প্রভু তাঁকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন—"তুমি আমার প্রিয়তম জন।" সে দিন থেকে শিখি মাহিতি প্রভু-পরিকরগণের অন্যতম বলে প্রসিদ্ধ হলেন।

শ্রীযদুনাথ দাস কবিরাজ

শ্রীযদুনাথের পিতা শ্রীরত্নগর্ভ আচার্য্য। তিনি ছিলেন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সমসাময়িক ও সহচর। শ্রীহট্ট জেলার একই গ্রামে উভয়ের জন্ম হয়েছিল। এঁদের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এইরূপ বর্ণনা আছে—

রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী জন্ম এক গ্রাম।।
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ-কবিচন্দ্র।।
ভাগবত পরম আদরে দ্বিজবর।
ভাগবত-শ্লোক পড়ে করিয়া আদর।।
ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম আবেশে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি করিল প্রবেশে।।

(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১।২৯৬-৩০০)

শ্রীকৃষ্ণানন্দ, শ্রীজীব ও শ্রীযদুনাথ তিন ভাই। শ্রীযদুনাথ শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ ছিলেন।

যদুনাথ কবিচন্দ্র—প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ-যাঁহারে সদয়।।

(চৈতন্য ভাগবত অন্ত্য ৫।৭৩৫)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর প্রতি সম্মান করে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন—

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ।।

শ্রীজীবও নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত ছিলেন। শ্রীযদুনাথের কবিচন্দ্র উপাধি দ্বারা তিনি যে বহু গীতাদি রচনা করেন ইহাতে প্রতীত হয়। কালস্রোতে সব লুপ্ত প্রায়। কিছু কিছু গীত, গীতি-সাহিত্য মাত্র প্রচলিত আছে। তাঁর ভাষা বড় সুমধুর, সরল, হৃদয়াকর্ষী ছিল।

পদাবলী গৌর বিষয়ক

গৌর বরণ তনু, সুন্দর সুধাময়,
সদয় হৃদয় রসালয়ে।
কুন্দ করবীর, গাঁথন থর থর,
দোলনি বনি বন মালয়ে।।
গৌর বামে বর, প্রিয় গদাধর,
নিগূঢ় রস পরকাশয়ে।
জগমন্ডল ঐছে, ভাসল প্রেমে,
গদ গদ ভাসয়ে।।
নদীয়া নগরে, চাঁদ কত কত,
দূরে গেও আঁধয়ারে।
কতিহুঁ উয়ল, দীপ নিরমল,
ইবেহুঁ নামই না পাররে।।
গৌর-গদাধর, প্রেম-সরোবর,
উথলি মহীতল পুররে।
দাস যদুনাথ, বিধি বিড়ম্বিত,
পরশ না পাইয়া ঝুররে।।

— — —

গদাধর নরহরি, করে ধরি গৌরহরি,
প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।
কহিলে না হয় তাহু, ফুকরি ফুকরি পহুঁ,
বৃন্দা বিপিন গুণ গায়।।
নিজ লীলা নিধুবন, সোঙারিয়া উচাটন,
কান্দে পহু যমুনা বলিয়া।
নয়ানে বহিছে কত, সুরধুনী ধারা মত,
দর দর শ্রীবুক বহিয়া।।
সুবলের শুদ্ধ সখ্য, বৃন্দাদেবীর প্রিয় বাক্য,
ললিতার ললিত সুলেহ।
বিশাখার প্রেম কথা, সোঙরি মরম ব্যথা,
কহি কহি না ধরয়ে দেহ।।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গোবর্দ্ধন গিরি,
কাঁহা মোর বংশী পীতবাস।
প্রেমসিন্ধু উথলিল, জগত ভরিয়া গেল,
না বুঝিল যদুনাথ দাস।।

— ঃঃ০ঃঃ —

অপরূপ চাঁদ উদয়, নদীয়া পুরে,
তিমির নাহিরে ত্রিভুবনে।
অবনিতে অখিল, জীবের শোক নাশল,
নিগম নিগূঢ় প্রেমদানে।।
আরে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর রায়।
ভকত হৃদয়, কুমুদ পরকাশল,
অকিঞ্চন জীবের উপায়।।

শেষ শঙ্কর, নারদ চতুরানন,
নিরবধি যাঁর গুণ গায়।
সো পহু নিরুপম, নিজ গুণ শুনইতে,
আনন্দে ধরণী লোটায়।।
অরুণ নয়নে, বরুণ আলয়,
বহয়ে প্রেমসুধা জল।
যদুনাথ দাস বলে, যেন সোনার কমলে,
প্রসবিছে মুকুতার ফল।।

শ্রীরাধার রূপ বর্ণন—

কষিত কনয়া কমল কিরে।
থীর বিজুরি নিছনি দিয়ে।।
কিরে সে সোন চম্পক ফুল।
রাই বরণে জলদ তুল।।
তাহি কিরণ ঝলকে ছটা।
বদনে শরদ বিধুর ঘটা।।
চাঁচর চিকুর সিথাঁয় মণি।
দশন কুন্দ কলিকা জিনি।।
অরুণ অধর বচন মধু।
অমিয়া উগারে বিমল বিধু।।
চিবুকে শোভয়ে কস্তুরি বিন্দু।
কনক কমলে বেড়ল ভৃঙ্গু।।
গলায়ে মুকুতা দোসৃতি ঝুরি।
সুরধুনী বেড়ি কনক গিরি।।

শঙ্খ ঝলমলি দুবাহু দোলা।
কিরে সরু সরু শশীর কলা।।
কর কোকনদ নখর মণি।
অঙ্গুলে মুদরি মুকুর জিনি।।
খিন মাঝখানি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
বান্ধল কিঙ্কিণি নিতম্বভরে।।
রাম রম্ভা ডরু চরণ শোভা।
কি হয়ে অরুণ কিরণ আভা।।
নখর মুকুর অঙ্গুলা বলি।
জনু সারি সারি চম্পক কলি।।
নীল ওড়নি ঢাকিল তনু।
সববিধু রাহু ঝাপিল জনু।।
অলপে অলপে তেয়াগে তায়।
যদুনাথ চিতে ঐছন ভায়।।

— - ঃঃ - —

বিরহ

শিশিরক শীত সবহুঁ দূরে গেল।
বিরহ অনলে জনু নিদাঘ সম ভেল।।
দহই কলেবর শীতল পবনে।
কো পাতিয়ায়ব ইহ সব বচনে।।
জর জর অন্তর বিরহক ধূমে।
জাগরে জাগি দূরে রহু ঘুমে।।
বচন কহই যব জনু পরলাপ।
কহই না পারিয়ে যতহু সন্তাপ।।

কোই কহই তোহে রসময় কান।
তুহুঁ সম কঠিন জগতে নাহি আন।।
তোহারি বচনে আর নাহি পরতীত।
কুলবতী করু জনি তোহে পিরীত।।
যতহুঁ বিরহ দুঃখ কি কহব হাম।
দাস যদুনাথ তোহে পরণাম।।

আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম।
ভাবিতে ভাবিতে ভেল রাধার বরণ।।
রা বোল বলিতে পূর্ণিত কলেবর।
ধা বোল বলিতে বহে নয়নের জল।।
ধারা ধরণী সঘনে বহি যায়।
পুলকে পূরিত তনু জপে নাম তায়।।
মন নিমগন গৌরী ভাবের প্রকাশ।
একমুখে কি কহিব যদুনাথ দাস।।

শ্রীরাঘব পণ্ডিত

মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে থেকে পানিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে এলেন।

কতদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পাণিহাটি রাঘব মন্দিরে।।
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত।।
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত।

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৫-৭৭)

শ্রীরাঘব পণ্ডিত শ্রীবিগ্রহগণের সেবা করছেন, আর ভাবছেন শ্রীগৌরসুন্দর কখন শুভাগমন করবেন। ঠিক এমন সময় শ্রীগৌরসুন্দর "হরেকৃষ্ণ" "হরেকৃষ্ণ" বলতে বলতে রাঘব ভবনে প্রবেশ করলেন। কণ্ঠস্বর শুনে শ্রীরাঘব পণ্ডিত বুঝতে পারলেন প্রভু এসেছেন, তৎক্ষণাৎ সেবা ছেড়ে গৃহের বাইরে এলেন। দেখলেন শ্রীমহাপ্রভু পরিকরসহ বিদ্যমান। তখনই আনন্দে আত্মহারা হয়ে শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে লুটিয়ে পড়লেন। শ্রীরাঘব পণ্ডিতকে মহাপ্রভু প্রেমার্দ্রচিত্তে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন। উভয়ের নয়ন জলে উভয়ে সিক্ত হতে লাগলেন।

শ্রীমহাপ্রভু বললেন—রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসার পর সমস্ত শ্রম

দূর হল। গঙ্গা মজ্জনে যে ফল, রাঘবের ঘরে এসে তা পেলাম।

মহাপ্রভু বললেন—আজ রাঘব পণ্ডিতের ঘরে উৎসব হবে। রাঘব পণ্ডিত তাড়াতাড়ি রান্না চাপিয়ে দিলেন। রাঘবের গৃহে সাক্ষাৎ রাধা ঠাকুরাণী রন্ধন করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে শ্রীরাঘব পণ্ডিত বহু প্রকার জিনিস তৈরী করলেন। শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগালেন। অনন্তর অন্তঃপুরে মহাপ্রভুর ভোজনের ব্যবস্থা করলেন, সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুও বসলেন। দুই ভাই আনন্দে ভোজন করতে করতে বলতে লাগলেন—

* * রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক।।
শাকেতে প্রভুর প্রীত রাঘব জানিয়া।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া।।

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।৮৯-৯০)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে শ্রীরাঘবের রন্ধনের প্রশংসা করতে করতে মহাপ্রভু ভোজন সমাপ্ত করলেন। শ্রীমুখ প্রক্ষালন করে বাইরে বসলেন, এ সময় শ্রীগদাধর দাস এলেন। প্রভুকে প্রণাম করতেই প্রভু তাঁকে বহু কৃপা করলেন। সেক্ষণে পুরন্দর পণ্ডিত ও পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরও এলেন। ক্ষণকাল মধ্যে এলেন শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য। তিনি পরম বৈষ্ণব। মহাপ্রভু হাসতে হাসতে তাঁদের সঙ্গে বিবিধ বার্ত্তালাপ করতে লাগলেন।

পানিহাটি গ্রামে ভক্তগণ একে একে আগমন করতে লাগলেন। রাঘব পণ্ডিতের ভবনে মহোৎসব চলতে লাগল। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভগিনী শ্রীদময়ন্তী দেবী তিনি মহাপ্রভুর একান্ত সেবা পরায়ণা।

মহাপ্রভু এক দিন রাঘব পণ্ডিতকে বলতে লাগলেন—রাঘব আমার দ্বিতীয় দেহ শ্রীনিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ আমায় যা করায় আমি তাই করি। আমার

যা কিছু নিগূঢ় লীলা সব নিত্যানন্দের দ্বারা করে থাকি। এ-সব রহস্য পরে তুমি জানতে পারবে। যে বস্তু মহা-যোগেশ্বরদেরও দুর্ল্লভ, শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় তা' তোমরা অনায়াসে পাবে। শ্রীরাঘব পণ্ডিতকে এ সব কথা বলে মহাপ্রভু বরাহনগরে শ্রীভাগবত আচার্য্যের ঘরে এলেন।

পানিহাটি ত্যাগ করবার আগে মহাপ্রভু ভক্ত মকরধ্বজ করকে বললেন—তুমি রাঘব পণ্ডিতের সেবা করবে, তাহলে তাঁর প্রীতি করা হবে।

কিছু দিন পরে সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঘরে এলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি রাঘব পণ্ডিতের স্বাভাবিক প্রেম। পানিহাটিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীমকরধ্বজ কর সপরিবারে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবা করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশ মত কীর্ত্তন বিলাসের জন্য ভক্তগণ পানিহাটিতে মিলিত হতে লাগলেন। মহাগায়ক শ্রীমাধব ঘোষ এলেন। আর এলেন বাসু ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ। তিন ভাই সঙ্গীত সম্রাট।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহানৃত্য ও সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় রাঘব ভবন আনন্দময় হয়ে উঠল। সংকীর্ত্তন করতে করতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু খট্টার উপর বসে আদেশ করলেন—আমার অভিষেক কর। তখন শ্রীরাঘব পণ্ডিত ভক্তগণসহ মহানন্দে অভিষেক কার্য্য আরম্ভ করলেন। গন্ধ চন্দন পুষ্প দীপ নৈবেদ্য ও সহস্র কলস জলের ব্যবস্থা করা হল। অভিষেক আরম্ভ হল। কলসে কলসে জল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিরে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করতে করতে ঢালতে লাগলেন। তারপর নব বস্ত্রাদি পরিয়ে তাঁর শ্রীঅঙ্গে গন্ধ চন্দন লেপন করা হল। গলদেশে দিব্য বনমালা প্রদান করা হল। শ্রীরাঘব পণ্ডিত শিরে ছত্র ধারণ করলেন, ভক্তগণ দুই পার্শ্বে চামর ব্যজন করতে লাগলেন। ভক্তগণের আনন্দ কোলাহলে চারিদিক্ পূর্ণ হল। শ্রীনিত্যানন্দের প্রেম-দৃষ্টিপাতে দিগ্বিদিক

প্রেমময় হয়ে উঠল। এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাঘব পণ্ডিতকে বললেন— কদম্বের মালা পরব, কদম্ব পুষ্প আমার বড় প্রিয়।

শ্রীরাঘব পণ্ডিত বললেন প্রভো! কদম্ব পুষ্প ত এ সময় পাওয়া যায় না।

বাগিচায় গিয়ে দেখ, পাবে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন।

রাঘব পণ্ডিত বাগিচায় এলেন, দেখলেন আশ্চর্য্য ব্যাপার। জম্বির বৃক্ষে অপূর্ব্ব কদম্ব ফুল ফুটে আছে। পণ্ডিত আনন্দে বাহ্যদশা শূন্য হলেন। তৎক্ষণাৎ ফুল তুলে মালা গাঁথলেন। মালা নিয়ে এলেন শ্রীনিত্যানন্দ স্থানে এবং হরিধ্বনি করতে করতে সে মালা পরালেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গলদেশে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা দর্শন করে ভক্তগণ পরম বিস্ময়ান্বিত হলেন। সে দিন আর এক লীলা করলেন নিত্যানন্দ প্রভু। ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে বসে আছেন অকস্মাৎ সকলেই দমনক পুষ্পের গন্ধ পেতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন—আপনারা কিসের গন্ধ পাচ্ছেন?

অপূর্ব্ব দমনক ফুলের গন্ধ পাচ্ছি, ভক্তগণ বললেন। নিত্যানন্দ প্রভু হাসতে হাসতে বললেন, আজিকার একটী রহস্যের কথা আপনারা শুনুন।

চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন।।
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্বন করিয়া রহিলা।।
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে।
চতুর্দ্দিকে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে।।

তোমা সবাকার নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে।।
(চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৫।২৯৪-২৯৭)

ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কথা শ্রবণ করে পরম চমৎকৃত হলেন।

পানিহাটিতে শ্রীরাঘব ভবনে কত অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিহার করেছিলেন।

কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে।।
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।৩৬০)

অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ রায় এইভাবে পানিহাটি রাঘব ভবনে আনন্দভরে কত দিব্য-লীলা প্রকট করে ভক্তগণকে সুখী করলেন।

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক কাশী বাসী একদন্ডী শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করাতেন। প্রথমতঃ মহাপ্রভুকে গৌর দেশবাসী ভাবুক সন্ন্যাসী বলে বহু অবজ্ঞা করতেন।

শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী—'ভাবুক'।
কেশব ভারতী শিষ্য, লোক প্রতারক।।
চৈতন্য নাম তাঁর ভাবুকগণ লঞা।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাঞা।।
যেই তাঁরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন বিদ্যা যে—দেখে সে মোহে।।
সার্ব্বভৌম, ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল।।
'সন্ন্যাসী'—নামমাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
'কাশীপুরে' না বিকাবে তাঁর-ভাবকালি।।

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭।১১৬-১২০)

অতঃপর শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ গৃহে যখন মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁর অমিত অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য বলে তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হয়ে তাঁর চরণে অবনত হয়ে পড়েন।

বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহাতেজোময় বপু কোটিসূর্য্যাভাস।।

প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যসীর মন।
উঠিল সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন।।
(চৈঃ চঃ আদি ৭।৬০-৬১)

সেই মহানিন্দুক প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর অদ্ভুত অঙ্গতেজ দর্শন করে শিষ্যগণ সহ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অনন্তর প্রকাশানন্দ শিষ্যগণ সহ প্রভুর সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে নানা বাদ বিতণ্ডা আরম্ভ করলেন। প্রভু বাস্তব সিদ্ধান্ত বাণে সবকিছু খণ্ড বিখণ্ড করে ফেললেন। শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বাত্মক ভাবে বেদান্ত সূত্রের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করলেন।

এই মত সর্ব্ব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া।।
বেদময় মূর্ত্তি তুমি—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন।।
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১৪৭-১৪৮)

প্রকাশানন্দ সরস্বতী শিষ্যগণ সহ প্রভুর চরণে শরণ নিলেন। প্রভু সকলের অপরাধ ক্ষমা করলেন। প্রভুর সে করুণা দর্শন করে সন্ন্যাসীগণ কৃষ্ণ নামে পাগল হলেন। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ।" কাশীতে মহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণ নিয়ে মহা হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন।

বাহু তুলি' প্রভু বলে,—বল হরি হরি।
হরি ধ্বনি করে লোক স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি।।
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১৫৯)

প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে প্রভু এইভাবে কৃপা করেছিলেন।

শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—ভক্তি অধিকারী।
মথুরাগমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী।।
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৪৬)

মহাপ্রভু যখন মথুরা বৃন্দাবন গমন করেছিলেন তখন তিনি ব্রহ্মচারীরূপে প্রভুর সঙ্গে গিয়েছিলেন। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রজ-লীলায় ছিলেন মধুরেক্ষণা নাম্নী গোপী। তিনি রন্ধন বিদ্যায় সুনিপুণা ছিলেন।

দ্বিতীয় বার শান্তিপুরে এসে কানাই নাটশালাদি দর্শন করে এবং অদ্বৈত ভবনে জননীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাপ্রভু যখন পুরী যাত্রা করেন তখন সঙ্গে ছিলেন—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এবং দামোদর পণ্ডিত। পুরীধামে এসে মহাপ্রভু কয়েকদিন ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন নৃত্যাদি উৎসব করলেন। একদিন রাত্রিকালে কোন ভক্তকে না জানিয়ে তিনি শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে ছিলেন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও এক ভৃত্য ব্রাহ্মণ। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ।

মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রা করবার সময় বললেন—সঙ্গে কাকেও নেব না—একাকী যাব। শুনে ভক্তগণ বড়ই চিন্তিত হলেন, এ দুর্গম পথ দিয়ে প্রভু একা কি করে যাবেন? স্বরূপ দামোদর বললেন—তুমি যদি

অন্য কাকেও সঙ্গে না নাও, নিওনা, কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলভদ্রকে ত নাও। আমাদের এই অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করবার সাধ্য কার? বলভদ্র তোমার রন্ধনাদি করে দিবে, তাঁর সঙ্গে যে একজন ভৃত্য ব্রাহ্মণ আছে তাকেও নাও। তোমার জলপাত্র ও বস্ত্রাদি নিয়ে চল্‌বে এবং তোমার সেবা করবে।

শ্রীস্বরূপ দামোদর ও ভক্তগণের অনুরোধ প্রভু রক্ষা করলেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও সেবক ব্রাহ্মণটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে না দেখে হাহাকার করতে লাগলেন। সকলে খোঁজ করতে উদ্যত হলে শ্রীস্বরূপ দামোদর তাঁদের নিষেধ করলেন।

মহাপ্রভু রাজপথ ছেড়ে বনপথ দিয়ে চলতে লাগলেন। ক্রমে ঝারিখণ্ড (ছোটনাগপুর) এলেন। বনপথে দেখলেন—দলে দলে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, সিংহ ও শূকর প্রভৃতি ঘোরাফেরা করছে। মহাপ্রভু কীর্ত্তন করতে করতে চলছেন। তারাও পথ ছেড়ে দিয়ে প্রভুর পাশে পাশে চলছে। মধুর কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করে এবং সাক্ষাৎ আনন্দ-মূর্ত্তি প্রভুকে দর্শন করে তারা হিংস্র স্বভাব ভুলে গেল। এই সব দেখে শ্রীবলভদ্র ও ভৃত্য ব্রাহ্মণ অবাক। প্রভুর একি অচিন্ত্য লীলা! চলতে চলতে হঠাৎ প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শে সিংহ ও ব্যাঘ্র যেন প্রেমে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। তৎকালে প্রভু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে' নাচতে বললে, তারা 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে আরম্ভ করল। প্রভু এক ব্যাঘ্রকে বললেন— 'কৃষ্ণ' বলে নাচ, অমনি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে লাগল।

প্রভু কহে—কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭।২৯)

এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে শ্রীবলভদ্র ও ভৃত্য ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হয়ে

গেলেন। মহাপ্রভুর কি অচিন্ত্য লীলা।

বনে এক নদীতে মহাপ্রভু স্নান করছেন, তখন একদল মত্ত হস্তীও সেখানে স্নান করতে আসে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মহাপ্রভু তাঁদের অঙ্গে জল ছিটাতে লাগলেন।

সেই জল বিন্দু কণা লাগে যার যার।
সেই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে প্রেমে নাচে গায়।।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭।৩২)

মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু-স্পর্শ পেয়ে হস্তী সকল 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে লাগল। কোন কোনটা নদীতটে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে গড়াগড়ি দিতে লাগল। প্রভুর এইসব লীলা দেখে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য একেবারেই চমৎকৃত হয়ে গেলেন।

মহাপ্রভু চলেছেন মধুর কীর্ত্তন করতে করতে, সেই মধুর কীর্ত্তন ধ্বনি শুনে আকৃষ্ট চিত্তে মৃগ-মৃগীগণও প্রভুর শ্রীঅঙ্গঘ্রাণ নিতে নিতে সঙ্গে চলতে লাগল। তাদের দেখে প্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে তাদের অঙ্গে হাত বুলাতে লাগলেন। কৃষ্ণ বিরহে গোপীগণ যে গান গেয়েছিলেন মৃগ-মৃগীগণকে দেখে তাদের কণ্ঠ জড়িয়ে প্রভু সেই সব গান গাইতে লাগলেন। প্রভুর মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনে ময়ূর-ময়ূরী মেঘধ্বনি ভ্রমে প্রভুকে ঘিরে নৃত্য করতে লাগল। প্রভুর মধুর কণ্ঠধ্বনিতে বৃক্ষশাখে কোকিল প্রভৃতি পক্ষীগণ চিত্রবৎ অবস্থান করতে লাগল। স্থাবর বৃক্ষ লতাও তাঁর মধুরকণ্ঠ ধ্বনিতে যেন পুলকিত হয়ে উঠল। বৃক্ষ সকল অশ্রুধারাবৎ মধুধারা বর্ষণ করতে লাগল। নদীসকল আনন্দ হিল্লোলরূপী উদ্বেলিত করে প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করতে চাইল। মহাপ্রভুর অচিন্ত্য শক্তিতে ঝারিখণ্ডের বৃক্ষলতা পশু-পক্ষী সকলেই যেন প্রেমভাব ধারণ করল।

সেই ঝারিখণ্ডের বনে কোন স্থানে পাষণ্ডী প্রভৃতি অসভ্য লোকদেরও

মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম দিয়ে শুদ্ধ করলেন। মহাপ্রভু যে গ্রামের উপর দিয়ে যেতেন এবং যে গ্রামে অবস্থান করতেন সে সব গ্রামের লোকদের প্রেমভক্তি লাভ হত। কেহ যদি প্রভুর শ্রীমুখে একবার কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করত সে নাম তার অন্তরে গভীর রেখাপাত করত। তাকে দেখে অন্য ব্যক্তিও কৃষ্ণ নামে পাগল হত।

ঝারি-খণ্ডের বন-প্রদেশে শাক-মূলাদি সংগ্রহ করে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করতেন, মহাপ্রভু কত আনন্দভরে তাই ভোজন করতেন। মহাপ্রভুর সেবায় উপযোগী যেখানে যে জিনিস বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পেতেন তা যত্ন করে নিয়ে নিতেন। চলতে চলতে পথে গ্রাম পাওয়া গেলে কোন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ গৃহে তাঁরা মধ্যাহ্নে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং রাত্রিবাস করতেন। যে গ্রামে বিপ্র মিলত না, সেই গ্রামে শূদ্র মহাজনের বাড়ীতে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করতেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভুর প্রিয় স্নিগ্ধ সেবক ছিলেন। দু-চার দিনের আন্দাজ চাল ডাল সর্ব্বদা তিনি সঙ্গে রাখতেন। বন্য প্রদেশে, যেখানে লোকের বসতি নাই, বৃক্ষমূলে রান্না করতেন। ভৃত্য ব্রাহ্মণটি জলপাত্র, প্রভুর যাবতীয় সেবার দ্রব্য মাথায় করে চলতেন। শীতকালে পার্ব্বত্য দেশে যেতে যেতে নির্ঝরের উষ্ণোদকে প্রভু দিনে তিনবার স্নান করতেন। সকাল সন্ধ্যায় অগ্নি জ্বালিয়ে তার তাপে শ্রীঅঙ্গ উষ্ণ করতেন।

শ্রীবলভদ্রের সেবা দেখে সুখে প্রভু একদিন বলতে লাগলেন—ভট্টাচার্য্য, তোমার প্রসাদে আমার এত সুখ হল। কত দেশ ভ্রমণ করেছি, কিন্তু কোথাও কোন দুঃখ অনুভব করি নাই। কৃষ্ণ বড় কৃপালু, আমাকে বহু কৃপা করলেন। বন পথে আমাকে এনে বড় সুখ দিলেন।

ভট্টাচার্য্য বললেন—প্রভো! তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দয়াময় আমি অধম জীব, আমার প্রতি সদয় হয়ে আমাকে যে সেবার অধিকার দিয়েছ এই তোমার অহৈতুকী দয়া।

মহাপ্রভু চল্‌তে চল্‌তে ক্রমে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে পৌঁছালেন। তখন শ্রীতপন মিশ্র সেই ঘাটে স্নান করছিলেন। তপন মিশ্র পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাবতী নদীর তটে বাস করতেন। মহাপ্রভু অধ্যাপক বেশে যখন পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাবতী তটে গমন করেন, তখন তপন মিশ্র প্রভুর কৃপা-উপদেশ পেয়েছিলেন ও তাঁর নির্দ্দেশ মত কাশীবাসী হয়েছিলেন।

তপন মিশ্র ইতি পূর্ব্বে জানতে পেরেছিলেন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। অকস্মাৎ প্রভুকে দেখে বিস্ময়ান্বিত হলেন, অবাক ভাবে তাকিয়ে রইলেন, ভাবলেন—ইনি নিশ্চয় অধ্যাপক শিরোমণি শ্রীনিমাই পণ্ডিত হবেন। তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে মিশ্র মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করলেন, মহাপ্রভু মিশ্র বলে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। মিশ্র আনন্দে প্রভুর চরণে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। মিশ্রকে প্রভু বিবিধ কুশল-বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করলেন। উভয়ে উভয়ের মিলনে বড়ই আনন্দিত হলেন। তারপর তপন মিশ্র প্রভুকে বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করালেন। শ্রীগৌর সুন্দর প্রেম পুলকিত অঙ্গে নৃত্য-গীতাদি করলেন। অনন্তর তপন মিশ্রের গৃহে শুভাগমন করলেন। মিশ্র সগোষ্ঠী মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে দণ্ডবৎ করে পাদ ধৌতাদি করিয়ে সেই জল শিরে ধারণ ও পান করলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে তপন মিশ্র বহু সম্মান প্রদর্শন করলেন।

কয়েকদিন কাশীতে অবস্থান করবার পর প্রভু বিদায় নিলেন। প্রভুর বিরহে তপন মিশ্র আদি ভক্তগণ কাতর হয়ে পড়লেন। প্রভু তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে গৃহে পাঠিয়ে প্রয়াগের দিকে চলতে লাগলেন। প্রয়াগে এলেন, ত্রিবেণীতে স্নান করে শ্রীবেণীমাধব বিগ্রহ দর্শন করলেন। তথায় বহু নৃত্য-গীতাদি করলেন। যমুনার নীল জল দর্শন করে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি হল, প্রেমোন্মত্ত হয়ে যমুনায় ঝাঁপ দিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও ভৃত্য ব্রাহ্মণটী তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে তুললেন। কয়েকদিন প্রয়াগ ধামে থাকার পর, মথুরায় জন্মস্থানে এলেন। সেখানে যে অদ্ভুত নৃত্য-গীতাদি করলেন তা দেখে মথুরাবাসিগণ পরম

চমৎকৃত হলেন। আদিকেশব দর্শন করলেন, সেবক প্রসাদী মালা প্রভুর কণ্ঠে দিলেন। মথুরা নগরে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ গৃহে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। মথুরার চব্বিশ ঘাট দর্শন করলেন। তারপর প্রবেশ করলেন গোপেন্দ্র নন্দনের লীলা-ভূমি দ্বাদশ বন যুক্ত শ্রীবৃন্দাবনে। গাভীগণ প্রভুকে পেয়ে আনন্দে হুঙ্কার দিতে লাগলেন। বাৎসল্য-প্রীতিতে প্রভু তাদের গলা জড়িয়ে ধরলেন। তারা অঙ্গ লেহন করতে লাগল। বলভদ্র ভট্ট দেখে অবাক! মৃগ মৃগিগণ তাঁর অঙ্গের ঘ্রাণ নিতে লাগল ও ময়ূর-ময়ূরীগণ আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। শুক-শারী মধুর স্বরে শ্লোক পাঠ করতে লাগল। প্রভুর করস্পর্শে তরু-লতাগণ যেন পুলকরূপ নব পত্রোদ্গম ও হাসিরূপ ফুলভারে তাঁর চরণ স্পর্শ করতে লাগল। প্রভুও প্রতিটি তরুলতাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। আবার সেই প্রাণবন্ধু যেন ফিরে এসেছেন। বন্ধু দেখে যেমন বন্ধুর আনন্দ হয়, সেরূপ গৌরকৃষ্ণকে দর্শন করে বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম সকলে আনন্দে বিহ্বল হল। কৃষ্ণ যেন আবার বৃন্দাবনে উদয় হয়েছেন। তাই চতুর্দ্দিকে কেবল আনন্দ কোলাহল। বন্য মৃগ-মৃগীগণের কণ্ঠ ধরে প্রভু প্রেমে রোদন করতে লাগলেন। তারাও প্রভুর করুণ রোদন দেখে রোদন করতে লাগল। প্রভু শুক-শারীকে বললেন—কৃষ্ণ-গুণ বর্ণন কর। আনন্দে শুক-শারী কৃষ্ণ-গুণ বর্ণন করতে লাগল। তারপর ময়ুর-ময়ূরীগণ এসে প্রভুকে ঘিরে নাচতে লাগল, ময়ূরের কণ্ঠ নিরীক্ষণ করে প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হল, তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। বলভদ্র সাবধানে প্রভুকে কোলে ধারণ করলেন। ভৃত্য ব্রাহ্মণ যমুনা থেকে জল এনে প্রভুর মুখে ছিটা দিতে লাগলেন। কর্ণে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম করলে তাঁর চৈতন্য আস্তে আস্তে ফিরে এল। শ্রীবৃন্দাবনে এসে প্রভুর প্রেমাবেশ চতুর্গুণ বেড়ে উঠল। বৃন্দাবনের কোন স্থানে রোদন, কোথাও আনন্দে নৃত্য, কোথাও কৃষ্ণবিরহে বিরহিণী রাধার ন্যায় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হতে লাগলেন। বলভদ্র ভট্ট সাবধানে প্রভুর সেবা করতে লাগলেন।

আরিট গ্রামে এলেন। সেখানকার লোকদের কাছে রাধাকুণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কিছু বলতে পারল না। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু এক ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে স্নান করলেন, বললেন—এই সেই রাধাকুণ্ড। তারপর সেই কুণ্ডের স্তব পাঠ করতে লাগলেন। "গোপীদের মধ্যে শ্রীরাধা ঠাকুরাণী যেমন শ্রেষ্ঠা তেমনি তাঁর কুণ্ডও পরমা আরাধ্যা।" কুণ্ডের মৃত্তিকা দিয়ে প্রভু তিলক করলেন। তাঁর আদেশে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কিছু মৃত্তিকা নিয়ে নিলেন। ক্রমে কুসুম সরোবর, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি দর্শন করলেন। গিরিরাজকে "হরিদাসবর্য্য" বলে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। সে দিন ব্রহ্মকুণ্ডে এসে বলভদ্র রান্না করলেন, রাত্রে শ্রীহরিদেবের মন্দিরে প্রভু বহু নৃত্য-গীতাদি করলেন। মহাপ্রভুর একান্ত ইচ্ছা হল শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপাল দর্শন করবার, কিন্তু গোপাল রয়েছেন গোবর্দ্ধন গিরিরাজের উপর। তিনি গিরিরাজ চড়বেন না। দর্শন কিরূপে হবে? সেই রাত্র গোবর্দ্ধনধারী হরি এক ছল করে গাঠুলি গ্রামে এলেন। সেখানে মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনধারীকে মহানন্দে দর্শন করলেন। তিনি তিন দিন গোপালদেবের সামনে নৃত্য-গীত করলেন। অতঃপর প্রভু বিদায় হলেন। গাঠুলি গ্রাম হতে গোপাল দেবও নিজস্থানে গেলেন।

মহাপ্রভু পুনঃ বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। সেখানে যমুনার পরপার থেকে কৃষ্ণদাস রাজপুত এলেন, প্রভুর দর্শনে। প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন — তুমি কে? কৃষ্ণদাস রাজপুত বললেন—আমি অধম গৃহস্থ জাতিতে রাজপুত।

মহাপ্রভু—তুমি কি চাও?

কৃষ্ণদাস—বৈষ্ণব কিঙ্কর হতে চাই।

মহাপ্রভু—তুমি কেমনে জানলে যে আমি এখানে এসেছি?

কৃষ্ণদাস—শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম আপনি বৃন্দাবনে আছেন, তাই প্রাতে ছুটে এলাম।

মহাপ্রভু—কৃষ্ণদাস! কৃষ্ণ তোমাকে এনেছেন। এই বলে প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণদাস অক্রূর তীর্থে এলেন। সেখানে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুতকে অবশিষ্ট পাত্র দিলেন। পত্নী-পুত্র ও গৃহত্যাগ করে কৃষ্ণদাস প্রভুর সঙ্গে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হয়েছেন বলে সর্ব্বত্র গুজব রটে গেল। একদিন অক্রূর তীর্থ থেকে লোক এল বৃন্দাবনে। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে তোমরা এসেছ? তারা বলল কালিয়দহ তীর্থ থেকে। কালিয়দহে কৃষ্ণ পুনঃ প্রকট হয়ে কালিয়নাগের শিরে নৃত্য করছেন। তিন রাত্রি ধরে সকলে দর্শন করেছে। এ কথা শুনে মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন। এই ভ্রান্ত বাক্যে সরলমতি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যেরও মতিভ্রম হল। তিনি সন্ধ্যাকালে প্রভুর কাছে বললেন—আমি কৃষ্ণ দর্শন করতে যাব।

মহাপ্রভু— কোথায় কৃষ্ণ দর্শন করতে যাবে?

ভট্টাচার্য্য—কালিয়দহে।

মহাপ্রভু— মূর্খের বাক্যে মূর্খ হলে? তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি। তুমি কোন বিবেচনা করতে পারলে না? কলিকালে কৃষ্ণ দর্শন হয় না। মূর্খ লোক নিজের ভ্রমে মিথ্যা কোলাহল করছে। বসে থাক, সব কিছু পরে জানতে পারবে।

প্রাতঃকালে প্রভুর কাছে কালিয়দহ হতে কোন লোক এল, প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণ দেখলে?

লোকটি বললে— কোথায় কৃষ্ণ? কৈবর্ত্ত্যগণ নৌকা নিয়ে দেউটী জ্বালিয়ে দহের জলে মাছ ধরে, দূর থেকে লোকের ভ্রম হয়। নৌকাকে কালিয়নাগ জেলেটিকে কৃষ্ণ ও দীপটিকে মণি মনে করে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-উদয় ঠিক, কৃষ্ণকে লোকে দেখছে—তাও ঠিক। কিন্তু

ভ্রমবশতঃ কৃষ্ণকে কৃষ্ণ না বলে মানুষকে কৃষ্ণ কল্পনা করছে। এবার বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের ভ্রম দূর হল। তিনি খুব লজ্জিত হলেন, প্রভুর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু পুনঃ একদিন অক্রূর ঘাটে এলেন এবং স্নান করলেন। এখানে গোপ-গোপীগণ ব্রহ্মলোক দর্শন করেছিলেন। মহাপ্রভুকে দর্শন করবার জন্য সেখানে দিনরাত লোকের খুব ভিড় হতে লাগল এবং খুব আমন্ত্রণও আসতে লাগল। এ সব দেখে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণদাস রাজপুত ঠিক করলেন প্রভুকে অন্যত্র নিয়ে যাবেন। প্রভুর বৃন্দাবনে অবস্থানের অনেক অসুবিধাও দেখা দিল। তিনি যমুনার জল দেখলে প্রেমোন্মত্ত হয়ে তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন, প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। ভক্তগণ একদিন মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করলেন —এখানে বহু লোক আপনাকে আমন্ত্রণ করতে আসে ও দর্শন করতে আসে। আপনাকে না দেখলে আমাদের বড় জ্বালাতন করে। আমরা অতীষ্ট হয়ে উঠেছি। তাই মনে করি এখান থেকে প্রয়াগ অভিমুখে যাত্রা করলে ভাল হয়, মাঘ মাসও নিকটবর্ত্তী হয়েছে।

বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে মহাপ্রভুর ইচ্ছা হচ্ছিল না, তথাপি ভক্তগণের ইচ্ছায় বৃন্দাবন থেকে বিদায় নিলেন। ক্রমে চললেন প্রয়াগের দিকে। যেতে যেতে পথে এক বৃক্ষতলে প্রভু বসলেন বিশ্রামের জন্য। সেকালে রাখাল বালকগণের বংশীধবনি শুনে প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হল। তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে লাগল, ভক্তগণ সাবধানে তাঁকে কেহ হাওয়া করতে লাগলেন, কেহ জল দিতে লাগলেন ও কেহ কোলে করে রইলেন। দশজন পাঠান সৈন্য সেইপথ দিয়ে যাচ্ছিল, প্রভুর মূর্চ্ছা দশা দেখে তারা অশ্ব থেকে নেমে, চারজন ভক্তকে চোর জ্ঞানে বন্দী করল।

ভট্টাচার্য্য ও ভৃত্য ব্রাহ্মণটি ত' ভয়ে কাঁপতে লাগল। সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রাজপুত তারা সে-দেশেরই অধিবাসী, তারা ভয় করে না। কৃষ্ণদাস

রাজপুত বলতে লাগলেন—আমি যদি হাঁক মারিতো তিনশত তুড়কধারী এখনি আসবে। পাঠান সৈন্যগণ বলল তোমরা চোর। এই সন্ন্যাসীর কাছে অনেক ধনরত্ন ছিল, তোমরা বিষ খাইয়ে সব হরণ করেছ। কৃষ্ণদাস বললেন আমরা চোর নহি, তোমরা চোর। ইনি আমাদের গুরু, এঁর মৃগীরোগ আছে, মাঝে মাঝে এইরূপ মূর্চ্ছা হয়। তখন আমরা এঁকে রক্ষা ও সেবা করি। তোমরা একটু অপেক্ষা কর, এখনি উনি উঠবেন। ইতিমধ্যে মহাপ্রভু 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠে নৃত্য করতে লাগলেন। তা দেখে পাঠান সৈন্যদের মনে ভয় হল, তাড়াতাড়ি ভক্তদের বন্ধন মোচন করে দিল। সকলে বিস্ময়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যদশা হল, শান্তভাবে বসলেন। পাঠান সৈন্যদের অধ্যক্ষ ছিলেন রাজকুমার বিজলি খাঁন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা এবং উপদেশ চাইলেন। মহাপ্রভু তাঁদের প্রতি অনেক উপদেশ করলেন। প্রভুর করুণায় সমস্ত পাঠানগণ শুদ্ধমতি হলেন, সকলেই প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করলেন, প্রভুও তাদের অহৈতুকী কৃপা করলেন। তারা "পাঠান-বৈষ্ণব" নামে খ্যাত হলেন।

অতঃপর মহাপ্রভু প্রয়াগে এলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুত ও সনোড়িয়া বিপ্রকে মহাপ্রভু নিজ গৃহে যেতে আদেশ করলেন। তাঁরা প্রভুর বিচ্ছেদ ভাবনায় ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু উপদেশ ও আলিঙ্গন দিয়ে তাঁদের বিদায় করলেন। কিছুদিন প্রভু প্রয়াগ ধামে থেকে ত্রিবেণী স্নানাদি করলেন এবং পরে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রভুর দর্শন উৎকণ্ঠায় নীলাচলবাসী ভক্তগণ অতি দুঃখে দিন যাপন করছিলেন, এমন সময় শ্রীমহাপ্রভুর শুভবিজয় দর্শনে আনন্দসাগরে ভাসতে লাগলেন। আবার ভক্তগণেরও প্রভুর মিলন হল। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত লীলাবলী সকল ভক্তদের কাছে বলতে লাগলেন। ভক্তগণ শুনে শুনে সুখসাগরে ভাসতে লাগলেন।

শ্রীভগবান আচার্য্য

শ্রীভগবান্ আচার্য্য হালি শহরে বাস করতেন। তাঁর পিতার নাম শতানন্দ খাঁ। ভগবান্ আচার্য্যের পুত্রের নাম শ্রীরঘুনাথ। ইনি খঞ্জ ছিলেন। ভগবান্ আচার্য্য ছিলেন 'গোপ অবতার'। অতি সরল, মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অনুরক্ত। তিনি হালিশহর ছেড়ে পুরীতে প্রভুর নিকট বাস করতেন। কোন কোন দিন তিনি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতেন। ইনি একবার ছোট হরিদাসের দ্বারা শ্রীমাধবী দেবীর নিকট থেকে মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য চাল আনিয়েছিলেন। ইনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। এঁর হৃদয় সর্ব্বদা সখ্য রসাবিষ্ট হয়ে থাকত। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে সখ্যভাবে অনেক নর্মালাপ করতেন। এই সরল বিপ্রের ছোট ভাইয়ের নাম গোপাল। কাশীতে আচার্য্য শঙ্করের বেদান্ত ভাষ্য পড়ে গোপাল পুরীতে ভগবান্ আচার্য্যের নিকট এল। সকলকে গোপালের মুখে বেদান্ত ভাষ্য শ্রবণ করাবার জন্য ভগবান্ আচার্য্য উদ্গ্রীব হলেন। একদিন তিনি শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভুকে বললেন। এস, গোপালের মুখে বেদান্ত শুনি। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বললেন— বৈষ্ণবের শঙ্কর বেদান্ত ভাষ্য শুনতে নাই। আপনার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, তাই গোপালের মুখে মায়াবাদ ভাষ্য শুনতে উৎসুক হয়েছেন। বৈষ্ণব হয়ে যাঁরা মায়াবাদ ভাষ্য শুনেন তাঁদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, সেব্য-সেবক জ্ঞান থাকে না ও নিজকে ঈশ্বর বলে অভিমান করেন। সেব্য-সেবক ভাবশূন্য কথা শুনলে মহাভাগবতগণের মনে দুঃখ হয়।

ভগবান্ আচার্য্য বললেন—আমাদের চিত্ত কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত আছে। আমাদের মন ফিরবে না।

স্বরূপ-গোস্বামী বললেন—তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে মহাদোষ। মায়াবাদ সিদ্ধান্তে—জীবকে ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরের স্বরূপ অস্বীকার করা হয় ও ভাষ্য শুনলে দুঃখে ভক্তের হৃদয় ফেটে যায়। আপনার অসৎ মায়াবাদ শ্রবণে এত মতি হল কেন? শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কথা শুনে ভগবান্ আচার্য্য লজ্জায় ও ভয়ে নীরব রইলেন। বাসায় ফিরে এলেন। বুঝতে পারলেন গোপালের প্রতি স্নেহবশতঃ এই অসৎ মায়াবাদ শুনতে তাঁর রুচি হয়েছিল। গোপালকে আচার্য্য শীঘ্রই দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

একবার বঙ্গদেশ থেকে একজন ব্রাহ্মণ পুরীতে ভগবান্ আচার্য্যের কাছে এলেন এবং তাঁর স্থানে রইলেন। তিনি আচার্য্যের পরিচিত। ব্রাহ্মণটী পণ্ডিত, তিনি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এক নাটক রচনা করেছেন। একদিন নাটক খানি ভগবান্ আচার্য্যকে ও কতিপয় বৈষ্ণবকে শুনালেন। তাঁরা নাটকের প্রশংসা করলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হল নাটক মহাপ্রভুকে শুনাবেন। একদিন তিনি ভগবান্ আচার্য্যের কাছে ইহা প্রস্তাব করলেন। কিন্তু নিয়ম ছিল যে গদ্য-পদ্য-নাটক প্রভৃতি যে কোন সাহিত্য মহাপ্রভুকে শুনাবার পূর্ব্বে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীকে শুনাতে হবে। তিনি যদি পছন্দ করেন তবে মহাপ্রভু শুনেন। কারণ কোন অপসিদ্ধান্ত কিম্বা রসাভাস দোষ মহাপ্রভু সইতে পারেন না।

একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর নিকট ভগবান্ আচার্য্য বলতে লাগলেন—বঙ্গদেশ থেকে একজন কবি এসেছেন, তিনি আমার পরিচিত। তিনি মহাপ্রভু সম্বন্ধে এক নাটক রচনা করে এনেছেন, আমরা সকলে শুনেছি, বড় সুন্দর হয়েছে। তুমি যদি একবার শুন ও অনুমোদন কর তবে মহাপ্রভুকে শুনাতে পারি।

স্বরূপ কহে, — তুমি 'গোপ' পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজেয় তোমার।।
(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫।১০১)

স্বরূপ গোস্বামী বললেন—আপনি পরম উদার, যে কোন কথা ও শাস্ত্র শুনতে ইচ্ছা করেন। যাদের সাধুসঙ্গ হয়নি, রসতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান নাই, তাদের বর্ণনা কদাপি সুসিদ্ধান্তযুক্ত হয় না। তাতে রসাভাস প্রভৃতি দোষ থাকবেই।

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'।।
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫।১০৭-১০৮)

সৎসঙ্গে ভক্তিরস অনুশীলন করে নাই, ভক্তিশাস্ত্র পড়ে নাই বা ভক্তিরস বিচার শুনে নাই তারা হল গ্রাম্য কবি। তাদের বাক্য ভক্তি রসিকের হৃদয়ে সুখোৎপাদন করতে পারে না।

ভগবান্ আচার্য্য বললেন—তুমি একবার শুনে দেখ, যদি ভাল মনে না কর ত শুনাব না। ভাল মনে কর ত শুনাব। এবার স্বরূপ দামোদর প্রভু স্বীকৃত হলেন। কবিকে ডেকে ভগবান্ আচার্য্য তাঁর কাব্য শুনাতে বললেন। কবি স্বরূপ দামোদর ও অন্যান্য ভক্তগণের সামনে নান্দী শ্লোক পড়তে লাগলেন।

কবি কহে,—'জগন্নাথ' সুন্দর শরীর।
শ্রীচৈতন্য গোসাঞি শরীরী মহাধীর।।
সহজে জড় জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫।১১৪-১১৫)

শ্লোকের অভিপ্রায়—শ্রীজগন্নাথ হলেন শরীর, মহাপ্রভু প্রাণ। জড়

জগতকে চৈতন্য করবার জন্য নীলাচলে বর্ত্তমানে উদিত হয়েছেন। শ্লোক শুনে শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী বললেন মূর্খ অতত্ত্বজ্ঞ এইরূপ বর্ণন করে। শ্রীজগন্নাথকে স্থূলরূপে দর্শন ও মহাপ্রভুকে প্রাণরূপে দর্শন অপরাধজনক কথা। দুই পূর্ণ ব্রহ্ম, দেহ-দেহী অভেদ। ভগবদ্ বিগ্রহকে স্থূল জড় কঠিন পাথর মনে করা মহাপরাধ। ঈশ্বরের দেহ-দেহীতে কোন ভেদ নাই।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত শুনে সকলে স্তম্ভিত হলেন। বললেন শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত সত্য সিদ্ধান্ত, কবির বাক্যে বহু দোষ রয়েছে।

কবি শুনে স্তম্ভিত ও লজ্জিত হয়ে অবনত শিরে বসে রইলেন, তখন শ্রীরূপ গোস্বামী বলতে লাগলেন—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবেত জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ।।
তবেত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্মল।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫।১৩১-১৩৩)

শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর করুণা ব্যঞ্জক বাক্য শুনে বঙ্গদেশের কবি সুখী হলেন। অনন্তর সব ত্যাগ করে মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে পুরীতে রইলেন।

সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি রহিলা নীলাচলে।
গৌর ভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫।১৫৮)

বাস্তবতঃ কবি অতিশয় সরল, হিংসা-মাৎসর্য্যাদি দোষশূন্য ছিলেন।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভক্তগণের চরণে শরণ নিলেন। কবি ভগবান আচার্য্যকে অনুনয় করে বললেন আপনি আমার মহৎ উপকার করেছেন। যদি এই সমস্ত ভক্তের সঙ্গ আমার না হত, চিরকাল আমার জীবনে এইরূপ মহৎ ভুল অপরাধ থেকে যেত।

ভক্ত কালিদাস

কালিদাস শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়া, তাঁর ব্রত ছিল বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট ভোজন করা। গৌড় দেশে যত বৈষ্ণব ছিলেন প্রায় সকলের প্রসাদ তিনি পেয়েছেন।

তিনি বৈষ্ণবের গৃহে উত্তম ভেট প্রদান করে তবে অবশেষ গ্রহণ করতেন। কোন বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট দিতে রাজী না হলে তিনি লুকিয়ে উহা গ্রহণ করতেন।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া।
(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৬।৮)

এইভাবে কালিদাস সমস্ত জীবন বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেছেন।

শ্রীঝড়ু ঠাকুর নামে একজন বৈষ্ণব বাস করতেন। তিনি জাতিতে ছিলেন ভূঁইমালী। বৈষ্ণব যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, সর্ব্বপূজ্য। একদিন কালিদাস তাঁর গৃহে এসে তাঁকে কিছু পাকা আম ভেট দিলেন। ঝড়ু ঠাকুর তাঁকে খুব আদর করে বসালেন। উভয়ে কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করলেন। ঝড়ু ঠাকুর বললেন—আমি নীচ জাতি, আপনার সৎকার কি করে করব? যদি আজ্ঞা করেন কোন ব্রাহ্মণের ঘরে আপনার ভোজনের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কালিদাস বললেন—ঠাকুর! তুমি আমার জন্য কিছুই কর না, তোমার দর্শনে আমি কৃতার্থ হয়েছি। মনে এক বাসনা আছে যদি আজ্ঞা কর, তা বলি।

ঝড়ু ঠাকুর বললেন—আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।

কালিদাস—তোমার পদরজঃ শিরে ধারণ করতে চাই।

ঝড়ু ঠাকুর—হায়। হায়! এইরূপ কথা বলে আমাকে নরকগামী করবেন না। আমি নীচ জাতি, আপনি কুলীন।

কালিদাস—শুন ঠাকুর! শাস্ত্রে বলছেন—চতুর্ব্বেদ অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ যদি ভক্ত না হয় ত সে চণ্ডালের অধম। আর চন্ডাল যদি হরিভক্তি পরায়ণ হন ত ব্রাহ্মণের গুরু। শাস্ত্রে ভগবান আরও বলেছেন—চার বেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত না হলে, তার হাতে আমি খাই না। শ্বপচ যদি ভক্ত হয় তার হাতে খাই, সে আমার ন্যায় পূজ্য;সে যে বস্তু দেয় তা আমি প্রীতি ভরে গ্রহণ করি।

ঝড়ু ঠাকুর বললেন—শাস্ত্র ঠিক বলেছেন। যাঁর কৃষ্ণ-ভক্তি আছে তিনি কখন নীচ নন। তিনি সর্ব্বোত্তম। আমি নীচ জাতি, তাতে কৃষ্ণ-ভক্তি শূন্য। আমি কি করে পদরজঃ আপনাকে দিব? ইহা ত মহাপরাধের কাজ। দুইজন এইরূপে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি করলেন। পরিশেষে কালিদাস তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে গৃহাভিমুখে চললেন। ঝড়ু ঠাকুর কালিদাসের কিছুদুর অনুগমন করলেন। তারপর কালিদাস চললেন, ঝড়ু ঠাকুর ঘরে ফিরে এলেন। কালিদাস পুনঃ ফিরে এসে যেখানে যেখানে ঝড়ু ঠাকুরের পদ-চিহ্ন পড়েছিল সেখানকার রজঃ মাথায় নিতে লাগলেন। ঝড়ু ঠাকুরের গৃহের পার্শ্বে জঙ্গলের আড়ালে বসে রইলেন।

একদিকে ঝড়ু ঠাকুর কালিদাস প্রদত্ত আম ভগবান্‌কে ভোগ লাগালেন। অনন্তর সেই প্রসাদী আম পতি-পত্নী দুই জন চুষে চুষে খেয়ে উচ্ছিষ্ট খোসা ও আঁটি বাইরে ফেলে দিলেন। কালিদাস সেই আটি কুড়িয়ে ভক্তি ভরে চুষতে লাগলেন। কালিদাস এইভাবে বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খেতে খেতে বুড়া হয়েছেন।

একবার কালিদাস মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য পুরীধামে এলেন। মহাপ্রভু তাঁকে দেখে সুখী হলেন, তাঁর থাকবার ব্যবস্থাদিও করে দিলেন। কালিদাস

প্রতিদিন প্রভুর সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে যেতেন। মন্দিরে প্রবেশ করবার আগে মহাপ্রভু বাইরে সিঁড়িতে পাদধৌত করতেন, কিন্তু পাদধৌত জল কাকেও নিতে দিতেন না। কালিদাস একদিন সেই জল নিবার জন্য প্রভুর পিছনে পিছনে চললেন। মহাপ্রভু পাদ প্রক্ষালন করে যখন মন্দিরের দরজার দিকে যাচ্ছিলেন, কালিদাস গিয়ে সেই জলের দুই অঞ্জলি পান করলেন। তৃতীয় অঞ্জলি গ্রহণের সময় প্রভু তাঁকে নিষেধ করলেন, বললেন—

অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার।
এতাবত বাঞ্ছা-পূরণ করিলুঁ তোমার।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৬।৪৭)

জগন্নাথ দর্শন করে প্রভু গম্ভীরায় ফিরে এলেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজনে বসলেন। প্রভুর অবশেষ পাবার প্রতীক্ষায় কালিদাস বহিঃদ্বারে বসে রইলেন। প্রভুর ভোজন শেষ হল। অন্তর্য্যামী প্রভু জানতে পেরে তাঁকে অবশেষ পাত্রটি দিবার জন্য গোবিন্দকে ইঙ্গিত করলেন। বাইরে এসে গোবিন্দ কালিদাসকে ডেকে বললেন—নাও, প্রভু তোমাকে অবশেষ দিয়েছেন। মহাপ্রভুর এবম্বিধ কৃপা দেখে কালিদাসের দু-নয়ন দিয়ে আনন্দাশ্রু পড়তে লাগল। শত শত বন্দনা করে কালিদাস প্রসাদ ভক্ষণ করলেন, তাঁর সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হল।

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৬।৫৭)

ভক্তপদ ধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ,—তিন মহাবল।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৬০)

এই তিনটীই কৃষ্ণ প্রেম লাভের পরম উপায়।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী। তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ছিলেন এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য ছিলেন। তাঁর থেকে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীহরিভক্তি বিলাসের ভূমিকায় স্বয়ং গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ লিখেছেন—

"ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎ প্রিয়স্য।

গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ ।।"

১৪৩৩ শকাব্দে মহাপ্রভু যখন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিজয় করেন তখন শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁর দর্শন ও কৃপা লাভ করেন।

ত্রিমল্ল ভট্ট, ব্যেঙ্কট ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ এঁরা তিন ভাই। (ভঃ রঃ ১।১২৮) তিন ভাই শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। মহাপ্রভু চার মাস তাঁদের গৃহে অবস্থান করে নিয়ত কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট তখন শিশু ছিলেন। তাঁকে প্রভু বড় আদর করতেন। শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভুর শ্রীচরণ মর্দ্দন করতেন এবং তাঁকে জল এনে দিতেন।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবন শতক, শ্রীনবদ্বীপ শতক ও শ্রীরাধারস সুধানিধি নামক অপূর্ব্ব ভক্তি রসময় গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ঐশ্বর্য্য মার্গে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক

ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীরাধাগোবিন্দ-উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং মধুর রসের মহাকাব্য গ্রন্থসকলও প্রণয়ন করেন। তাঁর বিশুদ্ধ ভক্তিময় হৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের দিব্যস্বরূপ এবং তাঁর ধাম ও পরিকরগণের স্বরূপ যুগপৎ স্বতঃস্ফুরিত হয়েছিল। ইহা তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে।

ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ভক্তি সমাধি ভাবময় নেত্রে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের স্বরূপ এবং তাঁর ধামের স্বরূপ যেভাবে দর্শন করেছিলেন তা নবদ্বীপশতক গ্রন্থে প্রথমে বন্দনা মুখে বর্ণন করেছেন—

নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরটরুচিরং ভাববলিতং
মৃদঙ্গাদ্যৈর্যন্ত্রৈঃ স্বজনসহিতং কীর্ত্তনপরম্।
সদোপাস্যং সর্ব্বৈঃ কলিমঙ্গলহরং ভক্তসুখদং
ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণমননাদ্যর্চ্চন বিধৌ।।

ভাবানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এই নবদ্বীপধামে কিরূপ মূর্ত্তি প্রকট করে বিরাজ করছেন—"নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরটরুচিরং।" নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণের ন্যায় মনোহর কান্তি ধারণ করে বিরাজ করছেন। তারপর তাঁর বিলাসের কথা বলছেন—"ভাববলিতং মৃদঙ্গাদ্যৈঃ যন্ত্রৈঃ স্বজনসহিতং কীর্ত্তন পরম্" অষ্টসাত্ত্বিকাদি বিবিধ প্রেম বিকার (শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর ক্ষণে ক্ষণে যে প্রেম বিকার) দ্বারা মণ্ডিত এবং স্বজনসহ মৃদঙ্গ করতাল আদি বাদ্যযন্ত্র যোগে স্ব-নাম সংকীর্ত্তনে নৃত্যপরায়ণ। অতঃপর শ্রীগৌরকৃষ্ণের মহিমা সম্বন্ধে বলছেন—"সদোপাস্যং সর্ব্বৈঃ" তিনি ব্রহ্মা শিব ও ইন্দ্রাদির নিত্য উপাস্য তত্ত্ব। "কলিমল হরং" এই কলিকালে অবতীর্ণ হয়ে তিনি বিবিধ কুতর্ক মায়াবাদ প্রভৃতি

অজ্ঞানকল্পিত মতবাদের বিধ্বংসকারী এবং "ভক্ত সুখদং" শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম আশ্রিত ভক্তগণের সুখ প্রদানকারী। আমি (প্রবোধানন্দ সরস্বতী) নিত্য শ্রবণ-মনন-অর্চ্চনাদির দ্বারা তাঁকে উপাসনা করি।

অতঃপর নবদ্বীপ ধামের স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন—

শ্রুতিশ্ছন্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমব্রহ্ম পুরকং।
স্মৃতির্ব্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্‌বিষ্ণুসদনম্।।
শ্বেতদ্বীপং চান্যে বিরল রসিকো যং ব্রজবনং।
নবদ্বীপং বন্দে পরম সুখদং তং চিদুদিতম্।।

ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি যাঁকে পরম ব্রহ্মপুরী, স্মৃতিগণ যাঁকে বৈকুণ্ঠ লোক বা বিষ্ণুসদন ও ভক্তি-রসিকগণ যাঁকে শ্বেতদ্বীপ বা ব্রজবন বলে বলেন সেই পরম সুখদ চিদ্‌ধাম অধুনা নবদ্বীপ নামে ধরাতলে উদিত; আমি ঐ ধামকে বারবার বন্দনা করি।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর মহিমা বর্ণন করেছেন—

যস্যাঃ কদাপি রসনাঞ্চল খেলনোত্থ-
ধন্যাতি ধন্যঃ পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গম-গতিমধুসুদনোঽপি।
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভূবো দিশেঽপি।।
(শ্রীরাধারস সুধানিধি)

কোন সময় যে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণীর বস্ত্রাঞ্চল সঞ্চালন ফলে পবনদেব ধন্যাতিধন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি দুর্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত আপনাকে কৃত কৃতার্থ মনে করেছিলেন। সেই

বার্ষভানবীদেবীর উদ্দেশে আমাদের নমস্কার বিহিত হউক।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোকুলে কাম্যবনে বাস করতেন। তিনি মহাপ্রভুর অপ্রকটে খেদ পূর্ব্বক বলেছিলেন—

অভিব্যক্তো যত্র দ্রুত কনক গৌর হরিরভূন্মহিম্ন
তস্যৈব প্রণয়রসমগ্নং জগদভূৎ।
অভদুচ্চৈরুচ্চৈস্তুমুলহরিসংকীর্ত্তন বিধি
স কাল কিং ভূবোঽপ্যহঽপরিবর্ত্তেত মধুরঃ।।

(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত ১৩৯ শ্লোক)

যে কালে গলিত কনক-কান্তি শ্রীগৌরহরি প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয়েছিলেন, তৎকালে তাঁর প্রভাবে পৃথিবী প্রণয় রসে মগ্ন এবং উচ্চৈঃস্বরে তুমুল কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন প্রণালীও প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। হায়! সেই মধুর কাল আর কি ফিরে আসবে?

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করতে এলেন। তিনি মহাপ্রভুর রূপ ও প্রেমাদি দেখে চমৎকৃত হলেন। তিনিও তাঁর বড় ভক্ত হলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী গৃহত্যাগ করে কাশীতে এলে মহাপ্রভু তাঁকে কৃপা করলেন এবং মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করে দিলেন। বিপ্র শ্রীসনাতন গোস্বামীকে স্বীয় গৃহে প্রসাদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করলেন এবং বললেন—আপনি যতদিন কাশীতে থাকবেন এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। সনাতন গোস্বামী বললেন—আমি প্রতিদিন এক ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করব না। গৃহে-গৃহে মাধুকরী করব।

কাশীতে যেখানে সেখানে মহাপ্রভুর নিন্দা হয় দেখে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বড় ব্যথিত হলেন। একদিন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—যারা মহাপ্রভুর সম্মুখীন হয়, তারা তাঁর স্বরূপ অনুভব করে, তাঁকে ঈশ্বর বলে মানে।

কোন প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইহা দেখি সন্ন্যাসিগণ হবে ইহাঁর ভক্তে।।

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২৫।৯)

কোন রকমে একবার যদি এ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রভুর মিলন ঘটাতে

পারি, তাহলে তাঁকে দর্শন করে তাঁরা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন এবং ভক্ত হবেন। আমি সব সময় কাশীতে বাস করি। মহাপ্রভু সম্বন্ধে যদি তাঁদের মত বদলাতে না পারি, তাদের মুখে অনবরত তাঁর নিন্দা আমাকে শুনতে হবে, এ সব চিন্তা করে ব্রাহ্মণ মতলব ফাঁদলেন। আমার গৃহে সন্ন্যাসীদের এক ভোজের আয়োজন করব। তাতে শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের আমন্ত্রণ করব, মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়ে তাঁকেও যে কোন ভাবে আনব। এ সব চিন্তা করে ব্রাহ্মণ একদিন ভোজের আয়োজন করলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে আমন্ত্রণ করলেন। পরিশেষে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এলেন। তাঁর চরণ ধরে অনেক অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন—আপনার শ্রীচরণে এক অনুরোধ।

মহাপ্রভু বললেন—কি অনুরোধ?

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—আমি সন্ন্যাসী ভোজনের আয়োজন করেছি, কৃপা পূর্ব্বক তাতে আপনাকেও যোগ দিতে হবে।

মহাপ্রভু— আমি কোথাও আমন্ত্রণে— ভোজন করি না।

ব্রাহ্মণ—আমি তা' জানি। আপনি দীন দয়াল, দীনের প্রতি দয়া করে আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন আশা করি।

মহাপ্রভু কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলেন—আচ্ছা বেশ। তোমার ভোজন-উৎসবে যোগদান করব। এ কথায় ভক্তগণ আনন্দে হরি-হরি ধ্বনি করতে লাগলেন।

ঐদিন সন্ন্যাসিগণ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে এসে সমবেত হতে লাগলেন। সন্ন্যাসীদের গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীও এলেন। ব্রাহ্মণ খুব যত্ন

করে তাঁকে উচ্চ আসনে বসালেন। অতঃপর মহাপ্রভু চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্র আদি ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে সকলের শেষে এলেন। ব্রাহ্মণ বহু ভক্তি পুরঃসর প্রভুকে স্বাগত জানালেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসীদের দেখে দূর থেকে প্রণাম করলেন, পরে সভাপ্রান্তে পাদ-প্রক্ষালন স্থানে গিয়ে বসলেন এবং কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করলেন। সন্ন্যাসীদের গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী দূর থেকে মহাপ্রভুর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অপূর্ব্ব অঙ্গদ্যুতি দেখে ও ঈশ্বরীয় প্রভাব দেখে আসনে বসতে পারলেন না, শিষ্যগণের সহিত দণ্ডায়মান হলেন। তারপর শ্রীপ্রকাশানন্দ অমনি ছুটে এলেন প্রভুর কাছে এবং প্রভুর দু'খানি হাত ধরে বললেন—শ্রীপাদ! একি! এ অপবিত্র স্থানে বসেছেন কেন? সভা মধ্যে আসুন।

মহাপ্রভু দৈন্যভরে বললেন—আমি কি আপনাদের মধ্যে বসবার যোগ্য?

প্রকাশানন্দ—আপনি এ কি বলছেন? এত দৈন্য করছেন কেন? প্রভাবে ত আপনাকে ঈশ্বর বলে মনে হয়।

মহাপ্রভু—ছি, ছি, অমন কথা বলবেন না। জীবকে নারায়ণ জ্ঞান করা মহাপরাধ। আমি কৃষ্ণদাস। প্রভুর কথা শুনে সন্ন্যাসীগণ চমৎকৃত হলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী জোর করে প্রভুকে সভামধ্যে নিয়ে গেলেন এবং উত্তম আসনে বসালেন।

সন্ন্যাসীগণ মনে মনে বলতে লাগলেন—ইনি এত মহৎ ব্যক্তি কিন্তু কত দৈন্য-ব্যঞ্জক বিনম্র ব্যবহার। দিগ্বিজয়ী কেশব ভট্ট, মহান্ বৈদান্তিক, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতগণও এঁর কাছে পরাজিত। এত বড় পণ্ডিত কিন্তু অভিমানের লেশমাত্র এঁর মধ্যে

দেখছি না। মানুষ এত নিরভিমান হতে পারেন না—ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর।

শ্রীপ্রকাশানন্দ বললেন—শ্রীপাদ আপনি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী এখানে আছেন, আমাদের সঙ্গে মিশেন না কেন?

মহাপ্রভু— আমি হীন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, আপনাদের সঙ্গে মিশবার যোগ্য নই।

প্রকাশানন্দ —আপনি সন্ন্যাসী হয়ে নৃত্য গীত করেন, বেদান্ত শুনেন না কেন? সন্ন্যাসীর ধর্ম ত বেদান্ত শ্রবণ।

মহাপ্রভু— শ্রীপাদ, আপনি ঠিক বলেছেন, আমি কেন বেদান্ত শুনি না তা শুনুন। আমি হলাম মূর্খ, বেদান্ত কিছুমাত্র বুঝি না। এ সম্বন্ধে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনই যুগধর্ম। এই নাম কীর্ত্তন কর, এতে সর্ব্বসিদ্ধি হবে। আমি নাম সংকীর্ত্তন করতে লাগলাম, তখন সেই কৃষ্ণ নামই আমাকে নাচাতে ও গাওয়াতে লাগাল। ফলে অবশেষে আমি নাচতে গাইতে লাগলাম। আমি নিজ ইচ্ছায় নাচ-গান করি না।

প্রভু মধুর বাক্য শুনে সন্ন্যাসীগণের মন ফিরে গেল। বললেন আপনি ঠিক বলেছেন কলিকালে এই পথই উত্তম। আমরা বুঝি, তথাপি সম্প্রদায় অনুরোধে বেদান্ত শ্রবণ করি।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন—আপনি বঞ্চনা করছেন। আপনার কথা শুনেছি, মহাবৈদান্তিক সার্ব্বভৌম পণ্ডিতও আপনার কাছে পরাভূত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন। আপনি ছলনা ত্যাগ করুন। আমরা না বুঝে

আপনার চরণে বহু অপরাধ করেছি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্রকাশানন্দ এই বলে প্রভুর চরণ স্পর্শ করতে উদ্যত হলেন, প্রভু উঠে প্রকাশানন্দকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন ও আসরে বসালেন। অতঃপর প্রভু বলতে লাগলেন—

বেদান্তসূত্র, ঈশ্বর ব্যাসরূপে করেছেন। উপনিষদ সহ সূত্রের যে অর্থ তা মুখ্য অর্থ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করেছেন তা কল্পিত অর্থ, ঈশ্বরের আদেশেই তিনি অসুরগণকে মোহিত করবার জন্য করেছেন। এ আখ্যান পদ্মপুরাণে শিব ও বিষ্ণু সংবাদে আছে। শ্রীবিষ্ণু শিবকে বলছেন—"তুমি কলিতে আচার্য্যমূর্তি ধরে কল্পিত ভাবে সূত্র ব্যাখ্যা করে অসুরগণকে মোহিত কর। তাই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কোন দোষ নাই। এ ব্যাখ্যা যে শুনবে তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হবে।

ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ শ্রীভগবান্। তিনি চিদানন্দময়, পরিপূর্ণ তাঁর দেহ, স্থান পরিকরাদি অপ্রাকৃত। তাঁকে প্রাকৃত দেহধার মনে করলে অপরাধ হয় উপনিষদ বলেছেন—সেই ভগবানের অঙ্গকান্তি ব্রহ্মনামে অভিহিত, তাঁর আংশিক প্রকাশের নাম পরমাত্মা ও সম্পূর্ণ প্রকাশ ভগবান্ নামে অভিহিত। জীব হল ঈশ্বরের শক্তি। সূর্য্যের কিরণ যেমন, অথবা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন, জীব সেরূপ ঈশ্বরের অনুশক্তি। ভগবানের আর এক শক্তি আছে তার নাম—মায়া শক্তি। তাঁকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলা হয়। এই প্রাকৃত বিশ্ব বহিরঙ্গা শক্তির পরিণাম। অনুশক্তি জীব এই বহিরঙ্গা শক্তির বশযোগ্য। জীব যখন শ্রীকৃষ্ণ ভোলে তখন বহিরঙ্গা মায়া তাকে বশীভূত করে। জীব তখনই ত্রিবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। এই জীবগণকে কৃপা করবার জন্য ভগবান্ সাধুরূপে, শাস্ত্ররূপে ও গুরুরূপে এসে উপদেশ দেন।

আচার্য্য শ্রীশঙ্কর অনুশক্তি মায়াবশ জীবকে ব্রহ্ম বলে ভ্রান্তমত জগতে প্রচার করেছেন। 'ওঁ' প্রণব এটি হল মহাবাক্য। আচার্য্য শ্রীশঙ্কর সে মহাবাক্য গ্রহণ না করে, কল্পিত চারিটী মহাবাক্য সৃষ্টি করেছেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচয়িতা, পুনঃ তিনিই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য করলেন শ্রীমদ্ভাগবত। আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বেদান্ত সূত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্ব বিরোধী কল্পিত ব্যাখ্যা।

অতঃপর শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সন্ন্যাসীগণ এ প্রকার শুদ্ধ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হলেন। পরে বিনয় সহকারে মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন—

বেদময় মূর্তি তুমি—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ,—পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন।।

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১৪৮)

মহাপ্রভু উঠে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে আলিঙ্গন করলেন। ভক্তগণ দেখে মহা আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা রইল না। প্রেমাশ্রু নেত্রে প্রভুর চরণতলে পড়ে বললেন— হে বাঞ্ছাকল্পতরু! আমি যে বাঞ্ছা করেছিলাম তা পূর্ণ হল। অনন্তর তিনি মহাপ্রভু ও প্রকাশানন্দ আদি সন্ন্যাসীগণকে নিয়ে ভোজন মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। যথাযথ আসনে সকলকে বসিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ অন্ন প্রদান করলেন। প্রসাদ ভোজন কালে প্রভু এক এক বার মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। সেই দিন থেকে কাশী কৃষ্ণ প্রেমময় হয়ে উঠল।

সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ।।

*   *   *

বাহু তুলি প্রভু বলে,—বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি।।

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১৫৯)

মহাপ্রভু কয়েক দিন কাশীতে অবস্থান করবার পর ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে পুরী ধামের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পিতার নাম ছিল শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। উত্তরকালে তাঁর নাম হয় শ্রীচৈতন্য দাস, এঁর পত্নীর নাম ছিল—শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া। ইনি ভাগীরথী তটে চাখন্দি গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন নদীয়া লীলা সাঙ্গ করে সন্ন্যাস নেবার জন্য কন্টক নগরে শ্রীকেশব ভারতীর আশ্রমে গেলেন, এ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হল। চতুর্দ্দিক থেকে সহস্র সহস্র লোক প্রভুর সন্ন্যাস দেখবার জন্য আসতে লাগল। চাখন্দি হতে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যও এলেন। প্রভুর মস্তকের সুন্দর চাঁচর কেশ অন্তর্হিত হবে এ-ভাবনায় ভক্তগণ কেঁদে আকুল হচ্ছেন। নাপিত ক্ষৌর কর্ম করতে পারছে না, নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে কেঁদে আকুল হচ্ছে। মহাপ্রভু তাকে ক্ষৌর করতে অনুরোধ করছেন। বহুক্ষণ পরে শ্রীমধু নাপিত ক্ষৌর কর্ম করল। কিন্তু দুঃখে কি করলাম? কি করলাম? বলে ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। চতুর্দিকে ক্রন্দনের রোল উঠল, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যও ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। কে কাকে প্রবোধ দিবে? কি করুণ দৃশ্য। নর-নারীর কথা দূরে থাকুক, এ দৃশ্য দেখে বৃক্ষ ডালে পক্ষিগণও রোদন করছিল।

অনেকক্ষণ পরে শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের মূর্চ্ছা যদিও ভাঙল, তিনি উন্মাদের মত হলেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলতে লাগলেন। চাখন্দি গ্রামে ফিরে এলেন। কিন্তু পাগলের ন্যায় ঐ নাম জপ করতে লাগলেন। তাঁর সাধ্বী পত্নীও প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনে কেঁদে আকুল হলেন।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এ ভাবে দিন যাপন করতে লাগলেন।

লোকে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের নাম দিল 'চৈতন্যদাস'।

শ্রীচৈতন্যদাস মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্য সস্ত্রীক পুরীধামে এলেন।

কতদিনে নীলাচলে উত্তরিলা গিয়া।
প্রভুর দর্শন লাগি' উৎকণ্ঠিত হিয়া।।

(ভক্তি রত্নাকর ২।৮৭)

শ্রীচৈতন্যদাস দূর থেকে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করে সস্ত্রীক কেঁদে ধরাতলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু আহ্বান করে তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং কৃপা দৃষ্টিপাত করে মধুর বাক্যে বলতে লাগলেন—

"জগন্নাথ তোমা আনাইলা হৃষ্ট হৈয়া।।
চল চল জগন্নাথ করহ দর্শন।
করিবে কামনা পূর্ণ শ্রীপদ্মলোচন।।

(ভঃ রঃ ২।১০৩-১০৪)

শ্রীজগন্নাথ পরম করুণাময়। তিনি করুণা করে তোমাদের এনেছেন, এবং তিনিই করুণা করে তোমাদের বাসনা পূর্ণ করবেন। যাও তোমরা তাঁকে দর্শন কর। শ্রীচৈতন্যদাস সস্ত্রীক শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চললেন। প্রভুর সেবক গোবিন্দ তাঁদের সঙ্গে গেলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী শ্রীজগন্নাথ দর্শন করে প্রেমে কত ক্রন্দন স্তব-স্তুতি করলেন। তারপর প্রভু যে স্থানে তাঁদের থাকতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন সে স্থানে এলেন। শ্রীচৈতন্যদাস কিছুদিন আনন্দে নীলাচলে প্রভু সন্নিধানে রইলেন।

অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর একদিন গোবিন্দকে ডেকে বললেন—

গোবিন্দ! ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পুত্র কামনা করে এসেছেন। 'শ্রীনিবাস' নামে তাঁর এক সুন্দর পুত্র হবে।

শ্রীরূপ সনাতনের দ্বারা আমি ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করেছি। শ্রীনিবাসের সহায়তায় সে শাস্ত্র সর্ব্বত্র বিতরণ করব। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী শীঘ্র গৌড় দেশে গমন করুক।

শ্রীচৈতন্যদাস মহাপ্রভুর শুভ আশীর্বাদ পেয়ে আনন্দে গৌড় দেশে ফিরে এলেন। এ সময় ব্রাহ্মণীর গর্ভে শ্রীচৈতন্যের কৃপাশক্তির অধিষ্ঠান হল। লক্ষ্মীপ্রিয়ার বাবার নাম শ্রীবলরাম বিপ্র। তিনি পণ্ডিত ও জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন। লক্ষ্মীর গর্ভে কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করবেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা দিবা রোহিণী মুহূর্ত্ত।
শুভক্ষণে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রসবিলা পুত্র।।

(ভঃ রঃ ২।১৫৬)

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা দিবসে রোহিণী নক্ষত্রে সর্ব্ব শুভ লগ্নে এক অপূর্ব্ব সন্তান প্রসব করলেন। পুত্রের অঙ্গকান্তি যেন স্বর্ণচাঁপার ন্যায়। দীর্ঘ নাসা, আকর্ণ নেত্র, বিস্তৃত বক্ষস্থল, আজানুলম্বিত ভুজ যুগল। মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ তাতে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল।

শ্রীচৈতন্যদাস পুত্রকে তৎক্ষণাৎ শ্রীচৈতন্য পাদ-পদ্মে অর্পণ করলেন। পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণকে সেবা, দান-দক্ষিণা প্রদান করলেন। পুত্র পেয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বড়ই সুখী হলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া পুত্র কোলে নিয়ে শ্রীগৌরনাম কীর্ত্তন করতেন। পুত্রকে গৌর নাম শিখাতেন। চন্দ্রকলার ন্যায় পুত্র দিন দিন বাড়তে লাগল। ক্রমে চূড়াকরণ যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি হল। তারপর শ্রীধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন

করতে লাগলেন। বালক অল্পকালের মধ্যে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হলেন।

বাল্যকালেই শ্রীনিবাস শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতির কৃপা প্রাপ্ত হলেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাসের পিতৃ বিয়োগ হয়। পিতার অন্তর্ধানে শ্রীনিবাস অত্যন্ত কাতর হলেন। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে অনেক প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া পতি বিয়োগে বড়ই কাতর হলেও পুত্র মুখপানে তাকিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করলেন।

শ্রীনিবাস জননীকে নিয়ে চাখন্দি থেকে কিছুদিন পরে যাজি গ্রামে মাতামহ শ্রীবলরাম বিপ্রের গৃহে এলেন। যাজি গ্রামে শ্রীনিবাসের আগমনে তথাকার সজ্জনবৃন্দ পরম আনন্দ লাভ করলেন। শ্রীনিবাসের অগাধ পাণ্ডিত্য ও ভক্তিপ্রেম দেখে তথাকার পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ চমৎকৃত হলেন। শ্রীনিবাসের হৃদয় কোন বস্তুর জন্য লালায়িত নয়। তিনি কেবল শ্রীচৈতন্য চরণ দর্শন চিন্তায় বিভোর থাকেন। ক্রমে নীলাচলে যাবার জন্য বড়ই অধীর হয়ে পড়লেন।

শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে শ্রীখণ্ডে এলেন এবং প্রেমে গদ্‌গদ্ চিত্তে তাঁর শ্রীচরণমূলে লুটিয়ে পড়লেন। এতাদৃশ প্রেম দেখে শ্রীসরকার ঠাকুর তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। শ্রীনিবাস গৌরসুন্দরের নাম স্মরণ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তারপর প্রার্থনা জানালেন নীলাচলে গিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থান দর্শন করবেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি তাঁর শুভ প্রস্তাব শুনে সুখী হলেন, বললেন—কয়েকদিন ধৈর্য্য ধারণ কর। যখন গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরী যাবেন তখন তাদের সঙ্গে যেয়ো।

শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডের ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে যাজিগ্রামে এলেন এবং জননীকে এই প্রস্তাব জানালেন। জননী বড় কাতর হয়ে পড়লেন। তথাপি

পুত্রের একান্ত ইচ্ছা দেখে যাবার অনুমতি দিলেন। অতঃপর কিছুদিন গৌড়ীয় ভক্তদিগের সঙ্গে তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। তিনি বড় বিহ্বল অন্তরে ক্রমে নীলাচলে পৌঁছলেন সন্ধ্যাকালে। রাত্রে সিংহদ্বারের নিকট এক পাণ্ডাগৃহে অবস্থান করলেন। প্রাতঃকালে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহে এলেন। পণ্ডিতকে দেখে শ্রীনিবাস ভূতলে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁকে স্নেহে ধরাতল থেকে উঠিয়ে কোলে করলেন। শ্রীনিবাস গদাধরের কোলে গৌর বিরহে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহে একদিন অবস্থানের পর শ্রীনিবাস, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীশিখি মাহিতি, গোবিন্দ, শঙ্কর ও গোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি শ্রীগৌর-পার্ষদগণের শ্রীচরণ দর্শনে চললেন। শ্রীনিবাসকে দর্শন করে ভক্তগণ সকলে সুখী হলেন। শ্রীনিবাসের অপূর্ব্ব গৌর প্রেম দর্শনে ভক্তগণ বুঝতে পারলেন তিনি গৌরশক্তি। তাঁর দ্বারা জগতে ভবিষ্যতে গৌরবাণী ও গ্রন্থাবলী প্রচারিত হবে। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করতে লাগলেন। শ্রীনিবাস কিছুদিন পুরীতে থেকে শ্রীগৌরসুন্দরের যাবতীয় লীলাস্থলী সকল দর্শন করলেন। অনন্তর গৌড় দেশে আসবার জন্য ভক্তগণের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে স্নেহে আলিঙ্গন আদি করে বিদায় দিলেন। শ্রীনিবাস ভক্তদের থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে আসতে লাগলেন। কিছু পথ চলবার পর সংবাদ পেলেন শ্রীগদাধর পণ্ডিত অপ্রকট হয়েছেন। শ্রীনিবাস তাঁর বিরহে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন, অতঃপর বিরহে আর্ত্তস্বরে রোদন করতে লাগলেন। রাত্রে স্বপ্নযোগে শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁকে দর্শন দিয়ে শান্ত করলেন। শ্রীনিবাস পুনঃ গৌড় দেশাভিমুখে চলতে লাগলেন। পথে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করলেন। শ্রীনিবাস সেদিন

তথায় অবস্থান করলেন, বিরহে অবিরাম অশ্রুপাত করতে লাগলেন। স্বপ্নে দর্শন দিয়ে করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য তাঁকে শান্ত করলেন। শ্রীনিবাস ক্রমে গৌড়দেশে এলেন। প্রথম শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর আদির শ্রীচরণ দর্শন করলেন। তাঁদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তিনি নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে আগমন করলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভূমি দর্শন করে শ্রীনিবাস প্রেমে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। মহাপ্রভুর গৃহে তখন শ্রীবংশীবদন ঠাকুর অবস্থান করছিলেন। শ্রীনিবাস বংশীবদন ঠাকুরের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। শ্রীবংশীবদন ঠাকুর তাঁর পরিচয় পেয়ে পরম সুখী হলেন। মহাপ্রভুর নাম স্মরণ করে শ্রীনিবাস উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। শ্রীনিবাস শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শন প্রার্থনা করলেন। সেইকালে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কাকেও দর্শন দিতেন না। শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে শ্রীনিবাসের কথা জ্ঞাপন করলেন। অনেকক্ষণ ভাবার পর আজ্ঞা করলেন, তাঁকে নিয়ে এস।

শ্রীনিবাসকে শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে নিয়ে গেলেন। শ্রীনিবাস শ্রীঠাকুরাণীকে দর্শন মাত্রই প্রেমাশ্রু নেত্রে ভূমি তলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করলেন।

"শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী সাক্ষাতে।।
প্রেমধারা নেত্রেতে বহয়ে নিরন্তর।
ধরণী লোটাঞা কৈল প্রণতি বিস্তর।।

—(ভঃ রঃ ৪।৪০-৪১)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন এবং সে দিবস তথায় প্রসাদ পেতে বললেন।

গৌর বিরহে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীঅঙ্গ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর চাঁদের মত অতি ক্ষীণ। তণ্ডুলের সাহায্যে শ্রীহরিনামের সংখ্যা রাখতেন, তাতে যে কয়েকটি তণ্ডুল হত তা রন্ধন করে শ্রীগৌর সুন্দরকে অর্পণ করতেন, তা স্বয়ং গ্রহণ করে জীবনধারণ করতেন।

শ্রীনিবাস নবদ্বীপে শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীসঞ্জয়, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, দাস গদাধর প্রভৃতির শ্রীচরণ দর্শন করলেন। তিনি কয়েক দিন নবদ্বীপে অবস্থান করবার পর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত ভবনে এলেন এবং সীতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শন করলেন—

প্রাণ মাত্র আছে সীতা মাতার শরীরে।
শ্রীনিবাসে বোলাইয়া লৈল অন্তঃপুরে।।

—(ভঃ রঃ ৪।৭০)

শ্রীসীতা ঠাকুরাণী গৌর বিরহে প্রাণে মাত্র জীবিত আছেন। শ্রীনিবাসকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করলেন। শ্রীনিবাস শান্তিপুরে অন্যান্য ভক্তগণেরও শ্রীচরণ দর্শন-বন্দনাদি করলেন। ক্রমে সেখান থেকে খড়দহ গ্রামে এলেন। খড়দহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গৃহে শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর তখন অবস্থান করছিলেন। তিনি শ্রীনিবাসকে শ্রীবসুধা, শ্রীজাহ্নবা ও শ্রীবীরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করালেন। শ্রীনিবাস প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডবৎ করতেই শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী তাঁর শিরে শ্রীচরণ ধূলি দিলেন। শ্রীনিবাসকে সকলে পরম স্নেহ করতে লাগলেন। খড়দহ গ্রামে কয়েক দিন তিনি রহিলেন। অনন্তর শ্রীজাহ্নবা মাতা তাঁকে শ্রীবৃন্দাবন ধামে যেতে আদেশ করলেন। শ্রীনিবাস শ্রীজাহ্নবা দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য করে খানাকুলে শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের গৃহে এলেন। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরকে বন্দনা করতেই তিনি তাঁর জয়-মঙ্গল নামক চাবুক তিনবার শ্রীনিবাসের দেহ স্পর্শ করালেন। তাঁর পত্নী শ্রীমালিনী দেবী নিষেধ করলেন।

প্রেমাবেশে পুনঃ সে চাবুক স্পর্শাইতে।
শ্রীমালিনী দেবী আসি ধরিলেন হাতে।।
—(ভঃ রঃ ৪।১৪১)

জয়মঙ্গল চাবুক স্পর্শে শ্রীনিবাসের দেহে প্রেমের সঞ্চার হল। শ্রীনিবাস অভিরাম গোপাল ঠাকুরকে বন্দনা করে তাঁর কৃপাশীর্ব্বাদ নিয়ে শ্রীখণ্ডে এলেন। শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর তাঁকে দেখে অতি সুখী হলেন। অতঃপর তিনি যাজিগ্রামে নিজ গৃহে এলেন এবং স্বীয় জননীর চরণ বন্দনা করলেন। শ্রীনিবাস জননী স্থানে বৃন্দাবনে যাবার আজ্ঞা প্রার্থনা করলেন। জননী সানন্দে অনুমতি দান করলেন। শ্রীনিবাস শীঘ্র বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে গয়াধামে উপস্থিত হয়ে শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শন করলেন। এই স্থানে শ্রীঈশ্বর পুরীর সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন হয় এবং প্রভু তাঁর থেকে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গয়াধামে দুই তিন দিন অবস্থান করে কাশীতে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে এলেন। শ্রীনিবাসের অন্যান্য ভক্তগণের সহিত তথায় মিলন হল। শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপন মিশ্রের মুখে কাশীতে মহাপ্রভু যে যে লীলা করেছিলেন তা শ্রবণ করে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। কয়েকদিন তথায় থাকার পর সেখান থেকে শ্রীমথুরা ধামে এলেন। বিশ্রাম ঘাটে স্নান করলেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কংসাসুরকে বধ করার পর বিশ্রাম করেছিলেন। তাই বিশ্রামঘাট নাম হয়েছে। শ্রীনিবাস মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান ও আদিকেশব দর্শন করে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন, পথে কয়েকজন বৃন্দাবনবাসী ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীরূপ-সনাতনের তথা রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতির অপ্রকট কথা শুনে অতি বিষণ্ণ হলেন। "শুনি শ্রীনিবাস ভাসিলেন নেত্র জলে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমিতলে।।" (ভঃ রঃ ৪।২০৩) তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন, তাঁরা শ্রীনিবাসকে অনেক কথা বুঝিয়ে শ্রীজীব গোস্বামীর স্থানে নিয়ে এলেন। শ্রীজীব গোস্বামী

পূর্ব্বেই শ্রীনিবাসের পরিচয় শুনেছিলেন। শ্রীনিবাস শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীপাদ-পদ্ম বন্দনা করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী আনন্দে শ্রীনিবাসকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর উভয়ে বিবিধ কথোপকথন করতে লাগলেন। শ্রীজীব গোস্বামী গৌড় দেশবাসী ভক্তগণের বিবিধ কুশল বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর থাকবার ও প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করলেন। সেদিন শ্রীগোবিন্দদেবের সেবক শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত প্রসাদ নিয়ে এলেন। শ্রীজীব গোস্বামী সে প্রসাদ শ্রীনিবাসের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা দিবসে অপরাহ্নে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে এসেছিলেন। প্রাতঃকালে তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীরাধারমণ দর্শন করলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সঙ্গেও দেখা হল। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাসকে দেখে পরম সুখী হলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীনিবাস শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীপাদ-পদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে মন্ত্র-দীক্ষাদি প্রার্থনা করলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী আনন্দের সহিত রাজি হলেন। পরদিবস শ্রীনিবাসকে শ্রীশ্রীরাধারমণ সন্নিধানে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী মন্ত্র-দীক্ষা দান করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী পরদিন শ্রীনিবাসকে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন। শ্রীনিবাস আনন্দে শ্রীরাধাকুণ্ডে এসে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীরাঘব পণ্ডিত প্রভৃতির শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। তিন দিন শ্রীনিবাস রাধাকুণ্ডে গোস্বামিদের সঙ্গে অবস্থান করে অনেক রকমের ভজনোপদেশ লাভ করেন। সকলের অনুমতি নিয়ে শ্রীনিবাস পুনঃ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের নিকট ফিরে এলেন।

অনন্তর শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে শ্রীমদ্ভাগবত ও গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করাতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে গোস্বামী গ্রন্থের সিদ্ধান্ত সমূহ শ্রীনিবাস হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। তাঁর প্রতিভা দর্শন করে শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী তাঁকে "আচার্য্য" পদবী প্রদান করলেন। সে দিন থেকে তিনি

শ্রীনিবাস আচার্য্য নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে খ্যাত হলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য পূর্ব্বে শ্রীনরোত্তমের নাম শ্রবণ করেছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেলেন। শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের মিলন হল, চির সৌহার্দ্য ভাব জেগে উঠল। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমকে শ্রীরাঘব গোস্বামীর সঙ্গে 'বন' ভ্রমণের আদেশ দিলেন। শ্রীগোস্বামীর আদেশ পেয়ে তাঁরা আনন্দে 'বন' ভ্রমণে যাত্রা করলেন।

শ্রীরাঘব গোস্বামী দাক্ষিণাত্য নিবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত অনুরক্ত প্রিয়জন ছিলেন।

শ্রীমদ্ কবি কর্ণপুর লিখেছেন—

শ্রীরাধা প্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতা ব্রজে।
সাদ্য রাঘব গোস্বামী গোবর্দ্ধন কৃতস্থিতিঃ।।

পূর্বে যিনি ব্রজে শ্রীরাধার প্রাণসখী চম্পকলতা নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি বর্ত্তমানে শ্রীগৌরলীলায় শ্রীরাঘব গোস্বামী নামে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং নিয়ত গোবর্দ্ধন গিরিরাজে অবস্থান করে গিরিরাজের আনন্দ বর্দ্ধন করছেন।

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীরাঘব গোস্বামীর সহিত শ্রীমথুরা মণ্ডলের ৮৪ ক্রোশ ভ্রমণ প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

কিছুদিন শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম, শ্রীরাঘব গোস্বামীর সঙ্গে বন ভ্রমণ করে বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ফিরে এলেন। এমন সময় দুঃখী শ্রীকৃষ্ণদাস (শ্যামানন্দ প্রভু) গৌড়দেশ থেকে ব্রজে এলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে দেখে বড় আনন্দিত হলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর প্রিয় শিষ্য। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু স্বয়ং তাঁকে শ্রীজীবের নিকট পাঠিয়েছেন। দুঃখী

কৃষ্ণদাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গৌড় দেশ ও উৎকল দেশবাসী ভক্তগণের কুশল বার্ত্তা প্রদান করলেন।

অতঃপর দুঃখী কৃষ্ণদাসের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য্যের ও শ্রীনরোত্তমের পরিচয় হল। তিনজন সর্ব্বগুণমণ্ডিত, পরস্পর চির মৈত্রী ভাবযুক্ত। তিনজন শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট 'গোস্বামীগ্রন্থ' অনুশীলন করতে লাগলেন। এই সমস্ত গোস্বামী-গ্রন্থ শ্রদ্ধালু প্রিয়জনগণকে অধ্যয়ন করাব, শ্রীজীব গোস্বামীর অন্তরে এরূপ যে বাসনা ছিল, তা যেন সিদ্ধ হল।

এ সময় ব্রজের গোস্বামিগণ মিলিত হয়ে ঠিক করলেন। এই তিনজনের দ্বারা গৌড়দেশে গোস্বামি-গ্রন্থ প্রচার করতে হবে। তিনজন মহাবৈরাগ্যশীল ও ভক্তিরস শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত। অতঃপর তিনজনকে আহ্বান করে গোস্বামিগণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন। তিনজন অবনত শিরে সে আদেশ পালন করতে রাজি হলেন। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী গ্রন্থ সম্পুটের অধ্যক্ষ করলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যকে। তাঁদের গ্রন্থ নিয়ে যাবার দিন ঠিক হল অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে।

অতঃপর শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদন মোহনের বন্দনা করে গোস্বামিদের অনুমতি নিয়ে শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীদুঃখী কৃষ্ণদাসকে (শ্যামানন্দ) গ্রন্থসহ গৌড়দেশে প্রেরণ করলেন। গ্রন্থের গাড়ী রক্ষার জন্য উপযুক্ত রক্ষক পুরুষগণও চলতে লাগলেন। মথুরা থেকে সুপ্রসিদ্ধ পথ ধরে গাড়ী গৌড়দেশ অভিমুখে চলবার সময় বহু পথিকও গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। স্থানে স্থানে বিশ্রাম, সংকীর্ত্তন, ভোগ-রাগ প্রদান প্রভৃতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে গাড়ী বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করল।

বনবিষ্ণুপুরের অধিকারী ছিলেন দস্যু দলপতি বীর হাম্বীর। তিনি চরের মুখে জানতে পারলেন যে বহু লোকজনসহ ধনরত্ন পূর্ণ এক গাড়ী গৌড়

দেশের দিকে যাবার পথে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করেছে। তাই তিনি স্থির করলেন গাড়ী লুঠ করতে হবে। এদিকে গাড়ী বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করতে সূর্য্যদেব অস্তমিত হলেন। তিনজন মন্ত্রণা করে ঐ নগরীর মধ্যে সরোবর তটে উপবন প্রান্তে বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। সন্ধ্যায় তথায় সঙ্কীর্ত্তন নৃত্য আরম্ভ হল। গ্রামের বহু লোক তা দেখবার জন্য ছুটে এল। বৈষ্ণবগণের অঙ্গ তেজ দেখে, ভজন-কীর্ত্তনাদি শুনে সকলে আশ্চর্য্য হল।

রাজা বীর হাম্বীর বার বার চর প্রেরণ করে খবর নিচ্ছেন। ভাবছেন বিধাতা বহুদিন পরে মনের সাধ মিটালেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হলে বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণের পর গ্রন্থ পূর্ণ গাড়ীর চারি পার্শ্বে শয়ন করলেন। সকলে নিদ্রিত হলেন। এ সময় দস্যুগণ সাবধানে গাড়ী থেকে গ্রন্থ পূর্ণ সিন্দুকটি নিয়ে বরাবর রাজ অন্তঃপুরে এলে। রাজা গ্রন্থের সিন্দুক দেখে বিবেচনা করলেন— তাতে বহু ধন-রত্ন আছে। তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন। দস্যুগণকে ডেকে বস্ত্র-ভূষণাদি দিয়ে তাদের প্রশংসা করতে লাগলেন।

শ্রীবীর হাম্বীর রাজা মনে বিচারয়।
এই গাড়ী পশ্চিম দেশের সুনিশ্চয়।।
বহু দিন বহু অর্থ লাভ হৈল মোরে।
এরূপ আনন্দ কভু না হয় অন্তরে।।
বুঝিলু—অমূল্য রত্ন আছয় ইহায়।
এত কহি গ্রন্থের সম্পুট পানে চায়।।

—(ভঃ রঃ ৭।৮০-৮২)

রাজা বীর হাম্বীরের একজন গণক ছিলেন। তঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনিও বললেন সিন্দুকে বহু অমূল্য নিধি আছে।

এদিকে বৈষ্ণবগণ প্রাতঃকালে জেগে দেখলেন গাড়ীতে গ্রন্থ সম্পুটটী

নাই। অমনি সকলের শিরে যেন বজ্রপাত হল। সকলে চতুর্দিকে অন্বেষণ করতে বের হলেন। কিন্তু কোন সন্ধান পেলেন না। বিষাদে সকলে মৃতপ্রায় হলেন। কিছুক্ষণ পরে বৈষ্ণবগণ একটু ধৈর্য্য ধারণ করে বলতে লাগলেন— শ্রীগোবিন্দদেবের কি ইচ্ছা, কি জানি? তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাত্রা করেছি। তিনি গ্রন্থপূর্ণ সম্পুট বের করে দিবেন। বৈষ্ণবগণ এভাবে বলাবলি করতে লাগলেন। এমন সময় গ্রামবাসীদিগের কাছে শুনতে পেলেন, এ দেশের রাজা দস্যু দলপতি। তিনিই এ সমস্ত জিনিস হরণ করেছেন।

এদিকে রাজা সেই রাত্রে গ্রন্থ সম্পুট খুললেন—দেখলেন মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত গ্রন্থ-রত্নরাজি। পরে গ্রন্থগুলি খুলে যখন 'শ্রীরূপ গোস্বামী" এ নাম ও তাঁর মুক্তা পাঁতির ন্যায় শ্রীহস্ত অক্ষর দর্শন করলেন তখন তাঁর জীবনের পুঞ্জীভূত পাপ দূর হয়ে গেল। হৃদয় পবিত্র হল। শুদ্ধ হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হল। রাজা গ্রন্থ সম্পুট রেখে নিদ্রিত হলেন। তখন স্বপ্নে দেখতে লাগলেন—

স্বপ্নচ্ছলে দেখে—এক পুরুষ সুন্দর।
জিনি হেম পর্ব্বত অপূর্ব্ব কলেবর।।
শ্রীচন্দ্রবদনে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চিন্তা না করিহ তেঁহ মিলিব আসিয়া।।
হইব তোমার প্রতি প্রসন্ন অন্তর।
জন্মে জন্মে হও তুমি তাহার কিঙ্কর।।

—(ভঃ রঃ ৭।১০৩-১০৫)

অপূর্ব্ব গ্রহরত্ন দেখে রাজা মনে মনে বললেন—এ গ্রহরত্ন যাঁদের তাঁদের বড় দুঃখ দিয়েছি নিশ্চয়ই। আমার কি গতি হবে জানি না। স্বপ্নে এক দিব্য পুরুষ এসে বলতে লাগলেন— "রাজা। তুমি চিন্তা কর না। যাঁর এ

অপূর্ব্ব গ্রহরত্ন তিনি সত্বর তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। জন্মে জন্মে তুমি তাঁর কিঙ্কর হও।"

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে খেতরি গ্রামে এবং শ্রীদুঃখী কৃষ্ণদাসকে অম্বিকায় প্রেরণ করে, রাজগৃহ থেকে গ্রন্থ উদ্ধার করবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বয়ং বিষ্ণুপুরে রইলেন।

বিষ্ণুপুরবাসী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামক একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দর্শন করে মুগ্ধ হলেন এবং আচার্য্যকে যত্ন করে গৃহে নিয়ে তাঁর পূজাদি করলেন। অনন্তর তাঁর থেকে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তথায় আর কয়েকজন ব্যক্তিও তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে মন্ত্র দীক্ষা নিলেন।

রাজা নিত্য ভাগবত শুনেন—শুনে শ্রীনিবাস আচার্য্য ইচ্ছা করলেন একদিন রাজগৃহে ভাগবত পাঠ করবেন। এ প্রস্তাব শ্রীকৃষ্ণবল্লভের কাছে করলেন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ বললেন রাজার ভাগবত ও সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা আছে। চলুন অদ্যই আমরা রাজগৃহে গমন করি।

ভাগবত শুনে রাজা—এ কথা শুনিয়া।
রাজসভা চলে কৃষ্ণবল্লভে লইয়া।।
আচার্য্যের তেজ দেখি রাজা সাবধানে।
ভূমে পড়ি প্রণমি আপনা ধন্য মানে।।

—(ভঃ রঃ ৭।১৩৬-১৩৭)

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণবল্লভকে নিয়ে শীঘ্র রাজভবনে এলেন। রাজা বীর হাম্বীর শ্রীআচার্য্যের দিব্য তেজোময় শ্রীঅঙ্গ দর্শন করে ভূমিতলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন এবং বহু যত্ন করে তাঁকে উত্তম আসনে বসিয়ে গন্ধ পুষ্প-মাল্যাদি প্রদান করলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস আচার্য্য সুমধুর কণ্ঠে গুরু বন্দনাদি

করে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করতে লাগলেন। আচার্য্যের কি অদ্ভুত শ্লোক উচ্চারণ এবং ব্যাখ্যা! তা শুনে সভাসদ্ সহ রাজা বীর হাম্বীর প্রেমার্দ্র হয়ে পড়লেন।

"দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।" মহাদস্যু দলপতি রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দর্শন মাত্রই পবিত্র হলেন। বৈষ্ণব দর্শনে পবিত্রতা লাভ হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য ভাগবত পাঠ সমাপ্ত করে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করলেন ও কিছুক্ষণ নৃত্যাদি সহ কীর্ত্তন করলেন। অনন্ত রাজা গলে বস্ত্র দিয়ে দৈন্যভরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীচরণ মূলে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন এবং বারংবার তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। শ্রীআচার্য্য তাঁকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। বললেন অচিরাৎ শ্রীগৌরসুন্দর তোমাকে কৃপা করবেন। তারপর রাজা গ্রন্থ সম্পুটসহ নিজেকে আচার্য্য পাদপদ্মে অর্পণ করলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের অসীম কৃপা-মাধুর্য্যের কথা বুঝতে পারলেন। তাঁর ইচ্ছায় সব কিছুই হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজাকে অনুগ্রহ করলেন। সব খবর শীঘ্র তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠালেন। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী অন্যান্য গোস্বামিগণ সব শুনে পরম আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজার থেকে বিদায় নিয়ে গ্রন্থ সম্পুটসহ যাজিগ্রামে এলেন এবং তত্রস্থ ভক্তগণের কাছে সমস্ত কথা বললেন। বৈষ্ণবগণ শুনে সকলেই পরম সুখী হলেন। এই সময় তিনি শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অন্তর্দ্ধান বার্ত্তা শুনলেন। বিষাদে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ বহু প্রবোধ বাক্যে শ্রীআচার্য্যকে একটু স্থির করালেন। এমন সময় শ্রীখণ্ড হতে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আহ্বান পত্র এল। শ্রীআচার্য্য বিলম্ব না করে শ্রীখণ্ডে যাত্রা করলেন। শ্রীআচার্য্যকে দর্শন করে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি প্রভুর পার্ষদগণ বড় সুখী হলেন। শ্রীআচার্য্য

পার্ষদগণের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ বন্দনা-পূর্ব্বক তাঁদের নিকট শ্রীবৃন্দাবন ধামবাসী গোস্বামী সমূহের সংবাদ বললেন।

এ সময় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তাঁকে বলতে লাগলেন—

"তোমার জননী তেঁহো পরম বৈষ্ণবী।
কথোদিন রহু যাজিগ্রামে তাঁরে সেবি।।
তাঁর মনোবৃত্তি যাহা করিতেই হয়।
ইথে কিছু তোমার নহিব অপচয়।।
বিবাহ করহ বাপ এই মোর মনে।"

—(ভঃ রঃ ৭।৫৮৩-৫৮৫)

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়, আচার্য্যকে তাঁর জননীর ইচ্ছা অনুসারে বিবাহ করতে বললেন। শ্রীআচার্য্য দ্বিরুক্তি না করে সে আদেশ শিরে ধারণ করলেন। তিনি কয়েকদিন শ্রীখণ্ডে থাকার পর কন্টক নগরে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের দর্শনের জন্য এলেন। আচার্য্য শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরকে বন্দনা করতেই তিনি তাঁকে কোলে নিয়ে কত স্নেহ করতে লাগলেন। আচার্য্যের কাছে শ্রীগদাধর ঠাকুর বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণের কুশল সংবাদ শুনলেন। সব শুনে সুখী হলেন। আচার্য্য কয়েকদিন শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের কাছে থাকার পর বিদায় নিলেন। যাবার সময় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর বলতে লাগলেন—

"পরম দুর্ল্লভ শ্রীপ্রভুর সংকীর্ত্তন।
নিরন্তর আস্বাদিবে লৈয়া নিজগণ।।
করিবে বিবাহ শীঘ্র—সবার সম্মত।
হইবেন অনেক তোমার অনুগত।।

—(ভঃ রঃ ৭।৬২৬-৬২৭)

শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের উপদেশ-আশীর্ব্বাদ নিয়ে শ্রীআচার্য্য যাজিগ্রামে ফিরে এলেন। এ সময় যাজিগ্রামে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শুভ বিজয় করলেন। তিনি শ্রীআচার্য্যের বিবাহ-উৎসব করতে লাগলেন। যাজিগ্রামে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক ভক্ত-ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর অতি সুন্দরী ভক্তিমতী দ্রৌপদী নামে কন্যা ছিল। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর সেই কন্যার সঙ্গে আচার্য্যের বিবাহ উদ্যোগ করলেন। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় আচার্য্যের বিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন হল। আচার্য্যের পত্নীর পূর্ব্ব নাম ছিল দ্রৌপদী, বিবাহের পর নাম হল 'ঈশ্বরী'। পরবর্ত্তীকালে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী আচার্য্য থেকে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করলেন। শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর শ্যামদাস ও রামচন্দ্র নামে দুটি পুত্র ছিলেন। তাঁরাও আচার্য্যের থেকে দীক্ষা নিলেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর আচার্য্যের বিবাহ বার্ত্তা শুনে অতিশয় সুখী হলেন।

অনন্তর শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে শিষ্যগণকে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করাতে লাগলেন। দ্বিজ হরিদাসের পুত্র শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দ আচার্য্যের থেকে দীক্ষা নিয়ে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন। দিন দিন শ্রীআচার্য্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে লাগল। অল্পকালের মধ্যে তাঁর চরণ আশ্রয় করবার জন্য বহু সজ্জন ব্যক্তি আসতে লাগলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মিলন

একদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে স্বীয় গৃহে ভক্তগণ সঙ্গে বসে ভগবদ্ কথা বলছেন। এমন সময় তাঁর গৃহের পাশ দিয়ে গৌরপার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করে নব বধূ নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য দূর থেকে তাঁকে দেখলেন, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজও দূর থেকে শ্রীআচার্য্যকে দর্শন করলেন। পরস্পরের দর্শনে নিত্যসিদ্ধ সৌহার্দ্যভাব যেন তখন থেকেই জেগে উঠল। দর্শনের পর মিলনের আকাঙ্খা উভয়ের হতে

লাগল। শ্রীনিবাস আচার্য্য লোকমুখে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের পরিচয় নিলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজও শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিচয় নিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নব বধূ সঙ্গে গৃহে এলেন। কোন রকমে দিনটা কাটালেন। রাত্রিকালে গৃহ থেকে বের হয়ে যাজিগ্রামে এসে কোন এক ব্রাহ্মণ গৃহে রাত্রি যাপন করলেন। প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহে এলেন এবং তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। আচার্য্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে ভূমি থেকে উঠিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন—"জন্মে জন্মে তুমি আমার বান্ধব।" বিধাতা সদয় হয়ে আজ পুনঃ মিলায়ে দিয়েছেন। মিলনে উভয়ের খুব আনন্দ হল। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের অগাধ পাণ্ডিত্য প্রতিভা জেনে আচার্য্য অতিশয় সুখী হলেন। তিনি তখন তাঁকে গোস্বামী গ্রন্থ শ্রবণ করাতে লাগলেন। কয়েকদিন পরে আচার্য্য তাঁকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য পুনঃ শ্রীবৃন্দাবন ধামাভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে কতিপয় ভক্তও বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। আচার্য্য পূর্ব্ব পরিচিত পথে চলতে চলতে গয়াধামে এলেন এবং শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শন করলেন। তথা হতে কাশী এলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর আদি ভক্তগণের দর্শন করলেন। দণ্ডবৎ আদি করতেই সকলে শ্রীনিবাসকে স্নেহে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

শ্রীনিবাস কাশীতে দু-এক দিবস অবস্থান করে শ্রীমথুরা ধামে প্রবেশ করলেন। শ্রীবিশ্রাম ঘাটে স্নান করে আদিকেশব ও জন্মস্থানাদি দর্শন করে শ্রীবৃন্দাবন ধামে এলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের দর্শন প্রতীক্ষা করছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য এসে তাঁর শ্রীচরণ সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করতেই শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে ভূমি হতে তুলে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন এবং গৌড় দেশের বৈষ্ণবগণের কুশল বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করলেন। পুরীধাম থেকে এই

সময় শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুও বৃন্দাবন ধামে এলেন। তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীচরণ বন্দনাদি করলেন, শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে স্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বসিয়ে পুরীধামবাসী বৈষ্ণবগণের কুশল বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের মিলন হল। পরস্পরকে দণ্ডবৎ আলিঙ্গন প্রভৃতি করলেন। তাঁদের খুব আনন্দ হল। তথায় তাঁরা দ্বিজ হরিদাসের অপ্রকট বার্ত্তা শুনে অতিশয় দুঃখিত হলেন। উভয়ে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের নিকট অবস্থান করতে লাগলেন এবং ষট্সন্দর্ভের বিবিধ সিদ্ধান্ত তাঁর কাছ থেকে শুনতে লাগলেন। এই সময় শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী শ্রীগোপাল চম্পূ গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেছেন। তিনি শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দকে মঙ্গলাচরণ শ্লোক পড়ে শুনালেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী তথা অন্যান্য গোস্বামিদিগের সঙ্গে কয়েকমাস সুখে অবস্থান করলেন। এমন সময় গৌড়দেশ থেকে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ তাঁকে গৌড় দেশে নেবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হলেন। গৌড় দেশবাসী ভক্তগণ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীমদ্ জীব গোস্বামীর সাথে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পড়ে বন্দনা করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে তুলে স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে শ্রীরাধারমণ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ আদি বিগ্রহগণকে দর্শন করতে আদেশ করলেন এবং গোস্বামিবৃন্দের শ্রীচরণ দর্শনে আজ্ঞা দিলেন। শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ প্রভু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সব দর্শন করাতে লাগলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের দৈন্য ভক্তি প্রভৃতি দেখে গোস্বামিগণ সকলেই পরম সুখী হলেন। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে বন দর্শনে আদেশ করলেন, তিনি সর্ব্বত্র দর্শন করে রাধাকুণ্ডেশ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ও শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচরণ দর্শনে এলেন। এদিকে শ্রীমদ্ জীব গোস্বামীর আদেশ নিয়ে

শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু গৌড়দেশের দিকে যাত্রা করলেন। বন বিষ্ণুপুরে আগমন করলেন। রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীচরণ দর্শন করে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। রাজপুরে মহাযত্নে নিয়ে শ্রীপাদকে পূজাপূর্ব্বক বিবিধ উপাচারে ভোজন করালেন, রাজগৃহে মহোৎসব আরম্ভ হল। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু রাজার ভক্তি দেখে চমৎকৃত হলেন। এইবার আচার্য্য প্রভু রাজাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। রাজার নাম হল 'শ্রীচৈতন্য দাস'। রাজপুত্র ধাড়ি হাম্বীরও মন্ত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম হল শ্রীগোপাল দাস। শ্রীবীর হাম্বীর আচার্য্যের দ্বারা শ্রীকালাচাঁদের সেবা প্রকট করালেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহের অভিষেক পূজাদি করলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু কয়েকদিন তথায় থাকার পর পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে আসবার উদ্যোগ করলেন। এই সময় শিখরেশ্বর রাজ শ্রীহরিনারায়ণ দেব নিজ গৃহে শ্রীনিবাস আচার্য্যকে বিশেষ আমন্ত্রণ করলেন। সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁর গৃহে শুভ বিজয় করলেন। কয়েক দিন তাঁর গৃহে আচার্য্য অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীভাগবত কথা-গঙ্গা প্রবাহিত করলেন। বহুলোক শ্রীআচার্য্যপাদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য কয়েক দিন শিখরেশ্বর দেশে অবস্থান করে শ্রীখণ্ডে আগমন করলেন এবং অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অপ্রকট বার্ত্তা শুনে ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। আচার্য্য বহু খেদ পূর্ব্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন। তারপর অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীসরকার ঠাকুরের বিরহে বড়ই কাতর হয়েছিলেন। শ্রীনিবাসকে দেখে একটু শান্ত হলেন। কয়েক দিন শ্রীআচার্য্য শ্রীখণ্ডে অবস্থান করার পর কন্টক নগরে এলেন। সেখানে এসে শুনলেন শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কার্ত্তিক মাসে অপ্রকট হয়েছেন। নিদারুণ শোকে আচার্য্যের প্রাণ বিদীর্ণ হতে লাগল। অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক যাজিগ্রামে এলেন এবং স্বগৃহে

ভাগবতগণকে আহ্বান করে এক মহোৎসবের আয়োজন করলেন। অতঃপর মাঘকৃষ্ণ একাদশীতে দ্বিজ হরিদাসের অপ্রকট মহোৎসব করবার জন্য আচার্য্য কাঞ্চনগড়ি নগর অভিমুখে যাত্রা করলেন। কাঞ্চনগড়িতে দ্বিজ হরিদাসের অপ্রকট মহামহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। উৎসবের দিন দ্বিজ হরিদাসের পুত্র শ্রীদাসও শ্রীগোকুলানন্দ আচার্য্য থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করবার পর শ্রীআচার্য্য ফাল্গুন পূর্ণিমায় খেতরির মহোৎসবে যোগ দেবার জন্য যাত্রা করলেন। খেতরিতে এ উৎসবের আয়োজন রাজা সন্তোষ দত্ত করেন। তিনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য। এ উৎসবে স্বয়ং শ্রীজাহ্নবাদেবী আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীনিধি, শ্রীপতি, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, শ্রীগোকুল, শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি গৌর-পার্ষদগণ আগমন করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের অভিষেক পূজাদি করেন। ভোগ রন্ধন শ্রীজাহ্নবা মাতা করেন। ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে অহোরাত্র শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব হয়। ঐ কীর্ত্তনে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হয়ে ভক্তগণকে দর্শন দিয়েছিলেন। ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে সকলে উপবাস করেন। দ্বিতীয় দিবসে পারণ মহোৎসব করা হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ।।

এই ছয় বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা উৎসব হয়। বৈষ্ণব জগতে এইরূপ মহোৎসব ইতঃপূর্ব্বে বিশেষ হয় নাই। রাজা সন্তোষ দত্ত সমাগত বৈষ্ণবগণকে বস্ত্র-মুদ্রাদি দান করেন। বৈষ্ণবগণ রাজা সন্তোষ দত্তকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করেন।

উৎসবের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু যাজি গ্রামে আগমন করেন। বৈষ্ণবগণের আগমনে শ্রীআচার্য্যের গৃহে মহোৎসব আরম্ভ হল। কয়েক দিন পরে তথায় শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও শুভাগমন করলেন।

কয়েক দিন তিনজন যাজিগ্রামে অবস্থানের পর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু উৎকল দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করলেন। নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগৌর গৃহে তাঁরা আগমন করে অতি বৃদ্ধ শ্রীঈশান ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। স্ব-স্ব নাম ধরে তাঁরা পরিচয় জানালেন, ঈশান ঠাকুর উঠে অতি প্রেমভরে সকলকে আলিঙ্গন করলেন। এ সময় শ্রীগৌর-গৃহে একমাত্র ঈশান ঠাকুর অবস্থান করেছিলেন। পরদিবস ভক্তগণ শ্রীঈশান ঠাকুরকে নিয়ে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় বের হলেন। ভক্তগণ অতি আনন্দ ভরে ঈশান ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত সকল শুনতে শুনতে পরিক্রমা করতে লাগলেন। পরিক্রমা সমাপ্ত করে ভক্তগণ শ্রীঈশান ঠাকুরকে বন্দনা পূর্ব্বক বিদায় নিলেন এবং শ্রীখণ্ডে আগমন করলেন। ইতিমধ্যে শ্রীঈশান ঠাকুরের অপ্রকট বার্ত্তা মায়াপুর হতে এল। এ কথা শ্রবণ করা মাত্র ভক্তগণ বিরহে হাহাকার করে উঠলেন। এইরূপে নবদ্বীপ ও মায়াপুরে ক্রমে ক্রমে গৌর পার্ষদগণ প্রায় সকলে অপ্রকট লীলা করলেন।

একদিন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীআচার্য্যকে আনবার জন্য কোন ভক্তকে যাজিগ্রামে প্রেরণ করলেন। শ্রীনিবাস অতি সত্বর শ্রীখণ্ডে এলেন এবং শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর আচার্য্যকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন—"তুমি চিরজীবী হও। প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার কর।" এই সব বলে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীবিগ্রহগণের সামনে এলেন এবং স্বীয় পুত্র কানাইকে ডেকে শ্রীমদন গোপাল ও শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শ্রীচরণে সমর্পণ করলেন। অনন্তর তিন দিন মহাসংকীর্ত্তনে মগ্ন হলেন। শেষ দিবস শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীমদন-গোপাল দেবের শ্রীরূপে নয়নযুগল সমর্পণ করে অন্তর্ধান করলেন।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের অন্তর্ধান দর্শন করে শ্রীনিবাস আচার্য্য, পুত্র কানাই ঠাকুর ও অন্যান্য ভক্তগণ বিরহে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন ও নয়ন জলে ভাসতে

ভাসতে বিবিধ বিলাপ করতে লাগলেন।

অতঃপর শ্রীকানাই ঠাকুর এক মহোৎসবের বিপুল আয়োজন করলেন। চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণবগণকে প্রেরণ করলেন। মহোৎসবের আমন্ত্রণ বৈষ্ণবগণ সর্বত্রই জানালেন। উৎসব দিবসে বৈষ্ণবগণ উপস্থিত হলেন। মহাসংকীর্ত্তন-নৃত্য বৈষ্ণবগণ সমাধি প্রাঙ্গনে আরম্ভ করলেন। সে সংকীর্ত্তনে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর যেন সাক্ষাৎ প্রকট হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের অপ্রকট—শ্রাবণ শুক্লা চতুর্থী তিথিতে। শ্রীনিবাস আচার্য্য উৎসবের দেখা শুনার যাবতীয় কার্য্য করলেন। উৎসব অন্তে বৈষ্ণবগণ সহ তিনিও বিদায় নিয়ে বনবিষ্ণুপুরে রাজা বীর হাম্বীরের গৃহে শুভ বিজয় করলেন। আচার্য্য রাজগৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। চতুর্দ্দিক থেকে বহু ভক্তের সমাগম হতে লাগল। মহারাজ বহু প্রীতি ভরে ভক্ত সেবা করতে লাগলেন। বন বিষ্ণুপুর তৎকালে প্রকৃত বিষ্ণুপুরে পরিণত হল। বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীআচার্য্যের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

রাঢ় দেশের মধ্যে গোকুলপুর গ্রামে শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী নামে একজন পরমভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া নাম্নী তাঁর এক কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ না পেয়ে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সমস্ত কথা ও দায় অর্পণ করলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এক রাত্রি স্বপ্ন দেখছেন যে তাঁরা শ্রীনিবাস আচার্য্যকে কন্যা দান করছেন। এই আশ্চর্য্যজনক স্বপ্ন দেখে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সুখী হলেন। পুনঃ একার্য্য অসম্ভব বলে চিন্তা করলেন। বহুবিধ চিন্তা করতে করতে ব্রাহ্মণ শীঘ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের কাছে এলেন এবং বন্দনা পূর্ব্বক করজোড়ে সামনে দাঁড়ালেন। শ্রীআচার্য্য তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ঈষৎ হাস্য করতে করতে তাঁকে বসতে বললেন এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ

মৌন থাকার পর বললেন আপনার শ্রীচরণে একটী নিবেদন করতে এসেছি। কিন্তু যদি আপনার অভয় পাই, বলতে পারি। আচার্য্য বললেন আপনি নির্ভয়ে বলুন। এবার ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্যার কথা নিবেদন করলেন। আচার্য্য কথা শুনে হাস্য করতে লাগলেন। ভক্তগণ এ সব কথা শুনে বড় সুখী হলেন। পরিশেষে শ্রীআচার্য্য বিবাহ করতে রাজি হলেন।

মহা সমারোহের সহিত মহারাজ বীর হাম্বীর শ্রীআচার্য্যের বিবাহের আয়োজন করলেন। শুভলগ্নে শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার সহ কন্যা এনে শ্রীআচার্য্যের করে সমর্পণ করলেন। শ্রীমতী গৌরাঙ্গ-প্রিয়াকে বিবাহ করবার পর আচার্য্য পত্নীসহ যাজিগ্রামে ফিরে এলেন। ঠিক এই সময় নিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবা দেবীও বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা করে যাজিগ্রামে আচার্য্য গৃহে শুভাগমন করলেন। তাঁকে দর্শন করে আচার্য্যের আনন্দের সীমা রইল না। মহা সমাদরে তাঁর পাদপদ্ম ধৌত করে তাঁকে আসনে বসিয়ে পূজাদি করবার পর নববিবাহিতা গৌরাঙ্গ প্রিয়াকে তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করালেন। সুশীলা সুন্দরী সাক্ষাৎ ভক্তি স্বরূপিণী পত্নী দেখে পরম স্নেহ ভরে কোলে তুলে নিলেন। শ্রীজাহ্নবা দেবী আচার্য্যের পত্নীদ্বয়ের প্রতি বহু প্রীতি প্রকাশের পর শ্রীবৃন্দাবন ধামস্থ গোস্বামিবৃন্দের সংবাদ বলতে লাগলেন। পরম সুখে শ্রীজাহ্নবা মাতা শ্রীআচার্য্য-গৃহে কয়েকদিন থাকবার পর খড়দহ গ্রামে ফিরে এলেন।

যাজিগ্রামে আচার্য্য লইয়া শিষ্যগণে।
গোঙায়েন সদা শাস্ত্রালাপ সংকীর্ত্তনে।।

—(ভঃ রঃ ১৪।১৯২)

শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে ভক্ত শিষ্যগণ সঙ্গে পরম আনন্দে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় সুখে দিন যাপন করতে লাগলেন। আচার্য্যের ঐশ্বর্য্য ও বৈভব দর্শনে সকলে আশ্চর্য্য হতে লাগলেন। তাঁর প্রভাবে মহাপাষণ্ডিগণও

এসে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করতে লাগল।

শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র তিনজন অভিন্ন হৃদয় ছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লিখেছেন—

দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের তিনটী কন্যা ও তিনটী পুত্র হয়। কন্যাদের নাম—কৃষ্ণপ্রিয়া, হেমলতা ও ফুলপি ঠাকুরাণী। পুত্রদের নাম—বৃন্দাবন বল্লভ, রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগতিগোবিন্দ। শ্রীগতিগোবিন্দ ঠাকুরের পুত্র কৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর তাঁর পুত্র জগদানন্দ ঠাকুর। শ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের দুই পত্নী ছিলেন। প্রথম পত্নীর সন্তান যাদবেন্দ্র ঠাকুর ও দ্বিতীয় পত্নীর সন্তান রাধামোহন ঠাকুর, ভুবন মোহন ঠাকুর, গৌর মোহন ঠাকুর, শ্যাম মোহন ঠাকুর ও মদন মোহন ঠাকুর। ভুবন মোহন ঠাকুরের বংশধরগণ মুর্শিদাবাদের মাণিক্যহার গ্রামে এখনও বসবাস করছেন।

শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর

আকুমার ব্রহ্মচারী সর্ব্বতীর্থদর্শী।
পরম ভাগবতোত্তম শ্রীল নরোত্তম দাসঃ।।

পদ্মাবতী নদীতটে গোপালপুর নগরে রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত বাস করতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত। দুই ভাইয়ের ঐশ্বর্য্য ও যশাদির তুলনা হয় না।

রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীনরোত্তম এবং শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের পুত্র শ্রীসন্তোষ দত্ত। মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শুভলগ্নে পুত্রের জন্মে রাজা কৃষ্ণানন্দ আনন্দে বহু দান-দক্ষিণা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ব্রাহ্মণগণ লগ্ন দেখে বললেন পুত্র প্রসিদ্ধ মহান্ত হবে, এর প্রভাবে বহু লোক উদ্ধার হবে।

রাজপুরে দিন দিন শশীকলার ন্যায় শিশু বাড়তে লাগল। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গকান্তি, দীঘল নয়ন, আজানুলম্বিত ভুজযুগল ও গভীর নাভি, — মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ বর্ত্তমান। পুত্র দর্শনের জন্য রাজপুরে সর্ব্বদা লোকজনের সমাবেশ হত। ক্রমে অন্নপ্রাশন চূড়াকরণাদি হল। পুত্রের কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ বহু দান-ধ্যান করলেন।

রাজা কৃষ্ণানন্দের পত্নীর নাম শ্রীনারায়ণী দেবী। তিনি অপূর্ব্ব পুত্র পেয়ে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। তিনি শ্রীনারায়ণের কাছে সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন। শিশু অতিশয় শান্ত, জননী যেস্থানে

রাখতেন সেখানে থাকতেন। অন্তঃপুরে রমণীগণ শিশুকে লালনপূর্ব্বক কত আনন্দ প্রাপ্ত হতেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হলে তার হাতে খড়ি দিলেন। বালক যে বর্ণ একবার গুরু স্থানে শুনতেন তখনই তাহা কণ্ঠস্থ করতেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গত হলেন। পণ্ডিত স্থানে দর্শন শাস্ত্রাদি কিছু কাল অধ্যয়ন করলেন। কিন্তু ভাগবদ্ ভজন বিনা বিদ্যার কোন সার্থকতা হয় না ইহা বিশেষ অনুভব করলেন। পূর্ব্বে বহু বিদ্বান ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে গিয়ে শ্রীহরির উপাসনা করেছেন। শ্রীনরোত্তম দাসের মন দিনের পর দিন সংসারের প্রতি উদাসীন হতে লাগল। তিনি ভোগবিলাসে উদাসীন হলেন। এ সময় শ্রীগৌরসুন্দরের ও নিত্যানন্দের মহিমা ভক্তগণের মুখে শুনে হৃদয়ে পরম আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে শ্রীনরোত্তম শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের গুণে আকৃষ্ট হয়ে দিন রাত ঐ নাম জপ করতে লাগলেন। দয়াময় শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদ একদিন স্বপ্নযোগে নরোত্তমকে দর্শন দিলেন।

অতঃপর কেমনে সংসার ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে যাবেন শ্রীনরোত্তম দিন রাত ভাবতে লাগলেন।

হরি ! হরি ! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।

নয়নে নিরখিব যুগল রূপরাশি।।

এই বলে শ্রীনরোত্তম সর্ব্বদা গাইতে লাগলেন। বিষয়ের প্রতি, ভোগ-বিলাসের প্রতি শ্রীনরোত্তমের বৈরাগ্য দেখে রাজা কৃষ্ণানন্দ ও নারায়ণী দেবী নানা চিন্তা করতে লাগলেন। পুত্র যাতে সংসার ত্যাগ করে যেতে না পারে তজ্জন্য কিছু লোক পাহারা নিযুক্ত করলেন। শ্রীনরোত্তম দেখলেন দুর্গম বিষম পর্ব্বত অতিক্রম করে, তিনি বোধ হয় শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ ভজন ও শ্রীবৃন্দাবন ধামে যেতে পারবেন না। নিরুপায়ভাবে কেবল শ্রীগৌর-

নিত্যানন্দের কাছে কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। ইতি মধ্যে গৌড়েশ্বরের লোক এসে রাজা কৃষ্ণানন্দকে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে বললেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ ও পুরুষোত্তম দত্ত দুই ভাই গৌড়-রাজ-দরবার অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীনরোত্তম সংসার-ত্যাগের ভাল সুযোগ পেল। তখন জননীর কাছ থেকে কোন প্রকারে বিদায় নিয়ে রক্ষক-লোকের অলক্ষ্যে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। কার্ত্তিক পূর্ণিমায় শ্রীনরোত্তম সংসার ত্যাগ করেন। তিনি অতি দ্রুত বঙ্গভূমি অতিক্রম করে শ্রীমথুরা ধামের পথ ধরলেন। যাত্রীগণ শ্রীনরোত্তমের প্রতি অতি স্নেহ করতে লাগলেন, তাঁকে দেখে বুঝলেন কোন রাজকুমার হবে। তিনি কখনও দুধ পান করে, কখনও বা ফলমূলাদি ভোজন করে চলতে লাগলেন। শ্রীবৃন্দাবন ভূমি দর্শনের আশায় তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা চলে গেছে। স্থানে স্থানে লোক মুখে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহিমা শুনে তাঁদের শ্রীচরণ চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েন। চলতে চলতে পতিত পাবন নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব মধুর বৃন্দাবন।।

এইরূপে চলতে চলতে শ্রীনরোত্তম মথুরা ধামে এলেন এবং যমুনাদেবীকে দর্শন বন্দনাদি করলেন। শ্রীরূপ, সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের নাম স্মরণ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনন্তর শ্রীবৃন্দাবন ধামে এলেন। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী তাঁকে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শ্রীচরণ সেবা করতে বললেন। অতি বৃদ্ধ লোকনাথ গোস্বামী শ্রীগৌর-বিরহে অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করছেন। শ্রীনরোত্তম তাঁর চরণ বন্দনা করলে, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী বললেন তুমি কে? শ্রীনরোত্তম বললেন আমি আপনার দীন-হীন দাস, শ্রীচরণ

সেবাকাঙ্খী। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী বললেন—আমি শ্রীগৌর-গোবিন্দের সেবা করতে পারলাম না অন্যের সেবা কি করে নিব। শ্রীনরোত্তম গুপ্তভাবে নিশাকালে গোস্বামীর মূত্র-পুরীষের স্থানাদি সংস্কার করে রেখে দিতেন। কয়েক বছর এই ভাবে সেবা করতে থাকলে, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর কৃপা হল, শ্রাবণ পৌর্ণমাসীতে দীক্ষা প্রদান করলেন।

তিনি মাধুকরী করে খেতেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গোস্বামী-গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে তার চির মিত্রভাব, উভয়ে শ্রীজীবের নিকট অধ্যয়ন করেন। এ সময় গৌড় দেশ থেকে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এলেন; তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। তিনজন একাশয় ও এক হৃদয় ছিলেন। তিনজন একান্তভাবে ব্রজে ভজন করবেন বলে সঙ্কল্প করলেন কিন্তু সে আশা পূর্ণ হল না। একদিন শ্রীজীব গোস্বামী তিনজনকে ডেকে বললেন ভবিষ্যতে তোমাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে হবে। এ গোস্বামী-গ্রন্থরত্ন নিয়ে তোমরা শীঘ্র গৌড় দেশে গমন কর এবং তা প্রচার কর।

তিনজন বৃন্দাবন বাসের সংকল্প ত্যাগ করে শ্রীগুরু-বাণী শিরে ধারণ করলেন। গ্রন্থ রত্ন নিয়ে গৌড় দেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করলেন। বনবিষ্ণুপুরের রাজা দস্যু দলপতি শ্রীবীর হাম্বীর রাত্রে সেই গ্রন্থ রত্নসমূহ হরণ করলেন। প্রাতে গ্রন্থ-রত্ন না দেখে শিরে যেন বজ্রপাত হল। দুঃখিত অন্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করতে করতে খবর পেলেন রাজা বীর হাম্বীর গ্রন্থ হরণপূর্ব্বক উহা রাজগৃহে সংরক্ষণ করছেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু উৎকল অভিমুখে এবং শ্রীনরোত্তম খেতরির দিকে যাত্রা করলেন ও শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামী-গ্রন্থ রাজগৃহ থেকে উদ্ধার করবার মানসে তথায় অবস্থান করতে লাগলেন।

শ্রীনরোত্তম মহাপ্রভুর জন্ম-স্থান দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে শীঘ্র

নবদ্বীপে এলেন। হা গৌর হরি, হা গৌর হরি বলে গঙ্গা তটে তিনি শত শত বার বন্দনা করতে লাগলেন। একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন এবং কোথায় প্রভুর জন্মস্থান ? কি করে দর্শন পাবেন ভাবতে লাগলেন, এমন সময় অতিবৃদ্ধ এক জন ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করলেন। শ্রীনরোত্তম উঠে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন—বাবা কোথা থেকে এসেছ? কি নাম ? শ্রীনরোত্তম নিজ পরিচয় দিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্ম স্থান দর্শনের ইচ্ছা নিয়ে এসেছেন বললেন।

ব্রাহ্মণ বললেন,—আহা, আজ প্রাণ শীতল হল। গৌরের প্রিয় ভক্তের দর্শন পেলাম।

শ্রীনরোত্তম—বাবা ! আপনি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পেয়েছিলেন ?

ব্রাহ্মণ—কি বলব বাবা ! শ্রীনিমাই প্রতিদিন এই ঘাটে বসে শিষ্যগণসহ শাস্ত্র চর্চ্চা করতেন। দূর থেকে আমরা তখন তাঁর কি অপূর্ব্ব রূপ দেখতাম, আজও সেই রূপ স্মরণ করে এই বৃক্ষতলে প্রতিদিন একবার করে আসি। ব্রাহ্মণ বলতে বলতে অশ্রু জলে ভাসতে লাগলেন।

শ্রীনরোত্তম—বাবা ! আজ আপনার চরণ দর্শন করে জীবন ধন্য হল ! এ বলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীনরোত্তম ব্রাহ্মণের চরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন।

ব্রাহ্মণ—বাবা ! আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি গোবিন্দ চরণে ভক্তি লাভ কর। গৌর-গোবিন্দের কথা সর্ব্বত্র প্রচার কর।

অতঃপর ব্রাহ্মণ নরোত্তম দাসকে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে যাবার পথ দেখিয়ে দিলেন। শ্রীনরোত্তম সে পথ দিয়ে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে আগমন করলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি মিশ্র গৃহের দ্বার দেশে সাষ্টাঙ্গ বন্দনাপূর্ব্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনন্তর ভবনে প্রবেশ করে শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর

চরণ দর্শন পেলেন। নরোত্তম তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। অনুমানে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বুঝতে পারলেন ইনি গৌরসুন্দরের কোন কৃপা পাত্র।

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে?

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন বর্ত্তমানে শ্রীব্রজ ধাম, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতির সন্নিকট থেকে এসেছি।

শ্রীশুক্লাম্বর—বাবা, তুমি ব্রজে শ্রীলোকনাথ ও শ্রীজীবের থেকে এসেছ? এ বলে উঠে নরোত্তম দাসকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। অনন্তর তিনি যাবতীয় গোস্বামিগণের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারীর নিকট ব্রজের যাবতীয় সংবাদ যথাযথ বর্ণনা করলেন। অনন্তর শ্রীনরোত্তম শচীমাতার সেবক—অতিবৃদ্ধ শ্রীঈশান ঠাকুরের চরণ বন্দনা করলেন এবং স্বীয় পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীঈশান ঠাকুর তাঁর শির স্পর্শ করে আশীর্ব্বাদ করতে করতে স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। তথায় শ্রীদামোদর পণ্ডিতকেও নরোত্তম বন্দনা করলেন।

অনন্তর শ্রীনরোত্তম শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এসে শ্রীপতি ও শ্রীনিধি পণ্ডিতকে বন্দনা করলেন। তাঁরা স্নেহ ভরে শ্রীনরোত্তমকে আলিঙ্গন করলেন। কয়েকদিন নবদ্বীপ মায়াপুরে থাকার পর শ্রীনরোত্তম শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে এলেন ও শ্রীঅচ্যুতানন্দের চরণ বন্দনা করলেন। পরিচয় পেয়ে শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাদরে তাঁকে আলিঙ্গন এবং ব্রজে গোস্বামিদিগের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন। শান্তিপুরে নরোত্তম দাস দুই দিবস অবস্থানের পর অম্বিকা কালনায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ভবনে এলেন। তখন শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু তথায় অবস্থান করছেন। তিনি গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীনরোত্তম শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করলেন। সাদরে হৃদয় চৈতন্য প্রভু নরোত্তম দাসকে ধরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উপবেশন করলেন এবং ব্রজের গোস্বামিগণের সন্দেশ নিতে লাগলেন।

একদিন অম্বিকা কালনাতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর থাকবার পর গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থলী সপ্তগ্রামে এলেন। এ স্থানে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর থাকতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সপ্তগ্রাম বাসীরা পরম ভক্ত হন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অপ্রকটের পর সপ্তগ্রাম অন্ধকারময় হয়। শ্রীনরোত্তম উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে গমন করলেন। তথায় যে কয়েকজন ভক্ত আছেন প্রভু বিরহে অতি দুঃখে তাঁরা দিন যাপন করছেন। শ্রীনরোত্তম দাস বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করে তথা হতে খড়দহ গ্রামে এলেন।

খড়দহ গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করতেন। তাঁর শক্তিদ্বয় শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবী তথায় অবস্থান করছেন। শ্রীনরোত্তম নিত্যানন্দ ভবনে এসে অঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম স্মরণ পূর্ব্বক গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর শ্রীনরোত্তম দাসকে অন্তঃপুরে শ্রীবসুধা জাহ্নবা মাতার শ্রীচরণে নিলেন। তাঁরা নরোত্তম দাসের পরিচয় এবং শ্রীজীব ও শ্রীলোকনাথের পরম কৃপা পাত্র শুনে খুব অনুগ্রহ করলেন।

সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা বসু-জাহ্নবী ঈশ্বরী।
অনুগ্রহ কৈল যত কহিতে না পারি।।

—(ভঃ রঃ ৮।২১৩)

চার দিবস শ্রীনরোত্তম দাস খড়দহ গ্রামে কৃষ্ণ-কথা আনন্দে অবস্থান করবার পর শ্রীবসুধা জাহ্নবা মাতা থেকে বিদায় নিয়ে খানাকুল কৃষ্ণনগর শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের আলয়ে এলেন। শ্রীনরোত্তম দাস তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। তিনি শ্রীগৌর নিত্যানন্দ বিরহে অতি কষ্টে দিন যাপন করছেন। বাহ্য দশা প্রায় সময় থাকে না। শ্রীনরোত্তম তাঁর এরূপ দশা দেখে বহু ক্রন্দন করলেন। অভিরাম ঠাকুরের গোপীনাথ বিগ্রহ অপূর্ব্ব দর্শন। নরোত্তম দাস বিগ্রহ দর্শন করে বহু স্তব-স্তুতি করলেন। এক দিবস অভিরাম গোপাল ভবনে অবস্থান পর তাঁর অনুমতি নিয়ে নরোত্তম দাস শ্রীনীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর প্রভু-পরিকরগণের স্মরণ করতে করতে শীঘ্র নীলাচলে এলেন। শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীনরোত্তমের পথ নিরীক্ষণ করছিলেন। এমন সময় শ্রীনরোত্তম উপস্থিত হলেন। নরোত্তম শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের চরণে দণ্ডবৎ করতেই আচার্য্য তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—অদ্য তুমি আসবে আমাদের মনে হচ্ছিল। শ্রীনরোত্তম ব্রজবাসী ও গৌড় দেশবাসী ভক্তগণের যাবতীয় সংবাদ প্রদান করলেন।

ভক্তগণ নরোত্তম দাসকে পেয়ে পরম সুখী হলেন, তাঁকে নিয়ে শ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে গেলেন। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা দেবীকে দর্শন করে নরোত্তম বহু স্তব-স্তুতি-দণ্ডবৎ করতে লাগলেন। তারপর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি পীঠে এলেন। নরোত্তম প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তথা হতে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহে আগমন করলেন। নরোত্তম হা গৌর প্রাণ গদাধর বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। তথায় শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন পূর্ব্বক শ্রীমামু গোস্বামী ঠাকুরকে বন্দনা করলেন। তিনি তৎকালে গোপীনাথের সেবা করছিলেন।

অনন্তর শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের কাছে, গোপীনাথের অঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু কিরূপে অন্তর্ধান হন তা' ভক্তগণ বর্ণনা করেন।

ন্যাসি শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কা'র।
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার।।
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন,—পুনঃ না আইলা বাহিরে।।
—(ভঃ রঃ ৮।৩৫৬-৩৫৭)

শ্রীনরোত্তম শ্রবণ মাত্রই হা শচীনন্দন গৌরহরি বলে ভূতলে অচৈতন্য হলেন। ভক্তগণ নরোত্তমের বিরহ আকুলতা দেখে প্রেমে ক্রন্দন করতে

লাগলেন।

অতঃপর শ্রীনরোত্তম কাশী মিশ্র ভবনে শ্রীগোপাল গুরু প্রভুর চরণ দর্শন ও শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ দর্শনাদি করলেন। শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির দর্শনের পথে মহাপ্রভুর লীলাস্থলী জগন্নাথবলভ উদ্যান, নরেন্দ্র সরোবর প্রভৃতি দর্শন করলেন। তিনি কিছুদিন নীলাচলে ভক্তগণ সঙ্গে আনন্দে মহাপ্রভুর বিলাসস্থলী সকল দর্শন করলেন। অতঃপর ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীনৃসিংহপুরে এলেন। এ স্থানে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু অবস্থান করছিলেন। বহুদিন পরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দর্শন করে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। দুইজন প্রেম ভরে পরস্পরকে কত আলিঙ্গন করলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বহু আদর পূর্ব্বক শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে কয়েক দিন নৃসিংহপুরে রাখলেন। শ্রীনরোত্তমের শুভাগমনে শ্রীনৃসিংহপুরে সংকীর্ত্তন বন্যা প্রবাহিত হল। শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীনরোত্তম উভয়ে শ্রীকৃষ্ণ কথানন্দে দিন রাত জ্ঞান রহিত হলেন। অনন্তর শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শীঘ্র শ্রীখণ্ডে এলেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করলেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীনরোত্তম দাসের পিতা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তকে ভালভাবে জানতেন। শ্রীনরোত্তম বন্দনা করতেই শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তাঁর শিরে হাত দিয়ে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ধরে আলিঙ্গন করলেন। নরোত্তম ঠাকুরকে বসিয়ে পুরী ধামের ভক্তগণের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। নরোত্তম ঠাকুরের আগমনে শ্রীখণ্ড আনন্দময় হয়ে উঠল। নরোত্তম ঠাকুর কয়েকদিন শ্রীখণ্ডে ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন নৃত্যাদি রঙ্গে সুখে যাপন করলেন।

শ্রীনরোত্তম শ্রীখণ্ডবাসী গৌর-পার্ষদগণের থেকে বিদায় নিয়ে কণ্টক নগরে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের ভবনে এলেন। গৃহাঙ্গনে দণ্ডবৎ করতেই শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর তাঁকে কোলে তুলে নিলেন।

নরোত্তমে দেখিয়া শ্রীদাস গদাধর।
কোলে করি' সিঞ্চে নেত্রজলে কলেবর।।

—(ভঃ রঃ ৮।৪৪৮)

শ্রীগদাধর দাস প্রভু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিরহে দুঃখে দিন যাপন করছেন। নরোত্তম ঠাকুর দুই দিন তথায় অবস্থান করবার পর রাঢ় দেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন করতে চললেন। নরোত্তম ঠাকুর একচক্রা গ্রামে এলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন করলেন। তথায় কেজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নরোত্তমকে স্নেহ করে শ্রীনিত্যানন্দের বিবিধ লীলাস্থলী দর্শন করালেন। হাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতী দেবীর নাম স্মরণ করে নরোত্তম ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন করার পর খেতরির দিকে যাত্রা করলেন।

খেতরি গ্রামের পথ জিজ্ঞাসি লোকেরে।
অতিশীঘ্র আইলেন পদ্মাবতী তীরে।।
পদ্মাবতীর পার হৈয়া খেতরী যাইতে।
আইলাগ্রামবাসীলোক আগুসরি নিতে।।

— (ভঃ রঃ ৪।৪৬৮)

বহুদিন পরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর খেতরি গ্রামে শুভবিজয় করছেন শুনে আনন্দে খেতরিবাসিগণ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এলেন।

রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত ও শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত পরলোকে গমন করবার

পর পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র শ্রীসন্তোষ দত্ত বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন। তিনি সনজ্জাগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। বহুদিন পরে শ্রীনরোত্তম শুভাগমন করছেন শুনে আনন্দে তাঁকে বহু সম্মান পুরঃসর অভিনন্দন করে আনবার জন্য লোকজন সঙ্গে খেতরি গ্রামের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করছিলেন। অতঃপর দূর থেকে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন এবং অগ্রসর হয়ে আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে চরণ-ধূলি গ্রহণ করলেন। শ্রীনরোত্তম সন্তোষ দত্তকে স্নেহ ভরে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

অতঃপর কয়েক দিবস পর শ্রীসন্তোষ দত্ত শ্রীনরোত্তম ঠাকুর থেকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত মন্দির নির্মাণ পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানালেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সানন্দে অনুমতি প্রদান করলেন।

রাজা সন্তোষ দত্ত কয়েক মাসের মধ্যে বিশাল মন্দির, ভোগশালা, কীর্ত্তন মণ্ডপ ভক্তগণের নিবাস-গৃহ 'সরোবর' পুষ্পোদ্যান ও অতিথিশালা প্রভৃতি নির্মাণ করলেন। ফাল্গুন পৌর্ণমাসী শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মোৎসব বাসরে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহা মহোৎসবের, রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায়, বিপুল আয়োজন আরম্ভ করলেন। দেশ-বিদেশে রাজা, জমিদার, কবি, পণ্ডিত, বৈষ্ণব ও সাহিত্যিক প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করবার জন্য আমন্ত্রণপত্র সহ লোক প্রেরণ করলেন। কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তিকে পুরী, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, কালনা প্রভৃতি স্থানের গৌরপার্ষদগণকে আমন্ত্রণ করতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পত্র সহ প্রেরণ করলেন। দেশ বিদেশে উত্তম উত্তম গায়ক ও বাদকগণকে আমন্ত্রণের জন্য কিছু লোক প্রেরণ করলেন। এককালে ছয়টী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবার উদ্যোগ চলতে লাগল।

খেতরি মহোৎসব

বুধরিগ্রামে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের গৃহের মহোৎসব সেরে ভক্তগণসহ শ্রীনিবাস আচার্য্য খেতরির মহোৎসবের অধিবাসের দুই দিবস পূর্ব্বে খেতরিতে শুভাগমন করলেন। অধিবাসের এক দিবস পূর্ব্বে উড়িষ্যার নৃসিংহপুর হতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, খড়দহ থেকে শ্রীজাহ্নবা মাতার সঙ্গে শ্রীপরমেশ্বরী দাস, কৃষ্ণদাস সরখেল, মাধব আচার্য্য, রঘুপতি বৈদ্য, মীনকেতন রামদাস, মুরারি চৈতন্যদাস, জ্ঞানদাস, মহীধর, শ্রীশঙ্কর, কমলাকর পিপ্লাই, গৌরাঙ্গদাস, নকড়ি, কৃষ্ণদাস, দামোদর, বলরামদাস, শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এলেন। শ্রীখণ্ড থেকে রঘুনন্দন ও অন্যান্য ভক্তগণ, নবদ্বীপ থেকে শ্রীপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি, শান্তিপুর থেকে অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও শ্রীগোপাল প্রভৃতি;অম্বিকা কালনা হতে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ খেতরি গ্রামে উপস্থিত হলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত পদ্মাবতী নদীর পারের জন্য বৃহৎ নৌকা এবং পদ্মাবতী তট হতে খেতরি পর্য্যন্ত পাল্কী ও গো যান প্রভৃতির সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও রাজা সন্তোষ দত্ত বৈষ্ণবগণের অভিগমন পূর্ব্বক সাদরে বহু সম্মান পুরঃসর পুষ্প মাল্যাদি দিয়ে অভিনন্দন পূর্ব্বক আনয়ন করেন। বৈষ্ণবগণের থাকবার জন্য পৃথক গৃহ ও ভৃত্য প্রস্তুত ছিল। ভুবনপাবন বৈষ্ণবগণের পদধূলিতে খেতরিগ্রাম মহাতীর্থে পরিণত হল। শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন কোলাহলে গগন পবন পূর্ণ হল।

শ্রীভগবদ্ মন্দির ও অন্যান্য গৃহের দ্বারে দ্বারে কদলী স্তম্ভ, মঙ্গলঘট, পাত্র মধ্যে মাঙ্গলিক দ্রব্য সমূহ, পত্র পুষ্পের বৃহৎ তোরণ সকল দ্বারে দ্বারে ও সর্ব্বত্র স্বস্তিক চিহ্ন দ্বারা অপূর্ব্ব শোভা পাচ্ছিল। উৎসব মণ্ডপের কোন স্থানে পর্ব্বত প্রমাণ মৃৎভাণ্ড সকল, কোন স্থানে রজত পাত্র সকল, কোন স্থানে দুধের বৃহৎ বৃহৎ গাগরী, কোন স্থানে ঘৃতের গাগরী, কোন স্থানে সহস্র

সহস্র ভাণ্ড দধি, কোন স্থানে উৎসবের তরিতরকারি পর্বত প্রমাণে শোভা পাচ্ছিল।

অধিবাস দিবসে বৈষ্ণবগণ শ্রীজাহ্নবা মাতার আদেশ নিয়ে শ্রীশ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহামহোৎসবের অধিবাস কার্য্য করতে লাগলেন। সন্ধ্যাকালে অধিবাস সংকীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রথমে চন্দন মাল্যাদি দ্বারা শ্রীজাহ্নবা মাতার পূজা করলেন। অনন্তর বৈষ্ণবগণকে মালা চন্দনে ভূষিত করলেন। শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুরোধে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর মঙ্গলাচরণ গীত আরম্ভ করলেন। মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত মঙ্গল অধিবাস সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি হবার পর বৈষ্ণবগণ বিশ্রাম করলেন।

বহু সহস্র ব্যক্তি অধিবাস মহোৎসবের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্রীশ্রীগৌর-আবির্ভাব মহামহোৎসবের ও শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট মহামহোৎসবের প্রাতঃকাল হতে বৈষ্ণবগণ মহা-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের অভিষেক কার্য্যাদি করতে লাগলেন। পূর্বাহ্নে অভিষেক মুহূর্ত্তে শ্রীনিবাস আচার্য্য ছয় বিগ্রহ সাথে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করলেন। তখন দেশ-বিদেশ থেকে আগত বাদ্যকারগণ বিবিধ যন্ত্র বাদন, গায়কগণ মধুর সংগীত ও নর্ত্তকগণ মধুর নৃত্যাদি আরম্ভ করলেন। অপর দিকে বৈষ্ণবগণের মধুর নাম সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক আনন্দময় হচ্ছিল।

যথাবিধানে অভিষেক কার্য্য শ্রীআচার্য্য সমাপ্ত করবার পর বিগ্রহগণকে অপূর্ব বস্ত্র অলংকারে বিভুষিত করলেন। অতঃপর বিবিধ মিষ্টান্ন তরি-তরকরী পিঠা পানা প্রভৃতি সহস্র প্রকার বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধারমণ এবং শ্রীরাধাকান্ত এই ছয় বিগ্রহের পৃথক পৃথক্ পাত্রে ভোগ নিবেদন করলেন। ভোগ অর্পণ কীর্ত্তন হবার পর আচমন দিয়ে তাম্বুল বাটীকা অর্পণ করলেন;অনন্তর গন্ধ চন্দন মাল্যাদি দ্বারা বিগ্রহগণকে

ভূষিত করে, মহা আরত্রিক করলেন। আরত্রিক সংকীর্ত্তনাদি বৈষ্ণবগণ মহানন্দ ভরে করতে লাগলেন। কীর্ত্তন নৃত্যাদির পর সকলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করলেন।

তারপর শ্রীনিবাস আচার্য্য ভগবদ্‌প্রসাদী চন্দন মালা শ্রীজাহ্নবা মাতাকে অর্পণ করলেন। অনন্তর বৈষ্ণবগণকে প্রদান করলেন। শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ সকলকে প্রসাদী চন্দন মালা দেওয়া শেষ হলে, জাহ্নবা মাতার আদেশে শ্রীনৃসিংহচৈতন্য দাস তিনজনকে প্রসাদী চন্দন মালা পরিয়ে দিলেন। বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন মণ্ডপে যথাযথ আসন গ্রহণ করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা কীর্ত্তন মণ্ডপের সম্মুখে উত্তম আসনে উপবিষ্ট হলেন। অনন্তর শ্রীজাহ্নবা মাতার ও শ্রীঅচ্যুতানন্দের আদেশে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীগোকুল দাস, ও শ্রীবল্লভ দাস প্রভৃতি তাঁর দোঁহারী করতে লাগলেন, দেবী দাস মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন। পূর্বোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ দাসাদি নিবদ্ধ, অনিবদ্ধ, শ্রুতি, স্বর, গ্রাম ও মূর্চ্ছনাদিতে পটু ছিলেন।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সেই সুমধুর কীর্ত্তন ধ্বনি ও স্বর-মূর্চ্ছনাদিতে চতুর্দ্দিকস্থ অগণিত নরনারী প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। সকলে বৈকুণ্ঠানন্দ সুখসিন্ধুতে বিহার করতে লাগলেন, অধিক কথা কি স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদ সেই সংকীর্ত্তনে উদিত হলেন।

কহিতে কি—সংকীর্ত্তন সুখের ঘটায়।
গণসহ অবতীর্ণ হইলা গৌররায়।।
মেঘেতে উদয় বিদ্যুতের পুঞ্জ যৈছে।
সংকীর্ত্তন-মেঘে প্রভু প্রকটয় তৈছে।।
—(ভঃ রঃ ১০।৫৭১-৫৭২)

মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনরহরি, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈত

আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমাধব ঘোষ, শ্রীবাসু ঘোষ, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, আচার্য্য পুরন্দর, শ্রীমহেশ, শ্রীশংকর, শ্রীধর, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত, শ্রীযদুনন্দন ও শ্রীকাশীশ্বর প্রভৃতি প্রভু-পার্ষদগণ প্রকটিত হয়ে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন। এঁদের সঙ্গে শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি প্রভৃতি মিলিত ভাবে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন।

কিবানন্দে বিহ্বল অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কিবা ভক্ত মণ্ডলী মধ্যেতে গৌরচন্দ্র।।
প্রকাশিলা প্রভু কিবা অদ্ভুত করুণা।
কিবা এ বিলাস! ইহা বুঝে কুন জনা।।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কিবা অনুগ্রহ।
দুঁহু অভিলাষ পূর্ণ কৈলা গণসহ।।

—(ভঃ রঃ১০।৬০৫-৬০৭)

ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি নিজগণ সহ অবতীর্ণ হয়ে শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের অভিলাষ পূর্ণ করলেন। সংকীর্ত্তন অন্তে শ্রীজাহ্নবা মাতা শ্রীবিগ্রহগণকে ফাগু অর্পণ করে বৈষ্ণবদের ফাগু খেলতে আদেশ করলেন। বৈষ্ণবগণ আনন্দ ভরে ফাগু খেলতে লাগলেন।

কিবা পরস্পর ফাগু খেলায় বিহ্বল।
কিবা ফাগুময় অঙ্গ করে ঝলমল।।

—(ভঃ রঃ ১০।৬৫১)

এভাবে ফাগু খেলায় অপরাহ্ন কাল সমাপ্ত হ'লে বৈষ্ণবগণ সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক গীত আরম্ভ করলেন। সন্ধ্যা কালে স্নানাদি করে শ্রীনিবাস আচার্য্য অভিষেক কার্য্য করতে লাগলেন।

তথাহি অভিষেক গীত—

ফাল্গুন পূর্ণিমা মঙ্গলের সীমা
প্রকট গোকুল ইন্দু।
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
উথলে আনন্দ সিন্ধু।।
কিবা কৌতুক পরস্পরে।
শচীদেবী ভালে পুত্র লৈয়া কোলে
বিলাসে সূতিকা ঘরে।।
বালক দেখিতে ধায় চারিভিতে
কেহ না ধরয়ে ধৃতি।
গ্রহণান্ধকারে কে চিনে কাহারে
অসংখ্য লোকের গতি।।
বালক মাধুরী দেখি আঁখি ভরি
পাসরে আপন দেহ।
নরহরি কয় শচীর তনয়
প্রকাশে কি নবনেহা।।

অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত রাত কিভাবে কেটে গেল কেহ জানতে পারলেন না। অতঃপর মঙ্গল আরতি আরম্ভ হল। মঙ্গল আরতির নৃত্যগীত সমাপ্ত হলে বৈষ্ণবগণ দণ্ডবৎ করে নিজ নিজ কুটিরে গমন করলেন এবং প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি করতে লাগলেন। এ দিকে শ্রীজাহ্নবা মাতা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরন্ধনের জন্য রন্ধনশালায় প্রবেশ করলেন। রন্ধনবিদ্যানিপুণা শ্রীজাহ্নবা মাতা অল্প সময়ের মধ্যে বহু প্রকার ব্যঞ্জন তরকারী মিষ্টান্ন পিঠা পানাদি তৈরি করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের স্নান অভিষেক পূজাদি সেরে ভোগ লাগালেন।

অতঃপর ভোগ আরত্রিক অন্তে মহান্তগণ মহাপ্রসাদ ভোজন করতে বসলেন। স্বয়ং জাহ্নবা মাতা পরিবেশন করলেন। মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনি সহ ভাগবতগণ প্রসাদ সেবা করতে লাগলেন। মহান্তগণের প্রসাদ পাওয়া শেষ হ'লে শ্রীজাহ্নবা মাতার অনুরোধে শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রসাদ পেলেন। সর্ব্বশেষে শ্রীজাহ্নবা মাতা প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

বাহিরের মণ্ডপে উৎসবে আগত সহস্র সহস্র লোককে রাজা সন্তোষ দত্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করলেন। সমস্ত বন্ধুবান্ধব অতিথি ব্রাহ্মণাদির প্রসাদ গ্রহণ সমাপ্ত হলে রাজা গৃহ পরিজনের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় দিবসে রাজা সন্তোষ দত্তের একান্ত অনুরোধে ভাগবতগণ নিজ নিজ কুটীরে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন পূর্ব্বক ভগবানকে অর্পণ করতঃ গ্রহণ করলেন।

তৃতীয় দিবসে বৈষ্ণবগণ যথাস্থানে বিজয় করতে উদ্যোগ করলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভাগবতগণকে মুদ্রা, বস্ত্র ও বিবিধ প্রকার জল পাত্রাদি অর্পণ করতঃ ভাগবতগণকে বন্দনা করলেন। ভাগবতগণ রাজাকে বহু আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় নিলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা নিজ পরিকরসহ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। খেতরিতে কয়েকদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু অবস্থান করবার পর তাঁরাও যথাস্থানে বিদায় হলেন।

খেতরির এ মহোৎসবের পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের যশ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। রামকৃষ্ণ আচার্য্য ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আদি বিদ্বান্ মণ্ডলী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পাদপদ্মে আশ্রয় নিলেন।

গোপালপুর গ্রামে শ্রীবিপ্রদাস নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। অকস্মাৎ তাঁর গৃহে একদিন শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শুভ বিজয় করলেন। বিপ্রদাস বড়ই সুখী হলেন, যথাবিধি আসনাদি দিলেন। বিপ্রদাসের ধানের গোলায় এক

ভয়ঙ্কর সর্প বাস করছিল, তার ভয়ে কেহ গোলার ধারে যেতে পারত না। এই কথা বিপ্রদাস শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে বললেন। শুনে ঠাকুর মহাশয় ঈষৎ হাস্য করলেন, বললেন কোন চিন্তা কর না। ঠাকুর মহাশয় গোলার দরজা খুলতেই সর্প অন্তর্ধান হল।

গোলা হৈতে প্রিয়া সহ শ্রীগৌরসুন্দর।
ক্রোড়ে আইলা—হৈল সৰ্ব্ব নয়ন গোচর।।
—(ভঃ রঃ ১০।২০২)

সকলে দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হল যে গোলা খুলতেই গোলার ভিতর থেকে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বেরিয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কোলে উঠলেন। সে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ নিয়ে ঠাকুর মহাশয় খেতরিতে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। বৰ্ত্তমানে বিগ্রহ গাম্ভীলাতে আছেন।

শ্রীঠাকুরের যশ মহিমা

কোন সময় একস্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক নিজ ছাত্রদের কাছে শ্রীঠাকুর মহাশয়কে শূদ্র বুদ্ধি করে তাঁকে নিন্দা করেন। সেই অপরাধে ব্রাহ্মণের সৰ্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হয়। রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ব্রাহ্মণ গঙ্গায় ডুবে মরবেন সঙ্কল্প করলেন। সে রাত্রে ভগবতী দেবী ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে বললেন—"তুই পরম ভাগবত শ্রীনরোত্তমকে শূদ্র বুদ্ধি করেছিস্, তোর কোটি জন্মেও নিস্তার নাই, তুই যদি তাঁর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিস্ তো তোর ভাল হবে।"

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ গলবস্ত্র হয়ে দীন ভাবে ক্রন্দন করতে করতে শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে পতিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কুষ্ঠ রোগ সেরে গেল। শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁকে কৃষ্ণ-ভজন করতে উপদেশ দিলেন; তিনি ঠাকুর মহাশয়ের ভক্ত হলেন।

একদিন শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ পদ্মাবতী নদীতে

স্নান করতে যাচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন—দুই ব্রাহ্মণ কুমার অনেক ছাগ মেষ নিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর মহাশয় বললেন এ দুই ব্রাহ্মণ কুমার যদি হরি ভজন করত তাদের রূপ যৌবনাদি সার্থক হত। ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় এ কথা শুনতে পেল। তারা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের দিব্য মূর্তি ও মধুর বাক্য শুনে তাঁদের পাশে এল এবং বিনীত ভাবে বন্দনা করল। ঠাকুর মহাশয় তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল আমরা গোয়াস গ্রামের জমিদার শ্রীশিবানন্দ আচার্য্যের পুত্র। আমাদের নাম হরিরাম ও রামকৃষ্ণ। গৃহে দুর্গাপূজা হচ্ছে, পিতার আদেশে বলি দেওয়ার জন্য এসব ছাগ মেষ নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা আমাদের কিছু উপদেশ প্রদান করুন। আপনাদের দেখে বড় শান্তি পাচ্ছি।

ব্রাহ্মণ পুত্রদ্বয়ের দৈন্যভাব দেখে শ্রীঠাকুর মহাশয় মধুর হাস্যপূর্ব্বক ভগবদ্ তত্ত্ব কথা বলতে লাগলেন। বেদোক্ত যে কর্মকাণ্ড তাহা রাজস ও তামস ভাবযুক্ত, পরিণামে নরকপ্রদ। বেদোক্ত কর্মকারী কর্মিগণ পুণ্য ক্ষয়ে স্বর্গ হতে চ্যুত হয় এবং নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। বিষয় দ্বারা আচ্ছন্নমতি বিষয়ী বেদের আপাততঃ মধুর বাক্য বহুমানন পূর্ব্বক জীব-হত্যাদি করে ও অন্তে নরক যন্ত্রণা পেয়ে থাকে। সমস্ত জীব ভগবদ্ শক্তি। পরমাত্মদর্শী, হিংসা-শূন্য, নিরহঙ্কার ভগবদ্ ভজনকারীগণ বাস্তবতঃ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ পাদপদ্ম লাভ করতে পারে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মুখে এই সমস্ত কথা শুনে ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় উঠে ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে বললেন, অধম ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয়কে চরণরজঃ দিয়ে কৃপা করুন। ঠাকুর মহাশয় তাদের শিরে হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।—"তোমাদের কৃষ্ণ-ভক্তি হউক।"

ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় ছাগ ও মেষগুলিকে ছেড়ে দিয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয় ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে পদ্মাবতী নদীতে স্নান করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে

এলেন। সে দিবস প্রসাদ পাওয়ার পর পুনঃ তারা ঠাকুর মহাশয়ের ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নিকট থেকে বিবিধ তত্ত্ব-কথা শ্রবণাদি করলেন। দ্বিতীয় দিবসে মস্তক মুণ্ডন পূর্বক শ্রীহরিরাম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ থেকে এবং রামকৃষ্ণ শ্রীঠাকুর মহাশয়ের থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

এদিকে তাদের পিতা শিবানন্দ আচার্য্য খোঁজ করতে করতে দেখলেন পুত্রদ্বয় খেতরিতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তথায় বাস করছে। শিবানন্দ আচার্য্যের ক্রোধের সীমা রইল না।

কিছুদিন পরে দুই ভাই গৃহে ফিরে এলেন। তাঁদের ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র, কণ্ঠে তুলসী মালা, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ও শিরে শিখা দেখে শিবানন্দ আচার্য্য অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন—

ওরে মূর্খ কহ দেখি কোন্ শাস্ত্রে কয়।
ব্রাহ্মণ হৈতে কি বৈষ্ণব বড় হয়?
ভগবতী নিগ্রহ করিলা এতদিনে!
বৃথাই জীবন তোর ভগবতী বিনে।।
বিপ্রে শিষ্য কৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব।
পণ্ডিতের সমাজে করাব পরাভব।।

—(শ্রীনরোত্তম বিলাস ১০।৪৩-৪৪)

পিতার এই সমস্ত কথা শুনে কুমারদ্বয় বলতে লাগলেন—

ধর্মে কিংবা কর্মে অন্যের হিংসা হয়—দুঃখ হয় তা ধর্ম কিংবা কর্ম বলে অভিহিত হতে পারে না। তার নাম অকর্ম কিংবা অধর্ম। ওহে পিতঃ! শ্রীশালগ্রাম নারায়ণ ছাড়া কোন দেব-দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে পারে কি? সেই শ্রীনারায়ণ ভজন বাদ দিয়ে কেবল দেব-দেবীর পূজা নিরর্থক মনে করি।

শিবানন্দ আচার্য্য ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ পুত্রদ্বয়ের কাছে সিদ্ধান্তে পরাভূত হলেন। মনে মনে শিবানন্দ আচার্য্য বিচার করলেন, একটী বড় স্মার্ত্ত পণ্ডিত এনে এদের পরাভূত করব এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম ছোট বলে প্রতিপাদন করব। মিথিলা থেকে স্মার্ত্ত মহাপণ্ডিত মুরারিকে শিবানন্দ আচার্য্য নিয়ে এলেন এবং এক তর্ক সভার আয়োজন করে পুত্রদ্বয়কে তথায় ডাকলেন এবং বললেন তোমরা কি সিদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণব বড় বলছ তা এ সভার মধ্যে বল।

শ্রীহরিরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ দুইজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণ পূর্ব্বক ভাগবত সিদ্ধান্ত দ্বারা স্মার্ত্ত মত খণ্ড বিখণ্ড করতে লাগলেন। স্মার্ত্ত মহাপণ্ডিত মুরারি তাঁদের সামনে কোন যুক্তি উত্থাপন করতে পারলেন না। পরিশেষে তিনি অধোবদনে সভা ত্যাগ করলেন ও লজ্জায় ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করলেন।

শিবানন্দ আচার্য্য পরাভূত হয়ে রাত্রে দেবীর চিন্তা করতে লাগলেন। নিদ্রিত হ'লে দেবী স্বপ্নে বলতে লাগলেন—ওহে শিবানন্দ! সকলের পতি, গতি ও প্রভু হলেন শ্রীহরি। তাঁকে অবজ্ঞা করে যারা আমাকে ভজন করে আমি তাদের বিনাশ করে থাকি। যারা শ্রীহরিকে মানে না তারা দৈত্য। যারা শ্রীহরির প্রিয় ভক্ত, তাঁরাই বাস্তব আমার প্রিয়। তুই যদি রক্ষা পেতে চাস্ তবে নরোত্তমের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নতুবা বৈষ্ণব অপরাধী তোকে আমি বিনাশ করব। দেবী শিবানন্দ আচার্য্যকে এইরূপ বাক্যে শাসন করে অন্তর্হিতা হলেন।

গাম্ভীলা গ্রামে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামে একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীমুখে গোস্বামী সিদ্ধান্ত শুনে একান্তভাবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করলেন এবং ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ একান্ত দেবীর উপাসনা করতেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখছেন দেবী তাঁকে বলছেন—ওহে সরল বিপ্র! তুমি শ্রীনরোত্তমের নিকট যাও ও তাঁর আশ্রয় করে কৃষ্ণ ভজন কর। তোমার পরম কল্যাণ হবে। কৃষ্ণই আমাদের প্রভু, পতি ও গুরু। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমরা কেহ স্বতন্ত্র হয়ে চলতে পারি না।

জগন্নাথ আচার্য্য প্রাতঃকালে স্নানাদি সেরে খেতরি গ্রামে এলেন এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করে সমস্ত কথা বললেন। শুনে ঠাকুর মহাশয় হাস্য করে বললেন আপনার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ আছে। শুভদিনে ঠাকুর মহাশয় তাঁকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের স্নিগ্ধ শিষ্য হলেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মহিমা দেখে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ সমাজ ঈর্ষায় দগ্ধ হতে লাগল। সকলে রাজা নরসিংহের কাছে গিয়ে নালিশ করল মহারাজ! আপনি যদি ব্রাহ্মণ সমাজকে না বাঁচান, তবে তারা ধ্বংস হবে। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণগণকে শিষ্য করছে এবং যাদু করে সকলকে মুগ্ধ করছে।

রাজা নরসিংহ বললেন—আমি আপনাদের রক্ষা করব। আমায় কি করতে হবে বলুন। ব্রাহ্মণগণ বললেন মহাদিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা খেতরি যাব এবং নরোত্তমকে পরাভূত করব। সে আমাদের সামনে কিছু বলতে পারবে না। এতে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

রাজা নরসিংহ বললেন আমি স্বয়ং আপনাদের সঙ্গে যাব। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ দিগ্বিজয়ী রূপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে খেতরি গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করলেন। একজন লোক এসে খেতরিতে শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ-আদির নিকট জানালেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী এসব শুনে বড় দুঃখিত হলেন। তখন দুইজন অনুসন্ধান করে জানলেন স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কুমারপুরের বাজারে একদিন বিশ্রাম করে খেতরিতে আসবেন। তাঁরা শীঘ্রই কুমারপুরের বাজারে এলেন এবং দুইজন দুইখানি দোকান খুললেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ কুম্ভকারের দোকান ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী পান সুপারির দোকান।

এদিকে রাজা নরসিংহ সঙ্গে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কুমারপুর বাজারে এলেন এবং বাজারের বৃহৎ দোকান গৃহাদিতে অবস্থান করতে লাগলেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের ছাত্রগণ কুম্ভকারের দোকানে এলে হাঁড়ি কিনতে;কুম্ভকার (রামচন্দ্র কবিরাজ) সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ছাত্রগণও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগল, ক্রমে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। এদিকে পান সুপারির দোকানদারের (গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী) সঙ্গে ছাত্রদেরও তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। ক্রমে অধ্যাপকগণ তর্ক-বিতর্ক ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁদের সঙ্গে কথা আরম্ভ হল। অধ্যাপকগণও তাঁদের কথার জবাব দিতে পারছেন না। পরিশেষে রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ পণ্ডিত সেখানে এলেন। কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত বিচারে পণ্ডিত রূপনারায়ণ তথায় পরাস্ত হলেন। চতুর্দ্দিকে মহাকোলাহল হতে লাগল। বাজারের কুম্ভকার তাম্বুলিকের সহিত স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ পরাভূত হলেন। তখন রাজা নরসিংহ অনুসন্ধান নিলেন এই কুম্ভকার ও তাম্বুলিক শ্রীল নরোত্তম দাসের শিষ্য। তিনি পণ্ডিতগণকে বললেন আপনারা যখন তাঁর এই সামান্য শিষ্যগণের সঙ্গে সিদ্ধান্ত বিচারে পারেন না, তখন তাঁর সঙ্গে কিরূপে বিচার করবেন? স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ নীরবে তথা হতে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

রাত্রিকালে রাজা নরসিংহ ও শ্রীরূপনারায়ণ স্বপ্নে দেখলেন স্বয়ং দুর্গাদেবী বলছেন—"যদি শ্রীনরোত্তমের চরণে শরণ না নিস্ এ খড়্গ দ্বারা সকলকে বিনাশ করব।" প্রাতঃকালে রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ শ্রীনরোত্তম

ঠাকুরের সন্নিধানে এলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁদের বহু আদর সৎকার পূর্ব্বক বসালেন এবং দৈন্য করে বললেন আপনাদের ন্যায় সজ্জন পণ্ডিতের দর্শনে আমি ধন্য হলাম। রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের বৈষ্ণবীয় নম্র ব্যবহারে একেবারেই মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। পরিশেষে দেবীর কথা জ্ঞাপন করলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শুনে মৃদুহাস্য করলেন। অনন্তর কিছুদিন বাদ তাঁদের রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান করলেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অন্তর্দ্ধান

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নিরন্তর গৌর নিত্যানন্দের গুণ গানে বিভোর থাকতেন। দিনের পর দিন কত পাষণ্ড তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে পবিত্র হতে লাগলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গেলেন। কয়েকমাস বাদ তথায় তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। বোধ হয় এই নিদারুণ সংবাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রাপ্ত হলে, ভক্ত বিরহ সইতে অক্ষম হয়ে তিনিও কয়েক দিন বাদে নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। এ সব নিদারুণ সংবাদ পেয়ে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বিরহ সিন্ধুতে যেন নিমজ্জিত হলেন। কাতর কণ্ঠে গাইতে লাগলেন—"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।।" এ নিদারুণ বিরহ সিন্ধুতে ভাসতে ভাসতে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ভক্তগণ সঙ্গে গঙ্গাতটে গাম্ভীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে এলেন। ভক্তগণকে ঠাকুর মহাশয় নাম-সংকীর্ত্তন করতে আদেশ করলেন। ভক্তগণ নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। অতঃপর সংকীর্ত্তন সহ ঠাকুর মহাশয় গঙ্গাতীরে এলেন এবং সজল নয়নে গঙ্গা দর্শন করতে করতে দণ্ডবৎ করলেন; অনন্তর স্নান করলেন। গঙ্গা তীরে স্বল্পজলে উপবেশন করলেন, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করতে লাগলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী দুই দিকে কীর্ত্তন করছেন।

ইতিমধ্যে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় দুই জনকে বললেন শ্রীগঙ্গাজলে আমার অঙ্গ মার্জ্জন কর। এই বলে তিনি নামসংকীর্ত্তনে মগ্ন হলেন। কীর্ত্তন করতে করতে তাঁরা গঙ্গাজল নিয়ে যখন অঙ্গ মার্জ্জন করতে উদ্যত হলেন তৎক্ষণাৎ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন করতে করতে শ্রীগঙ্গার সহিত মিলিত হয়ে গেলেন।

কার্ত্তিক কৃষ্ণ পঞ্চমীতে তিনি অপ্রকট লীলা করলেন।

—ঃঃ০ঃঃ—

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

(শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ)

জয় সনাতনরূপ, প্রেমভক্তি রসকূপ,
যুগল উজ্জ্বলময় তনু।
দুঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক,
প্রকটিল কল্পতরু জনু।।
প্রেমভক্তি রীতি যত, নিজ গ্রন্থে সুব্যাকত,
করিয়াছেন দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল মধুর রসাশ্রয়।।
যুগল কিশোর প্রেম, জিনি লক্ষবান হেম,
হেন ধন প্রকাশিলা যাঁরা।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে সেই ধন,
সে রতন মোর গেল হারা।।
ভাগবত শাস্ত্র মর্ম, নববিধ ভক্তিধর্ম,
সদাই করিব সুসেবন।

অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই,
এই ভক্তি পরম কারণ।।
সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে।
কর্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে।।
আন কথা আন ব্যথা, নাহি যেন যাই তথা,
তোমার চরণ স্মৃতি মাঝে।
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল,
গাই যেন সতের সমাজে।।
অন্য ব্রত অন্য দান, নাহি করোঁ বস্তু জ্ঞান,
অন্য সেবা অন্য দেবপূজা।
হাহা কৃষ্ণ বলি বলি, বেড়াব আনন্দ করি,
মনে আর নহে যেন দুজা।।
জীবনে মরণে গতি, রাধকৃষ্ণ প্রাণপতি,
দোঁহার পিরীতি রস সুখে।
যুগল ভজয়ে যাঁরা, প্রেমানন্দে ভাসে তাঁরা,
এই কথা রহু মোর বুকে।।
যুগল চরণ সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
যুগলেতে মনের পিরীতি।
যুগল কিশোররূপ, কামরতি গুণভূপ,
মনে রহু ও লীলা পিরীতি।।
দশনেতে তৃণ ধরি, হাহা কিশোর কিশোরী,
চরণাব্জে নিবেদন করি।

ব্রজরাজসুত শ্যাম, বৃষভানুসুতা নাম,
শ্রীরাধিকা নাম মনোহারী।।
কনক কেতকী রাই, শ্যাম মরকত তায়,
কন্দর্প দ রপ করু চুর।
নটবর শিরোমণি, নটিণীর শিখরিণী,
দুঁহু গুণে দুঁহু মনঝুর।।
শ্রীমুখ সুন্দরবর, হেমনীল কান্তি ধর,
ভাব ভূষণ করু শোভা।
নীল পীতবাসধর, গৌরী শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুহেঁ শোভা।।
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
তছু পায় নরোত্তম কহে।
দিবানিশি গুণ গাঙ, পরম আনন্দ পাঙ,
মনে এই অভিলাষ হয়ে।।
জয়রে জয়রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেম ভকতি মহারাজ।
যা কর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ।।
প্রেম মুকুটমণি, ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গাহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন, খেতরি মাহ বৈঠত,
সঙ্গাহি ভকত সমাজ।।
সনাতন রূপকৃত, গ্রন্থ ভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।

রাধা মাধব, যুগল উজ্জ্বলরস,
পরমানন্দ সুখসার।।
শ্রীসংকীর্ত্তন, বিষয়ে রসে উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান।
যোগ দান ব্রত, আদি ভয়ে ভাগত,
রোয়ত করম গেয়ান।।
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতিধন,
তাকে গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ।।
অভকত চোর, দুরাহি ভাগি রহুঁ,
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে, দেয়ল ভকতি ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি জানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।।"

শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম, শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন ছিলেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণের বাণী পৃথিবীতে প্রচার করবার জন্য তাঁরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু আবির্ভূত হন উৎকলে ধারেন্দা বাহাদুরপুরে। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম শ্রীদুরিকা। সদ্‌গোপ বংশে জাত শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের বহু পুত্র কন্যা গতাসু হবার পর এ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এজন্য এর নাম রাখা হয়েছিল দুঃখিয়া। সকলে বলতে লাগলেন এ ছেলে মহাপুরুষ হবে। চৈত্র পূর্ণিমার শুভক্ষণে শ্রীশ্রীজগন্নাথের কৃপায় এ জন্মেছে। বোধ হচ্ছে শ্রীজগন্নাথদেব জগতে নিজের কথা প্রচার করবার জন্য একে এনেছেন, একে যত্নে পালন কর। পুত্রটি মদনের ন্যায়। দর্শনে নয়ন মন জুড়িয়ে যায়।

ছেলের ক্রমে অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও বিদ্যারম্ভ প্রভৃতি হ'ল। শিশুর অদ্ভুত মেধা দেখে পণ্ডিতগণ বিস্মিত হ'তে লাগলেন। বালক অল্প কাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। গ্রামবাসী বৈষ্ণবগণের মুখে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহিমা শ্রবণ করতে করতে তাঁদের শ্রীচরণে বালকের প্রবল অনুরাগ উৎপন্ন হ'ল। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল পরম ভাগবত পুরুষ ছিলেন। তিনি পুত্রকে সর্ব্বদা গৌর-নিত্যানন্দের ভাবে আবিষ্ট দেখে মন্ত্র গ্রহণ করতে বললেন।

বালক বললো শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু আমার গুরু, তিনি অম্বিকা কালনায় আছেন। তাঁর গুরু শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দুই ভাই তাঁর গৃহে নিত্য বিরাজ করছেন। যদি আজ্ঞা দেন, তথায় গিয়ে তাঁর শিষ্য হই।

শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল বললেন, দুঃখিয়া! তুমি সেখানে কেমনে যাবে?

দুঃখিয়া—বাবা! দেশের অনেক লোক গৌড় দেশে গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে যাব।

পিতা অনেকক্ষণ চিন্তা করবার পর অনুমতি প্রদান করলেন। দুঃখিয়া পিতা মাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গৌড় দেশ অভিমুখে যাত্রা করল। ক্রমে নবদ্বীপ শান্তিপুর হয়ে অম্বিকা কালনায় এল এবং লোক মুখে জিজ্ঞাসা করে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ভবনে এল। মহাপ্রভুর মন্দিরের বহির্দ্বারে দণ্ডবৎ করতেই শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু বাহিরে এসে তার দিকে তাকিয়ে বললেন তুমি কে?

দুঃখিয়া বললে—আমি আপনার শ্রীচরণ সেবা করতে এসেছি। ধারেন্দা বাহাদুরপুরে আমার নিবাস। সদ্‌গোপ বংশে আমার জন্ম। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। আমার নাম দুঃখিয়া।

শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু বালকের মধুর আলাপে সুখী হলেন। বললেন এখন থেকে তোমার নাম হল কৃষ্ণদাস। আমি অদ্য প্রাতঃকাল থেকে অনুভব করছিলাম কেহ আসবে।

শ্রীকৃষ্ণদাস খুব নিষ্ঠার সহিত সেবা করতে লাগলেন। শুভ দিন দেখে শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু তাঁকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। হৃদয় চৈতন্য প্রভু কৃষ্ণদাসের সেবা নিষ্ঠা ভক্তি এবং অগাধ বুদ্ধি মেধা দেখে তাঁকে বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট যেতে আদেশ করলেন এবং তাঁর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ প্রভৃতি পড়তে নির্দ্দেশ দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস নত শিরে বৃন্দাবনে যেতে স্বীকৃত হলেন। শুভদিন দেখে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাবার সময় শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু তাঁকে অনেক কথা বললেন ও বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিদিগের শ্রীচরণে দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস প্রথমে নবদ্বীপে এলেন। লোককে জিজ্ঞাসা করে মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে প্রবেশ করলেন। গৌর গৃহে শ্রীঈশান ঠাকুরকে দর্শন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুর "কে তুমি" বলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণদাস সমস্ত পরিচয় প্রদান করলেন। শুনে ঈশান ঠাকুর তাঁকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করলেন। এক দিবস নবদ্বীপে অবস্থান করবার পর তিনি মথুরা অভিমুখে যাত্রীগণ সহ যাত্রা করলেন। পথে গয়া ধামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন এবং মহাপ্রভুর শ্রীঈশ্বর পুরী হতে মন্ত্রাদি গ্রহণ প্রভৃতির কথা স্মরণ পূর্ব্বক প্রেমে বিহ্বল হলেন। তথা হতে কাশী ধামে এলেন এবং তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর আদি ভক্তগণের চরণ দর্শন এবং বন্দনাদি করলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণদাসকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করলেন। অনন্তর তিনি মথুরা ধামে প্রবেশ করলেন বিশ্রাম ঘাটে স্নান, আদি কেশব দর্শন করলেন ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে প্রেমে গড়াগড়ি দিলেন। তথা হতে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে চললেন। লোক মুখে শ্রীজীব গোস্বামীর কুটীরের ঠিকানা জেনে তথায় পৌঁছিলেন এবং শ্রীমদ্ জীব গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণদাস সবিশেষ পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু কৃষ্ণদাসকে তার কাছে সমর্পণ করেছেন—"দুঃখী কৃষ্ণ দাস শিষ্যে সঁপিলু তোমারে। ইহার যে মনোভীষ্ট পুরিবে সর্ব্বথা। কত দিন পরে পুনঃ পাঠাইবে এথা।।" —(ভক্তি রত্নাকর ১।৪০৭)

শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু দুঃখী কৃষ্ণদাসকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন, জেনে অতিশয় সুখী হলেন। শ্রীকৃষ্ণদাসকে তাঁর কাছে রাখলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস সাবধানে শ্রীজীব গোস্বামীর সেবা এবং গোস্বামী-গ্রন্থ অধ্যয়ন

করতে লাগলেন। শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম প্রভু পূর্ব্ব হতেই শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট এসেছিলেন এবং গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাসের তাঁদের সঙ্গে মিলন হল।

শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সেবা প্রার্থনা করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী উল্লাসের সহিত বললেন তুমি প্রতিদিন কুঞ্জ কানন ঝাড়ু দিবে। দুঃখী কৃষ্ণদাস সেদিন থেকে অতি প্রীতি সহকারে কুঞ্জ ঝাড়ু দিতে লাগলেন। সেবার সুযোগ পেয়ে স্বীয় জীবনকে কৃতার্থ মনে করতে লাগলেন। কুঞ্জ ঝাড়ু দিতে দিতে আনন্দে দু'নয়ন দিয়ে অশ্রু পড়ত। কখন শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ও কখন লীলা স্মরণ করতে করতে জড়বৎ অবস্থান করতেন। তিনি কখন কখন রজঃকণাযুক্ত ঝাড়ু খানি শিরে ধারণ করতেন। এ রজঃকণা ব্রহ্মা শিবও কামনা করেন।

দুঃখী কৃষ্ণদাস এ রূপে কুঞ্জ ঝাড়ু সেবা করতে লাগলেন। তাঁর সেবায় ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরী সুখী হলেন। তাঁকে দর্শন দিতে ইচ্ছা করলেন। একদিন কৃষ্ণদাস প্রেম ভরে কুঞ্জ ঝাড়ু দিচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন কুঞ্জ মধ্যে পড়ে আছে এক অপূর্ব নূপুর। তিনি বিস্ময়ান্বিত ভাবে নূপুরখানি তুলে শিরে ঠেকালেন ও আনন্দ ভরে ওড়নীর অঞ্চলে বেঁধে রাখলেন, যাঁর নূপুর তিনি খোঁজ করতে এলে দিবেন।

এদিকে সখিগণ প্রাতঃকালে শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর বাম পদে নূপুর না দেখে অবাক হলেন। শ্রীরাধা ঠাকুরাণী বললেন—নিশাকালে কুঞ্জে নৃত্য করবার সময় নূপুরখানি তথায় পড়েছে; তোমরা অনুসন্ধান করে এনে দাও। অনুসন্ধান করতে করতে বিশাখা দেবী কুঞ্জে এলেন এবং কৃষ্ণদাসকে কুঞ্জ ঝাড়ু দিতে দেখলেন।

বিশাখা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি একখানি নূপুর পেয়েছ?

দুঃখী কৃষ্ণদাস স্বর্গচ্যুত দেবীর ন্যায় অপূর্ব্ব কান্তিযুক্তা সে দেবীর অমৃতের ন্যায় মধুর কথা শুনে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিশাখা দেবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি একখানি নূপুর পেয়েছ? দুঃখী কৃষ্ণদাস নমস্কার করে বিনীত ভাবে বললেন—হ্যাঁ পেয়েছি। আপনি কে? আমি গোপকন্যা। কোথায় থাকেন? এ গ্রামে থাকি। নূপুরখানি আপনার? আমার নয়। আমার ঘরের এক নব বধুর। এখানে কি করে পড়ল? কাল কুঞ্জে ফুল তুলতে এসেছিল, পা থেকে পড়ে গেছে। যাঁর নূপুর তিনি এসে নিয়ে যান। বিশাখা দেবী বললেন তুমি দাঁড়াও।

কিছুক্ষণ পরে বিশাখা দেবীর সঙ্গে শ্রীরাধা ঠাকুরাণী এলেন এবং একটি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিশাখা দেবী বললেন, ভক্ত! যাঁর নূপুর তিনি এসেছেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস দূর হতে শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর অপূর্ব্ব কান্তিচ্ছটা দেখেই আত্মহারা হলেন। আনন্দে নূপুরখানি বিশাখা দেবীর হাতে দিলেন। গুঢ় রহস্য তিনি কিছু অনুভব করতে পারলেন। প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। আনন্দে রজে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তখন বিশাখা দেবী বলতে লাগলেন— হে ভক্তবর! আমাদের সখী তোমাকে কৃতজ্ঞতার স্বরূপ কোন বর দিতে চান।

দুঃখী কৃষ্ণদাস বললেন অন্য কোন বর চাই না। কেবল শ্রীচরণ রজঃ প্রার্থনা করি।

বিশাখা বললেন ঐ কুণ্ডে স্নান করে এসো।

দুঃখী কৃষ্ণদাস কুণ্ড-স্নানে চললেন, নমস্কার করে কুণ্ডে যেমনি অবগাহন করলেন অমনি এক সুন্দরী মূর্ত্তি হলেন ও বিশাখা দেবীর কাছে ফিরে এসে, বন্দনা করলেন। বিশাখা দেবী সে নব সখীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর

নিকট এলেন। নব সখী শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর শ্রীপাদ-পদ্মমূলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

সখিগণ তাঁকে ধরে সামনে বসালেন। শ্রীরাধা ঠাকুরাণী চরণের কুমকুম দিয়ে নূপুর দ্বারা তিলক করে দিলেন—বললেন এ তিলক তোর ললাটে থাকবে। আজ থেকে তোর নাম হবে "শ্যামানন্দ। তুই চলে যা" শ্রীরাধা ঠাকুরাণী এ বলে সখীদিগের সঙ্গে অন্তর্ধান হলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাসের সমাধি ভাঙল। দেখলেন ললাটে নূপুরের উজ্জ্বল তিলক রয়েছে। তিনি ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে কি দেখলাম! কি দেখলাম! বলে কিছুক্ষণ ক্রন্দন করলেন। তারপর শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে শত শত বার বন্দনা করে শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীচরণে ফিরে এলেন।

শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী তাঁর ললাটে নূতন ধরণের উজ্জ্বল তিলক দেখে অবাক হলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস দণ্ডবৎ করে সজল নয়নে সমস্ত ঘটনা বললেন। শ্রীজীব গোস্বামী শুনে পরম সুখী হলেন, বললেন—লোকের কাছে এ সব কথা প্রকাশ কর না। আজ থেকে তোমার নাম শ্যামানন্দ হল।

দুঃখী কৃষ্ণদাসের নাম, তিলক বদলে গেছে দেখে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেক কথোপকথন হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সে কথা গৌড় দেশে অম্বিকা কালনায় এল। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি শীঘ্র ছুটে এলেন বৃন্দাবনে। কৃষ্ণদাস কই? কৃষ্ণদাস সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে পড়লেন শ্রীগুরু পাদপদ্মে। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু তাঁর তিলক দেখে রেগে অস্থির হয়ে বলতে লাগলেন—তুমি আমার সঙ্গে গর্হিত আচরণ করছ। তিনি গালি দিতে দিতে প্রহার করতে লাগলেন, বৈষ্ণবগণ শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুকে ধরে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস অম্লান বদনে সব সহ্য করে গুরুর সেবা করতে লাগলেন।

শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু সে-দিবস রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন শ্রীরাধা ঠাকুরাণী স্বয়ং তাঁকে তিরস্কার করে বলছেন—"আমি দুঃখী কৃষ্ণদাসের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে তিলক করে দিয়েছি ও তার নাম বদলিয়েছি। তাতে অন্যের কিছু বলার কি আছে?" হৃদয় চৈতন্য প্রভু শ্রীব্রজেশ্বরীর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন।

অতঃপর প্রাতঃকালে শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু শ্যামানন্দকে ডেকে কোলে তুলে নিলেন, স্নেহে বারংবার আলিঙ্গন করতে লাগলেন। প্রেমাশ্রু নেত্রে বললেন তুমি ধন্য। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু কিছু দিন ব্রজ ধামে রইলেন। শ্রীশ্যামানন্দকে আর কিছুদিন জীব গোস্বামীর নিকট থাকবার আদেশ দিয়ে তিনি গৌড় দেশে ফিরে এলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম তিন জন আনন্দে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন ও ব্রজে মাধুকরী করে দিন কাটাতে লাগলেন। তিনজন ব্রজে মাধুকরী করে একান্তে ভজন করবেন—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হলেন।

এদিকে গোস্বামিগণ মন্ত্রণা করলেন এই তিনজনের দ্বারা গৌড় দেশে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার এবং গোস্বামী গ্রন্থ প্রচার করতে হবে। একদিন শ্রীজীব গোস্বামী তিনজনকে ডেকে গোস্বামিগণের নির্দ্দেশ জানালেন। তিনজন সে আদেশ অবনত শিরে ধারণ করলেন। অতঃপর শুভ দিন দেখে শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী গোস্বামী-গ্রন্থ সহ তিনজনকে গৌড় দেশে প্রেরণ করলেন। পথে বনবিষ্ণুপুরে রাজা বীর হাম্বীর গ্রন্থ হরণ করলেন। সেই গ্রন্থ উদ্ধারের জন্য তথায় শ্রীনিবাস আচার্য্য রইলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খেতরিতে এবং শ্যামানন্দ অম্বিকা কালনায় চলে এলেন। শ্রীশ্যামানন্দ হৃদয় চৈতন্য প্রভুর চরণ বন্দনা করতেই তিনি সানন্দে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং ব্রজস্থিত গোস্বামিগণের

কুশল বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। পরিশেষে গ্রন্থ অপহরণ বার্ত্তা শুনে বড়ই মর্মাহত হলেন। শ্যামানন্দ শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুর শ্রীচরণ সেবা করতে লাগলেন। কিছুদিন শ্যামানন্দের সুখে গুরু সেবা করতে করতে দিন কেটে গেল। উৎকল দেশের শ্রীগৌর ভক্তগণ প্রায় একে একে সব অপ্রকট হলেন। গৌরসুন্দরের বাণী প্রচার প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়ল। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু এ সব কথা বিশেষ ভাবে অনুভব করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীশ্যামানন্দকে গৌর বাণী প্রচারের জন্য উৎকল দেশে যাবার আজ্ঞা করলেন। শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীগুরুদেবকে ছেড়ে যাবেন ভেবে বড়ই মর্ম্মাহত হয়ে পড়লেন। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু তা বুঝতে পেরে তাঁকে ডেকে অনেক বুঝালেন। অগত্যা শ্রীশ্যামানন্দ গুরু বাণী শিরে ধরে উৎকলে যাত্রা করলেন। তিনি উৎকলের পথে ধারেন্দা বাহাদুরপুরে নিজ জন্মস্থানে এলেন। বহুদিন পরে গ্রামবাসিগণ তাঁকে দেখে অতিশয় সুখী হলেন। তিনি তথায় কয়েকদিন গৌর বাণী প্রচার করলেন। বহুলোক তা শুনে আকৃষ্ট হ'লেন এবং তাঁর চরণ আশ্রয় করলেন। তথা হতে দণ্ডেশ্বর নামক স্থানে এলেন। এখানে পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল অবস্থান করতেন। দণ্ডেশ্বর গ্রামে শ্যামানন্দ প্রভুর শুভাগমনে ভক্তগণ পরম সুখ প্রাপ্ত হ'লেন। কয়েকদিন তিনি তথায় হরিকথা মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। অনেক লোক তাঁর দিব্য বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে শিষ্য হলেন। উৎকল দেশে শ্রীশ্যামানন্দের শুভাগমনে পুনঃ সর্ব্বত্র গৌর বাণী প্রচার আরম্ভ হল।

সুবর্ণরেখা নদীর তটে শ্রীঅচ্যুতদেব নামে একজন ধর্মনিষ্ঠ জমিদার বাস করতেন। রসিক নামে তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলেন। রসিক শিশুকাল থেকে কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ। তাঁকে অধ্যয়নের জন্য পিতা পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করলেন। রসিক পণ্ডিতদের স্থানে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। কিন্তু এ জগতের বিদ্যাকে তিনি বহুমানন করলেন না। হরি-ভক্তিই সর্ব্বোত্তম রূপে নির্ণয় করলেন।

শ্রীরসিক গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। একদিন নির্জনে বসে চিন্তা করছেন। এমন সময় দৈববাণী শ্রবণ করলেন—"রসিক! তুমি কোন চিন্তা কর না। এস্থানে অতি শীঘ্র শ্রীশ্যামানন্দ নামে এক মহাভাগবত পুরুষ আগমন করবেন, তুমি তাঁর চরণ আশ্রয় কর।" দৈব বাণী শুনে রসিক কিছু আশ্বস্ত হলেন, প্রতি ক্ষণে শ্রীশ্যামানন্দের আগমন পথ দেখতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু সুবর্ণরেখা নদীতটে রোহিণী নামক গ্রামে শ্রীরসিক দেবের ঘরে শিষ্যগণ সহ শুভাগমন করলেন। শ্রীরসিক দেবের আনন্দের সীমা রইল না। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করে অতি বিনীতভাবে তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে তাঁর শ্রীপাদ পূজা পূর্ব্বক, সমস্ত স্বজন-কলত্র ও পুত্রাদি সহ রসিকদেব আত্মনিবেদন করলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শুভ দিনে শ্রীরসিকদেবকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। শ্রীরসিকদেব গৃহে নাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সমস্ত বন্ধু-বান্ধব ও প্রজাগণকে আমন্ত্রণ করলেন। সেই সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সকলে উপস্থিত হয়ে আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন পূর্ব্বক সকলেই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করলেন। রোহিণীতে আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বহু শিষ্য হল।

রোহিণীতে দামোদর নামে এক বড় যোগী ছিলেন। একদিন তিনি আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে দর্শন করতে এলেন। দূর থেকে সূর্য্যসম উজ্জ্বল দিব্য কান্তি দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অতঃপর নিকটবর্ত্তী হয়ে শ্রীআচার্য্যের চরণে বন্দনা করলেন। আচার্য্য তাঁকে প্রতি-নমস্কার করে সজল নয়নে বললেন—আপনি পবিত্র শুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে নিরন্তর শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম করুন। তাঁরা পরম দয়াল ঠাকুর। আপনাকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করবেন। আচার্য্যের এই উক্তি শ্রবণে যোগী দামোদরের মন বিগলিত হল। বললেন আমি গৌর-নিত্যানন্দের চরণ ভজন করব; আপনি কৃপা করুন। আচার্য্য তাঁকে অনুগ্রহ

করলেন। যোগী দামোদর পরম ভক্ত হলেন। নিরন্তর গৌর-নিত্যানন্দের নাম নিয়ে ক্রন্দন করতেন।

বলরামপুরে অনেক ধনীর বসবাস ছিল। সেখানে আচার্য্যের মহিমা শুনে সকলে তাঁকে দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। শ্রদ্ধালু কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তি এসে আচার্য্যকে বহু অনুনয় সহ প্রার্থনা করলেন বলরামপুরে যাবার জন্য। আচার্য্য তাঁদের প্রতি কৃপা করলেন। আমন্ত্রণ অঙ্গীকার করলেন। শ্রীরসিক ও দামোদর-আদি ভক্তগণ সঙ্গে আচার্য্য বলরামপুরে শুভ বিজয় করলেন। বলরামপুরের সজ্জনগণের আনন্দের সীমা রইল না। আচার্য্যের শ্রীচরণ পূজা করে তাঁর ভোজনাদির সুন্দর ব্যবস্থা করলেন। তিনি কয়েকদিন বলরামপুর হরিকথা কীর্ত্তন মহোৎসব করলেন। বহু লোক শ্রীআচার্য্যের পাদপদ্ম আশ্রয় করলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তথা হতে শ্রীনৃসিংহপুরে এলেন। নৃসিংহপুরে পূর্ব্বে বহু নাস্তিক পাষণ্ডী ব্যক্তির দল ছিল। কয়েকদিন আচার্য্য তথায় সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। আচার্য্যের দর্শনে এবং তাঁর অমৃতপ্রায় কথা শ্রবণে নাস্তিক পাষণ্ডিগণের মন বিগলিত হল। তারাও শ্রীআচার্য্যের চরণ আশ্রয় নিল।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর মহিমা দিন দিন উৎকল দেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আচার্য্য নৃসিংহপুর হতে শ্রীগোপীবল্লভপুরে এলেন। সেখানে বহু ধনীর বাস ছিল। শ্রীআচার্য্যপাদকে দর্শন করে তাঁরা আকৃষ্ট হলেন। প্রায় লোক শ্রীআচার্য্যের চরণ আশ্রয় করলেন। সকলে আচার্য্যের চরণে প্রার্থনা করলেন তথায় শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ হউক। আচার্য্য ভক্তগণের প্রার্থনা অঙ্গীকার করলেন। অতঃপর তথায় ভক্তগণের সহায়তায় ভগবদ্ মন্দির, সংকীর্ত্তন গৃহ, ভোগরন্ধন গৃহ, ভক্তগণের আবাস গৃহ, সরোবর ও উদ্যান আদি নির্মাণ করা হল। অতঃপর আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু মন্দিরে শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর প্রকট উৎসব করলেন। সে উৎসব যেন সমগ্র বঙ্গ ও

উৎকল দেশ ভরে হল। শ্রীবিগ্রহগণের শোভা মাধুরী দেখে সকলের প্রাণ শীতল হল। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তথাকার সেবাভার দিলেন শ্রীরসিকানন্দের উপর।

সমগ্র উৎকল দেশ ভরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু গৌর-নিত্যানন্দের বাণী প্রচার করে ফিরে এলেন অম্বিকা কালনায় শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে। শ্রীগুরু পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ বন্দনা পূর্ব্বক উৎকল দেশাদিতে গৌর-নিত্যানন্দের বাণী প্রচারের বিজয়-বৈজয়ন্তীর কথা বর্ণন করলেন। শ্রীহৃদয় চৈতন্য শ্রবণ করে শ্যামানন্দকে স্নেহে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

খেতরির প্রসিদ্ধ উৎসবে শ্রীশ্যামানন্দ আমন্ত্রিত হলেন। সশিষ্য শ্যামানন্দ প্রভু খেতরির দিকে যাত্রা করলেন। যথাকালে খেতরিতে উপস্থিত হলেন। তথায় পূর্ব্বতম প্রাণের মিত্র শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের সঙ্গে মিলন হল। পরস্পর কত প্রণয় আলিঙ্গন করে যেন সুখসিন্ধুতে ভাসতে লাগলেন। সে উৎসবে শ্রীজাহ্নবা মাতা, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি গৌর-পার্ষদগণ ও কত মহান্ত শুভাগমন করেছিলেন। উৎসব অন্তে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বৈষ্ণবদিগের থেকে বিদায় নিয়ে উৎকল অভিমুখে পুনর্ব্বার যাত্রা করলেন। পথে গৌড়দেশে কন্টকনগরে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের ভবনে, যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভবনে ও শ্রীখণ্ডে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের গৃহে আগমন করেন। তখন বহু গৌরপার্ষদ অপ্রকট হয়েছেন।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ক্রমে উৎকল দেশে প্রবেশ করলেন। পথে পথে ভক্তগৃহে অবস্থান এবং বহু সজ্জনকে অনুগ্রহ দান করতে করতে শ্রীগোপীবল্লভপুরে আগমন করলেন। এই সময় স্বীয় শ্রীগুরু পাদপদ্ম শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুর অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করলেন। নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। বহু রোদন করতে লাগলেন। তিনি বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়লে শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিলেন এবং

আশ্বস্ত করলেন।

উৎকল দেশে আচার্য্য শ্যামানন্দ প্রভুর মহিমা চতুর্দিকে ঘোষিত হল। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিত্য সেবা পূজা স্থানে স্থানে প্রকটিত হল। শ্রীরসিকমুরারি, শ্রীরাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীমনোহর, চিন্তামণি, বলভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর, শ্রীউদ্ধব, অক্রুর, মধুবন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীজগন্নাথ, গদাধর, আনন্দানন্দ ও শ্রীরাধামোহন প্রভৃতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্ত ছিলেন।

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু সর্ব্বত্র বিজয় করে ফিরে এলেন শ্রীগোপীবল্লভ পুরে এবং তথায় কয়েকদিন ব্যাপী মহোৎসব করলেন। অতঃপর আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু আষাঢ় কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে অন্তর্হিত হলেন।

অদ্যাপি তাঁর সমাধিপীঠ শ্রীগোপীবল্লভপুরে নিত্য সেবা হচ্ছে।

শ্রীরসিকানন্দ দেব

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই কার্ত্তিক (শকাব্দ ১৫১২) শুক্ল-প্রতিপদ তিথিতে দীপমালিকা মহোৎসব রাত্রে শ্রীরসিকানন্দদেব আবির্ভূত হন। তাঁর পিতা ছিলেন রয়ণী বা রোহিণীর জমিদার রাজা শ্রীঅচ্যুতদেব। তিনি বহুকাল অপুত্রক ছিলেন পরে শ্রীজগদীশের করুণায় এই পুত্র-রত্ন লাভ করেন।

শ্রীরসিকানন্দের অন্য নাম মুরারি। অনেকে তাঁকে শ্রীরসিক মুরারি বলতেন। রাজা অচ্যুতদেব অল্প বয়স্ক পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। শ্রীরসিকানন্দের পত্নীর নাম ছিল শ্যামদাসী। শ্রীরসিক যেমন রূপবান্ তেমনি বিদ্বান ছিলেন ও সর্ব্ববিষয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। তিনি শ্রীগুরু পদাশ্রয় করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন। এমন সময় একদিন আকাশ বাণীতে শুনলেন—

হইল আকাশ বাণী—চিন্তা না করিবে।
এথায় শ্রীশ্যামানন্দ স্থানে শিষ্য হবে।।

—(ভঃ রঃ ১৫ ।৩৩)

আকাশ-বাণী শুনলেন—তুমি চিন্তা কর না। শ্রীশ্যামানন্দ নামে একজন মহাভাগবত পুরুষ শীঘ্র এখানে আগমন করবেন। তুমি তাঁর পদাশ্রয় কর। তখন থেকে শ্রীরসিক শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পথ দেখতে লাগলেন।

এমন সময় ধারেন্দা বাহাদুরপুর থেকে ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু রোহিণীতে শুভাগমন করলেন। শ্রীরসিকের স্বপ্ন সত্য হল, তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি শ্রীশ্যামানন্দ। আচার্য্যের অপূর্ব্ব অঙ্গদ্যুতি, সর্ব্বদা গৌর-কৃষ্ণ-রসে বিহ্বল, নয়ন যুগল হতে প্রেমাশ্রু ধারা ক্ষরিত হচ্ছে। হস্তে জপ

মালিকা শোভা পাচ্ছে। শ্রীরসিক সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে, সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক নিজ রাজপুরে নিয়ে এলেন। শ্রীপাদপদ্ম যুগল ধৌত পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্প দিয়ে পূজা করলেন এবং রাজ্য কলত্রও পুত্রাদির সহিত আত্মসমর্পণ করলেন। শুভ দিনে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু রসিকানন্দকে ও তাঁর পত্নীকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

শ্রীরসিকানন্দ, মন্ত্র গ্রহণের পর হ'তে, নিয়ত শ্রীগুরু পাদপদ্মের সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি আচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্যহলেন। শ্রীগোপী-বল্লভপুরের শ্রীরাধা-গোবিন্দদেবের সেবাভার শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দকে সমর্পণ করলেন।

শ্রীরসিকাননদ দেব গোপীবল্লভপুরে শ্রীরাধা-গোবিন্দদেবের সেবায় নিযুক্ত হলেন। তাঁর অপূর্ব্ব সেবায় ভক্তগণ মুগ্ধ হলেন। তিনি গোপীবল্লভপুরে ও অন্যান্য স্থানে বিশেষ ভাবে গৌর-নিত্যানন্দের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর প্রভাবে বহু নাস্তিক পাষণ্ডী ব্যক্তিও গৌর-নিত্যানন্দের ভক্ত হয়েছিল।

রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার।
কৃপা করি কৈলা দস্যু পাষণ্ডী উদ্ধার।।
ভক্তিরত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে।
গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিষ্যগণে।।
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী তারে শিষ্য কৈল।
তারে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল।।
সে দুষ্ট যবন-রাজ প্রণত হইল।
না গণিলা ঘর—কত জীব উদ্ধারিল।।
শ্রীরসিকানন্দ সদা মত্ত সংকীর্ত্তনে।
কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর গুণগানে।।

—(ভঃ রঃ ১৫।৮২-৮৬)

শ্রীরসিকানন্দের কৃপায় বহু যবন, পাষণ্ডী ও নাস্তিক ব্যক্তি ভগবদ্ ভজন করে। ময়ুরভঞ্জের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, পটাশপুরের রাজা গজপতি, ময়নার রাজা চন্দ্রভানু প্রভৃতি সজ্জন রাজন্যবর্গ তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। পাপকর্ম পরায়ণ জমিদার ভীম, যবন সুবা আহম্মদবেগ ও পাষণ্ডী শ্রীকর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় নিয়েছিল। দুষ্ট বন্য হস্তী শ্রীরসিকানন্দ দেবের কৃপায় শিষ্ট হয়ে গোপালদাস নাম প্রাপ্ত হয়েছিল, দুই বন্য ব্যাঘ্র শ্রীরসিকানন্দের কৃপায় হিংস্র ভাব ত্যাগ করেছিল।

শ্রীরসিকানন্দ দেব শ্রীগুরু শ্যামানন্দের আজ্ঞা শিরে ধারণ করে প্রায় ছেচল্লিশ বৎসর কাল ধরাতলে শ্রীগৌরবাণী প্রচার করেছিলেন। অতঃপর তিনি রেমুনায় শ্রীগোপীনাথ দেবের শ্রীচরণ তলে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শকাব্দ ১৫৭৪ ফাল্গুন শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরসিকানন্দ দেব সরতা গ্রাম হতে সকলের অলক্ষ্যে পদব্রজে রেমুনা গ্রামে আগমন করেন এবং তত্রস্থ ভক্তগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা আলাপ করে সকলকে কৃষ্ণ ভজন করতে আদেশ দিয়ে শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করেন। শ্রীগোপীনাথের শ্রীচরণ যুগল স্পর্শ করে তিনি তাঁর অভয় শ্রীচরণে বিলীন হন।

শ্রীরসিকানন্দ দেবের তিন পুত্র— (১) শ্রীধারানন্দ, (২) শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ ও (৩) শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীগোপীবল্লভপুরের বর্ত্তমান মহান্ত বংশধরগণ শ্রীরসিকানন্দ দেবের এই পুত্রদেবের বংশধর।

শ্রীরসিকানন্দ দেবের রচিত গ্রন্থ—শ্রীশ্যামানন্দ শতক, শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টক ও বিবিধ স্তবাদি গীতাদি।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ

শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ ছিলেন নিষ্কিঞ্চন পরম ভাগবত। কোন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। বহু অমূল্য গ্রন্থ রত্ন লিখে মানব জাতির মহৎ উপকার করে গেছেন। তিনি কোথাও নিজের বংশ, পিতা-মাতা কিম্বা জন্মস্থানের কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। তজ্জন্য তাঁর জন্ম সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ অনুমান করেন বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রেমুনার পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর জন্ম হয়। অল্প বয়সে ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার ও ন্যায় শাস্ত্রে বিশেষ সুদক্ষতা লাভ করেন এবং তিনি তীর্থ ভ্রমণে বের হন। এ সময় কিছুদিন তিনি তত্ত্ববাদী শ্রীমধ্বাচার্য্যের মঠে অবস্থান করে তত্ত্ববাদ সিদ্ধান্তে পারঙ্গত হন। পরে তত্ত্ববাদ সিদ্ধান্ত প্রবলভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন।

ভ্রমণ করতে করতে শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ পুনরায় উৎকল দেশে আগমন করেন এবং কিছুদিন প্রচার কার্য্য চালান। এ সময় শ্রীরসিকানন্দ দেবের প্রশিষ্য পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদর দেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ হয়।

শ্রীমদ্ রাধাদামোদর দেব গোস্বামী তখন তাঁর কাছে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা অবদানের কথা বর্ণন করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সার্ব্বভৌমত্বের কথা তাঁকে জানান। শ্রীমদ্ রাধাদামোদর দেব গোস্বামীর কথা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের মর্ম্ম স্পর্শ করে। কয়েকদিবস তাঁর কথা শ্রবণের পর

তিনি রামকৃষ্ণ মন্ত্র নিয়ে গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ জীবগোস্বামিপাদের ষট্‌সন্দর্ভ অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ অল্পকাল মধ্যে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে পারঙ্গত হলেন। কিছুদিন শ্রীরাধাদামোদর দেব গোস্বামীর নিকট অবস্থান করবার পর, তিনি তাঁর অনুমতি নিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন আর কিছু বিশেষ জানবার আশায় বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের নিকট আগমন করেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (শ্রীহরিবল্লভ দাস) শ্রীবলদেবের বিনয়, নম্রতা, বৈরাগ্য ও স্বাধ্যায়শীলতা দর্শন করে বড় সুখী হন। তিনি তাঁকে তাঁর কাছে রেখে গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষা প্রদান করতে লাগলেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এ সময় থেকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত মনে প্রাণে একান্তভাবে গ্রহণ করেন এবং প্রচার করতে থাকেন।

এই সময় জয়পুর রাজ দরবারে গৌড়ীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছু তর্ক উত্থাপন করেন। তাঁরা রাজাকে জানান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোন ভাষ্য-গ্রন্থ নাই, অতএব তাঁদের মত সিদ্ধান্তনহে। শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথের সেবা তজ্জন্য শ্রী-সম্প্রদায়ের হাতে দেওয়া হউক। তখন জয়পুরের রাজা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ বৃন্দাবনে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট প্রেরণ করেন এবং জানতে চান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বেদান্ত ভাষ্যগ্রন্থ আছে কিনা? যদি থাকে তাহা যেন শীঘ্র জয়পুরে শ্রী-সম্প্রদায়ী পণ্ডিতগণের সম্মুখে স্থাপন করা হয়।

তখন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ অতি বৃদ্ধ, দুর্গম পথ অতিক্রম করে জয়পুরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নহে। তাই তিনি তাঁর শিষ্য ও ছাত্র শ্রীবলদেবকে প্রেরণ করলেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ সর্ব্ব দর্শন-শাস্ত্রে পারঙ্গত। তিনি বিশাল সভামধ্যে শ্রী-সম্প্রদায়ী রামানন্দী পন্থি পণ্ডিতগণের

সহিত তুমুল তর্ক-যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। সিদ্ধান্ত বিচারে তাঁরা শ্রীবলদেবের সম্মুখে দাঁড়াতে পারলেন না। তিনি বললেন— গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই অকৃত্রিম বেদান্ত ভাষ্য বলে স্বীকার করেছেন। ষট্‌সন্দর্ভ তার প্রমাণ। ইহাতে সভাস্থলে শ্রী-সম্প্রদায়ী পণ্ডিতগণ আপত্তি তুললেন—সাক্ষাৎ বেদান্ত ভাষ্য ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করতে চাইলেন না। অগত্যা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁদের ভাষ্য দেখাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ অতি দুঃখিত মনে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে এলেন এবং সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে সমস্ত কথা শ্রীগোবিন্দ দেবের কাছে নিবেদন করলেন। রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগোবিন্দ দেব তাঁকে বললেন তুমি ভাষ্য রচনা কর। উহা আমার সম্মত ভাষ্য হবে। কেহই অগ্রাহ্য করতে পারবে না। স্বপ্ন দর্শনে শ্রীবলদেব সুখী হলেন ও হৃদয়ে পূর্ণবল লাভ করলেন। অতঃপর শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্ম যুগল ধ্যানপূর্ব্বক ভাষ্য লিখতে আরম্ভ করলেন, কয়েক দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ করলেন। ভাষ্যের নাম রাখা হল শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য।

ভাষ্যের শেষভাগে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ লিখলেন—

বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দ স্বপ্ননির্দিষ্ট ভাষ্যো রাধাবন্ধুবন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ।।

যিনি আমার প্রতি অতি উদার ও দয়া পরবশ হয়ে স্বপ্নাদেশ দিয়ে ভাষ্য লিখিয়েছেন, যে ভাষ্য বিদ্বৎ সমাজে পরম খ্যাতি লাভ করেছে এবং যে ভাষ্যের জন্য বিদ্বানগণ আমাকে বিদ্যাভূষণ উপাধি দান করেছেন, সে শ্রীরাধিকার প্রাণবন্ধু শ্রীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন।

ভাষ্য গ্রন্থ নিয়ে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ সভাস্থলে এলেন এবং রামানন্দী পণ্ডিতগণকে দেখালেন। এবার সকলে নির্ব্বাক হল। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের

জয় গোষিত হল। রাজা এবং গৌড়ীয় ভক্তগণ পরম সুখী হলেন। পণ্ডিতগণ শ্রীবলদেবকে বিদ্যাভূষণ উপাধি প্রদান করলেন।

এই সভা জয়পুরের গলতা নামক স্থানে ১৬২৮ শকাব্দতে হয়েছিল। এই দিন থেকে মহারাজ ঘোষণা করেন যে— শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর আরতি সর্ব্বাগ্রে হবে।

শ্রী-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ বলদেব বিদ্যাভূষণের নিকট পরাভব স্বীকার করলেন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ অতি বিনীতভাবে তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রী-সম্প্রদায় ভগবদ্ দাস্য ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বমান্য। তাঁদের কোন প্রকার মর্য্যাদাহানি হলেই অপরাধ সম্ভাবনা।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুর থেকে জয় পত্র নিয়ে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করলেন ও সমস্ত কথা নিবেদন করলেন। বৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণবগণ পরম সুখী হলেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীবলদেবকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করলেন। শ্রীবলদেব ষট্ সন্দর্ভের ভাষ্য লিখতে আরম্ভ করলেন।

অতঃপর শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অপ্রকট হলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের একটী জ্যোতিষ্ক যেন অস্তমিত হল। সেই সময় শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্ঘের পাত্ররাজরূপে অধিষ্ঠিত হন।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের—

সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা

একমেব পরং তত্ত্বং বাচ্যবাচক ভাবভাক্।
বাচ্যঃ সর্ব্বেশ্বরো দেবো বাচকঃ প্রণবোভবেৎ।।

মৎস্যকূর্মাদিভিরূপৈর্যথা বাচ্যো বহুর্ভবেৎ।
বাচকোঽপি তথার্থাদিভাবাদ্বহুরুদীর্য্যতে।।
আদ্যন্তরহিতত্বেন স্বয়ং নিত্যং প্রকীর্ত্ত্যতে।
আবির্ভাব তিরোভাবৌ স্যাতামস্য যুগে যুগে।।
(শ্রীসিদ্ধান্ত দর্পণম্)

একই পরতত্ত্ব বাচ্য ও বাচক ভাবে দুই প্রকার। পরমেশ্বরই বাচ্য এবং প্রণবই (ওঁ) তাঁহার বাচক। বাচ্য বস্তু পরমেশ্বর কূর্মাদি রূপে যেরূপ বহু, বাচক রূপ প্রণবও তদ্রূপ ঋক্সামাদি রূপে বহুরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেই পরমেশ্বরের আদ্যন্ত নাই। এই কারণেই তিনি স্বয়ং নিত্য রূপে প্রকীর্তিত হন। যুগে-যুগে তাঁহার জগতে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়ে থাকে।

ঈশ্বর—জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছারূপ তিনটী ধর্ম বিশিষ্ট। তিনিই এই জগতের কর্ত্তা এবং নিত্য কারণ। চৈতন্য খণ্ড বা চৈতন্য কণ রূপ বিভিন্নাংশ-গণের ইচ্ছা থাকলেও ঈশ্বরের অখণ্ড জ্ঞান ও সত্য সঙ্কল্পসিদ্ধ ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত সৃষ্টি হয় না।

ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই দোষ চতুষ্টয়শূন্য। সুতরাং বেদই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। জ্ঞানাদি যেরূপ ঈশ্বরের নিত্য ধর্ম বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। দেবও সেইরূপ ঈশ্বর জ্ঞানের বিস্তৃতিরূপ নিঃশ্বসিত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। বেদের ন্যায় পুরাণ ইতিহাসকেও কর্ত্তৃবর্জিত অনাদি বলিয়া জানিবে।

(শ্রীসিদ্ধান্ত দর্পণ)

"তদেবং সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যে শব্দস্য স্থিতে তত্ত্বনির্ণায়কস্তু শ্রুতি লক্ষণ এব ন ত্বর্যলক্ষণোঽপি।।" (বেদান্তস্যমন্তক)

প্রত্যক্ষঃ অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব ও

ঐতিহ্য। এই আটটী প্রমাণের মধ্যে শব্দ প্রমাণ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির হওয়ায় শ্রুতিলক্ষণ শব্দই একমাত্র তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সক্ষম। আর্য্য লক্ষণ শব্দ প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ দেখা যায়। অতএব অপ্রাকৃত নিত্য বেদশাস্ত্র শ্রুতি প্রমাণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ বেদশাস্ত্র চারি প্রকার দোষ শূন্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুল্য। (বেদান্তস্যমন্তক ১।৫১)

প্রমাণ দ্বারা যাহা নির্ণয় করা যায় তাহা প্রমেয়। তাহা পাঁচ প্রকার— ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম।

ঈশ্বর—বিভু, সর্ব্বজ্ঞ, বিজ্ঞানাত্মক আনন্দময়, গুণবান্ ও পুরুষোত্তম। তিনি সকলের স্বামী, জন্ম বা মৃত্যাদি শূন্য। তিনি ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণের দেবতা (দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং) পতিগণের পরম পতি ও পরম স্তবনীয় পুরুষ। তিনি প্রলয় কালাদিতে একমাত্র অবস্থান করেন। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণই তখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সেই শ্রীহরির তিনটী শক্তি বিদ্যমান। পরানাম্নী শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ নাম্নী শক্তি ও মায়া নাম্নী শক্তি (তত্রৈব ২।১৮) পরাশক্তি, স্বরূপশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি, জীবশক্তি ও মায়া বহিরংগাশক্তি। বিষ্ণুপুরাণে পরাশক্তি, বিষ্ণু-শক্তি, অপরাশক্তি, জীবশক্তি এবং অবিদ্যা কর্ম নাম্নী তৃতীয়া শক্তি।

শ্রীহরি দেহ-দেহী ভেদ-শূন্য। তিনি দ্বিভুজ, বনমালাধারী, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, গোপাল ও গোবিন্দ আদি নামে অভিহিত। লক্ষ্মী ভগবদ্ হইতে অভিন্ন স্বরূপা। " সেই জগন্মাতা লক্ষ্মী বিষ্ণুর অনপায়িনী শক্তি।" বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগামী ব্যাপকস্বরূপ এই লক্ষ্মীও সেই প্রকার সর্ব্বগামিনী ব্যাপকস্বরূপা। লক্ষ্মীদেবী হরির ন্যায় বহুরূপা। এই লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিষ্ণুর দেবত্বে দেবদেহা এবং মানুষত্বে মানুষীই হন।। (তত্রৈব ২।৩৬) "তেষু সর্ব্বেষু লক্ষ্মীরূপেষু রাধায়াঃ স্বয়ং লক্ষ্মীত্বং মন্তব্যম্। সর্ব্বেষু ভগবদ্রূপেষু

কৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্ববৎ” (তত্রৈব ২।৩৭) সেই লক্ষ্মীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই স্বয়ং লক্ষ্মী—ইহাই বুঝবে। সমস্ত ভগবদ্‌রূপের মধ্যে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। বৃহদ্- গৌতমীয় তন্ত্রে—“শ্রীরাধিকাই দেবী কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা সর্ব লক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি ও সম্মোহিনী এবং পরা বলিয়া কথিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশৌনক মুনি বললেন সমস্ত অবতার পুরুষের অংশ বা কলা কিন্তু কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। অতএব যাবতীয় উপাস্য তত্ত্বের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই পরম উপাস্য তত্ত্ব।

জীব ঈশ্বরের অনুশক্তি। জীবাত্মা নিত্য অবিনাশী। সেই জীবাত্মা নিত্য জ্ঞান-গুণ বিশিষ্ট। “স চ জীবো ভগবদ্দাসো মন্তব্যঃ। দাসভূতো-হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচনেতি পদ্মাৎ।” সেই জীব তত্ত্বতঃ ভগবানের দাস ইহাই জানিবে। যথা পদ্মপুরাণে—এই জীব শ্রীহরিরই দাস-স্বরূপ, কদাচ অন্য কাহারও নহে। (তত্রৈব ৩।১১) সেই জীব শ্রীগুরু চরণারবিন্দ আশ্রয় দ্বারা এবং শ্রীগুরু কৃপালব্ধ শ্রীহরিভক্তি দ্বারা পুরুষার্থ লাভ করে।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ বেদান্ত স্যমন্তক গ্রন্থের শেষে নিজ শ্রীগুরু পাদপদ্মের এইভাবে বন্দনা করেছেন—

রাধাদিদামোদর নাম বিভ্রতা,
বিপ্রেণ বেদান্তময়ঃ স্যমন্তকঃ।
শ্রীরাধিকায়ৈর্বিনিবেদিতোময়া
তস্যাঃ প্রমোদং স তনোতু সর্ব্বদা।।

শ্রীরাধাদামোদর নামক কোন বিপ্র (মদীয় গুরু) কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যৎকর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার উদ্দেশ্যে বেদান্ত স্যমন্তক বিনিবেদিত হইল স্যমন্তক সতত তাহারই প্রমোদ বর্দ্ধন করুক।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ পরবর্ত্তী কালে শ্রীগোবিন্দ দাস নামে পরিচিত হন। তাঁর দুইজন প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন—শ্রীউদ্ধব দাস ও শ্রীনন্দন মিশ্র।

বিরচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য, শ্রীসিদ্ধান্ত রত্ন, সাহিত্য কৌমুদী, বেদান্ত স্যমন্তক, প্রমেয় রত্নাবলী, সিদ্ধান্ত দর্পণ, কাব্য কৌস্তুভ, ব্যাকরণ কৌমুদী, পদকৌস্তুভ, ঈশাদি উপনিষদ ভাষ্য, গীতাভূষণ ভাষ্য, শ্রীবিষ্ণুনামসহস্রভাষ্য, সংক্ষেপ ভাগবতামৃত টিপ্পনি সারঙ্গরঙ্গদা, তত্ত্বসন্দর্ভ টীকা, স্তবমালা বিভূষণভাষ্য, নাটকচন্দ্রিকা টীকা, চন্দ্রলোক টীকা, সাহিত্য কৌমুদী টীকা—কৃষ্ণানন্দিনী, শ্রীমদ্ভাগবত টীকা (অসম্পূর্ণ) বৈষ্ণবানন্দিনী গোবিন্দভাষ্য সুক্ষ্ম টীকা, সিদ্ধান্ত রত্ন টীকা ও স্তবমালার টীকা (শকাব্দ ১৬৮৬,খৃষ্টাব্দ ১৭৬৪)

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর সম্ভবতঃ ১৫৮৬ শকাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীরামভদ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্তী নামে এঁর আর দুটী ভাই ছিলেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর থেকে মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইনি বহু দিন গুরুগৃহে অবস্থান করেন এবং তথায় থেকে বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর বহু দিন সৈয়দাবাদে বাস করেছিলেন বলে নিজকে সৈয়দাবাদবাসী বলে বলতেন। অলঙ্কার কৌস্তুভের টীকার অন্তিম শ্লোকে লিখেছেন—

সৈয়দাবাদনিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ শর্ম্মণা।
চক্রবর্ত্তীতি নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী।।

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নদীয়াতে থাকতেই ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে পাঠদ্দশাতেই ইনি এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। সংসারে আবদ্ধ করে রাখবার জন্য পিতা তাঁকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিছুকাল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গৃহে ছিলেন। অনন্তর গৃহ ত্যাগ করে তিনি বৃন্দাবনবাসী হন। স্বজনগণ গৃহে ফিরিয়ে আনবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর বৃন্দাবন ধামে গিয়ে রাধাকুণ্ড তীরে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটীরে তদীয় শিষ্য শ্রীমুকুন্দ দাসের সঙ্গে বসবাস করতেন এবং গোস্বামী গ্রন্থ-পত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বহু গোস্বামী গ্রন্থের টীকা এ স্থানে বসেই লেখেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগোকুলানন্দ বিগ্রহের সেবা করতেন। তিনি মহান্ত সমাজে শ্রীহরিবল্লভ দাস নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর চক্রবর্ত্তী উপাধিটি ভক্তগণ দিয়েছিলেন। স্বপ্ন বিলাসামৃত গ্রন্থের ভূমিকায় আছে।

বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তির্বর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্ত চক্রে বর্ত্তীতত্ত্বাচ্চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়া ভবৎ।।

রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীমদ্ভাগবত গীতার সারর্থবর্ষিণী টীকা, অলঙ্কার কৌস্তুভের সুবোধিনী টীকা, আনন্দ বৃন্দাবনের সুখবর্ত্তিনী টীকা, বিদগ্ধমাধব নাটকের টীকা, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য, স্বপ্নবিলাসামৃত কাব্য, মাধুর্য্য কাদম্বিনী, ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী, স্তবামৃতলহরী, চমৎকার চন্দ্রিকা, গৌরাঙ্গ লীলামৃত উজ্জ্বলনীলমণি টীকা, গোপালতাপনীর টীকা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকা অসম্পূর্ণ ও ক্ষণদাগীত চিন্তামণি বাংলাভাষায় ইত্যাদি বহু গ্রন্থ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় রচনা করেন।

শ্রীবিশ্বনাথ ঠাকুরের গুরু-পরম্পরা

শ্রীগৌরসুন্দর থেকে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, তাঁর থেকে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনরোত্তম হতে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, তাঁর থেকে শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী, এঁর থেকে শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী। এই রাধারমণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী সৈয়াদাবাদে

বাস করতেন। এখানে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অনেকদিন থেকে ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

মাঘ বাসন্তী পঞ্চমী তিথিতে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ অপ্রকট হন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা

ভগবৎস্বরূপভূতা মহাশক্তি ভক্তিই—মুখ্য অভিধেয় (মাধুর্য্য কাদম্বিনী ১।৪);ভক্তি (১) প্রধানী ভূতা, (২) গুণীভূতা, ও (৩) কেবলা ভেদে ত্রিবিধা। শ্রীগীতোক্ত (৭।১৬) আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি ব্যক্তি প্রধানীভূতা ভক্তির অধিকারী। ভক্ত ও ভগবানের কারুণ্যাধিক্যবশতঃ কখনও প্রধানীভূতা ভক্তিযাজীর শ্রীশুকাদির ন্যায় প্রেমোৎকর্ষও লাভ হইতে পারে।

গুণীভূতা ভক্তি—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীতে কর্ম, জ্ঞান ও যোগফল সিদ্ধির জন্য দৃষ্ট হয়। তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে। ভক্তি সহায়তার সকাম কর্ম— স্বর্গাদি ফল, নিষ্কাম কর্ম—জ্ঞান, এবং জ্ঞান ও যোগ—নির্ব্বাণ মোক্ষফল প্রাপ্তি হয় (সারার্থবর্ষিণী ৭।১৬)

কেবল কর্ম জ্ঞানাদি মিশ্র-ভাব শূন্য। অনন্যচেতা, ইহাকে অকিঞ্চনা ভক্তিও বলে। এ ভক্তির বহু ভেদ আছে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি। কেবলা ভক্তির ফল পার্ষদত্ব প্রাপ্তি। ভগবান্ এই কেবলা ভক্তিমান্ ভক্তকে নিজ আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে দেখে। "নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।" (ভাগবত) আমি স্বীয় আত্মাকে তত প্রীতি করি না। অথবা সাধুকে যত ভালবাসি তত প্রীতি নিজ আত্মাকে করি না।

এই কেবলা ভক্তিযোগযাজীর পুণ্যাদি কর্ম আশ্রয় কদাপি করা উচিত নহে—

সন্ন্যাসাদের্ন সাংখ্যেন দান-ব্রত তপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যা-সাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদযত্নবানপি।।

ইতি ভগবদুক্তেঃ। (গীতা ৭।২৯) ভগবান্ বলছেন—সন্ন্যাস, সাংখ্যজ্ঞান, দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা স্বাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা বহু যত্ন করলেও আমার এই কেবলা ভক্তি লাভ করতে পারে না, ইহা একমাত্র যাদৃচ্ছিক মদ্‌ভক্ত সঙ্গে লাভ হয়।

ভক্তি দুই প্রকার—সাধন ভক্তি ও প্রেম ভক্তি (১) সাধন ভক্তি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা, (ভাঃ ১।২।৬ সারার্থদর্শিনী টীকা) (২) প্রেম ভক্তি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির পরিপাক অবস্থা যেমন একই আমের কাঁচা অবস্থা ও পাকা অবস্থা। (ভাঃ ১।২।৬)

শ্রীভগবানের কৃপা ভক্ত-কৃপানুগামিনী;ভক্তের কৃপা হলেই ভগবানের কৃপা পাওয়া যাবে (ভাঃ ১।২।৬)।

ভক্তিযোগী সাধকের ভক্তিযোগ শ্রবণ কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন। "জ্ঞান বৈরাগ্যার্থং পৃথক্ যত্নো ভক্তের্ন কর্ত্তব্যঃ।" (ভাঃ ১।২।৭)

ব্রহ্ম—নিরাকার, জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি বিভাগশূন্য চিৎসামান্য চিদ্‌বিশেষ।

পরমাত্মা—সাকার মায়া শক্তি দ্বারা বিশ্বাদি নির্মাণকারক যোগীগণের হৃদয়-আকাশে ধ্যেয় প্রাদেশমাত্র মূর্ত্তি বিশিষ্ট।

ভগবান্—সাকার ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবন বিহারী। (ভাঃ ১।২।১১)

ভক্তের হরিতোষণ হতেই সাহজিক ভাবে অন্যান্য ধর্মাদি সিদ্ধি হয়। (ভাঃ ১।২।১৩)

ভগবদ্ কথারুচি হবার কারণ মহৎসেবা ও পুণ্যতীর্থ সদ্ গুরুর চরণ সেবা। (ভাঃ ১।২।১৬)

অথ ভক্তির ক্রম—সাধুকৃপা, মহৎসেবা, শ্রদ্ধা, গুরুপদাশ্রয়, ভজনে স্পৃহা, অনর্থনাশ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি ও প্রেম। (ভাঃ ১।২।২১)

শ্রীভগবানের দুইপ্রকার অবতার (১) চিৎ-শক্তিপ্রধান ও (২) মায়া শক্তি প্রধান। চিৎশক্তি প্রধান—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রামচন্দ্র ও বলরাম প্রভৃতি।

মায়াশক্তি প্রধান—বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র। বিষ্ণু সাত্ত্বিক গুণের হলেও নির্গুণ স্বরূপ। মায়া গুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। (ভাঃ ১।২।২৩)

ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে ব্রহ্মা (সুকৃতিশালী) জীব বিশেষ। শিবকে কেহ কেহ ঈশ্বর স্বরূপ বলেন "ব্রহ্মাশিবয়োর্মধ্যে শিবস্যেশ্বরত্বমিতি কচিদাহুঃ।" (ভাঃ ১।২।২৩)

সম্বন্ধ ত্রিবিধ— (১) নিয়ামক সম্বন্ধ, (২) সংযোগ সম্বন্ধ ও (৩) সামীপ্য সম্বন্ধ। ব্রহ্মা শিবাদিতে বিষ্ণুর নিয়ামকত্ব সম্বন্ধ। তজ্জন্য তাঁদের ঈশ্বর বলা হয়। (ভাঃ ১।২।২৩)

ভগবদ্ ভক্তের নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্মাদির ত্যাগে কোন দোষ হয় না। "সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসেতি।" (ভাঃ ১২।২০।৩৩) ভগবান বলছেন—আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগ প্রভাবে সব কিছুই অনায়াসে পেয়ে থাকে।

ভক্তের কেবল শ্রীঅচ্যুতের পূজাদ্বারা দেব পিতৃ পূজাদিও সিদ্ধি হয়ে থাকে, পৃথক্ ভাবে দেব-তর্পণ বা পিতৃতর্পণ করতে হয় না। "যথা তরোর্মূল নিষেচনেন" ইত্যাদি। (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন—

দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের অন্তরঙ্গ জন ছিলেন। সব সময় অভিন্নাত্মরূপে অবস্থান করতেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের পিতার নাম শ্রীচিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম—শ্রীসুনন্দা। শ্রীচিরঞ্জীব সেন প্রথমে কুমার নগরে বাস করতেন। শ্রীদামোদর কবির কন্যা শ্রীসুনন্দাকে বিবাহ করবার পর তিনি শ্রীখণ্ডে বাস করতেন।

শ্রীচিরঞ্জীব সেন মহাভাগবত ছিলেন। খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার প্রভৃতি তাঁকে প্রাণের সমান ভাল বাসতেন।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব, আর সুলোচন।।
চিরঞ্জীবসেন মহাবিজ্ঞ সর্ব্বমতে।
খণ্ডে বিলসয়ে নিজ পত্নীর সহিতে।।
অরুন্ধতীসম পতিব্রতা পত্নী তাঁর।
পরম সুশীলা অলৌকিক চেষ্টা যাঁর।।

—(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১১।৯২)

শ্রীমুকুন্দদাস, শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীচিরঞ্জীব সেন এঁরা শ্রীখণ্ডে বাস করতেন এবং এক প্রাণ এক আশয়বিশিষ্ট ছিলেন। প্রতি বছর রথ-যাত্রা সময় শ্রীক্ষেত্রধামে যেতেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শন করে রথাগ্রে নৃত্য-গীত করতেন।

শ্রীচিরঞ্জীব সেন বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দুই পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ। দুই পুত্র মহারত্ন ছিলেন। উভয়ে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপা লাভের পর তেলিয়া বুধরিগ্রামে বসবাস করতেন। বুধরিগ্রাম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ অত্যন্ত উদ্যমশীল বুদ্ধিমান ও রূপবান্ ছিলেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন কবি শ্রীদামোদর কবিরাজ। তিনি মহাকবি নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি শক্তি উপাসনা করতেন এবং শাক্ত ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন।

পিতা চিরঞ্জীব সেন পরলোক গমন করবার পর শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের আলয়ে বসবাস করতেন। শ্রীরামচন্দ্র ও গোবিন্দ মাতামহের আলয়ে বসবাস করতেন, তাই তাঁরা শাক্ত ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। শ্রীরামচন্দ্র সেন চিকিৎসক ছিলেন ও তিনি মহা কবি ও যশস্বী ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র সেন যাজিগ্রামের পথ দিয়ে বিবাহ করে যাচ্ছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহ পার্শ্ব দিয়ে যেতে তিনি ভক্তগণ পরিবেষ্টিত শ্রীনিবাস আচার্য্যকে গৃহ-অলিন্দে বসে হরিকথা বলতে দেখলেন। আচার্য্যকে দর্শন মাত্রই শ্রীরামচন্দ্রের মনে এক অভিনব ভাবোদয় হল। দীর্ঘকাল পরে যেন প্রাণের প্রিয়তমকে দর্শন করলেন। আচার্য্যও তাঁকে দেখলেন এবং তাঁর সঙ্গীদিগের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। "কি নাম? কি জাতি? এ পাত্রের কোথা স্থিতি?" (ভঃ রঃ ৮।৫৩০) তখন তাঁরা বলতে লাগলেন —এ মহাপণ্ডিত। রামচন্দ্র

নাম কবি নৃপতি বিদিত।। দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক যশস্বীপ্রবর। বৈদ্য কুলোদ্ভূত বাস কুমার নগর।। (ভঃ- রঃ ৮।৫৩২) এ সব কথা শুনে শ্রীনিবাস আচার্য্য মৃদু হাস্য করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র সেন পালকী মধ্যে বসে শ্রীল আচার্য্যের দর্শন এবং কথা শ্রবণ করেন। তখন থেকে আচার্য্যের দর্শন ও মিলনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা মনে জেগে উঠে। বাড়ীতে এলেন, মহা আনন্দ কোলাহল হল, স্বজনগণের আদর আপ্যায়নের সীমা নাই। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের মন পড়ে রয়েছে পথে সেই মহাপুরুষের প্রতি। বাড়ীতে পৌঁছে মহাকষ্টে রামচন্দ্র কবিরাজ দিবা অতিবাহিত করলেন। রাত্রিকালে যাজিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাজিগ্রামে এক ব্রাহ্মণ গৃহে রাত্রিযাপন পূর্ব্বক প্রাতে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভবনে এলেন এবং আচার্য্য চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য পূর্ব্ব দিবসে শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করবার পর থেকে অন্তরে কেবল তাঁর কথাই মনে করছিলেন। প্রাতঃকালে তাঁকে দর্শন করে মহানন্দে ভূমি থেকে তুলে আলিঙ্গন করলেন ও বললেন—"জন্মে-জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয়।" (ভঃ রঃ ৮।৫৭৪) জন্মে-জন্মে তুমি আমার বান্ধব। বৃন্দাবনে এই রূপে ভগবান্ শ্রীনরোত্তমকে মিলিয়েছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ আচার্য্য চরণে অবস্থান করে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন। তাঁর শুদ্ধ সদাচার শিষ্টাচার ও মহানুভবতায় আচার্য্য পরম সুখী হলেন এবং কয়েক দিন বাদে তাঁকে শুভক্ষণে 'রাধাকৃষ্ণমন্ত্র' প্রদান করলেন।

কিছু দিন রামচন্দ্র কবিরাজ যাজিগ্রামে অবস্থান করবার পর নিজ গৃহে ফিরে এলেন। তৎকালে শাক্তগণ তাঁকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। তাতে কবিরাজ মহাশয় ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি নিত্য দ্বাদশ-অঙ্গে তিলক ধারণ ও শ্রীহরিনাম জপাদি সর্ব্ব-সমক্ষে করতে লাগলেন।

একদিন রামচন্দ্র কবিরাজ স্নান করে গৃহে যাচ্ছেন, তখন শাক্তগণ ডেকে বলতে লাগলেন—কবিরাজ! এ কি তুমি শিব পূজা না করে ঘরে যাচ্ছ? তোমার মাতামহ দামোদর কবিরাজ শিবের পরম ভক্ত ছিলেন। তুমি সেই শিবের পূজা কি ছেড়ে দিলে?

শ্রীরামচন্দ্র বললেন—শিব ও ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের গুণাত্মক অবতার। শ্রীকৃষ্ণই সকল অবতারের মূল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারা সকলেরই পূজা হয়। যেমন বৃক্ষের মূলে জল দিলে শাখা পল্লব সহজেই পুষ্ট হয়।

প্রহ্লাদ-ধ্রুব-বিভীষণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত ছিলেন বলে শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মা তাঁদের প্রতি সহজেই সদয় ছিলেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বান প্রভৃতি হরি-বিদ্বেষী, কেবল শিবের ভক্ত ছিল। তজ্জন্য শিব তাঁদের স্বয়ং বিনাশ করেছেন।

শাস্ত্রে কথিত হয়েছে ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা প্রভাবে বিশ্ব সৃজন এবং শিব ভগবদ্ পাদোদক গঙ্গা শিরে ধারণ-প্রভাবে জগৎ মঙ্গল করতে সমর্থ হয়েছেন। এই সমস্ত কথা শুনে স্মার্ত্ত পণ্ডিত নির্বাক হলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবন ধাম ও গোস্বামিবৃন্দের শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বৈষ্ণবগণ সানন্দে তাঁকে বৃন্দাবনে গমনের অনুমতি দিলেন। শুভ দিনে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবন ধামাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে তিনি ক্রমে গয়া-কাশী-প্রয়াগাদি তীর্থ হয়ে শ্রীমথুরা ধামে আগমন করলেন এহং যমুনায় বিশ্রাম ঘাটে স্নান ও বিশ্রাম করলেন। আদিকেশব জন্মস্থানাদি দর্শন পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করলেন। এ সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে অবস্থান করছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনিবাসও শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং গৌড়দেশের ভক্তগণের কুশল

সংবাদ প্রদান করলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেন শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশ নিয়ে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীসনাতনের সমাধি মন্দির দর্শন করলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ প্রমুখ গোস্বামীপাদের শ্রীচরণ দর্শনাদি করলেন। তাঁরা সকলেই রামচন্দ্র সেনের অদ্ভূত কবিত্ব দেখে তাঁকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন।

শুনি' রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার।
"কবিরাজ"—খ্যাতি হৈল সম্মত সবার।।
(ভঃ রঃ ৯।২১৪)

ব্রজে গোস্বামিগণের কাছে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ কিছুদিন অবস্থান করবার পর তাঁদের আদেশ নিয়ে পুনঃ গৌড় দেশে ফিরে এলেন। তিনি শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, খড়দহ, অম্বিকা কালনা, প্রভৃতি স্থান দর্শন করে নবদ্বীপ মায়াপুরে এলেন। মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে তখন অতি বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুর অবস্থান করছিলেন। রামচন্দ্র সেন স্বীয় পরিচয় দিয়ে তাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করলে, তিনি প্রচুর আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের অতি প্রিয় ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। তেমনি শ্রীল নরোত্তম মহাশয় রামচন্দ্রকে প্রাণের সমান দেখতেন।

কোন সময় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে খেতরিতে এসেছিল। সঙ্গে রাজা নরসিংহ এবং দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপ-নারায়ণ ছিলেন। এ সব ব্যাপারে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী বড়ই মর্মাহত হন এবং স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করবার জন্য অগ্রসর হন। কুমারপুরের বাজারে এসে কুম্ভকার হয়ে হাঁড়ি কলসীর দোকান এবং তাম্বুলিক হয়ে পান সুপারির দোকান দিলেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কুমারপুরের বাজারে এসে খাওয়াদাওয়ার জন্য শিষ্যগণকে হাঁড়ি ও পান সুপারি কিনতে পাঠালেন, তারা এল কুম্ভকার ও তাম্বুলিকের কাছে। কুম্ভকার ও তাম্বুলিক সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ক্রমে

ছাত্রদিগের সঙ্গে বাদ বিবাদ হতে লাগল। কুম্ভকারের ও তাম্বুলিকের অগাধ বিদ্যা প্রতিভা দেখে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ অবাক্ হলেন এবং বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। ক্রমে তথায় রূপনারায়ণ এবং রাজা নরসিংহ এলেন। দিগ্বিজয়ী রূপনারায়ণও বিচারে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু ভাগবত সিদ্ধান্তের নিকট পরাস্ত হলেন। পরিশেষে রাজা তাঁদের পরিচয় নিলেন। তাঁরা বললেন—আমরা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অতি ক্ষুদ্র শিষ্য দাসানুদাস।

স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ ও রূপনারায়ণ তাঁদের কাছে পরাভূত হবার পর আর খেতরির দিকে কেহই অগ্রসর হতে ইচ্ছা করলেন না। সেখান থেকেই সকলে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন। রাজা নরসিংহ গৃহে ফিরে এলেন। রাত্রে দুর্গাদেবী রাজাকে স্বপ্নে স্বয়ং বললেন—"রে নরসিংহ! তোরা নরোত্তমের চরণে ঘোরতর অপরাধ করেছিস্। সে বৈষ্ণব অপরাধের জন্য এ খড়্গ দিয়ে তোদের সকলকে খণ্ড খণ্ড করব। যদি রক্ষা পেতে চাস্ শীঘ্র নরোত্তমের পদাশ্রয় কর।" রাজার নিদ্রাভঙ্গ হল, দেবীর কথা স্মরণপূর্ব্বক স্নানাদি করবার পর খেতরির অভিমুখে যাত্রা করলেন এ দিকে শ্রীরূপনারায়ণ পণ্ডিতও এইরূপ স্বপ্ন দেখেন। তিনিও খেতরির দিকে যাত্রা করলেন। রাজা ও রূপনারায়ণ খেতরিতে পৌঁছলেন এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে এলেন। ঠাকুর মহাশয় নাম ভজনে নিমগ্ন ছিলেন। সেবক রাজা ও পণ্ডিতের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করলে বাহিরে এলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কৃষ্ণপ্রেমময় অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করেই যেন তাঁরা পবিত্র হলেন ও দণ্ডবৎ করলেন। ঠাকুর মহাশয় অতি দীনভাবে বললেন আমি অধম। আপনারা উত্তম বিদ্যাবুদ্ধি ও রাজৈশ্বর্য্যবাণ। আপনাদের কিরূপে সৎকার করব? রাজা নরসিংহ ও পণ্ডিত রূপনারায়ণ ঠাকুর মহাশয়ের দৈন্যময়ী উক্তিতে একেবারেই বিগলিত হলেন। করজোড় পূর্ব্বক কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং দেবীর আদেশ জানালেন। ঠাকুর মহাশয় তাদের কৃপা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। পরে দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের কল্যাণে অনেক পাপীপাষণ্ডী উদ্ধার লাভ করে। খেতরিতে যে মহোসব হয়েছিল তাতে কবিরাজ মহাশয় অগ্রণী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের আদেশ নিয়ে বৃন্দাবনে পুনর্ব্বার যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে এসে গোস্বামিদিগের শ্রীচরণ দর্শন আর পান নাই। সকলেই প্রায় অপ্রকট লীলা করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গোস্বামিগণের অদর্শনে পরম ব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান করছিলেন। কিছুদিন বাদে তিনি শ্রীব্রজধামে শ্রীব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরীর শ্রীপাদ পদ্মযুগল চিন্তা করতে করতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। পৌষ কৃষ্ণ তৃতীয়া তাঁর নিত্যলীলা প্রবেশ তিথি।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য ছিলেন শ্রীহরিরাম আচার্য্য।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁর রচিত একটী গীত—

দেখ দেখ আরে ভাই, গৌরাঙ্গ চাঁদ পরকাশ।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন উদিত আকাশ।।
সিংহরাশি পৌর্ণমাসী গোরা অবতার।
ছাড়ল যুগের ভার ধরণী নিস্তার।।
মহীতলে আছয়ে যতেক জীবতাপ।
হরল সকল পহুঁ নিজহি প্রতাপ।।
কলিযুগে তপ-জপ নাহি কোন তন্ত্র।
প্রকাশিল মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মন্ত্র।।
প্রেমের বাদর করি ভরিল সংসার।
পাতকী-নারকী সব পাইল নিস্তার।।
অন্ধ অবধি যত করে পরকাশ।
বিন্দু না পড়িল মুখে রামচন্দ্র দাস।।

শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী

বর্ত্তমান বাংলা দেশের রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুঁটিয়ার রাজা ছিলেন শ্রীযুত নরেশনারায়ণ। তাঁর শচী নাম্নী একমাত্র কন্যা ছিল। শচী শিশুকাল থেকে ভগবদ্‌ভক্তি পরায়ণা। শচী অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ কাব্য প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। শচীর বয়স হলে তাঁর নব যৌবন সকলকে মুগ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু শচীর মন জগতের কোন সৌন্দর্য্যশালী কিম্বা ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হল না। তাঁর মন পড়ে রইল শ্রীমদন গোপালের উপর।

শ্রীযুত নরেশনারায়ণ কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শ্রী শচী তা' জানতে পেরে বললেন—তিনি কোন মর্ত্ত্য মরণশীল পুরুষকে বিবাহ করবেন না। রাজা রাণী শিরে হাত দিয়ে বসলেন। একমাত্র কন্যা বিবাহ করতে চায় না। এ সব চিন্তা করতে করতে রাজা ও রাণী স্বধাম প্রাপ্ত হলেন। রাজ্যভার পড়ল শ্রীশচীর উপর। তিনি কিছু দিন রাজকার্য্য দেখাশুনা করবার পর স্বজন প্রতিনিধিগণের উপর ভার দিয়ে তীর্থ পর্য্যটনে বের হলেন। কোথায়ও চিত্তের সন্তোষ উৎপাদন হল না। সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। পুরী ধামে এলেন। কয়েক দিন দর্শনাদি করবার পর, কোন এক প্রেরণায় শ্রীব্রজধামে এলেন। এইবার শ্রীশচীর সৌভাগ্য-শশী উদিত হল। তথায় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের একান্ত অনুরক্ত শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হল। তাঁর দিব্য তেজ এবং বৈরাগ্য মূর্ত্তি দর্শন করে শ্রীশচী পরম আনন্দিত হলেন, মনে মনে চিন্তা করলেন বহু দিন পরে তিনি যেন আশ্রয় পেয়েছেন।

শ্রীশচী হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন ও প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে করজোড়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করলেন।

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার সর্ব্ব আর্য্য।।
তাঁর অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহা পণ্ডিত হরিদাস।।

—(চৈঃ চঃ আদিলীলা)

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য। তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে থাকতেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী।

শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীশচীকে পরীক্ষা করবার জন্য বললেন—রাজকন্যার পক্ষে ব্রজে থেকে নিষ্কিঞ্চন ভাবে ভজন করা সম্ভবপর নয়। গৃহে থেকে ভজন করা তোমার পক্ষে ভাল হবে। শ্রীশচীদেবী বুঝতে পারলেন এ সব কথা ছল করে বলা হল। শ্রীশচী সে কথায় কান দিলেন না। তীব্র বৈরাগের সহিত সেবা করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করা কিম্বা অলঙ্কারাদি ব্যবহার করা একবারেই বর্জ্জন করলেন।

একদিন শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীশচীকে বললেন— যদি লজ্জা, মান ও ভয় ত্যাগ করে ব্রজে মাধুকরী করতে পার তবে কৃপা পেতে পার। শ্রীশচী গুরুবাক্য শ্রবণ করে অতি আনন্দিত হলেন। তখন হতে অভিমান শূন্য হয়ে সামান্য একখানা মলিন বস্ত্রে গাত্র আবৃত করে ব্রজবাসিগণের গৃহে-গৃহে মাধুকরী করতে লাগলেন। ব্রজবাসিগণ তাঁর অঙ্গের দিব্য তেজ দেখে

বুঝতে পারতেন তিনি অসাধারণ স্ত্রীলোক। তাঁর তীব্র বৈরাগ্যে বৈষ্ণবগণ চমৎকৃত হলেন।

শ্রীশচীর অঙ্গখানি অতিশয় ক্ষীণ ও মলিন হয়ে পড়ল। তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ না করে নিয়মিত যমুনা স্নান, মন্দির মার্জন, পরিক্রমা, আরাত্রিক দর্শন ও কথা শ্রবণাদি করতে লাগলেন। শ্রীশচীর তীব্র বৈরাগ্য দেখে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর মনে কৃপার উদ্রেক হল। তিনি শ্রীশচীকে ডেকে হাস্য করতে করতে বললেন—তুমি রাজকুমারী হয়েও শ্রীকৃষ্ণভজন প্রয়াসে যে এত ত্যাগ ও বৈরাগ্য দেখিয়েছ তাতে আমি পরম সুখী হয়েছি। তুমি শীঘ্র মন্ত্র গ্রহণ কর।

অনন্তর শ্রীশচী চৈত্রী শুক্ল-ত্রয়োদশীর দিন শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করলেন। শ্রীশচী অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পেয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমময়ী হলেন। তিনি অতি দীনহীন ভাবে শ্রীগুরু গোবিন্দের সেবা করতে লাগলেন এবং প্রতিদিন পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট গোস্বামী শাস্ত্রাদি শ্রবণ করতে লাগলেন। অল্পকালেই শ্রীশচী গোস্বামী সিদ্ধান্তে পারঙ্গত দেখে সকলে পরম সুখী হলেন।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর একজন পরম স্নিগ্ধা শিষ্যা এ সময় বৃন্দাবনে এলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করতেন। পণ্ডিত গোস্বামী তাঁকে আদেশ করলেন—তিনি যেন শচীকে নিয়ে শ্রীরাধাকুণ্ডে ভজন করেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীগুরুদেবের বাণী শিরে ধারণ করে শ্রীশচীসহ রাধাকুণ্ডে এলেন ও ভজন করতে লাগলেন। শ্রীশচী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করতে লাগলেন। শ্রীশচী এভাবে রাধাকুণ্ডে তীব্র ভজন করতে থাকলে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী তাঁকে ডেকে আদেশ করলেন—তুমি শীঘ্র শ্রীপুরী ধামে গিয়ে ভজন কর এবং শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বাণী শ্রদ্ধালু

জনদের মধ্যে প্রচার কর। তথাকার গৌর-পার্ষদগণ প্রায় অপ্রকট লীলা করেছেন। শ্রীশচী বৃন্দাবন থেকে ক্ষেত্র ধামে এলেন এবং গুরুদেবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গৃহে থেকে ভজন করতে লাগলেন এবং শ্রদ্ধালুজনের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে লাগলেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গৃহটি বহুদিন লোকজন না থাকায় জীর্ণ শীর্ণ হয়েছিল, তথায় কেবল মাত্র সার্ব্বভৌম সেবিত শ্রীদামোদর শালগ্রাম বিরাজ করছিলেন। শ্রীশচী তথায় অবস্থান পূর্ব্বক নিয়মিত ভজন করতে লাগলেন। শ্রীশচীদেবীর অপূর্ব ভাগবত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করবার জন্য শ্রদ্ধালু সজ্জন দিনের পর দিন তাঁর স্থানে আসতে লাগলেন। অল্পকালের মধ্যে প্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পুরীর রাজা শ্রীমুকুন্দদেব একদিন শ্রীশচীদেবীর স্থানে ভাগবত শুনতে এলেন। তাঁর অপূর্ব সিদ্ধান্ত শুনে বড়ই আকৃষ্ট হলেন। মনে-মনে তাঁকে কিছু অর্পণ করতে ইচ্ছা করলেন। ঠিক সেই দিবসের রাত্রে স্বপ্নে দেখতে লাগলেন—"শ্রীজগন্নাথ বলছেন —শচীকে শ্বেত গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানটি অর্পণ কর।" পরদিন প্রাতে রাজা মুকুন্দদেব শ্রীশচী দেবীর নিকট এলেন। অতি বিনীতভাবে রাজাকে বসবার আসন দিয়ে শ্রীশচী তাঁর আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীমুকুন্দদেব শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশের কথা জ্ঞাপন করে শ্বেত গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানটি গ্রহণ করতে প্রার্থনা করলেন। শ্রীশচী বিষয় সম্পত্তি গ্রহণে অসম্মতা হলেন। রাজা বারংবার বলতে লাগলেন। তখন শ্রীজগন্নাথের আদেশ জেনে রাজী হলেন। শ্রীমুকুন্দদেব শ্রীশচীর নামে শ্বেতগঙ্গার নিকটবর্ত্তী ভূসম্পত্তি দান পত্র করে দিলেন। শ্রীশচী যে একজন রাজকুমারী তা পূর্ব্বেই পুরীধামে প্রচারিত হয়েছিল।

একবার মহাবারুণী স্নানের যোগ উপস্থিত হলে শ্রীশচী গঙ্গা স্নানে যাবার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ শ্রীক্ষেত্রেই অবস্থান করা।

শ্রীগুরুদেবের কথা স্মরণ করে তিনি গঙ্গা স্নানে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। সেই রাত্রে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীশচীকে স্বপ্নে বললেন—"শচী কোন চিন্তা কর না। যে দিন বারুণী স্নান হবে, সে দিন তুমি শ্বেত গঙ্গায় স্নান কর। গঙ্গা দেবী তোমার সঙ্গ-প্রার্থিনী হয়ে শ্বেত গঙ্গায় আসবে।" স্বপ্ন দর্শন করে শ্রীশচীদেবী বড় আনন্দিত হলেন। বারুণী স্নানের যোগ উপস্থিত হল। শ্রীশচী একাকী মধ্যরাত্রে শ্বেত-গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। তিনি যেমন শ্বেত গঙ্গায় নামলেন অমনি গঙ্গাদেবী মহাস্রোতে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চললেন। তিনি ভাসতে ভাসতে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের অভ্যন্তরে এসে উপস্থিত হলেন। তথায় দেখলেন ক্ষেত্রবাসী সহস্র সহস্র লোক সানন্দে স্নান করছেন। চতুর্দ্দিকে স্তব স্তুতি আনন্দ কোলাহল। তিনি সেই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে আনন্দে স্নান করছেন।

এ কোলাহলে মন্দিরের দ্বার-রক্ষকগণের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তারা অবাক হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। শুনলেন ঐ মহাশব্দ মন্দিরের ভিতর থেকে আসছে। দ্বার-রক্ষকগণ তাড়াতাড়ি ঐ সংবাদ কার্য্যাধ্যক্ষগণকে জানাল, তাঁরা এ সংবাদ রাজার নিকট উপস্থিত করলেন। রাজা মন্দির খুলে দেখতে আদেশ দিলেন। অতঃপর মন্দির খোলা হল। অদ্ভুত ব্যাপার, ভাগবত-পাঠিকা শ্রীশচীদেবী একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাগণ মনে করতে লাগলেন—তিনি জগন্নাথ দেবের অলঙ্কার পত্রাদি হরণ করবার জন্য অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছেন। অনেকে বললেন তা হতে পারে না। নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। অনন্তর শ্রীশচী দেবীকে বিচারাধীন করে বন্দীশালে রাখা হল। শ্রীশচীদেবী এতে মুহ্যমান হলেন না। তিনি সানন্দে কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন। রাজা মুকুন্দদেব শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখছেন শ্রীজগন্নাথদেব রাগ করে বলছেন—শচীকে এখনই বন্দীশালা হতে মুক্ত করে দে। আমি তাঁর স্নানার্থে নিজ চরণ থেকে গঙ্গা নিঃসৃত করে মন্দিরে আনিয়েছি। মঙ্গল যদি তুমি চাও পূজক পাণ্ডাগণসহ শচী-চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর থেকে মন্ত্র গ্রহণ কর। এ

স্বপ্ন দেখে রাজা খুব সন্ত্রস্ত হলেন এবং প্রাতে শীঘ্র স্নানাদি সেরে পূজারী পাণ্ডাগণসহ যেখানে শ্রীশচীদেবীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেখানে এলেন ও শীঘ্র তাঁকে মুক্ত করে তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। রাজা বহু অনুনয়-বিনয় সহ শ্রীশচীদেবীর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং জগন্নাথদেবের আদেশ জানিয়ে মন্ত্র প্রার্থনা করতে লাগলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের এ লীলা দেখে শ্রীশচীদেবী প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন ও রাজাকে ভাগ্যবান্ বলে শিরে হস্ত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। অতঃপর শ্রীশচীদেবী শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ জেনে এক শুভদিনে শ্রীমুকুন্দদেবকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। রাজার সঙ্গে বহু পূজারীও তাঁর চরণ আশ্রয় করলেন। সেই দিন থেকে শ্রীশচীর নাম হল শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী।

মহারাজ শ্রীমুকুন্দদেব গুরু দক্ষিণা স্বরূপ কিছু ভূসম্পত্তি শ্রীগঙ্গামাতাকে দিতে চাইলেন। তিনি রাজী হলেন না, বললেন তোমার শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি হউক এইমাত্র আমি চাই। অন্য কোন দক্ষিণা গ্রহণের অধিকারিণী আমি নহি। রাজা বারংবার শ্রীগঙ্গামাতার চরণে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন। অবশেষে শ্রীগঙ্গামাতা বৈষ্ণব সেবার্থে দুই ভাণ্ড মহাপ্রসাদ, এক ভাণ্ড তরকারী, একখানি প্রসাদী বস্ত্র, দুই পণ কড়ি (১৬০ পয়সা) প্রত্যহ মধ্যাহ্ন ধূপের পর মঠে প্রেরণ করবার অনুমতি দিলেন। অদ্যাবধি সে মহাপ্রসাদ নিয়মিত শ্রীগঙ্গামাতা মঠে প্রেরিত হয় এবং উহা শ্রীগঙ্গামাতার সমাধি পীঠে অর্পণ করা হয়।

একবার মহীধর শর্মা নামক একজন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্বেত গঙ্গার তীরে পিতৃ-পুরুষগণের তর্পণাদি করতে আসেন এবং শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর মহিমা শুনে তাঁর চরণ দর্শন করতে যান। শ্রীগঙ্গামাতা পণ্ডিতকে বহু সম্মান দিয়ে আসনে বসান এবং তাঁর অভিপ্রায় শুনতে চাইলেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ

সরলতার সহিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তাঁর সরলতা দেখে শ্রীগঙ্গামাতা তাঁকে ভাগবত সিদ্ধান্ত শুনাতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ সেই অপূর্ব্ব ভাগবত সিদ্ধান্ত সকল শ্রবণ করতে করতে একেবারেই মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। পরে তিনি শ্রীগঙ্গামাতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শ্রীগঙ্গামাতা শুভদিনে তাঁকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। মহীধর শর্মার জন্মস্থান ধনঞ্জয়পুর। শ্রীগঙ্গামাতার আদেশে তিনি গঞ্জাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম-প্রেম প্রচার করতেন।

শ্রীশ্রীরসিক রায় জীউ

রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুর নগরীতে শ্রীচন্দ্রশর্মা নামক এক সদ্ধর্মশীল ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর গৃহে শ্রীরসিক নামক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঠিক মত শ্রীবিগ্রহের ভোগাদি অর্পণ করতে পারতেন না। এক রাতে শ্রীজগন্নাথদেব ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে বললেন— তোমার ঘরে যে রসিক রায় শ্রীবিগ্রহ আছে, তার ভাল ভাবে সেবা হচ্ছে না। তুমি শীঘ্র তাকে শ্রীক্ষেত্রে শ্বেত গঙ্গার তটস্থিতা গঙ্গামাতার নিকট পৌঁছিয়ে দাও। নতুবা তোমার অকল্যাণ হবে। ব্রাহ্মণ ভগবানের আদেশ পেয়ে বেশী বিলম্ব করলেন না। শীঘ্র রসিক রায়কে নিয়ে শ্রীক্ষেত্রে এলেন এবং লোককে জিজ্ঞাসা করে শ্রীগঙ্গামাতার নিকট উপস্থিত হলেন । শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীগঙ্গামাতা খুব সুখী হলেন। ব্রাহ্মণ সমস্ত কথা বললেন। তা শুনে শ্রীগঙ্গামাতা বললেন—আমি ভিখারিণী। মাধুকরী করে খাই। বিগ্রহ সেবা কি করে করব? আপনি বিগ্রহ নিয়ে যান। আমাকে অপরাধী করবেন না। ব্রাহ্মণ নিরুপায়। কি করেন? খুব চিন্তা করলেন। অবশেষে শ্রীগঙ্গামাতার তুলসী কাননের মধ্যে শ্রীরসিক রায়কে রেখে ব্রাহ্মণ রাত্রে পালিয়ে গেলেন।

এদিকে শ্রীরসিক রায় রাত্রে স্বপ্নে গঙ্গামাতাকে বলতে লাগলেন— আমি তোমার সেবা গ্রহণ করবার জন্য এখানে এসেছি। ব্রাহ্মণ আমাকে তুলসী কাননে ছেড়ে চলে গেছে। আমার এখনও ভোজন হয়নি। আমাকে কিছু ভোজন করাও।

স্বপ্ন দেখে শ্রীগঙ্গামাতা চমৎকৃত হলেন। স্বয়ং শ্রীহরি তাঁর কাছে এসে কিছু ভোজন করতে চান। এ সব চিন্তা করে গোস্বামিনী প্রেমে পুলকিত হয়ে তাড়াতাড়ি স্নান করলেন ও তুলসী কাননে এলেন। দেখলেন শ্রীরসিক রায় বিরাজ করছেন। শ্রীগঙ্গামাতা প্রেমাশ্রু-পূর্ণ নয়নে বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। ঠাকুরের ভোজন হয়নি। তিনি ক্ষুধার্থ ভেবে বড় ব্যাকুল চিত্তে তাঁকে গৃহে নিয়ে গেলেন, তাড়াতাড়ি স্নানাদি করিয়ে কিছু ভোগ লাগালেন। তিনি দেখলেন ক্ষুধার্ত্ত রসিক রায় সমস্ত উপকরণ দ্রুত ভোজন করছেন। শ্রীগঙ্গামাতা আনন্দাশ্রুতে ভাসতে লাগলেন। অনন্তর নূতন বস্ত্রাদি পেতে ঠাকুরকে শয়ন করালেন।

সকাল বেলা ভক্তগণ শ্রীগঙ্গামাতার গৃহে শ্রীরসিক রায়কে দেখে অবাক হলেন। তারপর সকলে শ্রীরসিক রায়ের বৃত্তান্ত শুনে আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।

প্রতিদিন শ্রীগঙ্গামাতা বহু প্রণয় ভরে বহু প্রকার ব্যঞ্জন পিঠাপানাদি তৈরী করে শ্রীরসিক রায়কে ভোজন করাতে লাগলেন। বিগ্রহ সেবায় শ্রীগঙ্গামাতার চার প্রহর সময় অতিবাহিত হত।

কিছুদিন ভিক্ষা করে তিনি শ্রীরসিক রায়ের সেবা করেন। বয়স হওয়ায় শ্রীগঙ্গামাতার ভিক্ষাদি করতে পরিশ্রম হত। শ্রীরসিক রায় তাঁর পরিশ্রম দেখে কৌশলে ধনী বণিকদের থেকে দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করতেন। বয়স হবার পর সেবার ত্রুটি হচ্ছে মনে করে গঙ্গামাতা শ্রীরসিক রায়ের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে বলেন—পরিচর্য্যা করতে তিনি অক্ষম। তাই জীবন আর ধারণ করতে চান না। তা শুনে শ্রীরসিক রায় স্বপ্নে বললেন— তোমার সেবায় আমি সুখী, তুমি খেদ কর না। তুমি আর কিছু দিন সেবা কর।

অনন্তর কিছুদিন পরে গঙ্গামাতা শ্রীরসিক রায়কে আবার জানান যে

তিনি আর থাকতে চান না। প্রাণ ত্যাগের সময় তাঁর নাম করতে করতে যেন যেতে পারেন। শ্রীরসিক রায় বললেন—তুমি কোন চিন্তা কর না, উপযুক্ত শিষ্যের হাতে আমার সেবা ভার দিয়ে তুমি আমার ধামে চলে এস।

অতঃপর বনমালী দাস নামক একজন শান্ত দান্ত ভক্তের হাতে শ্রীগঙ্গামাতা শ্রীরসিক রায়ের সেবা অর্পণ করে ১২০ বছর বয়সে ১৭২১ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীরসিক রায়ের শ্রীচরণ চিন্তা এবং নয়নে তাঁর শ্রীরূপ মাধুরী দর্শন করতে করতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব ১৬০১ খৃষ্টাব্দে।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রপৌত্র। শ্রীবৈষ্ণব দাস (ওরফে শ্রীগোকুলানন্দ সেন) পদ কল্পতরু গ্রন্থের শেষে ঠাকুরের বংশ পরিচয় এইরূপ দিয়েছেন—

শ্রীআচার্য্য প্রভু বংশে শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন।।
যাঁহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের বিলাস।
যেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ।।
গ্রন্থ কৈলা পদামৃত সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান।।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর যেমন বিদ্বান তেমনি অসাধারণ গীতবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। তিনি "শ্রীপদামৃত সমুদ্র" নামক গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন।

বাংলা ১১২৫ সালে গৌড় মণ্ডলে "স্বকীয় ও পারকীয়া" সম্বন্ধে এক বিশাল আলোচনা সভা হয়েছিল, তাতে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল। সভামধ্যে শ্রীজীবের ষট সন্দর্ভ অনুসারে পারকীয়বাদের প্রাধান্য স্থাপন করাইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ সে সিদ্ধান্ত অবনত শিরে গ্রহণ করেন।

এ সভায় বৈষ্ণবদাস (গোকুলানন্দ সেন) ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। এঁরা শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।

বিচার সভায় শ্রীরাধামোহন যে জয়পত্র পেয়েছিলেন তা' শ্রীযুক্ত মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে বাংলা ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন রেজিষ্টী করা হয়েছিল। তখন ঠাকুর মহাশয়ের বয়স ত্রিশ বছর।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের প্রধান শিষ্যগণের অন্যতম ছিলেন মহারাজ শ্রীনন্দ কুমার। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মহারাজ শ্রীনন্দ কুমারের ফাঁসি হয়। এতে শ্রীঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে অপ্রকট হন।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর একজন বিশিষ্ট পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁর রচিত গৌর বিষয়ক গীত যথা—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সার।
অপরূপ কলাপ বিরিখ অবতার।।
অযাচিতে বিতরই দুর্লভ প্রেমফল।
বঞ্চিত না ভেল পামর সকল।।
চিন্তামণি নহে সেই ফলের সমান।
আচণ্ডাল-আদি করি তাহা কৈলা দান।।
হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়।
এ রাধামোহন মাগে চরণে আশ্রয়।।

গোষ্ঠ লীলা—

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরি-নেহ।
গোধন সঙ্গে বিজয় করু নিজ সুতে
কি করব না পায়ই থেহ।।ধ্রু।।
মুখ ধরি চুম্বন করতহিঁ পুনঃ পুনঃ
নয়নে গলয়ে জল-ধার।
স্তন-গত বসন তাগি পড়য়ে ঘন
ক্ষীর ধার অনিবার।।

বিনিহিত নয়ন বয়ন-কমল পর
যৈছন চান্দ চকোর।।
দিন অবসানে কীয়ে পুন-হেরব
অনুমানি হোয়ত বিভোর।।
কো বিহি অদ্‌ভূত প্রেম ঘটায়ল
তাহে পুনঃ ইহ পরমাদ।
ভন রাধামোহন অনুদিন ঐছন
হোয়ত রস-মরিষাদ।।

মিলন—

রাধা মাধব যব দুঁহু মেলি।
নিদাঘক দাহু সবহু দূরে গেলি।।ধ্রু।।
তহিঁ পুনঃ সরোবর মন্দির মাঝ।
জন-কণ শীকর নিকর বিরাজ।।
সৌরভ মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি কিরণক বন্ধ।।
তহিঁ বর সুরত-বাপি অবগাহ।
রাধামোহন পহু রসিক সুনাহ।।

দান লীলা—

গরবহি সুন্দরি চললহ আনত
নাগর পন্থ আগোর।
করতহিঁ বাত দান দেহ মঝু হাত
আন ছলে কাঁচলি তোড়।।

অপরূপ প্রেম তরঙ্গ।

দান কেলি রস কলিত মহোৎসব

বর কিল কিঞ্চিত রঙ্গ।।ধ্রু।।

অলপ পাটল ভেল অথির দৃগঞ্চল

তহিঁ জলকণ পরকাশ।

ধুনাইতে ভুরু ধনু পুলকে পুরল তনু

অলখিত আনন্দ হাস।।

ঐছন হেরি চকিত পুনঃ তৈখনে

বাহুড়ল পদ দুই চারি।

রাধামাধব দুহুঁ কর পদতল

রাধামোহন বলিহারি।।

বিরহ—

কানু যাহাঁ কেলি করল কত কৌতুক

সো পুনঃ কুঞ্জ নেহারি।

ভাবে ভরল মন নবমি-দশা পুনঃ

হোয়ল ও সুকুমারি।।

সখিহে! অনুভবি মরমক শেল।

তৈখনে কান্দি সখীগণ ঘেরল

কোই পুনঃ হৃদি পর নেল।।ধ্রু।।

তৈখনে কৈছনে চলিত কণ্ঠ হেরি

নলিনিক যোজাহি রাখি।

যমুনা তীর নীর হরণে চলু

তাই দেখি একবর পাখী।।

মাথুর দুত কনি প্রেমহিঁ মানল
নিবেদই সব দুখ ভাখি।
অদ্ভুত বচন রচন উহ যৈছন
রাধামোহন পহুঁ সখী।।

যুগল—

ভ্রমই গহন বনে যুগল কিশোর।
সঙ্গহি সখিগণ আনন্দে ভোর।।
সখি! এক কহে পুন হোর দেখ সখি।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে অনিমিখ আঁখি।।
তরু সব পুলকিত ভ্রমরের গণ।
সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুল বন।।
শ্রম ভরে বৈঠলি মাধবি কুঞ্জ।
রাই-মুখ-কমলে পড়ল অলিপুঞ্জ।।
লীলা কমলহি কানু তাহে বারি।
মধুসূদন গেও কহত উচারি।।
এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর।
কহ রাধামোহন অনুরাগ ওর।।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী

শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের পুত্র—(১) শ্রীচৈতন্যদাস ও (২) শ্রীনিত্যানন্দ দাস। শ্রীচৈতন্যদাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী। ইনি মহাপ্রভাবশালী আচার্য্য ছিলেন। এঁকে দ্বিতীয় বংশীবদন ঠাকুর বলা হত।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী শ্রীজাহ্নবা মাতা গোস্বামিনীর প্রতিপাল্য শিষ্য ছিলেন। তিনি পুরী, কাশী, প্রয়াগ ভ্রমণ করে মথুরায় আসেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থলী আদি কেশব প্রভৃতি দর্শন করেন। অনন্তর গোকুলের দ্বাদশ বনাদি দর্শন করেন। বৃন্দাবন ধামে তিনি কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তিনি রাম ও কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি নিয়ে গৌড়দেশে আগমন করেন। তাঁর ভক্তি সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ভক্তি সদাচারতা ও আচার-নিষ্ঠা প্রভৃতি দেখে সকলে মুগ্ধ হন। অল্পকাল মধ্যে তাঁর যশ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বহু সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

অম্বিকা নগরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে বালুকা নাম্নী একটা ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা, তার তীরে ছিল ঘোর জঙ্গল। জঙ্গলে ছিল হিংস্র ব্যাঘ্রের বাস। সেই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী বসবাস করতে লাগলেন। চারিদিকে শিষ্যগণের বসত বাটী করলেন। গোস্বামীর প্রভাবে সেই স্থান যেন মহাতীর্থে পরিণত হল। গোস্বামী মহোদয় একদিন একটী ব্যাঘ্রকে হরিনাম করতে বললেন। ব্যাঘ্রটি হরিনাম করতে লাগল। তিনি যাঁকে নাম উপদেশ করতেন, তিনি নামে মত্ত হতেন এবং উদ্ধার লাভ করতেন। সেইজন্য ঐ স্থানের নাম হল "বাঘনাপাড়া" ব্যাঘ্রকে উপদেশ দিয়ে উদ্ধার করলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বাঘ্না পাড়া গোস্বামিদিগের এক প্রশস্তি পত্রে বাঘ্নাপাড়া নামের কারণ উল্লেখ করেছেন।

"জয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণৌ বাঘ্না পল্লীবিভূষণৌ।
জাহ্নবীবল্লভৌ রামচন্দ্রকীর্ত্তিস্বরূপকৌ।।
ব্যাঘ্রঽপি বৈষ্ণবঃসাক্ষাৎ যৎপ্রভাবাদ্বভূব তৎ।
ব্যাঘ্নাপল্ল্যাত্মকং বন্দে শ্রীপাটং গৌড়পাবনং।।

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী)

বাঘ্না পাড়ায় শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী শ্রীরাম ও কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি সেই মূর্ত্তি তথায় বিরাজ করছেন। পশ্চিম অঞ্চলের কোন বণিক ভক্ত বিগ্রহের জন্য উত্তম মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থে আছে—

জাহ্নবীর প্রিয় বন্দ্য রামাই গোসাঞী।
যে আনিল গৌড় দেশে কানাই বলাই।।
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবী মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে—

অরুণ উদয় কালে তীর্থ প্রস্কন্দনে।
স্নান করিবারে প্রভু করেন গমনে।।
স্নান কালে রাম কৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি যুগল।
প্রভু রামচন্দ্র কোলে আসিয়া উঠিল।।

—(বংশীশিক্ষা)

প্রস্কন্দন তীর্থে স্নান করবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের কোলে এসে উঠলেন। ভগবান্ ভক্তের থেকে কি ভাবে সেবা নেন এবং কিভাবে জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য প্রকটিত হন তা কে বুঝতে পারে?

একদিন রাত্রিকালে শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী বহু শিষ্য নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর গৃহে এলেন এবং বললেন অদ্য আম্র প্রসাদ গ্রহণ করতে চাই। কোন শিষ্যের দ্বারা বকুল বৃক্ষ থেকে আম্রফল পাড়িয়ে শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামীকে ও শিষ্যগণকে ভোজনের সময় দিয়েছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ শকের মাঘ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে অপ্রকট হন। তিনি কখন বুধরী গ্রামে কখন বাঘ্নাপাড়ার নিকটে রাধানগরে অবস্থান করতেন। ইনি ব্রহ্মচারী ছিলেন। ছোট ভ্রাতা শ্রীশচীনন্দনকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করে বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীবিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করেন। শচীনন্দন গোস্বামী স-পরিবারে বাঘ্না পাড়াতে অবস্থান করেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীযুক্ত বিহারী গোস্বামী প্রভৃতি তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী লিখিত গ্রন্থ—(১) করচা মঞ্জরী (২) সম্পূটিকা ও (৩) পাষণ্ড দলন।

তাঁর দুইটি পদকীর্ত্তন শ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ রায়।
শিব শুক বিরিঞ্চি যার গুণ গায়।।
কমলা যাঁহার ভাবে সদাই আকুলি।
সেই পহুঁ বাহু তুলি কান্দে হরি বলি।।
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম।
সো অব কীর্ত্তন ধূলি ধূসর অভিরাম।।

খেনে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া।
গদাধর নরহরি রহে মুখ চাঞা।।
পূরব নিবিড় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে কে না বুঝে ও রঙ্গ।।

— — —ঃঃ০ঃঃ— — —

দেখ শচীনন্দন জগত জীবন ধন
অনুক্ষণ প্রেমধন জগজনে যাচে।
ভাবে বিভোর বর গৌর তনু পুলকিত
সঘনে বোলাঞা হরি গোরা পহুঁ নাচে।।
সব অবতার সার গোরা অবতার।
হেম বরণ যিনি নিরুপম তনু খানি
অরুণ নয়নে বহে প্রেমক ধার।।
বৃন্দাবন গুণ শুনি লুঠত সে দ্বিজমণি
ভাব ভরে গরগর পহুঁ মোর হাসে।
কাশীশ্বর অভিরাম পণ্ডিত পুরুষোত্তম
গুণ-গান করতহি নরহরি দাসে।।
খোল করতাল শুনি কিবা শিশু কিবা ধনী
ধায়ত সবহুঁ প্রেম প্রতি আশে।
এমন গৌর গুণ যাক জাগয়ে মনে
তাকর সেবক রামচন্দ্র দাসে।।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ
বা গোবিন্দ দাস (পদকর্ত্তা)

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ—ইনি মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের আলয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মাতৃগর্ভে অতিরিক্ত মাস অবস্থান করার ফলে জননী সুনন্দার অতিশয় কষ্ট হচ্ছিল। দাসী শ্রীদামোদর কবিরাজকে এসে এ কথা বললেন। তখন শ্রীদামোদর কবিরাজ দেবীর পূজা করছেন। তজ্জন্য দাসীর সঙ্গে কোন কথা না বলে চক্ষে ইঙ্গিত করে বললেন— দেবী-যন্ত্রটী সুনন্দাকে দেখাও, এখনই পুত্র প্রসব হবে। দাসীটী ইঙ্গিতে না বুঝে দেবী-যন্ত্র ধৌত করে সেই জল সুনন্দাকে পান করাল, তাতে তিনি সুখে পুত্র প্রসব করলেন।

"শীঘ্র যন্ত্র-ধৌত করি জল পিয়াইল।"

(ভক্তিরত্নাকর ৯।১৪৯)

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের জন্মের পর পিতা চিরঞ্জীব সেন অপ্রকট হন। তখন থেকে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের আলয়ে প্রতিপালিত হন। শ্রীদামোদর কবিরাজ শাক্ত ছিলেন। মাতামহের সঙ্গ ফলে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ শাক্ত ভাবাপন্ন হন।

শ্রীরামচন্দ্র পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ্রহে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন।

শ্রীগোবিন্দ ঘোরতর শাক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ভগবতী ছাড়া অন্য কোন কথা বলতেন না, কোন পূজাও করতেন না। সকলকে ভগবতী উপাসনার কথাই বলতেন। তখন গীত পদ্যাদি যা লিখতেন সমস্তই ভগবতী সম্বন্ধে।

শ্রীরামচন্দ্র শ্রীআচার্য্য স্থানে শিষ্য হৈতে।
গোবিন্দ একান্তে বসি বিচারয়ে চিতে।।
ভগবতী পাদপদ্ম কৈলে আরাধন।
না হৈত কি এ ভব বন্ধাদি বিমোচন।।

—(ভক্তিরত্নাকর ৯।১৫৭-১৫৮)

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ্রহ পাবার পর শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের মতি বৈষ্ণব ধর্মে এসেছিল— সেই সম্বন্ধে বলছেন শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—শক্তি উপাসনা মার্গে ভগবন্ধন থেকে কি মুক্তি পাওয়া যায় না?

ঠিক এই সময় তিনি দৈববাণী শুনলেন—

হেন কালে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি।।

—(ভক্তিরত্নাকর ৯।১৫৯)

অলক্ষ্যে দেবী যেন বলছেন—শ্রীকৃষ্ণ ভজন ছাড়া কারও ভববন্ধন মোচন হয় না। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ এই দৈববাণী শুনে বুঝতে পারলেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন ছাড়া অন্য কোন মার্গে বা অন্য কোন উপাসনার দ্বারা ভববন্ধন থেকে মুক্তি হয় না—ইহা দেবীর উপদেশ। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করলেন।।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণ ভজনের জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বড় ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ্রহে ধন্য হয়েছেন, তিনিও তাই শ্রীআচার্য্যের শ্রীচরণ আশ্রয় করতে উৎসুক হলেন।

শ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য হইব সর্ব্বথা।
তবে সে ঘুচিবে মোর অন্তরের ব্যথা।।
—(ভক্তিরত্নাকর ৯।১৬১)

আমি নিশ্চয় শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের চরণ আশ্রয়ে ধন্য হব। শ্রীগোবিন্দ এইরূপ বিচার করে যাজিগ্রামে যাবার উদ্যোগ করলেন, এমন সময় শুনলেন শ্রীআচার্য্য বৃন্দাবনে চলে গেছেন। শ্রীগোবিন্দের মনে বড় খেদ উপস্থিত হল। তখন তিনি মনে মনে বিচার করতে লাগলেন—

বৈষ্ণবগণেও মোর হিত চিন্তা কৈল।
কহিল পিতার বার্ত্তা—তাহা না শুনিল।।
মোর পিতা চিরঞ্জীব সেন বিদ্যাবান।
চৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত—গুণের নিধান।।
এ হেন সন্তান হৈয়া গেলু ছারে খারে।
এ কেবল কর্মদোষ—কি বলিব কা'রে।।
—(ভক্তিরত্নাকর) ৯।১৬৪-১৬৬)

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ স্বগত ভাবে—কৃপাময় বৈষ্ণবগণ পূর্বে আমার হিত চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের কথা বলেছিলেন। ভাগ্যদোষে তখন তাঁদের কথায় কর্ণপাত করি নাই।

আমার পিতা চিরঞ্জীব সেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম অনুগ্রহ পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম ভাগবত ও সমস্ত গুণের নিধান। হায়! আমি এহেন লোকের সন্তান হয়ে বৃথা জীবন কাটালাম। এ জগতে দেখছি আমার সমান দুর্ভাগা আর কে আছে?

পুনঃ যদিও দেবী স্বয়ং অহৈতুকী কৃপা করে কৃষ্ণ ভজন করতে বললেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে কিছুটা মতি হল কিন্তু সদ্ গুরু কোথায় পাব? মনে করলাম শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীচরণ আশ্রয় করব, তিনি ত শ্রীবৃন্দাবনে বাস

করছেন।

মোর জ্যেষ্ঠ আচার্য্য প্রভুর দরশনে।
ফিরিল সে মন—নিষ্ঠা হৈল সে চরণে।।

—(ভঃ রঃ ৯।১৬৯)

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ এই সমস্ত কথা বলে যখন খেদ করতে ছিলেন তখন দৈববাণী শুনলেন—

"হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে
অভিলাষ পূর্ণ হবে অলপ দিবসে।।"

—(ভঃ রঃ ৯।১৭২)

তোমার শীঘ্র অভিলাষ পূর্ণ হবে তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর। এবার গোবিন্দ কবিরাজ কিছুটা আশ্বস্ত হ'লেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ছোট ভা'য়ের এই সমস্ত চেষ্টা শুনে বড়ই সুখী হলেন।

এদিকে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্য গৌড় দেশবাসী ভক্তগণ বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আচার্য্যকে শ্রীবৃন্দাবন থেকে আনবার জন্য কাকে পাঠান হবে;সকলে মনোনীত করলেন শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা নিয়ে শুভদিনে বৃন্দাবন যাত্রা করে, তিনি কুমারহট্ট নগরে ছোট ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের কাছে এলেন। শ্রীগোবিন্দের কৃষ্ণ ভজন উৎকণ্ঠা দেখে তিনি খুব সুখী হলেন এবং আচার্য্যপাদ এলেই সব বাসনা সিদ্ধ হবে জানালেন।

এ সময় তিনি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজকে কুমার নগর থেকে তেলিয়া বুধরি গ্রামে গিয়ে বাস করতে বললেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবনে যাবার পর শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তেলিয়া বুধরি গ্রামে এসে বসত-বাটী নির্মাণ করেন।

ভক্তগণের ইচ্ছায় শ্রীনিবাস আচার্য্য গৌড় দেশে এলেন এবং বিভিন্ন স্থানে ভক্তগণ সঙ্গে সুখে হরিকথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর শুভাগমনে গৌড় দেশে শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন বন্যা আরম্ভ হল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তাঁর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন।

অতঃপর ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীআচার্য্য তেলিয়া বুধরিতে এলেন। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ অতিশয় ভক্তিপূত হৃদয়ে দৈন্য ভরে শ্রীল আচার্য্যকে আমন্ত্রণ করে স্বগৃহে আনলেন। বিপুল ভাবে তাঁর সেবা-আদি করতে লাগলেন। বুধরি গ্রামবাসী আচার্য্য দর্শনে পরমানন্দিত হলেন। এই সময় শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আচার্য্যের চরণে পড়ে কৃপা প্রার্থনা করলেন। করুণাময় শ্রীআচার্য্য ঠাকুর তাঁকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

"রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষা দিলেন গোবিন্দে।।"

—(ভঃ রঃ ১০।১৭১)

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আচার্য্য চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর ভক্তি দর্শনে বৈষ্ণবগণের আনন্দের সীমা রইল না। এই সময় গৌড় দেশে পুনঃ প্রেমভক্তি বন্যা প্রবাহিত হল।

গৌড় দেশে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাকবি বলে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর বিদ্যা প্রতিভা অত্যদ্ভুত ছিল। "তিনি সঙ্গীতমাধব" নামে একখানি মহানাটক রচনা করেন। তাঁর আরও কয়েকখানি রচিত গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ আছে। যেমন ছিল তাঁর সংগীত রচনা শক্তি, তেমনি ছিলেন তিনি সুকণ্ঠ গায়ক। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীজাহ্নবা মাতা গোস্বামিনী প্রভৃতি তাঁর ভক্তিময়ী সংগীত শ্রবণে পরম সুখী হয়ে তাঁকে কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি শ্রীবিদ্যাপতির মৈথিল ভাষাযুক্ত পদাবলীর অনুসরণে গীত রচনা করেন। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব সম্বলিত গীত রচনা করেন। তাঁর সংগীতে এত অনুপ্রাস, এত সরল সহজ ভাষা গম্ভীর ভাব যুক্ত

যে শ্রোতার হৃদয় সহজেই আর্দ্রিভূত করে তুলে।

শরণাগতির দৈন্যাত্মক একটি গীত—

ভজহুঁরে মন, শ্রীনন্দ নন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানব, জনম সৎসঙ্গে,
তরহু এ ভব সিন্ধু রে।।
শীত আতপ, বাত বরিষণ,
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখলব লাগি রে।।
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে।।
কমল দল জল, জীবন টলমল,
ভজনুঁ হরিপদ নিতিরে।।
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদ সেবন দাস্য রে।
পূজন সখিজন, আত্ম নিবেদন,
গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে।।

— — ঃঃ০ঃঃ— —

শ্রীগৌর বিষয়ক পদ কীর্ত্তন—

জাম্বু নদ-তনু বদন অম্বুজ
সঘনে হরি হরি বোল।
নয়ন অম্বুজে বহয়ে সুরধুনী
কম্বু কন্ধরে দোল।।
দেখ দেখ গৌর দ্বিজবর রাজ।

সঙ্গে সহচর সুঘড় শেখর
উয়ল নবদ্বীপ মাঝ।।
তরুণ প্রেমভরে দিন রজনী নাচত
অরুণ চরণ অথীর।
করুণ দিঠি জলে এ মহী ভাসল
নীলয় বরুণ গম্ভীর।।
কবহুঁ নাচত কবহুঁ গায়ত
কবহুঁ গদ্‌গদ্ ভাষ।
অখিল জগজন প্রেমে পুরল
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।।

-- ঃঃ০ঃঃ --

কুন্দয় কনয় কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গ অবিরল পুলক ভাতি।।
প্রেম ভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনী তাহা বহি যায়।।
দেখ দেখ গোরা গুণমণি।
করুণায় কো বিধি মিলওল আনি।।
জপি জপায় মধুর নিজ নাম।
গাই গাওয়ায়ে আপন গুণ গান।।
নাচি নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহুঁন পেখলু ঐছন পর রঙ্গ।।
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজপর নাহি সবারে দেই কোর।।
ভাসল প্রেমে সকল নর-নারী।
গোবিন্দ দাস বলে যাঁউ বলিহারী।।

—— ঃ০ঃ ——

সুরধুনী তীর তীর মহা বিলসই
ভকত জনগণ সঙ্গ।
কর তল তাল, বোলত হরিধ্বনি
নাচত নটবর ভঙ্গ।।
জয় শচী নন্দন ত্রিভুবন বন্দন
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জগু অনু রঞ্জন ভব ভয় ভঞ্জন
সংকীর্ত্তন পরচার।।
চম্পক গৌর প্রেমভরে কম্পই
ঝম্পই সহচর কোর।
অঙ্গহি অঙ্গ পুলক পুল আকুল
কঞ্জ নয়নে ঝরু লোর।।
ধ্বনি ধ্বনি ভাঙ্গনি চতুর শিরোমণি
বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দ দাস হেন রস বঞ্চিত
অবহু শ্রবণে নাহি পিব।।

— o —

সবহুঁ গায়ত সবহুঁ নাচত
সবহুঁ আনন্দে মাতিয়া।
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতল
বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া।।
মধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজত
চলত কত কত ভাতিয়া।
বদন গদ্ গদ্ মধুর হাসত
খসত মতিম পাতিয়া।।

পতিত কোলে ধরি বোলত হরি হরি
দেওত পুন প্রেম যাচিয়া।
অরুণ লোচনে বরুণ ঝরতঁহি
এ তিন ভুবন ভাসিয়া।।
এ সুখ সায়রে লুব্ধ জগজন
মুগধ দিন রাতি জাগিয়া।
দাস গোবিন্দ রোওত অনুক্ষণ
বিন্দু কণ আধ লাগিয়া।।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিষয়ক পদ—

কুন্দ কুসুমে ভরু কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজি মোতিম হার।।
চন্দন চরচিত রুচির কপুর।
অঙ্গহি অনঙ্গ ভরিপুর।।
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি অভিসার রভস রসে ভোরি।।ধ্রু।।
ধবল বিভুষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তরু চলুই।।
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ পূতলি কিয়ে রস মহা ধূর।।
পূরতি মনরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার।।
সুরত শিঙ্গার কিরিতি সমভাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দ দাস।।

— — ০ — —

দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ।।
ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার।
দামিনি দহই ঝলকে অনিবার।।
ঐছে সময়ে বর রাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম।।
দুহুঁ তনু মিলন মনমথে মাতি।
দুহুঁ পরিরম্ভন সমরক ভাতি।।
অপরূপ দুহুজন নিধুবন কেলি।
গোবিন্দ দাস হেরই সখি মেলি।।

— ঃঃ —

বিরহ গীত—

পরাণ পিয়া সখি হামারি পিয়া।
অবহু না আওল কুলিশ হিয়া।।
নখর খোয়ায়লু দিবস লিখি-লিখি।
নয়ন অন্ধায়লু পিয়া পথ দেখি।।
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কিয়েদোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল।।
অব হাম তরুণি বুঝলু রসভাষ।
হেন জন নাহি যে কহয়ে পিয়া পাশ।।
বিদ্যাপতি কহ কৈছন প্রীত।
গোবিন্দ দাস কহ ঐছন রীত।।

— ঃঃ —

বিরহ গীত—

মাধব তুহুঁ রহলি মধুপুর।
ব্রজপুর আকুল দুকুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর।।
যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
সাহসে উঠই না পার।
সখাগণ বেনু ধেনু সব বিছুরল
বিছুরল নগর বাজার।।
কুসুম ত্যজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই
তরুগণ মলিন সমান।
শারি শুক পীক ময়ুরী না নাচত
কোকিল না করতঁহি গান।।
বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব
দশদিশ বিরহ হুতাশ।
সহজে যমুনা জল হোয়ল অধিক
কহ তহি গোবিন্দ দাস।।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস সাহিত্য হিসাবে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের এই সমস্ত গীতি অনুপম। স্বয়ং শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পদ সমূহ শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'কবিরাজ' আখ্যা প্রদান করেছিলেন। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পদাবলী গীত সংখ্যা পদকল্পতরুতে ৪৬০ আছে।

গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম ১৪৫৯ শকে, অপ্রকট ১৫৩৫ শকে, আশ্বিন মাসের শুক্ল প্রতিপদে। তাঁর পত্নীর নাম মহামায়া। পুত্রের নাম শ্রীদিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের পুত্রের নাম কবি ঘনশ্যাম।

শ্রীদৈবকীনন্দন দাস

শ্রীদৈবকীনন্দন দাসের মন্ত্রদাতা গুরু শ্রীপুরুষোত্তম দাস। শ্রীপুরুষোত্তম দাসের পিতা শ্রীসদাশিব কবিরাজ। শ্রীপুরুষোত্তম দাস শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ-ভক্ত ছিলেন। অতএব দৈবকীনন্দন দাস শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবার ভুক্ত। বৈষ্ণব বন্দনায় আছে—

ইষ্টদেব বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কি কহিব তাঁহার যে গুণ অনুপম।।
সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণা শক্তি বলে।।
সপ্তম বৎসরে যাঁর কৃষ্ণের উন্মাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ।।

শ্রীমনোহর দাস কৃত "অনুরাগবল্লী"তেও দেখা যায়—

শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়।
দৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়।।
তেঁহো যে করল বড় বৈষ্ণব বন্দনা।।

শ্রীদৈবকীনন্দন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বাংলা বৈষ্ণব বন্দনা ভিন্ন সংস্কৃত "বৈষ্ণবাভিধান" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার বাসস্থান কুমারহট্ট বা হালিশহরে ছিল।

শ্রীদৈবকীনন্দন দাস নিজের পিতামাতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন নাই। মন্ত্রদাতাগুরু নিত্যানন্দ পার্ষদ ছিলেন। এইটুকু মাত্র বলেছেন। ইনি একজন বিশেষ পদকর্ত্তা।

শ্রীদৈবকীনন্দন দাসের শ্রীবৈষ্ণবশরণ—

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ।।
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ।।
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত।।
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দো করিয়া প্রণতি।।
যেদেশে যেদেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধ বাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ।।
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস।।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে-জনে।
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে।।
মহাপ্রভুর গণ সব, পতিত-পাবন।
তাই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ।।
বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি।
তমোবুদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি।।
তথাপি মুকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজদাস।।

সর্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমধন লুটে।।
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দৈবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়।।

পদ কীৰ্ত্তন শ্রীগৌর চন্দ্রস্য—

চৌদিকে ভকতগণ হরিহরি বলে।
রঙ্গন মালতী মালা দেই গোরা গলে।।
কুঙ্কুম কস্তুরী আর সুগন্ধ চন্দন।
গোরাচাঁদের অঙ্গে সব করয়ে লেপন।।
রাঙ্গা প্রান্ত পট্টবাস কোঁচার বলনি।
ঝলমল করে কিযে অঙ্গের লাবনি।।
চাঁচর চিকুরে চাঁপা মনোহর ঝুটা।
উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ চন্দনের ফোঁটা।।
আজানুলম্বিত ভুজ সরু পৈতা কান্ধে।
মদন বেদন পাঞা ঝুরি ঝুরি কান্দে।।
দৈবকীনন্দন বলে সহচর সনে।
দেখ সভে গোরাচাঁদ শ্রীবাস ভবনে।।

— ঃঃ —

নাহি নাহি নাহি ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ বিনে
দয়ার ঠাকুর নাহি আর।
কৃপাময় গুণনিধি সব মনোরথ সিদ্ধি
পূর্ণ পূর্ণতম অবতার।।

রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরেরে করিলা সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কারে না মারিল
মন শুদ্ধি করিলা সবার।।
কলি কবলিত যত জীব সব মুরছিত
নাহি আর মহৌষধি তন্ত্র।
তনু অতি ক্ষীণ প্রাণী দেখি মৃত সঞ্জীবনী
প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র।।
এ হেন করুণা তাঁর পাষাণ হৃদয় যার
সে না হইল মনির সোসর।
দৈবকীনন্দন ভনে হেন প্রভু যে না মানে
সেই জন বড় দুরাচার।।

শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য—

গজেন্দ্র গমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে।
যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে।।
পতিত দুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া।।
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও বল গৌরহরি।।
তো সভার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন নাই গৌরাঙ্গ সুন্দর নদীয়ার।।
যে পহুঁ গোকুলপুরে নন্দের কুমার।
তো সভার লাগিয়া এবে কৈল অবতার।।

শুনিয়া কান্দয়ে পাপী চরণে ধরিয়া।
পুলকে পুরল অঙ্গ গরগর হিয়া।।
তারে কোলে করি নিতাই যায় আন ধাম।
হেনমতে প্রেমে ভাসাইল পুরগ্রাম।।
দৈবকীনন্দন বলে মুঞি অভাগিয়া।
ডুবিলুঁ বিষয় কূপে নিতাই না ভজিয়া।।

শ্রীযদুনন্দন দাস (পদকর্ত্তা)

যদুনন্দন নামে পাঁচজন গৌরভক্ত ছিলেন।

১ নম্বর—হচ্ছেন কন্টকনগর নিবাসী যদুনন্দন আচার্য্য। ইনি অদ্বৈত শাখা অন্তর্ভুক্ত।

২ নম্বর— ঝামটপুর নিবাসী যদুনন্দন আচার্য্য।

৩ নম্বর—যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী। ইনি নিত্যানন্দ পার্ষদ।

৪ নম্বর—যদুনন্দন আচার্য্য, ইনি বাসুদেব দত্তের শিষ্য ও রঘুনাথ দাসের গুরু।

৫ নম্বর—যদুনন্দন দাস। এখানে এঁর সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ জেলার তের ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টক নগরের উত্তরাংশে ভাগীরথীর পশ্চিম তটে খালিহাটী গ্রামে ১৪৫৯ শকে শ্রীযদুনন্দন দাস পদকর্ত্তার জন্ম হয়। ইনি বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। শ্রীযদুনন্দন দাস লিখিত কর্ণানন্দ গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শ্রীগুরু-চরণ মহিমা কীর্ত্তন করে অধ্যায় শেষ করেছেন।

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা।
প্রেম কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা।।

সে দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস।।

শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে পদ্যানুবাদের বন্দনায় বলেছেন—

বন্দ্য গুরু পদতল চিন্তামণিময় স্থল
সর্ব্বগুণ খনি দয়ানিধি।
আচার্য্য প্রভুর সুতা নাম শ্রীল হেমলতা
তাঁহার স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি।
অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত দেখিয়া মোরে
জ্ঞানাঞ্জন দিলা দয়া করি।
যাঁহার করুণা হৈতে নেত্র হৈল প্রকাশিতে
দূরে গেল অন্ধকারাবলী।।

শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী মহিলা ছিলেন। তিনি তা শ্রীনিবাস আচার্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র গৌরবাণী প্রচার করতেন। তার প্রভাবে পাষণ্ড প্রকৃতির ব্যক্তিগণও ভক্তিমার্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি নির্ভীক বক্তা, 'সত্যশীল' সদাচার সম্পন্ন ছিলেন। কোন ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ অসৎ সিদ্ধান্তকে প্রশ্রয় দিতেন না। তাতে তিনি বজ্রাদপি কঠোর ছিলেন। কোন অপসিদ্ধান্ত ব্যাপার নিয়ে শ্রীরূপ কবিরাজ নামক একজন শিষ্যকে তিনি সভাস্থলে কণ্ঠি ছিড়ে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছিলেন।

শ্রীযদুনন্দন দাস গুরুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি অনেক সময় শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর চরণে অবস্থান করতেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণীর বাসবাটী ছিল ভাগীরথীর পশ্চিম তটে বুধাইপাড়া গ্রামে।

শ্রীযদুনন্দন দাসের দার পরিগ্রহ কিম্বা পুত্র-কন্যা সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রীযদুনন্দন দাস বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বহু গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করেছেন এবং গীতিও রচনা করেছেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন। কুঞ্জরাস্তব নামক একখানি কাব্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

তাঁর পদ্যানুবাদ গ্রন্থ—গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃত পদ্যানুবাদ, কর্ণামৃত মৌলিক গ্রন্থ, গৌরলীলাপদ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ প্রভৃতি।

পদাবলী—

গৌরাঙ্গ সুন্দর নট পুরন্দর
প্রকট প্রেমের তনু।
কিয়ে নবঘন পুরট মদন
সুধায়ে গড়ল জনু।।
ভাল নাচে গৌরাঙ্গ আনন্দ সিন্ধু।
বদন মাধুরী হাস চাতুরী
নিছয়ে শরদ ইন্দু।।ধ্রু।।
কিবা সে নয়ন জিনিয়া খঞ্জন
ভাঙর ভঙ্গিম শোভা।
অরুণ-বরণ যুগল চরণ
এ যদুনন্দন লোভা।।
দেবী ভগবতী পৌর্ণমাসী খ্যাতি
প্রভাতে সিনান করি।
কানুর দরশে চলিলা হরষে
আইলা নন্দের বাড়ী।।

শিরে শুভ্রকেশ তপসির বেশ
অণু বসন পরি।
বেদময় কথা ঘন হালে মাথা
করেতে লগুড় ধরি।।
দেখি নন্দরাণী ধাইয়া অমনি
পড়িয়া চরণ তলে।
তাঁরে কোলে লৈয়া শির পরশিয়া
আশিষ বচন বলে।।
সতী শিরোমণি অখিল জননী
পরাণ বাছনি মোর।
পতি পুত্র সহ ধেনু বৎস সব
কুশলে থাকুক তোর।।
রাণী তারে লৈয়া তুরিতে আসিয়া
দেখয়ে পুত্রের মুখ।
গায়ে হাত দিয়া উঠায় ধরিয়া
স্নেহে দরদর বুক।।
নয়নের নীরে স্তনখির ধারে
ভিজয়ে শয়ন বাস।
ধনিষ্ঠার পাশে দেখি মনে হাসে
এ যদুনন্দন দাস।।

— ঃঃ —

দুহুঁ প্রেম গুরু তেল শিষ্য তনু মন।
শিখায় দোঁহারে নৃত্য অতি মনোরম।।
চাপল্য উৎসুক হর্ষ ভাব অলঙ্কার।
দুহুঁ মন শিষ্য পরে ভূষণের ভার।।
সুজৃম্ভাদি উদ্ভাব সুদীপ্ত সাত্ত্বিক।
এই সব ভাব ভূষা রাধার অধিক।।
অযত্নজ শোভা আদি সপ্ত অলঙ্কার।
স্বভাবজ বিলাসাদি দশ পরকার।।
ভাবাদি অঙ্গজ তিন মোন্দ্য চকিত।
দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত।।
নানা ভাবে বিভূষিত কহনে না যায়।
এ যদুনন্দন দাস বিস্তারিয়া গায়।।

ভাগ্যবতী যমুনা মাই।
যার এ কূলে ও কূলে ধাওয়াধাই।।
শ্বেত শাঙল দোনো ভাই।
যার জলে দেখে আপন ছাই।।
যমুনার জলে কিবা শোভা।
এ যদুনন্দন মনলোভা।।

সহচরি সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনী
দামিনি যৈছে উজোর।
গোবর্দ্ধন তট নিকট বাটহি
লেই যজ্ঞ-ঘৃত-ঘোর।।
দেখি সখি অপরূপ রঙ্গ।
নিরুপম বিলাস রসায়ন পিবইতে
দুহুঁ জন পুলকিত অঙ্গ।।
দুর সঞে দরশন অনিমিখ লোচন
বহতহিঁ আনন্দনীর।
আনন্দ সায়রে ডুবল দুহু জন
বহু খণে ভৈ গেল থীর।।
অতিশয় আদর বিদগধ নাগর
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
ইহ যদু নন্দন নিরখই দুহুঁ জন
অতিসুখে নিগমন চীত।

শ্রীজ্ঞান দাস

শ্রীমদ্ জ্ঞান দাস নিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন। তিনি বীরভূম জেলার কান্দরা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে শ্রীজ্ঞান দাসের বাসভূমি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

রাঢ় দেশে কান্দরা নামেতে গ্রাম হয়।

তথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়।।

আজও কান্দরা গ্রামের শ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের ঠাকুর বাড়ী আছে। তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁর জ্ঞাতি-বংশধরগণ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতলপুর গ্রামে আছেন।

"পদসমুদ্র নির্য্যাস তত্বের" সংগ্রহ কর্ত্তা বাবা মনোহর দাস শ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের মিত্র ছিলেন। শ্রীমনোহর দাসও শ্রীজাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন।

শ্রীমদ্ জ্ঞান দাস রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। খেতরির মহোৎসবে ইনি শ্রীজাহ্নবা দেবীর সঙ্গে এসেছিলেন। বাবা মনোহর দাসও উৎসবে যোগ দান করেছিলেন।

শ্রীনরোত্তম বিলাসে আছে—

শ্রীল রঘুপতি উপধ্যায় মহীধর।

মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞান দাস, মনোহর।।

'মনোহর' মনোহর দাস বুঝতে হবে। শ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের জন্ম আনুমানিক ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে। প্রতি বছর পৌষ পূর্ণিমার সময় কান্দরা গ্রামে শ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের নামে শ্রীহরি নাম সংকীর্ত্তন মহোৎসব হয়।

শ্রীমদ্ জ্ঞান দাস কবি ও পদকর্ত্তা ছিলেন, তাঁর পদ কীর্ত্তন অতি সরস ও হৃদয়গ্রাহী।

পদ কীর্ত্তন—শ্রীনিত্যানন্দ রূপ-গুণ বর্ণন—

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলায়।।
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ড আর না রহিল দেশে।।
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে।।
সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর।
গৌরি দাস আদি করি সঙ্গে সহচর।।
চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাই গুণ গায়।।

—০—

পূরবে গোবর্দ্ধন ধরল অনুজ যার
জগজনে কহে বলরাম।
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে আইলা কীর্ত্তন রঙ্গে
ধরি পহুঁ নিত্যানন্দ নাম।।
পরম উদার করুণাময় বিগ্রহ
ভুবন মঙ্গল গুণ ধাম।

গৌর প্রেম রসে কটির বসন খসে
অবতার অতি অনুপাম।।
নাচত গাওত হরি হরি বোলত
নিরবধি জনু মাতোয়াল।
হাস প্রকাশ মিলিত মধুরাধরে
বোলত পরম রসাল।।
রাম দাসের পহুঁ সুন্দরের জীবন
গৌরী দাসের ধন প্রাণ।
অখিল জীব যত এই রসে উনমত
জ্ঞান দাস গুণ গান।।

হোরি লীলা—

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখিগণ বহু রঙ্গে।।
ডারত ফাগু দুহুঁ জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ রূপ মুরুছে অনঙ্গে।।
বাওত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মাল করুগান।।
চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারি।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি।।
বিগতি অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রম জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়।।
হেম মরকতে জনু জড়িত পঞ্জর।
তাহে বেঢ়ল গজ মোতিম হার।।
দোলোপরি দুহুঁ নিবিড়বিলাস।
জ্ঞানদাস হেরি পুরয়ে আশ।।

বিরহ—

শুন শুন নিরদয় কান।
তুহুঁ অতি হৃদয় পাষাণ।।
সো ধনি বিরহ বিষাদে।
খোয়ল কুল মরিযাদে।।
জীবন তনু ছিল শেষ।
সেই রহত অবলেশ।।
তাকর নাহিক আশ।
অতয়ে আয়লু তুয়া পাশ।।
খেনে মুরছিত খেনে হাস।
খেনে তান গদ গদ ভাষ।।
উঠিতে শকতি নাই তার।
জীবন মানয়ে ভার।।
চৌদশি চাঁদ সমান।
মলিন না ধরল বয়ান।।
ভূতলে শুতলি তায়।
সহচরি করু কি উপায়।।
জ্ঞান দাস কহ রোষ।
তিরি বধ লাগব তোয়।।

শ্রীউদ্ধব দাস (পদকর্ত্তা)

শ্রীউদ্ধব দাস একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁর জন্ম স্থান 'টেঞা বৈদ্যপুর'। ইনি অম্বষ্ঠ কুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।

তাঁর সম্বন্ধে শ্রীযুত জগাবন্ধু বাবু গৌরপদ তরঙ্গিণীর ভূমিকায় লিখেছেন "এক উদ্ধব দাস শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। কিন্তু পদাবলী রচয়িতা উদ্ধব দাস স্বতন্ত্র ব্যক্ত।"

এই উদ্ধব দাসের নাম—কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি পদকল্পতরু গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস বা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু ছিলেন। এ পরিচয় দিয়েছেন দীনেশ সেন।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্রের মধ্যে কোথাও উদ্ধব দাসের নাম উল্লেখ করেন নাই। পদামৃত সমুদ্রের পরেই উদ্ধব দাস পদকর্ত্তা রচনা আরম্ভ করেছেন।

শ্রীউদ্ধব দাস স্বয়ং এক জায়গায় নিজ গুরু শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

"শ্রীরাধামোহন পদ যার ধন সম্পদ
নাম গায় এ উদ্ধব দাস।"

শ্রীউদ্ধব দাসের কবিত্বশক্তি অদ্ভুত, শ্রীগোবিন্দ দাসের বা রায় শেখরের

ন্যায়। ইনি পূর্ব্বরাগ, মান আক্ষেপানুরাগ বাল্যলীলা, পোষ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাবিষয়ক বহু কীর্তন রচনা করেছেন।

পদ কীর্ত্তন শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক—

চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত যে শাখা গুরু
কীর্ত্তন কুসুম পরকাশ।
ভকত ভ্রমরগণ মধুলোভে অনুক্ষণ
হরি বলি ফিরে চারি পাশ।।
গদাধর মহাপাত্র শীতল অভয় ছত্র
গোলক অধিক সুখ তায়।
তিন যুগে জীব যত প্রেম বিনু তাপিত
তার তলে বসিয়া জুড়ায়।।
নিত্যানন্দ নাম ফল প্রেম রস ঢলঢল
খাইতে অধিক লাগে মীঠ।
শ্রীগুরুদেবের মনে মহিমা ফলের স্তানে
উদ্ধব দাস তার কীট।।

হিন্দোল লীলা বর্ণন ঃ—

রাধাকুণ্ড সন্নিধানে হর্ষদ বর্ষদ বলে
বকুল কদম্ব তরু শ্রেণী।
বান্ধিয়াছে দুই ডালে রক্ত পট্ট ডোরি ভালে
মাঝে মাঝে মুকুতা খিচনি।।
পুষ্প দল চূর্ণ করি সূক্ষ্মবস্ত্র মাঝে ভরি
সুকোমল তুলী নিরক্ষিয়া।

পাটার উপরে মঢ়ি ভুরি বন্ধ কোণা চারি
কৃষ্ণ আগে উঠিলেন গিয়া।।
রাইকর আকর্ষণ করি অতি হর্ষ মন
তুলিলেন হিন্দোলা উপরি।
কর পুটে আটি ভোরি দোলা পাটে পদ ধরি
সমুখা সমুখি মুখ হেরি।।
হেন কালে সখীগণে করি নানা রাগ গানে
পুষ্পের আরতি দুহেঁ কৈল।
এ উদ্ধব দাস ভণে সবে কৈল নির্মঞ্ছনে
অতিশয় আনন্দ বাড়িল।।

শ্রীগৌরচন্দ্র ঃ—

মধু ঋতু বিহরই গৌর কিশোর।
গদাধর মুখহেরি আনন্দে নরহরি
পুরব প্রেমে ভেল ভোর।।
নবীন লতা নব পল্লব তরুকুল
নঙ্গল নবদ্বীপ ধাম।
ফুল্ল কুসুমচয় ঝঙ্কৃত মধুকর
সুখদ এ ঋতুপতি নাম।।
মুকুলিত চূত গহন অতি সুললিত
কোকিল কাকলি রাব।
সুরধুনি তীর সমীর গন্ধিত
ঘরে ঘরে মঙ্গল গাব।।
মনমথ রাজ সাজ লেহ ফীরয়ে
বন ফুল ফল অতিশোভা।

—০—

সময় বসন্ত নদিয়া পুর সুন্দর
উদ্ধব দাস মনলোভা।।
নাগরি নাগর অরুণ বসন ধর
শ্রমভরে ঝরঝর ঘাম।
দুহুঁ মুখ ইন্দু বিন্দু বিন্দু চুয়ত
অরুণিত মুকুতা দাম।।
দুহুঁ মন আনন্দ পুঞ্জে।
বহুবিধ খেলি হেলি দুহুঁ দুহুঁ তনু
বৈঠল নিরজন কুঞ্জে।।ধ্রু।।
রতন সিংহাসন আসন মণিময়
ফুলচয় রচিত সুঠান।
সকল সখীগণ করতহিঁ সেবন
সময়োচিত যত জান।।
ঝারি ঝারি ভরি দেই গুণ মঞ্জরী
কোন সখী চামর ঢুলায়।
সুরঙ্গ অধরে কোই তাম্বুল যোগায়ই
উদ্ধব দাস বলি যায়।।

শ্রীবৈষ্ণবদাস পদকর্ত্তা

শ্রীবৈষ্ণব দাসের শ্রীগুরু পাদপদ্ম শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্র শ্রীরাধা মোহন ঠাকুর। তাঁর পূর্ব্বনাম শ্রীগোকুলানন্দ সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। নিবাস টেঞা বৈদ্যপুর।

বাংলাদেশে স্বকীয়া ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ১১১৫ সালে যে বিচার হয়েছিল, ঐ বিচার সভায় শ্রীগোকুলানন্দ সেন ছিলেন। ইনি শ্রীউদ্ধব দাস (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) মহাশয়ের সখা ছিলেন এবং উভয়ই পদকর্ত্তা ছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবদাস পদ-কল্পতরু গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। অথ পদকীর্ত্তন গৌরাঙ্গ বিষয়ক—

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
এই কৃপা কর যেন তোমার গুণ গাই।।
যে সে কুলে জন্ম হউ যে সে দেহ পাইয়া।
তোমার ভক্ত সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাইয়া।।
চিরকালে আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায়।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরাবে আমায়।।
তোমার নামে সদা রুচি হউক মোর।
তোমার গুণ গানে যেন সদা হউ ভোর।।
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে।
সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে।।

অশ্রু কম্প পুলকে পুরিবে সব তনু।
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জনু।।
যে সে কর প্রভু এক তুমি মাত্র গতি।
কহয়ে বৈষ্ণব দাস তোমায় রহু মতি।।

— ০ —

গোরাচাঁদ! ফিরিয়া চাহ নয়নের কোণে।

দেখি অপরাধি জনা যদি তুমি কর ঘৃণা
অযশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে।।
তুমি প্রভু দয়া সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
সাধু মুখে শুনিয়া মহিমা।
দিয়াছি তোমার দায় এই মোর উপায়
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা।।
মুঞি ছার দুষ্ট মতি তুয়া নামে নাহি রতি
সদাই অসত পথে ভোর।
তাহাতে হইছে পাপ আর অপরাধ তাপ
সে কত তাহার নাহি ওর।।
তোমার কৃপা বলবানে অপরাধ নাহি মানে
শুনি নিবেদিয়ে রাঙ্গা পায়।
পুরাহ আমার আশ ফুকারে বৈষ্ণব দাস
তুয়া নাম স্ফুরুক জিহ্বায়।।

— ০ —

নীলাচলে যব যদু নাথ।
দেখিব আপনে জগন্নাথ।।

রাম রায় স্বরূপ লইয়া।
নিজ ভাব কহে উঘারিয়া।।
মোর কি হইবে হেন দিনে।
তাহ কি মুঞি শুনিব শ্রবণে।।
পুন কিয়ে জগন্নাথ দেবে।
গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যাবে।।
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়।
করিবে কীর্ত্তন উচ্চরায়।।
মহানৃত্য কীর্ত্তন বিলাস।
সাত ঠাঞি হইবে প্রকাশ।।
মোর কি এমন দিন হব।
সে সুখ কি নয়নে দেখিব।।
সকল ভকতগণ মেলি।
উদ্যানে করিবে নানা কেলি।।
বৈষ্ণব দাসের অভিলাষ।
দেখি মোর-পুরিবেক আশ।।

হে নাথ গোকুলচন্দ্র হা কৃষ্ণ পরমানন্দ
হা হা ব্রজেশ্বরীর নন্দন।
হা রাধা চন্দ্রমুখি গান্ধর্ব্বা ললিতা সখি
কৃপা করি দেহ দরশন।।
তোমা দোঁহার শ্রীচরণ আমার সর্ব্বস্ব ধন,
তাহার দর্শনামৃত পান।

করাইয়া জীবন রাখ মরিতেছি এই দেখ,
করুণা কটাক্ষ কর দান।।
দোঁহে সহচরী সঙ্গে মদন মোহন রঙ্গে
শ্রীকুণ্ডে কল্পতরু ছয়।
আমারে করুণা করি দেখাইবে সে মাধুরী,
তবে হয় জীবন উপায়।।
হা হা শ্রীদাম সখা, কৃপা করি দেও দেখা
হা হা বিশাখা প্রাণ সখি।
দোঁহে সকরুণ হৈয়া চরণ দর্শন দিয়া
দাসিগণ মাঝে লেহ লোখি।।
তোমার করুণা রাশি তেঞি চিত্তে অভিলাষি
কৃপা করি পূর মোর আশ।
দশনেতে তৃণ ধরি ডাকি নাম উচ্চ করি
দীন হীন বৈষ্ণবের দাস।।

শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজ ছিলেন পরম নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত। জগতের লোক যে কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত, তিনি সে সমস্তকে ভজনের পরম প্রতিকূল জেনে বহুদূরে অবস্থান করতেন। দুঃখের বিষয় এরূপ একজন মহাভাগবত পুরুষের সমাধি ছাড়া জগতে আর কোন পরিচয় নাই।

ইংরাজী ১৯৩২ সনে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবাসুদেব প্রভু (ভক্তি প্রসাদ পুরী) কে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীমদ্ মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শন ও জীবনতথ্য সংগ্রহের জন্য ব্রজ ধামে সূর্য্যকুণ্ডে গিয়েছিলেন। তৎকালে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার কিছু অংশ এ স্থলে সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত হল।

"শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজ সূর্য্যকুণ্ডে ভজন করতেন। সূর্য্যকুণ্ড-এস্থানে শ্রীশ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী সূর্য্য পূজার জন্য আগমন করতেন ও সূর্য্য পূজা করতেন। তিনি কুণ্ডতটে একখানি লাল প্রস্তরের উপরে মুকুট রেখে স্নান করতেন। সে প্রস্তরে মুকুটের চিহ্ন আজও পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীরাধাকুণ্ড হতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে সূর্য্যকুণ্ড। কুণ্ডতীরে শ্রীসূর্য্য বিহারী (শ্রীকৃষ্ণের) মন্দির। সূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিমতটে শ্রীশ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির। পার্শ্বে একটি মন্দিরে বাবাজী মহারাজের সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারীর ও নামব্রহ্মের ফটো আছে। মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা বাবাজী

মহারাজের নিত্য ভোগ ও গুড় মাত্র ভোগের দ্বারা গিরিধারীর সেবা হয়।

অগ্রহায়ণী শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীবাবাজী মহারাজের সমাধিতে অপ্রকট মহোৎসব হয়। শ্রীবাবাজী মহারাজের সমাধির দক্ষিণ দিকে আর তিনটি সমাধি পরিদৃষ্ট হয়। দুইটী শ্রীবাবাজী মহারাজের শিষ্যদ্বয় শ্রীগোবিন্দ দাসের ও শ্রীহরিগোপাল দাসের। অপরটী শ্রীহরিগোপাল দাসের শিষ্য শ্রীগৌর দাসের।

গুরু পরম্পরা শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের শিষ্যাশিষ্য শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ। বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ বলদেব বিদ্যাভূষণের শিষ্য উদ্ধব দাস বা উদ্ধর দাস, তাঁর শিষ্য শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজ।

শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের প্রধান তিন শিষ্য, শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীহরিগোপাল দাস ও শ্রী জগন্নাথ দাস। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিষ্য শ্রীভাগবত দাস বাবাজী মহারাজ। এই ভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিষ্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ। এঁর শিষ্য শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ অতি বৃদ্ধ বয়সে শ্রীনবদ্বীপধামে শুভাগমন করেছিলেন। এ সময় তিনিই শ্রীমায়াপুরে গৌর জন্মভিটা ও শ্রীবাস অঙ্গন খোল ভাঙ্গা ডাঙ্গা প্রভৃতি নির্ণয় করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এঁর শিক্ষা-শিষ্য ছিলেন।

ব্রজে শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে শ্রীল বাবাজী মহারাজ ভজন কুটীরে যখন ভাগবত পাঠ করতেন তখন তথায় এক অজগর আসতো, পাঠ শেষ হলে দডবৎ করে অন্তর্ধান হতো। শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট তিথিতে তাঁর জয় গান করে প্রবন্ধ শেষ করলাম।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ

গৌরাবির্ভাবভূমেস্তং নির্দ্দেষ্টা সজ্জন প্রিয়ঃ।

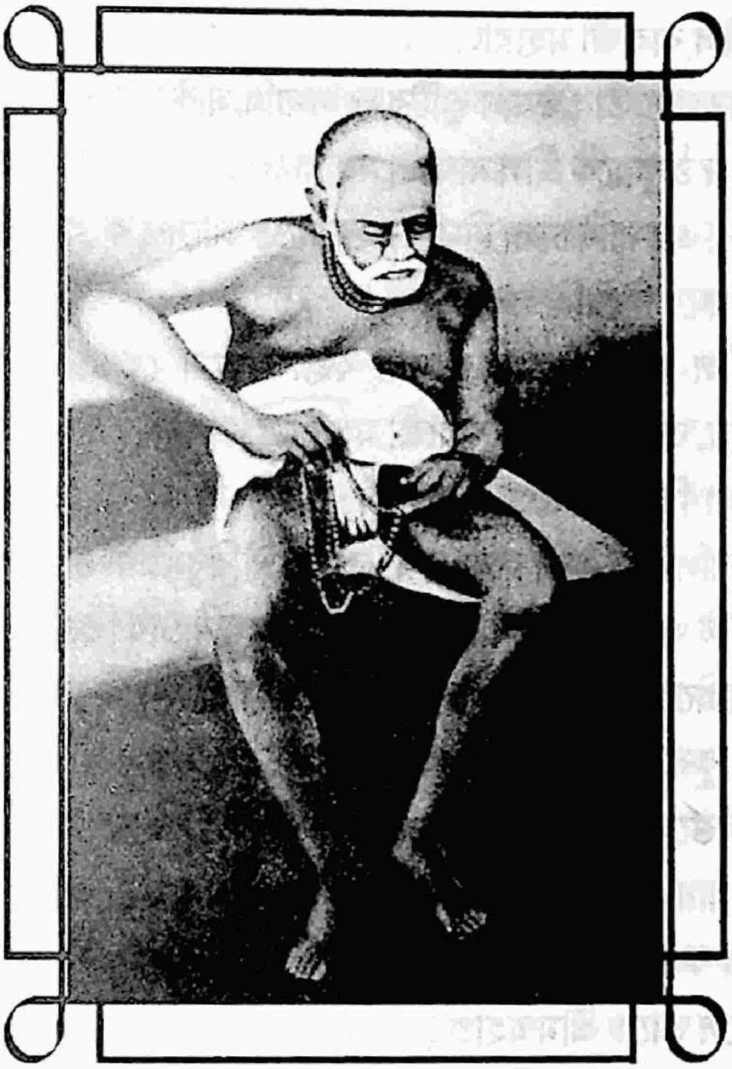
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ।।

শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ময়মনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমায় কোন গণ্ড গ্রামে ন্যূনাধিক দেড়শত বছর আগে এক সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহন করেন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ, তাঁর শিষ্য শ্রীউদ্ধব দাস বা উদ্ধর দাস বাবাজী, তাঁর শিষ্য সুর্য্যকুণ্ড বাসী শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী। এই শ্রীমধুসূদন দাসের শিষ্য শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বহু দিন শ্রীব্রজমণ্ডলে ভজন করেন। সিদ্ধ বাবা বলে তাঁর সর্ব্বত্র খ্যাতি ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবন ধামে প্রথম তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করেন এবং তাঁর থেকে বহু উপদেশ প্রাপ্ত হন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বঙ্গাব্দ ১৯২৮ সালে ফাল্গুন মাসে বর্দ্ধমানের আমলাজোড়া নামক গ্রামে শুভ বিজয় করেন। সেই সময় শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কোন কার্য্য উপলক্ষে তথায় গমন করেন এবং দ্বিতীয় বার শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের নাম প্রচারাদি কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেখে শ্রীল বাবাজী মহারাজ অতিশয় সুখী হন। তিনি আমলা জোড়া গ্রামে

একাদশী দিবসে অবস্থান করে অহোরাত্র শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমলাজোড়া গ্রামে পর দিবস শ্রীপ্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।



শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মাহারাজ

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীল বাবাজী মহারাজ কুলিয়া নবদ্বীপ থেকে শ্রীগোদ্রুমে সুরভি কুঞ্জে শুভাগমন করেন এবং আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের শুভ বিজয়ে সুরভিকুঞ্জ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছিলেন (সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা বঙ্গাব্দ ১৩৩২)।

শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ সপরিকরে শ্রীমায়াপুর দর্শনার্থে আগমন করে শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস অঙ্গন ও মায়াপুরের বিভিন্ন স্থানগুলি নির্দ্দেশ করেন। তিনি গৌরজন্মস্থলীতে আনন্দে নৃত্য করেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বেশীর ভাগ সময় কুলিয়াতে গঙ্গাতটে ভজন করতেন। তথায় তাঁর ভজন কুটির ও সমাধি মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁর কুটিরের সামনে ভক্তগণের বসবার জ়ন্য একখানি চালা নির্ম্মাণ করে দিতে আদেশ করেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তা' করে দিয়েছিলেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বার বছর বয়সে জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গত হন, তা শুনে শ্রীল বাবাজী মহারাজ একদিন তাঁকে ডেকে বলেন যে তুমি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মতে চৈতন্যাব্দ, ভগবদ্ সম্বন্ধী মাস, বার তিথি পর্ব্ব প্রভৃতি সংবলিত পঞ্জিকা রচনা কর। তাতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আবির্ভাব, পঞ্চমী তিথি ও অন্যান্য গৌর-পার্ষদগণের আবির্ভাব তিরোভাব তিথি সমূহ যথাযথ সন্নিবেশিত কর। শ্রীল বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা গণনা আরম্ভ করেন।

কীর্ত্তনে ও বৈষ্ণব সেবায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইনি প্রায় একশ পঁয়ত্রিশ বছর কাল ধরাধামে প্রকট থেকে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার করেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ যদিও তিনি খর্ব্বাকৃতি হয়েছিলেন, কিন্তু কীর্ত্তন কালে তাঁকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আজানুলম্বিতভুজ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু, চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ পুরুষ বলে মনে হত।

শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিষ্য শ্রীভাগবত দাস। এই শ্রীভাগবত দাসের বেশ শিষ্য ছিলেন শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ। শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবকের নাম ছিল শ্রীবিহারী দাস। তাঁর শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল। বার্দ্ধক্য বশতঃ শ্রীল বাবাজী মহারাজ চলতে পারতেন না। বিহারী দাস তাঁকে কাঁধে করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যেতেন।

কলিকাতায় আসলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মানিকতলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। অনেকে আগ্রহ করে তাঁকে তাদের গৃহে নিতে চাইলে বা ভোজন করাবার ইচ্ছা করলেও তিনি স্বীকার করতেন না।

বার্দ্ধক্য বশতঃ শ্রীল বাবাজী মহারাজের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পেয়েছিল। লোকে তাঁকে দর্শনের জন্য আসতেন এবং প্রণামী দিতেন। সেবক বিহারী দাস, সে সমস্ত প্রণামী একটী কলসীর মধ্যে রাখতেন। কোন সময় হঠাৎ শ্রীল বাবাজী বলতেন—বিহারী! কত টাকা প্রণামী হয়েছে সমস্তই আমাকে দে। বিহারী দাস যদি অন্য সেবার জন্য দশ বার টাকা সরিয়ে রাখতেন, বাবা টাকাগুলি হাতে নিয়ে বলতেন—বিহারী তুই বার টাকা রেখেছিস্ কেন? আমার টাকা নিয়ে আয়। বিহারী তখন হাসতে হাসতে টাকাগুলি এনে দিতেন। সে সমস্ত টাকা বাবাজী নিজের ইচ্ছা মত খরচ করতেন। একবার দুইশত টাকার রসগোল্লা কিনে ধামের গো সেবা করেছিলেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের গঙ্গাতটের তাঁবুতে একবার একটা কুকুরের পাঁচটা বাচ্ছা হয়েছিল। বাবাজী মহারাজ যখন প্রসাদ পেতেন, বাচ্ছাগুলি থালার চারি দিকে ঘিরে বসত। বিহারী দুই একটি বাচ্ছা লুকিয়ে রাখলে, বাবাজী মহারাজ বলতেন—বিহারী, তোর থালা নিয়ে যা, আমি খাব না। বিহারী তখন বাচ্ছাগুলি এনে দিয়ে বলতেন—এই নিন বাচ্চাগুলি। বাবাজী মহারাজ বলতেন—এঁরা ধামের কুকুর।

অনেক লোক শ্রীল বাবাজী মহারাজের কাছে ভেক্ নেবার জন্য আসতেন। শ্রীবাবাজী মহারাজ সকলকে ভেক্ দিতে চাইতেন না। তাদের সেবা করতে বলতেন। খুব সেবার চাপ পড়লে অনেকে পালাত। একবার শ্রীগৌর হরিদাস নামে একজন ব্যক্তি ভেক্ নিতে এসেছিলেন। বাবাজী মহারাজ তাকে ভেক্ দিতে চাইলেন না। তিনি তিন দিন অনাহারে তাঁবুর সামনে পড়ে রইলেন। অগত্যা শ্রীবাবাজী মহারাজ বিহারী দাসকে কৌপীন দিতে আদেশ

করলেন।

একবার শ্রীবাবাজী মহারাজ এক প্রসিদ্ধ ভাগবত পাঠককে বলেছিলেন—ভাগবত কীর্ত্তন ব্যবসা বেশ্যা বৃত্তি মাত্র। যারা ভাগবত ব্যবসা করে তারা নামাপরাধী, তাদের মুখে ভাগবত পাঠ বা কীর্ত্তন শুনতে নাই। উহা শ্রবণে নামাপরাধ ও অধোগতি হয়। সেই ভাগবত পাঠক সেই দিন থেকে ভাগবত পাঠ ব্যবসা ত্যাগ করেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি বৃন্দাবনবাসী হন এবং অতি দীনহীনভাবে ভজন করেন।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল বাবাজী মহারাজকে ভক্তগণের সেনাপতি বলতেন।

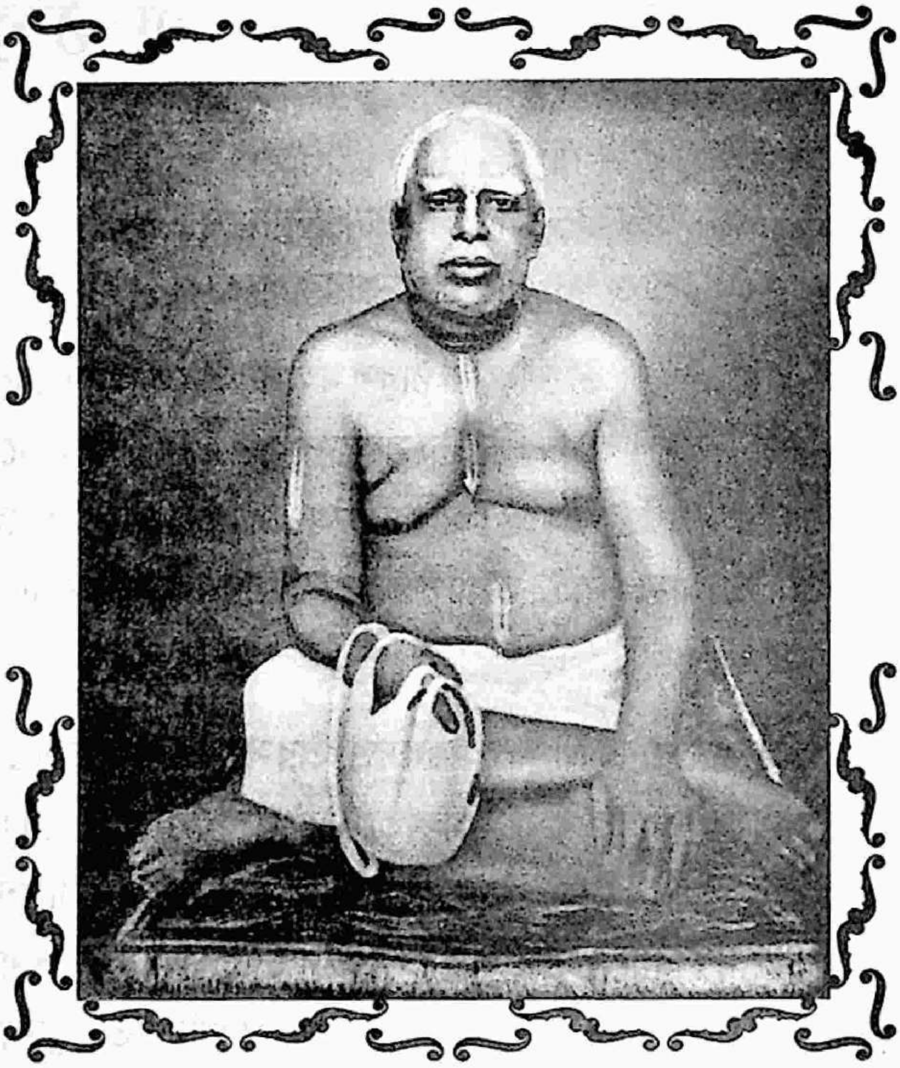
শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নমোভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌরশক্তি স্বরূপায় রূপানুগবরায়তে।।

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনেদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌর সুন্দরের নিজ জন ছিলেন। তিনি রূপানুগ ধারায় শ্রীগৌর সুন্দরের লুপ্ত-প্রায় বাণী মর্ত্ত্যলোকে পুনঃ প্রচার করেছিলেন। তাঁর গুণ ছিল অমিত ও অপার। তাঁর জীবনী আলোচনা করার মত পারঙ্গতা আমার নাই। তথাপি আত্ম পবিত্রতা করবার জন্য কিছুটা চেষ্টা করছি মাত্র।

কান্যকুব্জ কায়স্থপ্রবর শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত, তাঁর সপ্তদশ পর্যায়ে শ্রীগোবিন্দ শরণ দত্ত। তিনি দিল্লীশ্বরের কৃপায় গঙ্গাতটে ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি তথায় গোবিন্দপুর নামে গ্রাম পত্তন করেন। পরবর্ত্তীকালে গোবিন্দপুরে ইংরেজরা দূর্গ নির্মাণ করলে তাঁর পুত্র পৌত্রগণ হাটখোলায় এসে বসবাস করতেন। তখন থেকে তাঁরা হাট খোলার দত্ত নামে পরিচিত। পুরুষোত্তম দত্তের একবিংশ পর্যায়ে মহানুভব শ্রীমদন মোহন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাট খোলার দত্তদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং পরম ভক্ত বলে পরিচিত ছিলেন। প্রেতশিলাদি তীর্থে যে সব কীর্ত্তি বর্ত্তমান, তা বঙ্গবাসী মাত্রই অবগত আছেন। শ্রীমদন মোহন দত্তের পৌত্র ছিলেন শ্রীরাজবল্লভ দত্ত। তিনি সাধক ও দৈবজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বজনগণের উৎপীড়নে উড়িষ্যা প্রদেশে কটক জেলার অন্তর্গত বিরূপা নদীতটে ছুটি-গোবিন্দপুর গ্রামে বসবাস করতেন।। শ্রীরাজবল্লভ

দত্তের পুত্র শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত। তিনিও পরম ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নদীয়া জেলায় বীরনগর গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীঈশ্বরচন্দ্র



শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মস্তৌফী মহোদয়ের কন্যা শ্রীমতী জগন্মোহিনীকে। তাঁর গর্ভে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বাংলা ১২৪৫ সাল ১৮ই ভাদ্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম লগ্ন দেখে জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ বলেছিলেন শিশু ভবিষ্যতে বিদ্যাবুদ্ধিতে উন্নত হবে এবং একজন মহাপুরুষ হবে। পিতৃ প্রদত্ত নাম ছিল

শ্রীকেদার নাথ দত্ত।

ঠাকুর মহাশয় এগার বৎসর বয়সে পিতৃহারা হয়ে মাতামহের আলয়ে প্রতিপালিত হন। তাঁর মাতামহের ন্যায় ধনাঢ্য জমিদার নদীয়া জেলায় তখন ছিল না। বীরনগরে তাঁর প্রসিদ্ধ অট্টালিকা দেখবার জন্য অনেক জায়গা থেকে লোক আসত। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের বড় দুই ভাই কালক্রমে পরলোক গমন করেন। তখনকার কথা তিনি আত্ম-চরিতে লিখেছেন—'তিনি বড় কষ্টে প্রতিপালিত হন ও বিদ্যাভাসাদি করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে মাতামহের আলয়ে থেকে পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন। তাঁর অসাধারণ মেধা ছিল। নয় বৎসর বয়সে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অল্পকাল মধ্যে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ বিশদভাবে পাঠ করেন। ঠাকুর মহাশয়ের বার বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল। পত্নীর বয়স মাত্র পাঁচ বছর ছিল।

শৈশবকালে তাঁকে সকলে ভূতের ভয় দেখাত। তিনি ভূতের ভয়ে বাগিচায় গিয়ে আম জাম খেতে পারতেন না। ভয় কি করে যায় তা একদিন মাতামহের ভাণ্ডার রক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল 'রাম' 'রাম' বললে ভূত পালায়। তার কাছ থেকে ভূত তাড়ানো মন্ত্র পেলেন।। সর্ব্বদা 'রাম', 'রাম' জপ করতে লাগলেন, আর ভূতের ভয় করেন না। স্বচ্ছন্দে আম জাম খেতে পারেন। অন্যান্য ছেলেদেরও 'রাম' 'রাম' বলতে বললেন। পাড়ায় যাদের ঘরে রামায়ণ মহাভারত পাঠ হত তথায় যেতেন। রামের কথা তাঁর খুব ভাল লাগত। তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর কথা বলে না কেন? পুরোহিত বললেন কলিকালের ঠাকুর কথা বলে না। কারও কারও কাছে বলেন। তিনি মন্দিরে ঢুকে শিবের মাথায় হাত দিয়ে পালাতেন। কোন কোন দিন কথা বলতেন, মন্দিরে ভিতরে প্রতিধ্বনি শুনে মনে করতেন ঠাকুর কথা বলছে। বৃদ্ধাদের কাছে রাম ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। শৈশব হতেই ভগবানের প্রতি তাঁর দৃঢ় অনুরাগ প্রকাশ পায়। জগৎ

কি? আমরাই বা কে? এইসব বিষয়ে দশ বছর হতে ঠাকুরের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে। কলিকাতায় মেসোমশায় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের বাড়ীতে থেকে তিনি কলেজে পড়াশুনা করতে লাগলেন। এই সময় বিশেষ সাহিত্য চর্চা করতেন ও সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহোদয়ের বোধোদয় পুস্তকে "ঈশ্বর নিরাকার স্বরূপ" এই উক্তি পাঠ করে ঠাকুর মহাশয় একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেন ঈশ্বরকে দেখে তিনি তার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন কিনা? বিদ্যাসাগর মহাশয় সরলভাবে ছাত্রের নিকট ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বীয় অনভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর মহাশয় পিতামহ রাজবল্লভ দত্তকে দেখবার জন্য উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। বাষ্পীয় যান তখনও হয় নাই। যেখানে হউক পদব্রজেই যেতে হত। পদব্রজেই তিনি মাতা ও পত্নীকে নিয়ে অতি কষ্টে উড়িষ্যা ছুটী গোবিন্দপুরে পিতামহের কাছে এলেন। তাঁদের দেখে পিতামহ কাঁদতে লাগলেন। পিতামহ খুব বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তথাপি রাত্র ১২টার পর স্বহস্তে খিচুড়ী তৈরী করে খেতেন, দিনের বেলায় জপাদি করতেন। তিনি সন্ন্যাসীদের ন্যায় অরুণ বস্ত্র পরতেন।

একদিন তাঁর পিতামহ মহোদয় দ্বিপ্রহর সময়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে নাম জপ করতে লাগলেন। (স্বলিখিত জীবনী পৃঃ ৯৩) এমন সময় ঠাকুর মহাশয় ভোজন করে এলেন। দাদা মহাশয় তখন বলতে লাগলেন— "আমার মৃত্যুর পর তোমরা আর এদেশে থেকো না। ২৭ বছর বয়সে তোমার বড় চাকরী হবে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুমি এক বড় বৈষ্ণব হবে।" এই কথা বলা মাত্রই তাঁর ব্রহ্মতালু ভেদ করে জীবন নির্গত হল। ঠাকুর মহাশয় যথাশাস্ত্র বিধানে পিতামহের তর্পণ কৃত্যাদি সমাপ্ত করলেন।

ঠাকুর মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চেষ্টায় ভদ্রকের উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টারী পেলেন। বেতন মাত্র ৪৫ টাকা। ভদ্রকে থাকাকালে "মঠস্ অফ উড়িষ্যা" নামে ইংরাজী পুস্তক লিখেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি পুরী, সাক্ষী-গোপাল ও ভুবনেশ্বরাদি বিশেষভাবে দর্শন করে আসেন। ভদ্রকে ১২৬৭ সালের ভাদ্র মাসে তাঁর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। সেই পুত্রের নাম অন্নদাপ্রসাদ। এ বছর তিনি মেদিনীপুরে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য পান। পূর্ব্ব হতেই ঠাকুর মহাশয়ের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। একদিন ঐ স্কুলের পণ্ডিতের নিকট প্রসঙ্গক্রমে জানতে পারলেন যে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আপামরে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি দান করেছিলেন। সেদিন থেকে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব হন। তখন যেখানে সেখানে বৈষ্ণব গ্রন্থ পাওয়া যেত না।

মেদিনীপুরে ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী কঠিন রোগে মারা গেলেন। তখন নবজাত শিশুর বয়স মাত্র দশ মাস। বৃদ্ধা জননীও সঙ্গে রয়েছেন। সুতরাং দ্বিতীয় বার বিবাহ করা ছাড়া উপায় নাই। যকপুরের গণমান্য রায় মহাশয়ের দৌহিত্রী—শ্রীমতী ভগবতীকে বিবাহ করলেন। পত্নী খুব সুশীলা শান্ত ও যাবতীয় কার্য্যে নিপুণ ছিলেন। ঠাকুর মহাশয় 'বিজন গ্রাম কাব্য' সন্ন্যাসী প্রদত্ত our wants নামে কয়েকখানি ছোট গ্রন্থ রচনা করলেন। এ সময় তিনি আইন পরীক্ষা পাশ করলেন। ছাপরী জেলায় ডেপুটী রেজিষ্টার এর পদ পেলেন। কিছুদিন তথায় কাজ করবার পর কয়েকটা পরীক্ষা দিয়ে দিনাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এর পদ পেলেন। ছাপরায় থাকাকালে তিনি গৌতম মুনির আশ্রমটি দর্শন করেন। তিনি যখন যেখানে যেতেন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করতেন। মাঝে মাঝে কলিকাতা আসতেন এবং "বড়দাদা" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে থাকতেন। একবার ঠাকুর মহাশয় কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। সে খবর পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহোদয় পত্রে এক ঔষধের কথা লিখে পাঠান। সেই ঔষধ তৈরী করে ঠাকুর মহাশয় শীঘ্র সুস্থ হন।

দিনাজপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এর কাজ করবার সময় কোন বন্ধুর সৌজন্যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত তাঁর হস্তগত হয়। এ তাঁর প্রথম শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও অনুশীলন।

পূর্ব্বে ঠাকুর মহাশয় রাধা কৃষ্ণের লীলাকে হেয় মনে করতেন। কিন্তু যখন দেখলেন শ্রীচৈতন্যদেব সেই লীলা একমাত্র অবলম্বন করেছেন, তখন তিনি শ্রীচৈতন্য চরণে শরণ নিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব কৃপা পূর্ব্বক তাঁর হৃদয়ে যথার্থ তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি করালেন। সে সময় হতে তাঁর শ্রীরাধাকৃষ্ণে ও শ্রীচৈতন্য বিশেষ ভক্তি উৎপন্ন হল।

শ্রীঠাকুর মহাশয় "চৈতন্য গীতা" নামক এক পুস্তক সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। তিনি আগে ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পড়বার পর ব্রাহ্ম সমাজকে একেবারেই বাদ দিলেন।

ঠাকুর দিনাজপুরে থাকা কালে শ্রীকান্ত জীউ ও আত্রেয় নদী দর্শন করেন। ১৮৬৮ সালে তিনি পুরী ধামে বদলি হয়ে আসেন, বড় দাঁড়ে মণ্ডলের কোটা ভাড়া নিয়ে থাকলেন। এ সময় প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করতেন এবং মহাপ্রভুর লীলাস্থলী দর্শনাদি করতেন। তখন উড়িষ্যার কমিশনার ছিলেন রেভেন্সা সাহেব। তিনি ঠাকুর মহাশয়কে খুব স্নেহ করতেন।

একসময় এক ঘটনা ঘটল। অতিবাড়ী দলের বিষকিষণ নামে একজন লোক ছিল। সে কিছু যোগ বিভূতি জানত। শরদাইপুরের ক্রোশ খানেক দূরে এক জঙ্গলে সে আপন দলবল নিয়ে এক মঠ স্থাপন করে এবং নিজেকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলে জাহির করে। সে নিজের লোক দ্বারা কতকগুলি

কল্পিত কথা প্রচার করে যে—"মহাবিষ্ণু বিষকিষণ গুপ্তভাবে আছে। ১৪ই চৈত্র রণ হবে। তখন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরে সব যবন বধ করবে।" এ সব কথা শুনে অনেক স্ত্রী পুরুষ তাকে দেখতে যেত। ভৃঙ্গারপুরের চৌধুরী রমনীদের সম্বন্ধে কোন কেলেঙ্কারী হওয়ায় চৌধুরীরা ব্যাপারটা কমিশনার রেভেন্সা সাহেবকে জানান। তিনি ঠাকুর মহাশয়কে তদারক করতে পাঠান। ঠাকুর মহাশয় পুলিশের হেড্‌কে নিয়ে রাত্রিকালে সেই জঙ্গলে গিয়ে বিষকিষণের সঙ্গে আলাপ করেন। বিশকিষণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে যে ইংরাজ রাজ ধ্বংস করবেই। পেছন থেকে Dist. supdt. সাহেব সব কথা শুনলেন। পরদিন বিষকিষণকে গ্রেপ্তার করে পুরীর জেলে পাঠান হয়, তারপর বিচারে দেড় বছর তার কারাদণ্ড হয়। বিষকিষণের জটা কেটে ফেলা হল। এ সময় তার দলের প্রায় হাজার খানেক লোক পুরীতে উৎপাত করেছিল। এজন্য অনেকে বলেছিলেন তাকে মুক্ত করে দিলে ভাল হয়। কিন্তু ধর্ম পরায়ণ সত্যপ্রিয় ঠাকুর মহাশয় কারও কথায় কান দিলেন না। এ সময় যোগী বিষকিষণ কিছু যোগ বিভূতি প্রকট করেছিলেন। তাতে ঠাকুর মহাশয় ও তাঁর পুত্র কন্যাদির কিছু ক্লেশ হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। জেলেই বিষকিষণ মারা যায়। এর পরে দিনাজপুরে একজন নিজেকে ব্রহ্মা বলে পরিচয় দিয়ে উৎপাত করতে থাকলে, ঠাকুর মহাশয় তাকেও অনুরূপ শাস্তি প্রদান করেন।

পুরীতে ঠাকুর মহাশয় শ্রীগোপীনাথ পণ্ডিত, শ্রীহরিদাস মহাপাত্র ও মার্কণ্ডেয় মহাপাত্র প্রভৃতি সজ্জন সঙ্গে শ্রীভাগবত পাঠ এবং শ্রীধর টীকা আলোচনা করবার খুব সুযোগ লাভ করেন। এই সময় তিনি ষট্‌সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্য নকল করে তা অধ্যয়ন করেন। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু পাঠ করেন। হরিভক্তি কল্পলতিকা নকল করেন এবং দত্তকৌস্তুভ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতার অনেক শ্লোক সেই সময় রচনা করেন। তিনি শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে 'ভাগবত' সংসদ স্থাপন করেন। সে সভায় অনেক সজ্জন পণ্ডিত

আসতেন। সিদ্ধ রঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে মিশতেন না। অন্য কাকেও তাঁর সঙ্গে মিশতে নিষেধ করতেন। কিছুদিন বাদ তাঁর মাহাত্ম্য বুঝতে পারলেন। একদিন ঠাকুরের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন— আপনার তিলক মালা না দেখে আমি আপনাকে অবজ্ঞা করেছি। ক্ষমা করুন।

ঠাকুর বললেন—বাবাজী মহাশয়, আমার কি দোষ? তিলক মালা দীক্ষাগুরু দিয়ে থাকেন। মহাপ্রভু এখনও দীক্ষাগুরু জুটিয়ে দেন নাই। কেবল মালা-সাহায্যে হরিনাম জপ করি। এ অবস্থায় নিজের মনোমত তিলক মালা নেওয়া কি ভাল? শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজী সব বুঝতে পেরে ঠাকুর মহাশয়কে খুব প্রশংসা করতে লাগলেন।

মহাত্মা শ্রীস্বরূপ দাস বাবাজী একজন বড় বৈষ্ণব ছিলেন, ঠাকুর মহাশয় প্রায় সময় তাঁর দর্শনে যেতেন। তিনি তাঁকে অনেক উপদেশ দিতেন। ঠাকুর মহাশয় শ্রীজগন্নাথের অড়হর ডাল খুব পছন্দ করতেন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করতেই কে যেন তাঁকে ডাল এনে দিতেন। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও দোল যাত্রাদি সময়ে ঠাকুর মহাশয়ের উপর পর্য্যবেক্ষণের ভার পড়ত। তিনি খুব পরিশ্রম করে যাত্রিদের শ্রীজগন্নাথ দর্শনের সুন্দর ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি পূর্ণ পাঁচ বছর কাল শ্রীজগন্নাথ দেবের এই সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

১৮৭৪ খৃঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে শ্রীবিমলা প্রসাদ (শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ) ঠাকুরের ৬ষ্ঠ সন্তানরূপে পুরীতে আবির্ভূত হলেন। শ্রীজগন্নাথদেব ঠাকুরের সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে যেন এই পুত্রটীকে দান করেন। পুত্রটী যেন স্বর্ণ প্রতিমা বলে মনে হচ্ছিল। লগ্ন দেখে জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ বলেছিলেন—পুত্র ভবিষ্যতে একজন বড় আচার্য্য হবে, ধর্ম প্রচার করবে। কয়েক মাস পরে ঠাকুর মহাশয় শিশু ও তাঁর মা এবং অন্যান্য ছেলে মেয়েদের পাল্কী যোগে রানাঘাটে পাঠিয়ে দেন। কিছু দিন পরে তিনিও বদলী হয়ে নড়ালে আসেন।

১২৮৬ সাল নড়ালে থাকার সময় ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণ সংহিতা, কল্যাণ-কল্পতরু গ্রন্থ নতুন ভাবে প্রকাশ করেন। নড়ালে মফস্বলে অনেক বৈষ্ণবের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় হয়। রাইচরণ গায়ক নামে বৈদ্যবংশ জাত একজনকে ঠাকুর শুদ্ধ বৈষ্ণব বলে মনে করতেন।

ঠাকুর মহাশয় কিছু দিনের জন্য তীর্থ ভ্রমনে বের হয়ে বৃন্দাবন ধামে এলেন এবং বিভিন্ন স্থান দর্শন করলেন। সেই সময় শ্রীরূপ দাস বাবাজীর কুঞ্জে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের দর্শন পেলেন। বাবাজী মহারাজ তাঁকে অনেক উপদেশ দান করলেন। বৃন্দাবন হতে ঠাকুর মহাশয় কার্য্যস্থানে পুনঃ ফিরে এলেন। মিত্র উকিল সারদা চরণ মৈত্র মহাশয় তাঁকে বিশ্বনাথের টীকাসহ শ্রীমদ্ভাগবত খরিদ করে দেন। মাতৃদেবীর পরলোক গমনে ঠাকুর মহাশয় শ্রাদ্ধ করবার জন্য গয়া ধামে যান ও তর্পণ ক্রিয়াদি করেন। প্রেতশিলা পর্ব্বতে উঠতে ৩৯৫টা ধাপ তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীযুত মদন মোহন দত্ত নির্মাণ করেছিলেন। তা দর্শন করলেন এবং পর্ব্বত গাত্রে পিতামহের নাম দেখলেন। ১২৮৮ সালে নড়ালে 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৮৮৫ সালে রামবাগানের বাটীতে বৈষ্ণব ডিপোজিটারী হয়। এই সালে ঠাকুর মহাশয় শ্রীবিমলা প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে কুলিন গ্রাম ও সপ্তগ্রাম প্রভৃতি দর্শন করেন। ১৮৮৬ সালে শ্রীরামপুরে থাকার সময় চৈতন্য শিক্ষামৃত রচনা ও প্রকাশ করেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার সহিত স্বয়ং 'রসিকরঞ্জন' নামে অনুবাদ লিখে একখানি গীতা প্রকাশ করেন। তাতে শিক্ষাষ্টকের সংস্কৃত টীকাও প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ খানি এই সময় প্রথমবার ছাপা হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিনি চৈতন্য যন্ত্র নামে প্রেস স্থাপন করেন।

শ্রীঠাকুর মহাশয় ঠিক করেছিলেন চাকরীর থেকে অবসর নিয়ে বৃন্দাবনে বাস করবেন। এই সময় কোন কার্য্য উপলক্ষে তারকেশ্বরে যান। সেখানে স্বপ্নে শ্রীতারকেশ্বর বললেন—তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ

ধামে যে কার্য্য আছে তার কি করলে? স্বপ্ন দেখে তিনি বৃন্দাবনে যাবার ব্যবস্থা স্থগিত করলেন।

ঠাকুর মহাশয় গুরু করণের জন্য অনেক দিন ধরে চিন্তা করছিলেন। স্বপ্নে মহাপ্রভু তাঁকে জানান— তোমার গুরু বিপিন বিহারী শীঘ্র আগমন করবেন। এমন সময় বিপিন বিহারী গোস্বামীর পত্র পেলেন,—তিনি শীঘ্র এসে মন্ত্র দিবেন। শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামী বংশী বদনানন্দ ঠাকুরের বংশধর ছিলেন। গোস্বামী শীঘ্র এলেন এবং মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। ঠাকুর চিত্তে বড়ই প্রফুল্লতা লাভ করলেন।

ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে লিখেছেন—

বিপিন বিহারী তাঁর শক্তি অবতরি
বিপিন বিহারী প্রভুবর।
শ্রীগুরু গোস্বামীরূপে দেখি মোরে ভব কূপে
উদ্ধারিল আপন কিঙ্করে।।

শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামী বাগ্‌না পাড়ায় বাস করতেন। ঠাকুর মহাশয় যখন কিছুদিনের জন্য কৃষ্ণনগরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন, শ্রীনবদ্বীপ ধাম সম্বন্ধে তিনি বহু চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি প্রতি শনিবারে নবদ্বীপ যেতেন এবং প্রভুর লীলাস্থান ঠিক কোথায় তা অন্বেষণ করতেন। কিন্তু কোন সন্ধান পেলেন না। নবদ্বীপের লোকের শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা, পারমার্থিক কোন সন্ধান নেই। এইসব দেখে ঠাকুর মহাশয় বড়ই দুঃখিত হলেন। একদিন রাত্রে তিনি কমলাপ্রসাদ ও একজন কেরাণীর সঙ্গে ছাদের উপর বসে আছেন। তখন রাত দশটা, খুব অন্ধকার এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই সময় গঙ্গার ওপারে উত্তর দিকে এক অপূর্ব্ব আলোকময় অট্টালিকা দেখতে পেলেন। পুত্র কমলাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনিও দেখেছেন বললেন। কেরাণীবাবু কিন্তু কিছুই দেখতে পাননি।

ঠাকুর মহাশয় প্রত্যেক শনিবারে নবদ্বীপে রাণীর বাড়ীতে বৈকালে আসতেন এবং রবিবার থেকে সোমবার ভোরে কৃষ্ণনগরে যেতেন। তিনি পরের শনিবারে এলেন এবং রাত্রে ছাদের উপর বসে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। সে দিনেও ঐ অপূর্ব্ব আলোকময় অট্টালিকাটি দেখতে পেলেন। বড়ই আশ্চার্য্যান্বিত হলেন। কারও কারও কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন সেখানে কিছুই নাই। প্রাতে গঙ্গা পার হয়ে তিনি সেই স্থানে এলেন। দেখলেন তথায় মাত্র একটি তাল গাছ আছে। অনন্তর তিনি নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি দেখতে লাগলেন। অনুসন্ধানকালে বল্লাল সেন রাজার প্রাচীন কীর্ত্তি, ভগ্নপ্রাসাদ ও দীঘি জানতে পারলেন।

অতঃপর 'ভক্তি রত্নাকর' ও 'চৈতন্য ভাগবত' প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত গ্রামের নামগুলি অনুসন্ধান করতে করতে গ্রামের লোকেদের থেকে অনেক গ্রামের সন্ধান পেলেন। তার মধ্যে মায়াপুরেরও সন্ধান পেলেন। সে সময় গ্রাম্য লোকেরা ঐ স্থানটীকে ম্যেয়াপুর বলত।

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথায় জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।।

(ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বড় আনন্দিত হলেন। এই সময় তিনি শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং উহা ছাপিয়ে প্রচার করতে লাগলেন। কৃষ্ণনগরের ইঞ্জিনিয়ার দ্বারিকাবাবু নবদ্বীপের একখানা মানচিত্রও তৈরী করে দিলেন। ঐ গ্রন্থে তাও ছাপা হল। ক্রমে মায়াপুরে প্রচার আরম্ভ হল। মহাপ্রভুর আদেশ কিছুটা পালন করতে পেরেছেন বুঝে ঠাকুর মহাশয় বড়ই খুসী হলেন।

শ্রীঠাকুর মহাশয় একদিন কুলিয়ায় শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজকে দর্শন করতে গেলেন। ঠাকুর দণ্ডবৎ করলেন, বাবাজী তাঁর প্রতি বললেন—কুটিরের বারান্দাটা আপনি করে দেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় স্বীকার

করলেন এবং ১৫০ টাকা খরচ করে শীঘ্র বারান্দাটা করে দিলেন। বাবাজী মহারাজের কাছে ঠাকুর মহাশয় মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলেন। এই সময় তিনি স্বরূপগঞ্জে গোদ্রুমে একখানি গৃহ নির্মাণ করেন এবং মাঝে মাঝে তথায় অবস্থান করতে লাগলেন। এর পূর্ব্বেই তিনি নাম-হট্টের কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

ইং ১৮৯১ সালে আশ্বিন মাসে ঠাকুর মহাশয় রামসেবক বাবু, সীতানাথ ও শীতল নামে একজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে রামজীবনপুরে নাম প্রচার করতে বের হলেন। রামজীবনপুরে শ্রীযদুনাথ ভক্তিভূষণ মহোদয় খুব উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্যের সহায়তা করতে লাগলেন। তথায় অনেক জায়গায় ঠাকুর মহাশয় নাম সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করলেন। তার প্রচারে তথাকার ভদ্রমণ্ডলী খুব সুখী হলেন। সেখান থেকে ঘাটালে এলেন। সেখানেও খুব নাম প্রচার কীর্ত্তনাদি হল। ঠাকুর মহাশয় গোদ্রুমে ফিরে এলেন। গোদ্রুমে খুব সংকীর্ত্তন হল। কৃষ্ণনগরে অনেক বড় বড় সভা করে ঠাকুর মহাশয় শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে লাগলেন। মনোর সাহেব, গুপ্ত সাহেব, বেভওয়ালেস ও বাটলার সাহেব প্রভৃতি বিশিষ্ট সজ্জনগণ বক্তৃতা শুনে খুব সুখী হলেন।

ইং ১৮৯২ সালে ১৫ই ফাল্গুন ঠাকুর মহাশয় রামসেবক ও তারকব্রহ্ম গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বসিরহাটে প্রচার করতে যান। তথায় খুব প্রচার কার্য্য হয়েছিল। ২৭শে ফাল্গুন ঠাকুর মহাশয় রামসেবককে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন ধামে যাত্রা করেন। পথে বর্দ্ধমান, আমলাজোড়া গ্রামে ক্ষেত্রমোহনবাবুর বাড়িতে উঠেন। তথায় শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীর পুনঃ দর্শন লাভ ঘটে। বাবাজী মহারাজকে নিয়ে ভক্তগণ হরিবাসর একাদশী তিথির দিন রাত্রি জাগরণ করেন। পরদিন তথাকার প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ঠাকুর মহাশয় বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে এলাহাবাদ প্রভৃতি দর্শন করে ৯ই চৈত্র শ্রীবৃন্দাবন ধাম পৌঁছেন। তথায় কয়েকদিন থেকে শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি দর্শন

করলেন এবং বহু সজ্জনের সভাতে হরিকথা প্রচার করে কলিকাতা ফিরে এলেন।

ইং ১৮৯৩ সালে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ মায়াপুর দর্শন করতে এসেছিলেন। সেই দিবসে বহু বৈষ্ণব তথায় আগমন করেছিলেন। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ভক্তি বিনোদ ঠাকুরকে গিরিধারী সেবা দিয়েছিলেন। (গৌঃ ২০।২৮-২৯ সং)

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কখন কখন পুরী ধামে বাস করবার জন্য ১৯০২ খৃঃ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকট 'ভক্তিকুটি' নামে এক ভবন নির্মাণ করেন। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে পরম শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ঠাকুর মহাশয়কে সপ্তম গোস্বামী বলতেন। শ্রীযুত বলরাম বসু মহাশয়ের পিতৃদেব শ্রীযুত রাধারমণ বসু প্রায় সময় ঠাকুরের কাছে আসতেন। শ্রীযুত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বিজ্ঞগণ ঠাকুর মহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জগতে পুনঃ শুদ্ধভক্তি মন্দাকিনী প্রবাহিত করলেন।

১৩২১ বঙ্গাব্দ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ ৯ইআষাঢ় শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট তিথি বাসরে তিনিও শ্রীগৌর গদাধরের লীলা চিন্তন করতে করতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করলেন।

শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীজ্ঞান দাস ও শ্রীনরোত্তম দাসাদির ন্যায় তিনি বহু ভজন, পদকীর্ত্তন রচনা করেছিলেন তার শরণাগতি—

দৈনময়ী গীত— যথা—

(হরি হে—) আমার জীবন, সদাপাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।

পরের উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবের ক্লেশ।।
নিজ সুখ লাগি, পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থ পর।
পর সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পর দুঃখ সুখকর।।
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসাগর্ব্ব বিভূষণ।।
নিদ্রালস্য হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা কামী।।
এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
শুভ কার্য্য শূন্য, সদানর্থ মনাঃ,
নানা দুঃখে জর জর।।
বার্ধক্যে এখন , উপায় বিহীন,
তা'তে দীন অকিঞ্চন।
ভকতি বিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন।।

লালসাময়ী গীত যথা—

কবে হবে হেন দশা মোর।
ত্যজি' জড় আশা, বিবিধ বন্ধন,
ছাড়িব সংসার ঘোর।।
বৃন্দাবনাভেদে, নবদ্বীপ ধামে,
বাঁধিব কুটির খানি।
শচীর নন্দন, চরণ আশ্রয়,
করিব সম্বন্ধ মানি।।
জাহ্নবী পুলিনে, চিন্ময় কাননে,
বসিয়া বিজন স্থলে।
কৃষ্ণনামামৃত, নিরন্তর পিব,
ডাকিব 'গৌরাঙ্গ' বলে।।
হা গৌর-নিতাই, তোরা দু'টি ভাই,
পতিতজনের বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু।।
কাঁদিতে কাঁদিতে, ষোলক্রোশ ধাম,
জাহ্নবী উভয়ে কূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, কভু ভাগ্যফলে,
দেখি কিছু তরু মূলে।।
হা হা মনোহর, কি দেখিনু আমি,
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'ব।
সম্বিৎ পাইয়া, কাঁদিব গোপনে,
স্মরি দুঁহু কৃপা-লব।।

শ্রীনাম সংকীর্ত্তন—

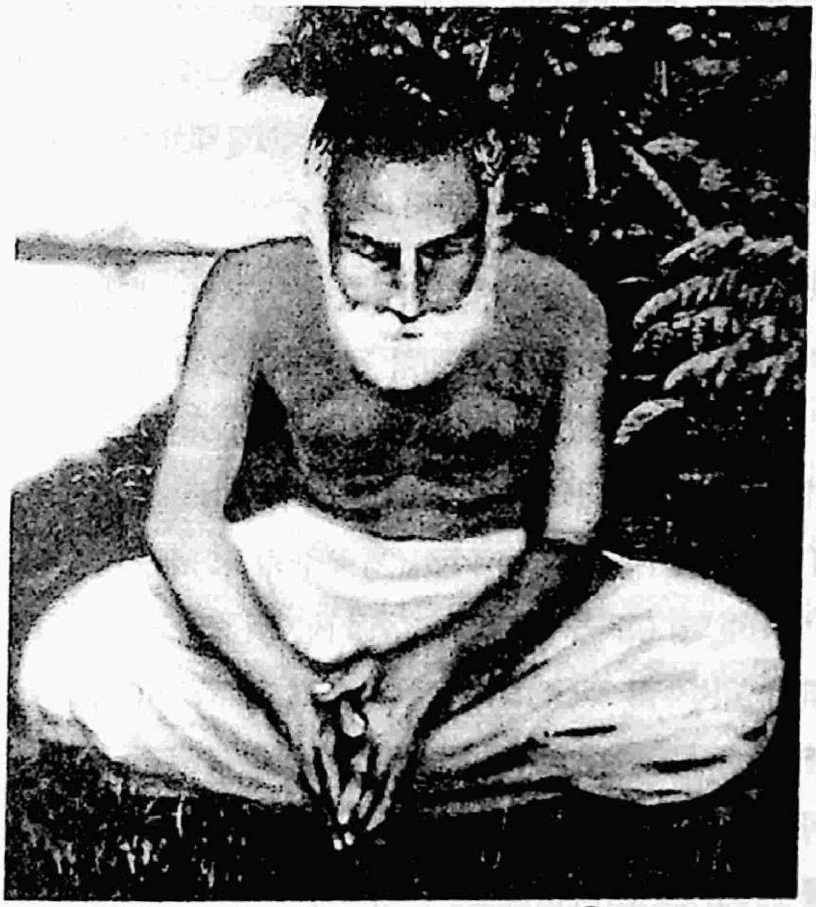
যশোমতী নন্দন ব্রজবর নাগর
গোকুল রঞ্জন কান।
গোপীপরাণ ধন মদন মনোহর
কালিয় দমন বিধান।।
অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা।
বিপিন পুরন্দর নবীন নাগরবর
বংশী বদন সুবাসা।।
ব্রজজন পালন অসুরকুল-নাশন
নন্দ-গোধন, রাখওয়ালা।
গোবিন্দ মাধব নবনীত তস্কর
সুন্দর নন্দ গোপালা।।
যামুনতটচর গোপী বসন হর
রাস রসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধা বল্লভ বৃন্দাবন নটবর
ভকতিবিনোদ আশ্রয়।।

শ্রীল ঠাকুরের রচিত গ্রন্থাবলী—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম, দত্তকৌস্তভ, শ্রীমদাম্নায় সূত্র, তত্ত্ববিবেক, শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গল স্বনিয়মদ্বাদশকম্, শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, শরণাগতি, গীতাবলী, কল্যাণ কল্পতরু, ভজন রহস্য, গীতায় রসিকরঞ্জন টীকা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অমৃত প্রবাহ ভাষ্য, শিক্ষাষ্টক ভাষ্য, চৈতন্য উপনিষদ ভাষ্য, উপদেশামৃতের ভাষ্য, Life and precepts of Sri Chaitanya, The Bhagabat ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

— ঃ ঃ —

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধুঃ।।



শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ

ভবসাগর পার হবার অভিলাষী নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজন অভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ীদর্শন ও যোষিতদর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু (খারাপ)— এই শাস্ত্র-বাণী জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ। তিনি কোন দিন বিষয়ীর জিনিস গ্রহণ করতেন না। গঙ্গাতটে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্ত্র গঙ্গাজলে ধৌত করে তা কৌপীন করে পরতেন। সজ্জন গৃহস্থের গৃহ থেকে চাল ভিক্ষা করে তা গঙ্গাজলে ভিজিয়ে রাখতেন। লবন লঙ্কা দিয়ে খেতেন। কাকেও অনুনয় বিনয় করতেন না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নিষ্কিঞ্চন পুরুষ ছিলেন তিনি।

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই সিদ্ধ মহাত্মার থেকে ভাগবত দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র অবগত হয়েছি যে তিনি পদ্মার তীরবর্ত্তী টেপাখোলার নিকটস্থ বাগযান নামক কোনও পল্লীতে বৈশ্যকুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বাবাজী মহারাজ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান কালে বংশী দাস নামে পরিচিত ছিলেন। তৎকালে তিনি শস্য ব্যবসার দ্বারা সৎ-বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সস্ত্রীক পরমার্থানুশীলন করতেন। পত্নী বিয়োগান্তে তিনি সংসার ত্যাগ করে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন এবং বৈষ্ণব সর্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের অন্যতম শিষ্য শ্রীল ভাগবত দাস বাবাজী মহারাজের থেকে বৈরাগী বেষ গ্রহণ পূর্ব্বক ছয় ক্রোশ শ্রীব্রজ মণ্ডলের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করতেন। এই সময় সামান্য মাধুকরী করে প্রাণ ধারণ এবং বৃক্ষতলে শয়ন করতেন। ব্রজবাসিগণকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পরিকর জ্ঞানে দর্শন ও সমস্ত বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গাদিকে দণ্ডবন্নতি করতেন। তিনি বহুদিন বর্ষাণায় বসতি করে শ্রীরাধা গোবিন্দকে নিত্য পুষ্প মাল্যাদি সেবা দ্বার সুখী করেছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রায় ত্রিশ বর্ষকাল শ্রীব্রজ মণ্ডলে অবস্থান করে শ্রীব্রজ ধামের ঈশ্বর

ঈশ্বরীকে বিবিধ সেবা দ্বারা তুষ্ট করেছিলেন। তারপর সেই শ্রীযুগল কিশোরের কৃপা নির্দেশে যেন তিনি গৌড় মণ্ডল শ্রীনবদ্বীপ ধামে এলেন। তিনি নবদ্বীপ ধামকে বৃন্দাবনাভেদে দর্শন করে শ্রীগৌর সুন্দরের মধুর লীলাস্থল সকল ভ্রমণ করতে লাগলেন।

এই সময় কত দিব্যভাব সমূহে শ্রীল বাবাজী মহারাজ সর্ব্বদা বিভোর থাকতেন। কখন বা দিব্যভাবে গঙ্গাতটে " গৌর গৌর" বলে নৃত্য করতেন, কখনও মূর্চ্ছিত হতেন। গঙ্গাতটের উপবন সমূহে রাধা গোবিন্দের দিব্য লীলা স্মরণ করে সানন্দে ভ্রমণ করতেন। এই সময় তাঁর পরিধানে কৌপীন থাকত। সময় সময় দিগম্বরও থাকতেন। মালার সাহায্যে নামজপ করতেন। কোন কোন সময় বস্ত্র গ্রন্থি দিয়েও নাম করতেন। তিনি কখনও কখনও গোদ্রুমধামে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ-মণ্ডপে এসে বাস করতেন এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণ করতেন। নিষ্কিঞ্চন শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবা করবার জন্য সজ্জন মাত্রেই পরম উৎসুক হতেন। কিন্তু তাঁর সেবার সুযোগ পাওয়া বড় দুষ্কর ছিল। এক সময় কাশিম বাজারের মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর শ্রীল বাবাজী মহারাজকে তাঁর রাজপ্রাসাদে নেবার জন্য এক বিশিষ্ট লোক পাঠান। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেছিলেন, আমি মহারাজের প্রাসাদে গেলে আমার অর্থলোভ হতে পারে। তাতে মহারাজের সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হবার সম্ভাবনা আছে। আমার যাবার পরিবর্ত্তে তিনিই সমস্ত বিষয় বৈভব আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে আমার নিকট আসুন। আমি তাঁর অবস্থানের জন্য আমার ন্যায় একটা ছৈ প্রস্তুত করে দিব এবং উভয়ে আনন্দে হরি ভজন করব।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলতেন যেখানে সেখানে ভোজন করলে ভজন পণ্ড হয়। এক বার ভক্ত হরেনবাবু নবদ্বীপের ভজন কুটীরের উৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। তজ্জন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজ তিন দিন তাঁর সঙ্গে কথা বলেন নাই। চতুর্থ দিন বললেন—ভজন কুটীরে যে উৎসবের প্রসাদ

দেওয়া হয়েছিল তা এক কুলটা রমণীর প্রদত্ত বস্তু। সঙ্গ বিচার না করে যেখানে সেখানে খেলে ভজন নষ্ট হয়।

একবার শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের তিরোভাব তিথির পূর্ব্ব দিনে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—"আগামীকল্য শ্রীগোস্বামী প্রভুর অপ্রকট তিথি। সুতরাং আমরা মহোৎসব করব। নিকটস্থ সেবকটি জিজ্ঞাসা করলেন—মহোৎসবের জিনিষ পত্র কোথায় পাওয়া যাবে? শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন কারও নিকট কিছু বল না, একবেলা খাওয়া বন্ধ করে সর্ব্বক্ষণ কেবল হরিনাম করব। তাই আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের মহোৎসব।

এক সময় আগরতলা নিবাসী শ্রীনরেন্দ্র কুমার সেন শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট আসলেন এবং শ্রীগুরু প্রণালী (সিদ্ধ প্রণালী) জানতে চাইলেন। তদুত্তরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—শ্রীভগবানকে কল্পনার দ্বারা জানা যায় না। শ্রীহরিনাম করতে করতে শ্রীনামের অক্ষর সমূহের ভিতর দিয়ে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায়। সাধকও তৎকালে আত্মস্বরূপ জানতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে সাধকের প্রিয় সেবাদিও জেগে উঠে।

একবার জনৈক ডাক্তার শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলেছিলেন তিনি শ্রীনবদ্বীপ ধামে বাস করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতে চান। তাকে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন আপনি যদি সত্যই নবদ্বীপে বাস করতে চান তবে বিনামূল্যে চিকিৎসা করে বিষয়ী লোকের বিষয় চেষ্টার সহায়তা করবার ইচ্ছা ত্যাগ করুন। যাঁরা বাস্তবিক হরিভজন করেন তাঁদের হরিভজনের সহায়তা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের সেবা বা ধর্ম সমস্তই ঘোর বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে।

কোন সময় একজন নবীন কৌপীন ধারী শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট কয়েকদিন যাতায়াত করবার পর নবদ্বীপে কোন ভূম্যধিকারিণী রাণীর এষ্টেটের কর্মচারীর থেকে পাঁচকাঠা জমি সংগ্রহ করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেই কথা শুনে অতি ক্রোধভরে বলেন—শ্রীনবদ্বীপ ধাম অপ্রাকৃত। এখানে

প্রকৃত ভূম্যধিকারিগণ কিরূপে ভূমি প্রাপ্ত হলেন যে তা হ'তে তাঁরা উক্ত কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হলেন? বিনিময়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্নরাজি প্রদান করলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটি বালুকার মূল্যের তুল্য হয় না। উক্ত কৌপীন ধারীরই বা কত ভজন বল আছে যে সে তার ভজন মুদ্রার বিনিময়ে নবদ্বীপে এত জমি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে?

একদিন একজন ভক্ত কিছু মিষ্টি মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়ে শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট নিয়ে গেলেন এবং তা গ্রহণ করবার জন্য প্রার্থনা জানালেন। বাবাজী মহারাজ বললেন—যারা মাছ খায়, ব্যভিচার করে কিংবা অন্য কোন অভিলাষ নিয়ে মহাপ্রভুকে ভোগ দেয়, তাদের হাতে মহাপ্রভু খান না। তা প্রসাদ হয় না।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ স্বয়ং চাল ভিক্ষা করে তা রান্না করে ভোগ দিয়ে নিজে গ্রহণ করতেন। কখনও অন্যের দেওয়া কোন জিনিষ গ্রহণ করতেন না। কোন সময় তিনি বর্ষাকালে ফুলিয়া নবদ্বীপের ধর্মশালায় কিছু দিন বাস করেন। কিছু প্রসাদ একটি ভাণ্ড করে রেখে দিয়েছেন। একটি সর্প তার পাশ দিয়ে চলে যায়, কোন মহিলা তা দেখতে পায়। যখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেই প্রসাদ পেতে বসলেন, স্ত্রীলোকটি তথায় উপস্থিত হয়ে সর্পের কথা বলতে লাগল। বাবাজী মহারাজ বললেন মা এখান থেকে আপনি না গেলে আমি প্রসাদ গ্রহণ করব না। বাধ্য হয়ে স্ত্রীলোকটি চলে গেল। তখন বাবাজী মহারাজ বললেন—মায়ার কার্য্য দেখ। মায়া সহানুভূতির ছল নিয়ে কিরূপে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে চায়। মায়া বহুরূপিণী। জীবকে হরিভজন করতে বাধা দেয়।

এক সময় শ্রীযুত গিরীশবাবু শ্রীল বাবাজী মহারাজকে নবদ্বীপে তাঁর কুটীরে থাকবার জন্য সপত্নীক বহু অনুনয় বিনয় করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁদের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—আপনাদের পায়খানাটি দিলে তথায়

বসে আমি ভজন করতে পারি। শ্রীগিরীশবাবু সপত্নীক বহু অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহারাজ দৃঢ়ভাবে পায়খানাটি চাইলেন। অগত্যা গিরীশবাবু পায়খানাটি ভালমতো পরিষ্কার করে দিলেন। বাবাজী মহারাজ তার মধ্যে বসে হরিনাম করতে লাগলেন। মহাভাগবতগণ যেখানে সেখানে বসে হরিভজন করতে পারেন। তাঁরা যে জায়গায় থাকেন তা হয় বৈকুণ্ঠ ধাম। বাহ্য চক্ষে অবশ্য আমরা অন্যরূপ দেখি।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ মহাভাগবত পুরুষ ছিলেন। তিনি কখনও ছল ধর্ম, কাপট্য ধর্ম বা অশাস্ত্রীয় কোন কথা বা সিদ্ধান্ত প্রশ্রয় দিতেন না। কোন প্রসিদ্ধ ভাগবত পাঠক সর্ব্বদা "গৌর "গৌর" বলতেন—একদিন শ্রীবাবাজী মহারাজের নিকট কোন ভক্ত তাঁর কথা উল্লেখ করলে বাবাজী মহারাজ বললেন—ও "গৌর" "গৌর" বলছে না। টাকা টাকা বলছে। যারা পয়সা নিয়ে ভাগবত পাঠ করে, তাদের মুখে ভগবানের নাম হয় না।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বাহ্যতঃ কাকেও কোন উপদেশ প্রদান করতেন না। কিন্তু তাঁর শুদ্ধ চরিত্রে সকলে মুগ্ধ হত। তিনি শুদ্ধ আচরণ করে জগতে প্রকৃত ভাগবত ধর্ম স্থাপন করে গেছেন। তাঁর দর্শনে মহা বহির্মুখ ব্যক্তিও হরিভজনে উন্মুখ হতেন। "দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।' " বৈষ্ণব হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ।।" (শ্রীনরোত্তম ঠাকুর) ভগবান শ্রীভক্তের হৃদয় মন্দিরে বাস করেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীহরি উত্থান একাদশী তিথিতে ১৩২২ বঙ্গাব্দের ৩০শে কার্ত্তিক শেষ রাত্রে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীগুরুদেবের সমাধি প্রদান করেন।

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ।।

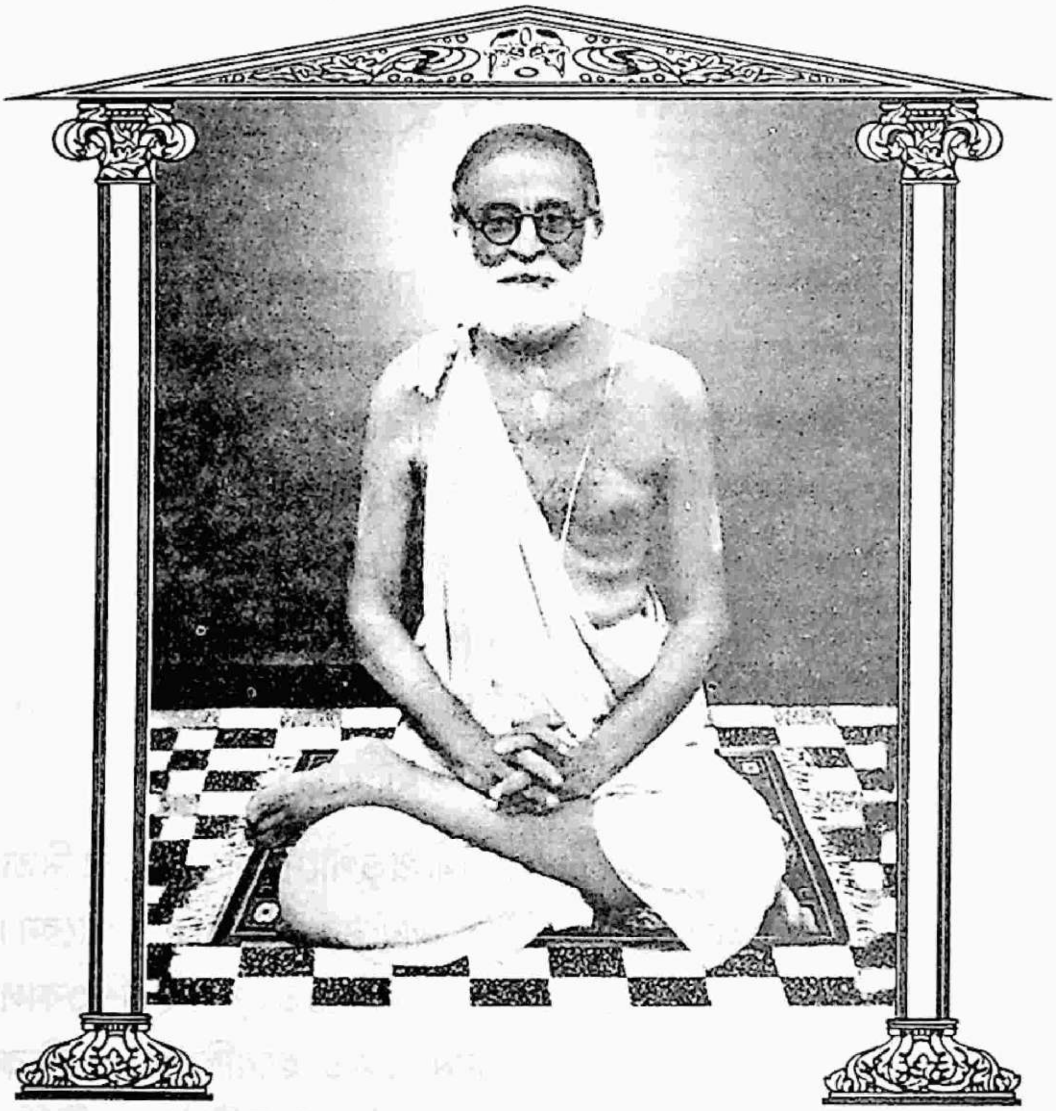
— o —

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতীতি-নামিনে।।
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।।
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তুতে।।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত হারিণে।।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে যাঁদের নিত্য সম্বন্ধ ছিল তাঁরা তাঁর অপ্রাকৃত ভজনশীল জীবনের কথা বলতে পারেন। জাগতিক কর্মবীর কিংবা ধর্মবীরের মত তাঁর জীবন গঠিত হয় নাই। শিশুকাল থেকে শুদ্ধ ভাগবত সঙ্গে ভাগবত জীবন গঠিত হয়েছিল। জাগতিক চমৎকারিতায় জগতের লোক মুগ্ধ হয়। কিন্তু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর জীবনে এরূপ কোন জড় বিভূতি দেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বরং ঐ প্রকার জড় বিভূতিকে বড় ঘৃণা করতেন। সর্ব্ব বিভূতিময় ভগবান যাঁদের বশীভূত হন, তাঁদের কোন বিভূতি লাভ করতে কি আর বাকী থাকে? "সর্বসিদ্ধি করতলে তাঁর।"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করবার সময় যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ পুরীধামে শ্রীমন্দির—সন্নিকটে নারায়ণ ছাতা নামক



শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

ভবনে বাস করছিলেন, তাঁর গৃহে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১২৮০ বঙ্গাব্দের) ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হন। এই মহাপুরুষের জননীর নাম ছিল শ্রীমতী ভগবতী দেবী।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবিমলা দেবীর প্রসাদ দ্বারা শিশুর অন্নপ্রাশন করিয়ে নামকরণ করলেন "বিমলা প্রসাদ"।

শ্রীশ্রীসরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাবের ছয় মাস পরে রথযাত্রা হয়। এই রথ যাত্রার সময় তিন দিন শ্রীজগন্নাথের রথ বড় দাঁড়ের উপর সরস্বতী ঠাকুরের জন্ম গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন জননী ভগবতী দেবী শিশুকে নিয়ে রথোপরি আরোহণ করলেন এবং তাকে শ্রীজগন্নাথের শ্রীপাদপদ্মমূলে ছেড়ে দিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব যেন শিশুর কত কালের পরিচিত। আনন্দভরে শ্রীজগদীশকে শিশু জড়িয়ে ধরল। ঠিক সেই সময়ে শ্রীজগন্নাথদেবের কণ্ঠ থেকে একটি ফুলের মালা ছিন্ন হয়ে শিশুর শিরে পতিত হল। তা দেখে পূজারী পাণ্ডাগণ আনন্দে 'হরি হরি' ধ্বনি করে উঠলেন। বললেন—মা! তোমার এই শিশু কালে একজন মহাপুরুষ হবে। শ্রীজগন্নাথদেব একে আশীর্ব্বাদী মালা দিয়েছেন। এ তাঁর কথা জগতে প্রচার করবে। জননী ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শুনে আনন্দে অশ্রুসিক্ত নয়নে শিশুকে কোলে নিলেন এবং বারংবার ব্রাহ্মণগণকে এবং জগন্নাথদেবকে বন্দনা করতে লাগলেন। আবির্ভাবের পরে শিশু জননীর সহিত দশমাস কাল পুরী থাকার পর পাল্কীতে স্থল পথে রাণাঘাটে উপনীত হন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় পরম নিষ্ঠাবান সদাচার সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর পত্নী শ্রীভগবতী দেবীও তদ্রূপ সদগুণ সম্পন্না ছিলেন। তাঁরা পুত্র-কন্যাগণকে কদাপি ভগবদ প্রসাদ ছাড়া অন্য কোন বস্তু খেতে দিতেন না। কোন অসৎ সঙ্গেও মিশতে দিতেন না। ১৮৮১ সালে কলিকাতার রামবাগানে ভক্তি ভবনের ভিত্তি খনন কালে এক শ্রীকূর্ম্মদেবের মূর্ত্তি প্রকট হয়। সপ্তমবর্ষ বয়স্ক শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীনাম ও মন্ত্র দিয়ে সেই কূর্ম্মদেবের সেবা করতে নির্দেশ দিলেন।

১৮৮৪ সালে ১লা এপ্রিল শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়

শ্রীরামপুরের সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। এই সময় সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীরামপুর হাইস্কুলে ভর্ত্তি করান হয়। তিনি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন বিকৃন্তি বা Bicanto নামে এক নূতন লেখন প্রণালী আবিষ্কার করেন। এই সময় তিনি পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র চূড়ামণির নিকট গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি লাইব্রেরীতে বসে বিভিন্ন দর্শন গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। এই সময় তিনি শ্রীযুত পৃথ্বীধর শর্মার নিকট বেদও অধ্যয়ন করতেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বেশী দিন কলেজে অধ্যয়ন করতে পারলেন না। কলেজ ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে তিনি আত্মচরিতে লিখেছেন —"আমি যদি মনোযোগ সহকারে বিদ্যালয়ের পাঠ শিক্ষা করতে থাকি তাহা হইলে সংসারে প্রবেশের জন্য আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি পীড়ন হইবে। আর যদি মূর্খ অকর্মন্য রূপে প্রতিপন্ন হই, তাহা হইলে সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হইতে কেহ আর তাদৃশী প্ররোচনা করিবে না।

পাঠ্যাবস্থায় তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় পারমার্থিক প্রবন্ধাদি লিখতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত গৌড় মণ্ডলের বিভিন্ন শ্রীগৌর পার্ষদগণের শ্রীপাট সকল দর্শন করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ১৮৯৮ সালে সারস্বত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করবার সময় পৃথকভাবে 'ভক্তি ভবনে' পণ্ডিতবর শ্রীযুত পৃথ্বীধর শর্মার নিকট সিদ্ধান্ত কৌমুদী অধ্যয়ন করেন। অল্প কালের মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি ভক্তিভবনে স্বতন্ত্র একটি সারস্বত "চতুষ্পাঠী" স্থাপন করেন। তাতে ছাত্রগণকে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। 'সারস্বত চতুষ্পাঠি' হতে সরস্বতী ঠাকুর জ্যোতির্ব্বিদ, বৃহস্পতি প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত করেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কিছুদিন স্বাধীন ত্রিপুরা এষ্টেটে কর্ম্ম গ্রহণ করে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের জীবন চরিত 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থ প্রকাশের সম্পাদকতা করতে লাগলেন। পরে তিনি যুবরাজ ব্রজেন্দ্র কিশোরের সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন এই কার্য্য করার পর তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কার্য্য পরিদর্শনের ভার নেন। বৈষয়িক কার্য্য মধ্যে বিবিধ প্রকারের হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি দেখে তিনি উহা শীঘ্রই ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেন। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর তা' অনুমোদন করে তাঁকে পূর্ণ বেতনে পেন্সন প্রদান করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তিন বছর পেন্সন ভোগ করে তা নিজেই বন্ধ করে দেন।

১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত কাশী, প্রয়াগ ও গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন করেন। কাশীতে শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রীর সহিত রামানুজ সম্প্রদায় সম্বন্ধে নানা আলাপ আলোচনা হয়। তখন থেকে তাঁর অদ্ভুত বৈরাগ্যময় জীবন বিকশিত হতে থাকে। তিনি মনে মনে সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে বৃন্দাবনে সিদ্ধ বাবা শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করতে নির্দ্দেশ দিলেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের উপদেশ মত শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। প্রথম দিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—আমি আপনাকে কৃপা করতে পারি কিনা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা না করে বলতে পারব না। দ্বিতীয় দিন সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হলেন। বাবাজী মহারাজ বললেন—আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। তৃতীয় দিন সরস্বতী ঠাকুর উপস্থিত হলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বললেন—সুনীতি বা পাণ্ডিত্য ভগবদ্ভক্তির কাছে অতি তুচ্ছ। তচ্ছ্রবণে সরস্বতী ঠাকুর বললেন আপনি কপট চূড়ামণির সেবা করেন তাই বঞ্চনা

করছেন, আমায় কৃপা করতে চান না। গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট শ্রীরামানুজ আচার্য্য অষ্টাদশ বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে পরে তাঁর কৃপালাভ করেছিলেন। আমিও তদ্রূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপালাভ একদিন না একদিন করবই। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সরস্বতী ঠাকুরের এইরূপ সুদৃঢ় নিষ্ঠা দেখে, শ্রীগোদ্রুমের স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে তাঁকে ভাগবতী দীক্ষা প্রদান করলেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ সাক্ষাদ্বৈরাগ্য মূর্ত্তি। কাকেও মন্ত্র-দীক্ষাদি দিতে চাইতেন না। তিনি গঙ্গাতটে বৃক্ষমূলে বাস করতেন। গঙ্গায় পরিত্যক্ত মৃত ব্যক্তির বস্ত্র কৌপীনরূপে ব্যবহার করতেন। কখনও গঙ্গাজলে চাল ভিজিয়ে লঙ্কা ও লবণ দিয়ে তা' খেতেন। কখনও পরিত্যক্ত মৃদ্ভাণ্ড গঙ্গাজলে ধুয়ে তাতে অন্ন রান্না করে ঠাকুরের ভোগ দিয়ে তা' গ্রহণ করতেন।

১৯০০ সালের মার্চ মাসে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত সরস্বতী ঠাকুর বালেশ্বর, রেমুণা, ভুবনেশ্বর ও পুরী প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। স্থানে স্থানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশ মত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দৌলতে শুদ্ধ ভক্তির মন্দাকিনী পুনঃ প্রবাহিত হয়। শ্রীগৌর পার্ষদগণের অপ্রকটের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে এক অন্ধকার যুগ এসেছিল। সেই যুগের অবসানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বাণী জগতে প্রচার করেন। তিনি শুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, বহু পারমার্থিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তাঁর কৃপায় বহু সজ্জন ব্যক্তি গৌরসুন্দরের ভজন করতেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে শ্রীনামহট্ট ও প্রপন্নাশ্রমাদি সংস্থাপন করেন।

১৯১৬ সালে বঙ্গাব্দ ১৩২১, ৯ই আষাঢ় গৌর শক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথির দিন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকট হন। ঠাকুর মহাশয় নিত্যলীলা প্রবেশ করবার পূর্ব্বে শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে বললেন—ষড় গোস্বামীর গ্রন্থ ও শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা বিশেষভাবে সর্ব্বত্র প্রচার কর।

মহাপ্রভুর জন্মস্থানের উন্নতিও করা চাই। জননী শ্রীভগবতী দেবীও কয়েক বৎসর পরে পরলোক গমন করেন। যাবার সময় তাঁর হাত ধরে বললেন—তুমি অব্যশ্যই আমার গৌরসুন্দরের কথা ও তাঁর ধাম শ্রীমায়াপুর সর্ব্বত্রই প্রচার করবে। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর পিতৃ মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধারণ করে বিপুল উদ্যমে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করলেন।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীসরস্বতী ঠাকুর শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করে শতকোটি মহামন্ত্র জপ ব্রতের উদ্‌যাপন করেছিলেন। সমস্ত বাংলাদেশে আচার্য্য সন্তানগণ স্মার্ত্ত জাতিবাদ দিয়ে বৈষ্ণবদের অবজ্ঞা ও নির্য্যাতন করছিল। এই বিষয় নিয়ে মেদিনীপুর বালীঘাই নামক স্থানে একটি বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। এই সভাতে শ্রীবৃন্দাবন ধামের শ্রীযুত মধুসূদন দাস গোস্বামী ও গোপীবল্লভ পুরের পণ্ডিতবর শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। তথায় গোস্বামীদ্বয়ের আহ্বানে শ্রীসরস্বতী ঠাকুরও উপস্থিত হন। সভার কার্য্য আরম্ভ হল। স্মার্ত্ত পণ্ডিত নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে থাকলে গোস্বামীদ্বয়ের অনুমোদনে শ্রীসরস্বতী ঠাকুর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের যথার্থ শাস্ত্র যুক্তি সম্পন্ন সে বক্তৃতা শ্রবণে স্মার্ত্ত আচার্য্য সন্তানগণ মোহিত ও আশ্চার্য্যান্বিত হন। সকলে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণবগণের মহিমা উপলব্ধি করতে পারলেন।

১৯১২ সালে কাশিম বাজারের মহারাজ শ্রীমণীন্দ্র নন্দী নিজ ভবনে একটি বৃহৎ বৈষ্ণব সম্মিলনীর আয়োজন করেন। সেই সম্মিলনীতে মহারাজ শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে নিয়েছিলেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর চারদিন যাবৎ শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধে চারটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু তথায় তথাকথিত প্রাকৃত সহজিয়াগণের সমাবেশ ও কেবলমাত্র লোক দেখানো ভাব দেখে তিনি চারদিন কিছু ভোজন করেন নাই। এ চারদিন উপবাসান্তে শ্রীমায়াপুরে এসে মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করেন। তথায় কোন কোন লোক

তাঁকে ভোজনের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি বলেছিলেন—অভক্তি বিচার পর বারোয়ারী স্থানে ভোজন করতে নাই। পরে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী এ ব্যাপার বুঝতে পেরে দুঃখিত হন এবং মায়াপুরে আগমন করে তাঁর চরণে অনেক অনুনয় বিনয় প্রকাশ করেন।

তখন সারা বাংলাদেশ আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া নেড়ী দরবেশ ও সাঁই প্রভৃতি প্রাকৃত সহজিয়া রূপ অপসম্প্রদায়ে ভরা ছিল। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর এ সমস্ত অপসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করেন। তিনি এই সমস্ত মহাপ্রভুর নামের কলঙ্ককারী অপসম্প্রদায়কে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিতেন না। এই সময় অনেক প্রসিদ্ধ গোস্বামী নামধারী ব্যক্তিও এই প্রাকৃত সাহজিয়াগণকে প্রশ্রয় দিতেন। প্রাকৃত সাহজিয়াবাদীর দল যখন পরমহংস গোস্বামী গুরুবর্গের পরমহংস বেষ ধারণ পূর্ব্বক জগৎকে প্রবঞ্চনা করতে লাগল তখন শ্রীসরস্বতী ঠাকুর দুঃখে অসৎসঙ্গ বর্জন পূর্ব্বক নির্জ্জনে ভজন করতে আরম্ভ করলেন। সে সময় অকস্মাৎ একদিন দিব্য মূর্ত্তিতে মহাপ্রভু ও ষড়গোস্বামী পূর্বতন আচার্য্যগণ যেন আবির্ভূত হয়ে বলতে লাগলেন—তুমি নিরুৎসাহ হয়ো না। উৎসাহের সহিত পুনঃ দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন কর ও বৈধমার্গে ক্রমবিধিতে ভগবদ্ ভজন প্রণালী প্রচার কর। তিনি সে দিব্য প্রেরণা পেয়ে সেদিন থেকে বিপুল উদ্যমে জগতে গৌরবাণী পুনঃ প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ শ্রীগৌরজয়ন্তী বাসরে শ্রীধাম মায়াপুরে ভাগবত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস লীলা প্রবর্ত্তন করলেন। সেদিন শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপন করলেন ও শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করলেন।

বরিশালের ভোলা নিবাসী ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরোহিণী কুমার ঘোষ হরিভজন করবার আশায় সংসার ত্যাগ করে নবদ্বীপ কুলিয়ায় আসেন এবং একজন বাউলের চরণাশ্রয় করে

তাঁদের শিক্ষাদীক্ষানুসারে চলতে লাগলেন। কিন্তু বাউলদের সেবাদাসী ব্যাপার দেখে তাঁর মনে মনে ঘৃণা হতে লাগল। রোহিণীবাবু একদিন মায়াপুরে যোগপীঠ দর্শনে এলেন। সেদিন শ্রীল প্রভুপাদ যোগপীঠে হরিকথা বলছেন। রোহিণীবাবু শ্রীল প্রভুপাদের অপূর্ব্ব তেজপুঞ্জ বিশিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি এবং অদ্ভুত সিদ্ধান্ত পূর্ণ বাণী সকল শুনে অতি আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। সেদিন শ্রীপ্রভুপাদের সমস্ত কথা শুনে তিনি কুলিয়ার বাউল গুরুর আশ্রমে ফিরে এলেন। একটু রাত্র হয়েছিল। রোহিণীবাবু শ্রীল প্রভুপাদের মুখে যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্তিময়ী কথা শুনেছেন তা চিন্তা করতে করতে শুয়ে পড়লেন, কিছু খেলেন না। নিদ্রিত হলে স্বপ্নে দেখছেন সেই বাউলটি একটা ব্যাঘ্র মূর্ত্তিতে ও সেবাদাসী ব্যাঘ্রী মূর্ত্তিতে তাঁকে খাবার জন্য যাচ্ছে। রোহিনীবাবু ভয়ে কম্পিত কলেবরে মহাপ্রভুকে ডাকছেন। এমন সময় দেখলেন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করছেন। রোহিণীবাবু সেইদিনই চিরতরে বাউল গুরুকে ত্যাগ করে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করলেন।

শ্রীশ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দত্ত (শ্রীল প্রভুপাদের বড় ভাই) দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে ভীষণ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। তাঁর নির্যান দিবসে শ্রীল প্রভুপাদ সমস্ত রাত্র তাঁর নিকট উপস্থিত থেকে তাঁকে হরিনাম শুনান। অতঃপর দেহত্যাগের কিছু পূর্ব্বে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তখন তিনি শ্রীল প্রভুপাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে শ্রীহরি স্মরণ করতে বললেন। সে সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। অন্নদাপ্রসাদ বাবুর ললাটে এ অপূর্ব্ব রামানুজীয় তিলক চিহ্ন স্পষ্ট ভাবে দেখা যেতে লাগল। তিনি সকলের সামনে পূর্ব্ব জীবনের কথা বলতে লাগলেন। তিনি রামানুজীয় বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে কিছু অপরাধ করার ফলে তাঁর পুনর্ব্বার জন্ম হয়। পূর্ব্বকৃত সুকৃতি ফলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঘরে আগমন হয়। এই সমস্ত কথা বলবার পর অন্নদাপ্রসাদ বাবু দেহত্যাগ করেন।

এক সময়ে মায়াপুরে শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীল প্রভুপাদ ভজন করছেন। ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর আগের দিন, ঠাকুরের নৈবেদ্যে দুগ্ধাদির কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। শ্রীল প্রভুপাদ চিন্তা করতে লাগলেন—আজ দুধ পাওয়া গেলে মহাপ্রভুকে ভোগ দেওয়া যেত। পরক্ষণে প্রভুপাদ চিন্তা করতে লাগলেন, আমার নিজের জন্য এইরূপ চিন্তা হল না কি? অন্যায় হল। তখন বর্ষাকাল। গৌর জন্মভিটা জলমগ্ন। নৌকা ছাড়া চলা দুষ্কর। এই অবস্থায় অপরাহ্নকালে একজন গোয়ালা সেই জল কাদা ভেঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দুধ, ক্ষীর, মাখন ও ছানা প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হলো। তখন জানতে পারা গেল গোয়ালাটিকে জমিদার হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাপ্রভুর প্রেরণা অনুযায়ী এই সমস্ত জিনিষ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরের ভোগের পর সেই প্রসাদ শ্রীল প্রভুপাদের কাছে নেওয়া হল। এত প্রসাদ দেখে তিনি অবাক হলেন। তারপর সমস্ত কথা শুনলেন। অনন্তর তিনি প্রসাদ নিয়ে মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন —"আমি আপনাকে কত কষ্টই না দিলাম। কেন আমার এইরূপ একটি দুর্বুদ্ধির উদয় হল? আপনি আমার জন্য অপরলোকের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া এই সকল দ্রব্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক প্রভাবে জগৎ মুগ্ধ হল। তাঁর আকর্ষণে বহু সম্ভ্রান্ত কুলের বিদ্বান ব্যক্তি শ্রীগৌরসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপ, মায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, রেমুণা বালেশ্বর, পুরী, আলালনাথ, মাদ্রাজ, কভুর, দিল্লী, পাটনা, গয়া, লক্ষ্ণৌ, কাশী, হরিদ্বার, এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন, আসাম, কুরুক্ষেত্র, ভারতের বহির্দেশে রেঙ্গুন ও লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ ৬৬টি শুদ্ধভক্তি মঠ স্থাপন করেন এবং মন্দার পর্ব্বতোপরি, শ্রীনৃসিংহাচল এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপন করেন। প্রাচ্য তথা পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ২৫

জন ব্যক্তিকে ভাগবত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করেন। তিনি জগতে বৈকুণ্ঠবাণী প্রচারের জন্য বহু শুদ্ধভক্তি পত্রিকা প্রকাশ করেন। (১)সজ্জনতোষণী বা (The Harmonist) পাক্ষিক পত্রিকা, (২) সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকা, (৩) হিন্দী পাক্ষিক ভাগবত নামক পত্রিকা, (৪) দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, (৫) আসামী ভাষায় মাসিক কীর্ত্তন নামক পত্রিকা, (৬) উড়িষ্যা ভাষায় পরমার্থী নামক পত্রিকা। এতদ্ব্যতীত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থও প্রকাশ করেন। তিনি পারমার্থিত জগতে একটি নূতন যুগ আনয়ন করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌর বাণী প্রচারের জন্য শুদ্ধ আচরণশীল-ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীদের প্রেরণ করলেন। মহা উদ্যমে শ্রীগৌরকৃষ্ণের বাণী পৃথিবীতলে প্রচার হতে লাগল। তিনি ষষ্টি বর্ষ পর্য্যন্ত এইরূপ উদ্যমে গৌর বাণী প্রচার করে যখন সঙ্কল্প কতকটা সিদ্ধ হয়েছে দেখলেন তখন হৃষ্ট মনে শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্য সেবায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করলেন। নিত্য লীলায় প্রবেশ করার কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি প্রধান প্রধান শিষ্য ভক্তগণকে সমবেত করে তাঁদের প্রচুর আশীর্ব্বাদ প্রদান করলেন। পরিশেষে উপস্থিত অনুপস্থিত ভক্তগণকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন— "সকলে রূপরঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করবেন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্ম ধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্খা। আপনারা সকলে এক অদ্বয় জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে মিলেমিশে থাকবেন।" শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ বহু মূল্যবান উপদেশ নিয়ম নীতি প্রভৃতি দিবার পর, গত ৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫০, ১৭ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১লা জানুয়ারী ১৯৩৭ সালে শুক্রবার নিশান্তঃকালে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কি জয়।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী দাস গোস্বামী

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপিনে।
শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদাখ্য পুরী গোস্বামিনে নমঃ।।
সন্দর্ভালোকদানেনাভক্তিধ্বান্তবিনাশিনে।
ভক্তি বীজর্পণেনৈব স্বেষ্টস্মৃতিবিধায়িনে।।
নামকৃপৈকনিষ্ঠায় কারুণ্যঘনমূর্ত্তয়ে।
ভাগবতরসাম্ভোধৌ নিরন্তরাবগাহিনে।।
শ্রীরাধামাধবপ্রেম প্রোজ্জ্বলারতিবর্ধনে।
বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট রূপানুগায় তে নমঃ।।

শ্রীশ্রীভগবানের আবির্ভাব তিথি যেমন পবিত্র, তাঁর ভক্তগণের আবির্ভাব তিথিও তদ্রূপ। ভগবান সব সময় অবতীর্ণ হন না বটে কিন্তু ভাগবত আচার্য্যগণের ভক্তিধারা সর্ব্বকাল প্রবাহিত হয়।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।।
(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১।৪৫)

শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামীর আবির্ভাব ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট বাংলা ১৩০২ সালে ভাদ্র শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে। তাঁর পিতৃদেবের নাম শ্রীযুত রজনীকান্ত বসু। মাতৃদেবীর নাম শ্রীযুক্তা বিধুমুখী বসু। পূর্ব্ববঙ্গে নোয়াখালী জেলার সন্দীপহাতীয়ায় এই মহাপুরুষের জন্মস্থান। শ্রীযুত বসু মহাশয়ের যোগেন্দ্র

(শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ) শ্রীনিবাস, সুদর্শন ও হৃষীকেশ নামে চারটি সন্তান ছিলেন। তাঁরাও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ছিলেন।



শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী শিশুকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণানুরাগী ছিলেন। তিনি অষ্টম বর্ষ বয়সে রামায়ণ, মহাভারত ও গীতার বহু অংশ মুখে মুখে বলতে পারতেন। ঐ সময় তিনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ও শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের

প্রার্থনাময়ী গীতগুলি মৃদঙ্গ সহযোগে কীর্ত্তন করতেন। মধুর কণ্ঠধ্বনি ও সুললিত মৃদঙ্গ বাদ্য ধ্বনিতে তিনি সকলকে মুগ্ধ করতেন। এতে তাঁর নিত্য সিদ্ধ ভাগবত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেত। তিনি বহরমপুর 'কৃষ্ণনাথ' কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ডিগ্রি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কৈশোর থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তখন থেকে ভাগবতের স্তবাদি মুখস্থ করতেন। তিনি ষোল বৎসর বয়সে পিতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু ও বড় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র বসুর (শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ) সঙ্গে কলিকাতার রামবাগানস্থ ভক্তিভবনে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ প্রথম বার দর্শন করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এক কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচরণ পার্শ্বে বসে হরিনাম করছিলেন এবং একটু দূরে বারান্দায় শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় বসে ছিলেন। সকলে শ্রীঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করলে তিনি সহাস্যবদনে বললেন—তোমাদের পরম মঙ্গল হউক। তারপর শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কিছুক্ষণ হরিকথা বললেন।

শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর ১৯১৮ সালে বড় ভ্রাতা শ্রীযোগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে রামবাগানে ভক্তিভবনে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনে যান। তাঁরা দণ্ডবৎ করলে প্রভুপাদ সহাস্যবদনে শ্রীমদ্ পুরী দাসকে একটি কীর্ত্তন করতে বললেন। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "কবে হবে বল সে দিন আমার" এই কীর্ত্তনটি শুনান। তাঁর মধুর কণ্ঠধ্বনিতে সকলে স্তম্ভিত হলেন। শ্রীল প্রভুপাদ খুব সুখী হলেন। সেই দিন তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাজা রামমোহন রায় ও জনৈক গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ও বৈষ্ণবধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন তা খণ্ডন করে, শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য তা

স্থাপন করা যায় কিনা। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন—রামমোহন রায়ের এবং গোস্বামীর শ্রুতি বিরুদ্ধ পাষণ্ডমত অচিরাৎ ভাগবত সিদ্ধান্তে খণ্ড-বিখণ্ড হবে। অসৎ সিদ্ধান্ত কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

১৯১৮ সালের ফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্রীগৌর-জন্মোৎসব বাসরে শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় দিন শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীমদ্ পুরী দাস গোস্বামী, শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন ও ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন শ্রদ্ধালু সজ্জন ব্যক্তিকে মন্ত্র-দীক্ষাদি প্রদান করেন। শ্রীপুরীদাস ঠাকুরের ব্রহ্মচারী নাম হল শ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা থেকে পরবিদ্যা ভূষণ উপাধি প্রদান করেন।

১৯২৫ সাল থেকে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন। এই সময় শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে যান। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাদি টুকে নিতেন এবং তাঁর যাবতীয় লেখা পড়ার কার্য্য করতেন। তিনি অদ্ভুত শ্রুতিধর ছিলেন। যা একবার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনতেন, অবিকল নকল করতে পারতেন। যে সমস্ত ভাগবতের শ্লোক শ্রীল প্রভুপাদের মুখে শুনতেন, পরক্ষণে তা বলতে পারতেন। সভাস্থলে অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে যে শ্লোক জিজ্ঞাসা করতেন তা তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দিতেন; এরূপ অদ্ভুত মেধা দেখে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা আশ্চর্য্যান্বিত হতেন। যেদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সেইদিন থেকে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা ভিন্ন স্বেচ্ছায় কিছু করতেন না। এমন কি শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাদি লিখতে লিখতে ভোজন করবার সময় এলেও প্রভুপাদ ভোজন করতে যেতে না বলা পর্য্যন্ত পত্র লিখেই যেতেন। শ্রীল প্রভুপাদের অবশেষ নিয়ে শ্রীমদ্ পুরীদাস ঠাকুর ভোজন করতেন। কতদিন তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অবশেষ না পেয়ে

উপবাসী থাকতেন। শ্রীল প্রভুপাদ জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ কিছু দুধ কিংবা কলা নিজ অধরে স্পর্শ করে তাঁকে ডেকে খাওয়াতেন।

প্রথম শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীবাসুদেব প্রভু, শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুত জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, শ্রীযুত হরিপদ কবিভূষণ এম, এ, বি, এল, শ্রীযশোদানন্দন ভাগবত ভূষণাদি কতিপয় ভক্ত অবস্থান করতেন। কলিকাতায় একটি ভক্তি প্রচার কেন্দ্র মঠ স্থাপন করবার আশায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবাসুদেব প্রভু ও শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণকে সঙ্গে নিয়ে ১নং উল্টাডিঙ্গি রোডে ৫০ টাকা মাসিক ভাড়া হিসাবে একখানি পুরাতন বাড়ী নেন। গৃহস্থ ভক্তগণই ভাড়া বহন করতেন। ১৯১৮ সালের অগ্রহায়ণ শ্রীল প্রভুপাদ ঐ বাড়ীতে 'শ্রীভক্তিবিনোদ আসন' স্থাপন করেন। ১৯১৯ সালে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শুভ আবির্ভাব দিবসে (বসন্ত পঞ্চমী) শ্রীভক্তি বিনোদ আসনে 'শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা" পুনঃ প্রকট হয়। ১৯২০ সালে শ্রীজগদীশ ভক্তি প্রদীপ ঠাকুরের পত্নী দেহত্যাগ করলে তিনি সম্পূর্ণভাবে শ্রীল প্রভুপাদের গৌরবাণী প্রচার কার্য্যের সহায়তা করবার জন্য আত্মসমর্পণ করেন। এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করেন। তখন থেকে তিনি শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ নামে খ্যাত হন। ইনিই শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম সন্ন্যাসী। শ্রীল প্রভুপাদ এই বৎসর সপার্ষদ ধানবাদে শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। বাংলা ১৩২৫ সাল থেকে শ্রীল পুরীদাস ঠাকুর শ্রীভাগবত প্রেস পরিচালনার কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি বহু বর্ষ এই প্রেসের সেবা করেন এবং বহু ভক্তি গ্রন্থ প্রকাশনের কার্য্যও সম্পাদন করেন। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের পঞ্চাশতম প্রকট বর্ষ থেকে শ্রীব্যাস পূজা আরম্ভ হয়। শ্রীপুরী দাস ঠাকুর ব্যাস পূজার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং তিনিই ব্যাস পূজার প্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখেছিলেন। বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রভুপাদের গৌরবাণী

প্রচারের সহায়কদের মধ্যে তিনিই অন্যতম ছিলেন।

১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বাংলা ১৩৪৩, ১৬ই পৌষ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকট লীলা বিস্তারের পর তিনি গৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি ও আচার্য্য পদে সমস্ত ভক্তগণের সমর্থনে অধিষ্ঠিত হন। আচার্য্যাভিষেক পৌরহিত্যের কার্য্য করেন আচার্য্যাত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সেই দিন মধ্যাহ্ন কালে শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর প্রায় শতাধিক লোককে হরিনাম মন্ত্র প্রদান করেন। তিনি যেদিন আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত হন সেদিন থেকে তাঁকে আচার্য্যদেব বলা হত। বাংলা ১৩৪৪ সালে ২৮শে বৈশাখ শ্রীল আচার্য্যদেব বহু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী নিয়ে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা নগরীতে প্রচার করতে যান। কয়েক দিন পূর্ব্ব বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিপুল ভাবে প্রচার কার্য্য করবার পর তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সে সময় তাঁর অভ্যর্থনার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে এক বিশাল জনসভার আয়েজন করা হয়েছিল।

১৯৩৮ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী এবং আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে প্রচার কার্য্যের জন্য রেঙ্গুন যান। রেঙ্গুনে বড় বড় স্থানে কিছুদিন বিপুলভাবে গৌরবাণী প্রচারিত হয়। অনন্তর ৭ই এপ্রিল শ্রীল আচার্য্যদেব বহু ভক্তসঙ্গে হরিদ্বার কুম্ভমেলায় আগমন করেন এবং তথায় সৎ শিক্ষা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রভুপাদের শ্রীচরণ স্মরণ করে সর্ব্বত্র বিপুল ভাবে প্রচার কার্য্য করতে থাকেন। বাংলা ১৩৪৫ সনের ভাদ্র মাসে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ শতবর্ষ পূর্ত্তি আবির্ভাব মহোৎসব দুই মাস ব্যাপী কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় শ্রীল আচার্য্যদেব সমারোহে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে শ্রীহরিকথা প্রচার করেন। তিনি বাংলা ১৩৪৬ সালে আষাঢ় কৃষ্ণ পঞ্চমীতে শ্রীগয়াধামে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং "শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী" এই নাম ধারণ করেন।

এই বৎসর ২৯শে আশ্বিন শ্রীল আচার্যদেব পুনর্ব্বার ঢাকায় শুভ পদার্পণ করেন। ঢাকা মাধ্ব গৌড়ীয় মঠে সেবকগণের তরফ থেকে এক বিপুল অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। নগরীর বহু গণমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। কয় দিন মঠে নিয়ত হরিকথা ও কীর্ত্তন হয়েছিল। একদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন—

আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী চার প্রকার লোক ভক্তির অধিকারী। গজেন্দ্র আর্ত্ত হয়ে ভগবানকে ডেকেছিল। পরে তার বিচার হল আমি নিজের সুখের জন্য ভগবানকে খাটালাম। তাঁর যা ইচ্ছা তিনি তা বিধান করুন। গজরাজের আর্ত্তির মধ্যে যে কামনা ছিল, তা ছেড়ে দিল। ধ্রুব মহারাজ অর্থার্থী অর্থাৎ রাজ্য সিংহাসন লাভেচ্ছু। যখন তিনি শ্রীহরির দর্শন পেলেন, তখন স্তুতি করে বললেন—আমি কাচানুসন্ধান করতে করতে দিব্যরত্ন পেয়েছি। অন্য বরের দরকার নাই। ধ্রুব মহারাজ অন্য কামনা ত্যাগ করলেন।

শৌনক মুনি জ্ঞান লাভের কৌতুহল বশবর্ত্তী হয়ে শ্রীহরির উপাসনা করেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসার মধ্যে যে কামনা ছিল তা তিনি পরে ছেড়েছিলেন। চতুঃসন নবযোগেন্দ্র প্রভৃতি জ্ঞানানুসন্ধান ছেড়ে শ্রীহরির সেবায় আকৃষ্ট হন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ও বলি মহারাজ এঁরা (বৈষ্ণব) শুদ্ধ ভক্ত। মার্কণ্ডেয় শিবের পরম ভক্ত হয়েও শুদ্ধ বৈষ্ণব। ইনি হরমহাদেবকে আশ্রয় বিগ্রহ এবং হরিকে বিষয় বিগ্রহরূপে দর্শন করেন।

ব্রজে শান্তরসে যমুনাদেবী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। মহানীপ বা মহাকদম্ব বৃক্ষ, যাঁকে কল্পদ্রুম বলা হয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের শান্তরসের সেবক। তাঁর অনুগত ব্রজের মত বৃক্ষরাজি ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি প্রভৃতি ব্রজে শান্তরসে বৃক্ষ ও ভ্রমরাদি রূপে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করেন। গোকুলে রক্তক, পত্রক, মধুকণ্ঠ, চন্দ্রহাস, পয়োদ বকুল, রসদ ও শরদ প্রভৃতি অনুগত দাস। ব্রজে সখা,—সুহৃৎ, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম-সখা এই চারি প্রকার সখ্যভেদ আছে। দেবপ্রস্থ,

বরুথপ, কুসুমপীড়, প্রভৃতি সখা। বলভদ্র ও মণ্ডলীভদ্র প্রভৃতি সুহৃৎ। শ্রীদাম, দাম, সুদাম, বসুদাম ও ভদ্রসেন প্রভৃতি প্রিয়সখা। শ্রীদাম বৃষভানু নন্দিনী শ্রীরাধার ভ্রাতা। ইহাদের কাছে কৃষ্ণের গোপনীয় কিছুই নাই।

যশোদার অঙ্গকান্তি নবঘনশ্যামবর্ত্ত, তাঁর বসন বহুরঙ্গে চিত্রিত;তিনি কৃষ্ণকে এক মুহূর্ত্ত না দেখলে কোটি প্রলয়সম মনে করতেন। শ্রীনন্দ মহারাজের অঙ্গকান্তি চন্দন শুভবর্ণ স্থুলকায় গুম্ফ স্মশ্রুযুক্ত;তাঁর নয়ন যুগল মধ্যে অনুপম বাৎসল্যরস অঙ্কিত। মধুর রসে সখী, নিত্যসখী, প্রিয়সখী ও পরম শ্রেষ্ঠ সখী পাঁচ প্রকার ভেদ আছে। বৃন্দা, ধনিষ্ঠা ও কুসুমিকা প্রভৃতি সখী। কস্তুরী, চম্পক মঞ্জরী, মণিমঞ্জরী ও কনকমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী। বাসন্তী ও শশীমুখী প্রভৃতি সখী। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দু, রঙ্গদেবী ও সুদেবী এই অষ্ট পরম শ্রেষ্ঠা সখী।

সান্দীপনি মুনির মাতা পৌর্ণমাসী দেবী। সান্দীপনি মুনির কন্যা নান্দীমুখী, পুত্র মধুমঙ্গল। শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী লীলাশক্তি তিনি ব্রজ নবদ্বন্দের মিলন বিধান করেন।

সে দিবস শ্রীল আচার্য্যদেব প্রসাদক্রমে বহু নিগূঢ় ভক্তিরসের কথা বলেছিলেন। ৪ঠা ভাদ্র তিনি সপার্ষদ চট্টগ্রামে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাটে শুভবিজয় করেন। শ্রীপাটের সেবক শ্রীযুত হরকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আচার্যদেবের মুখে বহু প্রাচীন তথ্য শ্রবণ করে বলেন—আমি গৌর-পার্ষদ বংশের কুলাঙ্গার, তাঁদের কিছুই জানি না এবং তাঁদের সেবাও করি না।

১৯৪০ সালে বাংলা ১৩৪৬—১৫ই ফাল্গুন গৌড়ীয় মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারী মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে অপ্রকট হন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁর জন্য বড় দুঃখ প্রকাশ

করেন এবং বলেন—শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু সত্যসার, মহাধীর, সারগ্রাহী ও মহাবীর পুরুষ ছিলেন। তিনি যথার্থ আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি বাহ্যতঃ সন্ন্যাসী না হলেও সন্ন্যাসিদের গুরু ছিলেন।

শ্রীমদ্ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর একটি নূতন জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি কৌপীন বহির্বাস ছাড়া অন্য বস্ত্র ত্যাগ করেন। পাদুকা ব্যবহার করতেন না। নগ্ন পায়ে চলতেন। ধাতু নির্মিত পাত্রে ভোজন করতেন না। ভূতলে শয়ন ও উপবেশন করতেন। একাদশীর দিন রাত্রি জাগরণ করতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহভৃত্য শ্রীঈশান ঠাকুরের আনুগত্যে ধামের বাগিচায় জল প্রদান করতেন এবং নিরাণী দ্বারা বাগিচায় তৃণাদি পরিষ্কার করতেন। অন্য লোক দিয়েও এ সেবা করাতেন।

বৈশাখমাসে গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজা, তুলসী সেবা, তুলসীতে ছায়াদান, জলধারা প্রদান করতেন। শ্রীহরিভক্তি বিলাসে বৈশাখমাসে যে সমস্ত কৃত্যাদি আছে তা সমস্তই স্বয়ং পালন করতেন—বৈশাখে শ্রীবিগ্রহাগারে সুগন্ধি পুষ্পাভিষেক, চন্দন প্রদান, সুশীতল পানীয় ও স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি ভোগর্পণ, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব অতিথি সেবা, নিত্য শ্রীধাম পরিক্রমা, সংকীর্ত্তন, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি। শ্রীহরিবাসর, গৌর-জয়ন্তী, নিত্যানন্দ জন্মব্রত উপবাস, অদ্বৈত আচার্য্যের ব্রত পালন ও শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত প্রভৃতি পালন প্রথা তিনি প্রবর্ত্তন করেন।

বাংলা ১৩৪৯ সাল থেকে ১৩৫২ পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ব্যাখ্যা করেন এবং গোস্বামিগণের বিচার ধারা অনুসরণ করেন। ১৯৫৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা দিবসে শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ পুরীধামে অপ্রকট হন। শ্রীল আচার্য্যদেব বাংলা ১৩৪২ সাল থেকে শ্রীশ্রীগোস্বামী গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। অনন্তর তিনি ১৯৫৪ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়ুলোমি মহারাজকে গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত

করে স্বয়ং নিষ্কিঞ্চনভাবে শ্রীবৃন্দাবন ধামে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি গোস্বামিদিগের আনুগত্যে অতি দীনভাবে ব্রজে বাস করতেন এবং ব্রজের তৃণ গুল্ম লতা, পশু পক্ষী প্রভৃতিকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রিয়জন জ্ঞানে নমস্কার ও দণ্ডবৎ করতেন। তিনি সতত গৌরকৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ে "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত গৌর গুণধাম"—এই নামকীর্ত্তন করতেন ও হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে রাধাকৃষ্ণকে আহ্বান করতেন। যে ধ্বনি ব্রজ ভূমির দিগদিগন্ত মুখরিত করে তুলত। ধ্বনির তালে তালে ময়ূর ময়ূরিগণ নৃত্য করত।

শ্রীল প্রভুপাদের কীর্ত্তন প্রচার যুগে প্রাথমিক দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে খুব আলোচনা হয়, অনন্তর মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভাগবত আদর্শ ধর্মের বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়াবাদ সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা হয় এবং সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় প্রবোধন কল্পে সাংখ্য জ্ঞানের বিচার বিশ্লেষণ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। শ্রীল আচার্যদেবের অভ্যুদয়ে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যার আলোকসম্পাতে ভক্তিরস বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হয়।

শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর যখন ব্রজধামে বাস করতেন তখন সঙ্গে শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ শিবদবাস্তব প্রভু ও শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাস প্রভৃতি ভক্তগণ থাকতেন। তিনি একদিন শ্রীরাধারমণ কুঞ্জ বাটীতে বসে হরিকথা প্রসঙ্গে বললেন—মহামন্ত্রের মধ্যে তিনটি মুখ্য নাম আছে—'হরি' 'কৃষ্ণ' ও 'রাম'। 'হরি'ই শ্রীগোবিন্দদেব, 'কৃষ্ণ'ই শ্রীমদন মোহন বা মদন গোপাল ও শ্রী'রাম'ই শ্রীগোপীনাথ (গোপীজনবল্লভ) বা শ্রীরাধারমণ। 'হরি'র সম্বোধনে হরে। হরা (শ্রীরাধার) এর সম্বোধনেও 'হরে'। 'হরে' 'হরে'— গোবিন্দ গোবিন্দ। 'হরে' 'হরে' 'রাধে' 'রাধে' 'হরে' 'হরে'— রাধাগোবিন্দ। শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হয়ে যখন মহামন্ত্র কীর্ত্তন করতেন, তখন পুনঃ পুনঃ শ্রীগোবিন্দদেবের মুখমণ্ডল মনে

পড়ত। সেইজন্য তিনি 'হরে' 'হরে' 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বলে সকাতরে আহ্বান করতেন। (বিশেষ দ্রষ্টব্য শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর গ্রন্থ)

অতঃপর শ্রীবৃন্দাবন ধামে ১৯৫৮ সালে ৮ই মার্চ শ্রীরাধারমণদেবের কুঞ্জ বাটীতে প্রাতঃকালে সমবেত ভক্তগণের কাছে তিনি বলতে লাগলেন অন্তর্মুখী হও। ভিতরে যাও। বাহিরে থাকলে চলবে না। স্বদেশে যেতে হবে। কর্ত্তৃত্বাভিমান ছাড়। হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। শরণাগত হও। শরণাগতি ভিন্ন বাঁচবার আর পথ নাই। শ্রীহরিই কর্ম করাচ্ছেন, নিজে কর্ত্তা সাজা বড় মূর্খতা।

শ্রীশ্যাম—শ্যামই শ্রীগৌর কিশোর

শ্যামকিশোরই বর্ত্তমান কলিতে "শ্রীগৌরকিশোর"—ইত্যাদি বলবার পর "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌর গুণধাম। গাও গাও অবিরাম, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌর গুণধাম।" এই নাম কীর্ত্তনটি সকলকে করতে বললেন, এবং অপরাহ্নকালে নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন।

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী দাস গোস্বামী ঠাকুর কী জয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

পূর্ব্ববঙ্গে নোয়াখালি জেলায় সন্দীপ হাতিয়া গ্রামে বাংলা ১২৮৩ সনে চৈত্র মাসে শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজের জন্ম হয়। পিতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু, মাতা শ্রীযুক্তা বিধুমুখী বসু। শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত বসু মহাশয় সরকারী চাকুরী করতেন। তিনি বাঘ্না পাড়া গোস্বামীদের শিষ্য ছিলেন, পরে শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁকে বাবাজী বেশ দেন এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী নাম প্রদান করেন। জীবনের শেষ সময়ে পুরী ধামে তিনি অবস্থান করেছিলেন। তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা বিধুমুখী বসুও শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্যা ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবস্থান করেছিলেন।

শৈশবে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নাম ছিল—শ্রীজগদীশ। তিনি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ, ডিগ্রি প্রাপ্ত হয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করতেন। তিনি সপত্নীক কলিকাতায় থাকতেন। জগদীশ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনন্ত বসু (ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর)।

বাংলা ১৩১৬ সালে ১১ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯১০ সালে ২৫শে মার্চ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব-দিনে জগদীশবাবু পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পতি মহাশয়ের সঙ্গে ধুবুলিয়া ষ্টেশন থেকে পদব্রজে শ্রীমায়াপুরে আগমন করেন এবং শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রথম দর্শন

লাভ করেন। তখন শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির সন্নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর সম্মুখে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ও টাকির জমিদার রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, মহাশয় প্রমুখ সজ্জন ব্যক্তিগণ বসে তাঁর মুখে হরিকথা শুনছিলেন।

অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল মহাশয় শ্রীযুত জগদীশ বাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীযুত জগদীশবাবু শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণ ধরে দণ্ডবৎ করে ক্রন্দন করতে করতে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বললেন—"আপনি শিক্ষিত সম্মানার্হ। সুতরাং আপনি যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন বহুলোক তাতে আকৃষ্ট হবে।"

ঐদিন অপরাহ্নকালে শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জগদীশ বাবুকে বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করান এবং বলেন—আপনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের আদেশ নিয়ে আগামী কল্য কুলিয়ার চড়ায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করুন। জগদীশবাবু প্রাতঃকালে কুলিয়ার চড়ায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শনে এলেন, ভূমিতে পড়ে দণ্ডবৎ করলেন এবং একটি তরমুজ ফল ভেট দিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বাইরের লোকের দেওয়া জিনিস প্রায় গ্রহণ করতেন না, কিন্তু কৃপা করে সেই তরমুজটী গ্রহণ করলেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—আপনাকে কে পাঠালেন?

জগদীশবাবু - - - - আমি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও সরস্বতী ঠাকুরের নির্দ্দেশে এসেছি।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ - - - -আপনি কীর্ত্তন জানেন?—একটি কীর্ত্তন করুন।

জগদীশবাবু শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর' গীতটী করলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন গুরুবৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হবেন, তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্ব্বদা নাম করবেন ও অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করবেন।



শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

জগদীশ বাবু - - -আমার এখনও গুরু পদাশ্রয় হয় নাই।

শ্রীলবাবাজী মহারাজ - - -মায়াপুরে ত শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শন

পেয়েছেন। মায়াপুর আত্মনিবেদনের স্থান। সেখানে সদ্‌গুরুর চরণে আত্মনিবেদন করেছেন আবার গুরু পদাশ্রয় হয় নাই বলছেন কেন? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। যান তাঁর কৃপা গ্রহণ করুন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের কথা শুনে জগদীশবাবু সেই দিনেই কুলিয়ায় মাথা মুণ্ডন করে গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক গোদ্রুমে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটীরে এলেন ও দ্বিপ্রহরে মন্ত্র দীক্ষা প্রাপ্ত হলেন। ঠাকুর মহাশয়ের সেবক শ্রীযুত কল্যাণ কল্পতরু দাস ব্রহ্মচারী ঠাকুরের ভোজন অবশেষ প্রসাদ জগদীশ বাবুকে দিলেন। তিনি অগ্রে শ্রীগুরুর অধরামৃত নিয়ে তারপর ভোজন করলেন। ঐ দিবসে বেলা দুইটার সময় শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শিক্ষাষ্টক ব্যাখ্যা করে সকলকে শুনান। অপরাহ্ন কালে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করেন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ব্যাখ্যা করেন।

কিছুদিন পরে কলিকাতা 'ভক্তিভবনে' শ্রীমদ্‌ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশে শ্রীজগদীশ বাবুকে, বসন্ত বাবুকে ও মন্মথ বাবুকে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সৎক্রিয়াসার দীপিকার বিধান অনুসারে পঞ্চরাত্র উপনয়ন সংস্কার প্রদান করেন এবং ব্রহ্মগায়ত্রী ও গৌরাঙ্গ গায়ত্রী প্রদান করেন।

জগদীশ বাবুর শাস্ত্র অনুশীলন ও সাধু গুরুর সেবা প্রভৃতি দেখে শ্রীমদ্‌ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁকে "ভক্তিপ্রদীপ" আখ্যা প্রদান করেন। তখন থেকে তিনি শ্রীজগদীশ ভক্তিপ্রদীপ নামে খ্যাত হন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিশাস্ত্রী এবং সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। জগদীশবাবু সে পরীক্ষা দিয়ে বিদ্যাবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য পদবী লাভ করেন। তিনি ছুটি পেলেই গোদ্রুম ধামে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট যেতেন এবং ছুটির দিনগুলি তথায় কাটাতেন। তথায় অপরাহ্ন কালে তিনি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করতেন স্বয়ং ঠাকুর

মহাশয় তার ব্যাখ্যা করতেন।

শ্রীগোদ্রুমে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কাছে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী ও কয়েকজন ভক্ত থাকতেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশে প্রাতঃকালে তাঁরা গোদ্রুম ধামে টহল দিতেন। তখন তাঁরা এই গানটা গাইতেন—"নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ।।"

ইংরাজী ১৯১৪ সালে ২৩শে জুন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকট হলেন। সে দিবস তথায় শ্রীজগদীশ বিদ্যাবিনোদ ভক্তিপ্রদীপ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সেই দিবস রাত্রে শ্রীল প্রভুপাদ কর্মজড় স্মার্ত্তবাদ খণ্ডন এবং শ্রীহরি ভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়া সার দীপিকায় সদাচার সম্বন্ধে বহু উপদেশ বাণী সকলকে শ্রবণ করান।

শ্রীজগদীশ বিদ্যাবিনোদ ভক্তি প্রদীপ মহাশয়ের পত্নী স্বধামে গমন করলে ইংরাজী ১৯২০ সালের কার্ত্তিক মাসে শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর তাঁকে ভাগবত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করেন। তখন থেকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ এই নামে অভিহিত হন। সন্ন্যাসের পরদিন তাঁকে প্রভুপাদ পূর্ববঙ্গে প্রচারে যাবার আদেশ করেন। তিনি কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তার পরের দিনই পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রা করেন।

তিনি যেমন ছিলেন বিদ্বান তেমনি ছিলেন রূপবান্—তিনি সুবক্তাও ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হত। তিনি কিছুদিন পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার করার পর কলিকাতায় ফিরে এলেন এবং বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম সন্ন্যাসী ছিলেন। প্রভুপাদ অতঃপর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁর চব্বিশ জন শিষ্যকে ত্রিদন্ডী সন্ন্যাস প্রদান পূর্ব্বক গৌরবাণী প্রচারের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ইংরাজী ১৯৩৩ সালের ১৮ই মার্চে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, মহোদয়কে ইউরোপে গৌর-বাণী প্রচার করবার জন্য বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন।

ইউরোপে শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ উৎসাহের সহিত কিছু বর্ষ গৌরবাণী প্রচার করেন। সেই সময় তিনি তথায় ইংরাজী ভাষায় শ্রীগৌরসুন্দরের জীবনী ও গীতার অনুবাদ করেন। এ ছাড়া আরও বহু প্রবন্ধাদি লেখেন।

বাংলা ১৩৪৩ সাল ইংরাজী ১৯৩৬ সন ৩১শে ডিসেম্বর ১৫ই পৌষ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন। সে সময় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে ছিলেন। তাঁকে এবং অন্যান্য শিষ্যগণকে তিনি কৃপা আশীর্ব্বাদ দিয়ে সকলকে পরম উৎসাহের সহিত শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করতে আদেশ দিয়ে অপ্রকট হন।

বাংলা ১৩৪৩, ইংরাজী ১৯৩৭, ২৬শে মার্চ শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠে শ্রীগৌরজয়ন্তী বাসরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামীর আচার্য্যাভিষেক কার্য্য আরম্ভ হলে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিপাদগণের তরফ থেকে অভিনন্দন অগ্রে জানিয়ে ছিলেন।

বাংলা ১৩৪৭, ইংরাজী ১৯৪১ সন ২৯শে ফাল্গুন শ্রীচৈতন্য মঠে প্রাতে গৌড়ীয় মিশনের (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের আইনানুযায়ী রেজিষ্ট্রীকৃত) সভ্যবৃন্দের সম্মিলিত প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশনের সভাপতি— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ হন।

সুদীর্ঘকাল গৌড়ীয় মিশনের প্রচার কার্য্য করবার পর শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ বাংলা ১৩৫০ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র ধামে আগমন করেন ও গুরুবর্গের নির্দ্দেশক্রমে তথায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ঐকান্তিক ভজন করতে থাকেন। তখন তাঁর বয়স আনুমানিক ৮২ বছর।

ইংরাজী ১৯৫৪ সন অগ্রহায়ণ মাস পূর্ণিমা তিথি শ্রীল মহারাজের তিরোধান দিন। শ্রীপুরুষোত্তম ধাম, পবিত্র মাস ও পবিত্র তিথি, সবের একাধারে সমাবেশ। সেদিন প্রাতঃকাল থেকেই শ্রীল মহারাজের এক অভিনব বাৎসল্য-ভাব সকলের প্রতি প্রকাশ পাচ্ছিল, সকলকে ডেকে কত স্নেহ করে ভগবদ্ ভজনের উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর দৈনন্দিন নিয়ম অনযায়ী প্রাতঃকালে শ্রীবিগ্রহ দর্শন, দণ্ডবৎ, স্তবাদি পাঠ করে নিজ ভজন গৃহে এসে বসলেন। প্রাতঃকালে কিছু দুধ মাত্র পান করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গল ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্বনিয়ম দশকম্ পাঠ করতে করতে কত রোদন, কত দৈন্যভাব প্রকাশ করলেন। তারপর শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধীয় স্তব (ব্রহ্মাস্তবাদি) ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে পড়তে লাগলেন। সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত পাঠ করলেন। সেবক শ্রীযুত অনাথনাথ দাস ব্রহ্মচারী দ্বিপ্রহর কালে স্নানাদির জল ঠিক করে মহারাজের শ্রীঅঙ্গে তৈলমর্দ্দন করে দিলেন, অনন্তর শ্রীল মহারাজ স্নান করলেন। সেবককে নূতন বস্ত্র বের করে দিতে বললেন, সেবক নূতন বস্ত্র শীঘ্রই বের করে দিলেন। মহারাজ পরিধান করে নূতন আসনে বসে দ্বাদশ অঙ্গে তিলকাদি ধারণ করলেন। নিত্য নিয়মিত জপ অন্তে শ্রীতুলসীতে জল প্রদান করে প্রদক্ষিণ করলেন ও তথা হতে শ্রীজগদীশের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। অতঃপর প্রসাদ সেবা করলেন। একটু বিশ্রাম কবার পর সেবককে ডাকলেন এবং নিত্য নিয়মিত শ্রীচৈতন্যভাগবত তাঁর সম্মুখে পড়তে আদেশ করলেন। পাঠ শ্রবণের জন্য তিনি এক নূতন আসনে বসলেন, হস্তে নামের জপ মালিকা ছিল। শ্রবণ করতে করতে মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে হা গৌরহরি, হা নিত্যানন্দ বলে

ডাকছেন। তখন শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগর সংকীর্ত্তনের কথা সেবক ব্রহ্মচারী সুস্বরে পাঠ করেন—

তথাহি—পাহিড়া রাগ

নাচে বিশ্বম্ভর জগত ঈশ্বর
ভাগীরথী তীরে তীরে।
যাঁর পদধূলি হই' কুতুহলী
সবে ধরিল শিরে।।
অপূর্ব্ব বিকার নয়নে সু-ধার
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া
বলে 'হরি হরি' বাণী।।
মদন সুন্দর গৌর কলেবর
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে মালা মনোহরে
যেন দেখি পাঁচ বাণ।।
চন্দন চর্চ্চিত শ্রীঅঙ্গ শোভিত
গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে থির নহে
আনন্দে শচীর বালা।।
কাম শরাসন, ভ্রুযুগ পত্তন
ভালে মলয়জ বিন্দু।
মুকুতা দশন শ্রীযুত বদন
প্রকৃতি করুণাসিন্ধু।।
ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত
কত করিব নিশ্চয়।

অশ্রু, কম্প, ঘর্ম, পুলক বৈবর্ণ্য
না জানি কতেক হয়।।
ত্রিভঙ্গ হইয়া কভু দাঁড়াইয়া
অঙ্গুলে মুরলী বায়।
জিনি মত্ত গজ চলই সহজ
দেখি নয়ন জুড়ায়।।
অতি মনোহর যজ্ঞ-সূত্র-বর
সদয় হৃদয়ে শোভে।
এ বুঝি অনন্ত হই গুণবন্ত
রহিলা পরশ লোভে।।
নিত্যানন্দ চাঁদ মাধব নন্দন
শোভা করে দুই পাশে।
যত প্রিয়গণ করয়ে কীর্ত্তন
সবা চা'হি চা'হি হাসে।।
যাঁহার কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ
শিব দিগম্বর ভোলা।
সে প্রভু বিহরে নগরে নগরে
করিয়া কীর্ত্তন খেলা।।

(চৈঃ ভাঃ ২৩।২৭১-২৮০)

এ পর্য্যন্ত শ্রবণ করে শ্রীল মহারাজ প্রেমভরে অজস্র অশ্রুপাত করতে করতে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—শ্রীগৌরসুন্দরের দুই পাশে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর কি অপূর্ব্ব শোভা পাচ্ছেন! এই বলে হাতের জপ মালিকাটি সামনে চৌকির উপর রেখে কর জোড়ে নতশিরে অতি করুণস্বরে হা গৌর! হা নিতাই! হা গদাধর! বলে তিনি যেন নিঃশব্দে বসে আছেন। কিছুক্ষণ পাঠের

পর তাঁর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে, পাঠক ব্রহ্মচারী মহারাজ! মহারাজ! বলে কয়েকবার ডাকলেন, তথাপি কোন সাড়া না পেয়ে মহারাজের শ্রীঅঙ্গে হাত দিয়ে দেখলেন তিনি আর এ জগতে নাই। যোগাসনে বসে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য মহাসংকীর্ত্তন রাস লীলায় চলে গেছেন।

শ্রীল মহারাজকে মর্ত্ত্যলোকে আর দেখতে না পেয়ে ভক্তগণ বিরহ বেদনাশ্রু জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করতে করতে রোদন করতে লাগলেন। সকলের শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অন্তর্ধানের কথা মনে হতে লাগল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে একটি মহারত্ন অন্তর্হিত হলেন।

এ মহাপুরুষের অপার কৃপা ও গুণের কথা কি বর্ণন করে সমাপ্ত করতে পারব? তথাপি মুকের ভাগ্য ও জিহ্বার উল্লাসে কিছু বলে যাই। এঁর স্নেহ ছিল সহস্র পিতৃ-মাতৃ স্নেহ সম। সেই স্নেহের আকর্ষণে আমার ন্যায় শিশু মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।

তিনি বলতেন প্রথমে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সেবা, সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ গ্রন্থ অনুশীলন ও কথা শ্রবণাদি করতে হবে। সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করতে হবে। "শুশ্রূষা"— সেবা করার ইচ্ছা, শ্রবণ করার ইচ্ছা যার আছে সেই শুশ্রূষু ব্যক্তি। তিনি হাতে ধরে সকলকে সেবা শিক্ষা দিতেন। আবার সৎগ্রন্থানুশীলন এবং ভাগবত ও গীতা অনুশীলনের দিকে সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন।

শ্রীল মহারাজ হরিকথা নোট করতে বলতেন, আর বলতেন যাদের স্মরণ শক্তি নাই তাদের হরিভজন হবে না। প্রাতঃকালে মাধুকরী ভিক্ষা করতে যেতাম, রাত্রে তাঁর মুখে যে সমস্ত কথা শুনতাম তা লোকের কাছে বলতাম। বিকালে গৌড়ীয় মঠের সারস্বত শ্রবণ সদনে শ্রীল মহারাজ ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস করতেন। জিজ্ঞাসা করতেন মাধুকরী করতে গিয়ে কার সঙ্গে কি কি কথা

বলেছ? রাত্রে আপনার থেকে যে সব কথা শুনেছি তাই বলেছি তা শুনে তিনি বড় খুশী হতেন, বলতেন হরিকথা ভাল করে নোট করে নিও। লোকের কাছে বলতে পারবে। নিজে শুনতে হবে। সেবা করতে হবে। অন্যকে শুনাতে হবে, সেবা করাতে হবে।

প্রায় সাত আট বছর কাল শ্রীল মহারাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। এক বার মহারাজকে বললাম মায়াপুরে টোলে ব্যাকরণ পড়ব কি? তিনি বললেন— সেবা কর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব কৃপায় তোমার সর্ব্বতত্ত্ব স্বয়ং স্ফুরিত হবে। সেবোন্মুখের স্বয়ং সর্ব্বতত্ত্ব স্ফুরিত হয়। আর আমি পড়বার কথা বললাম না। চিন্তা করলাম পড়তে ত আসি নাই; সেবা করবার জন্য এসেছি। পড়ে কি হবে? অন্য দিন মহারাজ বললেন যে সমস্ত কথা হচ্ছে তা ভাল ভাবে শুন। তাতে পড়ার কাজ হবে।

তখন শ্রীচৈতন্য মঠের নাট্যমন্দিরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিদিন ভক্তি সন্দর্ভ পাঠ করতেন। আমরা তা মনোযোগের সহিত শুনতাম। এ সব কথা ইংরাজী ১৯৪৬ সালের। শ্রীল তীর্থ মহারাজ কোন কোন দিন ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস করতেন। তখন সকলকে বক্তৃতা করা শিখাতেন। আমরাও বক্তৃতা করতে শিখতাম। পাঁচ মিনিট বলবার পর আর বলতে পারতাম না। মহারাজ বলতেন বলতে বলতে হবে। শ্রীল মহারাজ সেবা বিষয়ে কিংবা পাঠ বক্তৃতা বিষয়ে সকলকে খুব উৎসাহ দিতেন। তিনি অতিশয় সরল ছিলেন। কোন কোন দিন আমাদের বলতেন তোরা কুড়ে। "পূর্ব্বে রান্না অর্চ্চন করে শ্রীল প্রভুপাদের ভোজন করায়ে দৈনিক নদীয়া প্রকাশ বিক্রী করতে নবদ্বীপে যেতাম। বৈকালে এসে ঠাকুর জাগাতাম, রান্না করতাম, প্রবন্ধ লেখা প্রভৃতি সেবা করতাম। তখন মায়াপুরে পাকা মন্দির হয়নি। চৈতন্য মঠে, শ্রীবাস অঙ্গনে ও যোগপীঠে খড়ের ঘর ছিল। চাষী রেখে বাগ বাগচার কাজ ও জমি চাষ প্রভৃতি করাতাম। তাতে ধান

কলাই মটর যাহা হত তার দ্বারা সারা বৎসর প্রভুর সেবা চলত।"

শ্রীল মহারাজ পরম দয়ালু ছিলেন। সকলকে হরিভজন করাতে চাইতেন। যাঁরা পাঠ কীর্ত্তনে যোগদান করতে অবহেলা করতেন, তাদের তিনি বলতেন,—তুই আজ খেতে পাবি না। পাঠের সময় অনেক ব্রহ্মচারী ঘুমায় দেখে একদিন প্রসাদ পাওয়া স্থানে পাঠ করতে লাগলেন। সকলের সামনে প্রসাদের থালা। বললেন এখন দেখি কে ঘুমায়? যারা ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাসে ভাল বলতে পারতেন না তাদের দাঁড় করিয়ে শ্লোক মুখস্থ করাতেন। স্নেহ ভরে কাকে মারতেনও। মহারাজ ছিলেন শিক্ষা গুরু। তিনি বলতেন বিষ্ঠার জলে পূর্ণ কলসী গঙ্গায় ডুবালে কি হবে? যতটা বিষ্ঠার জল কম হবে ততটা গঙ্গা জল ঢুকবে। তোর যতটা হরিকথা কানে যাবে ও যতটা সেবা করবি, ততটা ভক্তি লাভ হবে। বিষয় বিষ্ঠা জলে হৃদয় কলসী ভরা থাকলে ভক্তি গঙ্গা জল তাতে ঢুকতে পারে না।

তিনি আরও বলতেন—সম্বন্ধ জ্ঞান না হলে ভক্তি হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর অভিমান ছাড়তে হবে। আমি শ্রীকৃষ্ণ দাসানুদাস এই অভিমান চব্বিশ ঘণ্টা মনে রাখতে হবে। এই অভিমান ভুললে মায়া এসে ধরবে। জীবের কৃষ্ণ সেবা করাই হল স্বধর্ম। পতিব্রতার স্বামী-সেবাই যেমন স্বধর্ম। যাঁরা কৃষ্ণ সেবা করে না তারা স্বধর্মত্যাগী বেশ্যা। সাধু, গুরু ও কৃষ্ণকে কান দিয়ে দেখ। অর্থাৎ শ্রৌত পথে শ্রবণ কর। চক্ষু দিয়ে দেখলে পাপ। আগে শ্রবণ, পরে দর্শন। যারা হরিকথা শুনে না তাদের দর্শন হয় না।

শ্রীল মহারাজ সেবকগণকে কখনও অমর্য্যাদা করতেন না। সকলকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করতেন। পত্র লিখলে পত্রের প্রারম্ভে "শ্রীশ্রীভাগবত চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বিকেয়ং" পত্রের শিরোনামায় লিখতেন "পরম ভাগবত"। ইংরাজী ১৯৪৮ সালের কার্ত্তিক মাসে আমি প্রথম "দশাবতার

বন্দনা" পদ্য লিখে তা ছাপিয়ে শ্রীল মহারাজের শ্রীকরকমলে অর্পণ করি। তিনি তা পেয়ে কত আনন্দ ভরে আমাকে কৃপাশীর্ব্বাদজনক এক পত্র দেন— " তোমার শ্রীশ্রীদশাবতার বন্দনা" বন্দনা-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া শিরে ধারণ করিলাম। বন্দনা রচনা নৈপুণ্যে শুদ্ধা সরস্বতী (ভক্তিসিদ্ধান্ত) যে তোমার কণ্ঠে উদিত হইয়া লেখাইয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কবে তোমার শ্রীমুখে এই শ্রীদশাবতার বন্দনা কীর্ত্তন-মুখে শুনিবার সৌভাগ্য পাইব। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থী, বৈষ্ণব দাসানুদাস—শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ।

শ্রীশ্রীল মহারাজের দয়া দাক্ষিণ্যের তুলনা হয় না। অধিক আর কি বলব? তাঁর সেই কৃপামৃতের বিন্দু গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা করি। জন্মে জন্মে যেন তাঁর আশীর্ব্বাদ বাণী শিরে ধারণ করে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ সেবা করতে পারি। ইহাই আমার একমাত্র বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ঠ সংস্থাপক স্বরূপ-রূপানুগবর-নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত প্রিয় অধস্তন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তি কেবল ঔডুলোমি মহারাজ।

শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে সমস্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণকে নিয়ে জগৎ ব্যাপী মহাপ্রভুর বাণী প্রচার অভিযান আরম্ভ করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔডুলোমি মহারাজ অন্যতম প্রচারক সন্ন্যাসী ছিলেন।

শ্রীল গুরু মহারাজ শৈশব কাল থেকে ধীর, স্থির, মৌনী ছিলেন। কবিত্ব ও সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন। আঠার বৎসর বয়সে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের থেকে শ্রীহরিনাম প্রাপ্ত হন। এ সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্যও গুরু মহারাজের ঘটেছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় অনেক কৃপাশীর্ব্বাদ করেন ও শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র অনুশীলন করতে অতি স্নেহভরে বলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ডিগ্রী পরীক্ষা স্বসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং কাশীতে কিছুদিন দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র গুহঠাকুরতা। মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা ভুবনমোহিনী। উভয়েই স্বধর্মনিষ্ঠ, নিত্য তুলসী ও ভগবদ্ সেবা পরায়ন ছিলেন। তাঁরা বরিশাল বানরী পাড়াতে বাস করতেন। শ্রীগুরু-মহারাজের আবির্ভাব ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ,

১৩০২ বাংলা সাল ২৪শে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাষ্টমীতে হয়। শিশু কালের নাম শ্রীপ্রমোদ বিহারী। কলেজের পড়া শেষ করবার পর কিছু দিন তিনি শিক্ষকতা করেন। এ সময় তিনি কিছুদিন মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশী আন্দোলনেও যোগদান করেছিলেন।



নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

অনন্তর সমস্ত কিছুরই ক্ষণ ভঙ্গুরতা উপলব্ধি করে তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীপাদ-পদ্মে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ মন্ত্র দীক্ষাদি সংস্কারের সময় তাঁকে শ্রীপতিত পাবন দাস ব্রহ্মচারী এ নাম প্রদান করেন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় তিনি মঠের যাবতীয় সেবা, শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চনাদি করতেন। অনন্তর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে শ্রীমথুরা ধামে ত্রিদন্ড সন্ন্যাস প্রদান করেন। সন্ন্যাসের নাম হল শ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔডুলোমি মহারাজ। তারপর তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতের সর্ব্বত্র গৌরবাণী প্রচার করতে লাগলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী গৌড়ীয় মঠ মিশনাদির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অপ্রকট লীলা করলেন। তাঁর অপ্রকটের পর গৌড়ীয় মঠ মিশনের আচার্য্য হলেন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ভার অর্পণ করেন শ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔডুলোমি মহারাজের উপর। সাত বর্ষ পর্য্যন্ত একাদিকক্রমে শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কেবল ধাম পরিক্রমার নেতৃত্ব করেছেন তা নয়, তিনি সমগ্র নবদ্বীপ মণ্ডলের ও শ্রীচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ রূপে সেবা করেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হলেন।

শুধু শ্রীধামের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তিনি ক্ষান্ত হন নি—ভক্তি গ্রন্থ প্রচারে, প্রণয়নে ও প্রকাশে তাঁর গভীর অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয়। তিনি শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন। এ সময় শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থের ব্যাখ্যা শুরু করেন। তিনি বিশেষ ভাবে তা শ্রবণে মনোনিয়োগ করেন।

কয়েক বছর ব্যাপী উর্জ্জব্রত কালে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জে বিপুলভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁর অমৃতময় বাণী শুনবার জন্য বহু দূর থেকে শ্রদ্ধালু জনগণ সমবেত হতেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে উর্জ্জব্রতকালে শারদীয়া পূর্ণিমা তিথিতে প্রেম যমুনার সুশীতল জলে শ্রীল গুরু মহারাজ (ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ) স্নান সমাপন করে শ্রীগুরুবর্গের অনুপ্রেরণায় পরমহংস বেশে ভূষিত হন।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে প্রয়াগে কুম্ভমেলা অবকাশে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরু মহারাজের নেতৃত্বে এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভা যাত্রা বাহির হয়েছিল। কয়েকদিন ব্যাপী মঠের নাট্য মন্দিরে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি সকলের চিত্তে বিমল আনন্দ প্রদান করেন।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম ধামে অপ্রকট হন। অনন্তর ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের সভাপতি আচার্য্যরূপে নির্ব্বাচিত হন।

এ সময় তদানীন্তন সেবাসচিব শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ পদত্যাগ করেন এবং পরমপূজ্য শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ সেবাসচিব পদ গ্রহণ করেন এবং শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাস ভক্তিসৌরভ অপর সেবাসচিব পদে অধিষ্ঠিত হন। শ্রীল গুরু-মহারাজ সভাপতি আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতের বিভিন্ন স্থানের মঠগুলি পরিদর্শন করেন এবং সেবকদের বিবিধ উপদেশ নির্দ্দেশ, নাম মন্ত্র-দীক্ষাদি প্রদান করেন।

তাঁর প্রেরণায় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চিরুলিয়া গ্রামে শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠে নূতন মন্দির, নাট্যমন্দির, সেবক খণ্ড ও ভজন কুটীর নির্ম্মিত হয়। শ্রীধাম বৃন্দাবনে কিশোরপূরায় অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের শ্রীমন্দির,

নাট্যমন্দির ও সেবক খণ্ডাদি নির্মিত হয়। তাঁর আনুগত্যে বর্ত্তমানে প্রতি বছর শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীনবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুম দ্বীপে নব মঠ স্থাপন করা হয়েছে এবং নাট্যমন্দির, সেবক খণ্ড, যাত্রী নিবাস প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে। প্রতি বছর সহস্র সহস্র যাত্রী সঙ্গে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা হচ্ছে।

শ্রীগুরু মহারাজের অনুপ্রেরণায় পাটনায় মন্দির, নাট্য মন্দির, সেবক খণ্ড প্রভৃতি প্রকটিত হয়। পুরী জেলার অন্তর্গত আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের নব মন্দির, নাট্য মন্দিরও নির্মাণ করা হয়।

লক্ষ্ণৌ শহরে নূতন মন্দির, নাট্য মন্দির, সেবক খণ্ড প্রভৃতি নির্মিত হয়। তিনি বিভিন্ন মঠসমূহে পরিভ্রমণ করে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের ভবনে, বড় বড় মণ্ডপাদিতে অনুষ্ঠিত ভাগবত সভায় শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। যাঁরা তাঁর প্রেমময় বাণী শুনেছেন তাঁরা মর্মে মর্মে তাঁর উদারতা ও মধরতা অনুভব করেছেন। আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। কিরূপে তাঁর মহান্ গুণ সাগরের পার পাব? তথাপি আত্ম পবিত্রতার জন্য যৎ সামান্য তাঁর গুণ গান করলাম।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ (আচার্য্যপাদ)

শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের কৃপামূর্ত্তি, করুণাশক্তি। নামরূপে শ্রীহরি যেমন কৃপা করছেন, তেমনি সাধু শাস্ত্র গুরুরূপে কৃপা করছেন। ভগবান নিত্যকাল সাধু গুরু ও শাস্ত্ররূপে কৃপা করছেন।

শ্রীহরি বলেছেন— বৈষ্ণব আমার প্রাণ, বৈষ্ণব হৃদয়ে আমি সতত বিশ্রাম করি। ভগবান ও ভক্ত অভেদাত্ম। ভগবানের আবির্ভাব তিথি যেমন পবিত্র তেমন বৈষ্ণব গুরুর আবির্ভাব তিথি পরম পবিত্র।

ভগবান শূকররূপে আবির্ভূত হলেও তাকে শূকর বলা অপরাধ, শ্রীহনুমান বানরকুলে আবির্ভুত বলে বানর মনে করাও অপরাধ। তেমনি সাধু গুরু যে কোন কুলে আসুন না কেন তাঁকে সেই কুল জাতি বুদ্ধি করা অপরাধ।

পূর্ব্ববঙ্গের খুলনা জেলার ডুমারিয়া থানান্তর্গত রুদাঘরা নামক গ্রামে এক কুলীন কায়স্থ জমিদার বংশে আচার্য্যপাদের জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীযুক্ত সীতানাথ হালদার, মাতার নাম শ্রীযুক্তা কুমুদিনী। জন্ম বাংলা ১৩০৩ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা দিবসে। পিতামাতা পরম ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, তাই ভগবান্ তাঁদের একটি অপূর্ব্ব পুত্র ধন অর্পণ করেছেন।

আচার্য্যপাদ শৈশব কাল হতেই পরম সাত্ত্বিক প্রকৃতির ছিলেন। মিথ্যা বলা, অন্যের সঙ্গে মিথ্যা কলহ করা, অকারণ গল্পগুজব করা, কোন প্রকার

নেশাদি করা, মৎস্য মাংসাদি ভোজন করা একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি চিরকাল সাত্ত্বিক ভোজী ছিলেন।

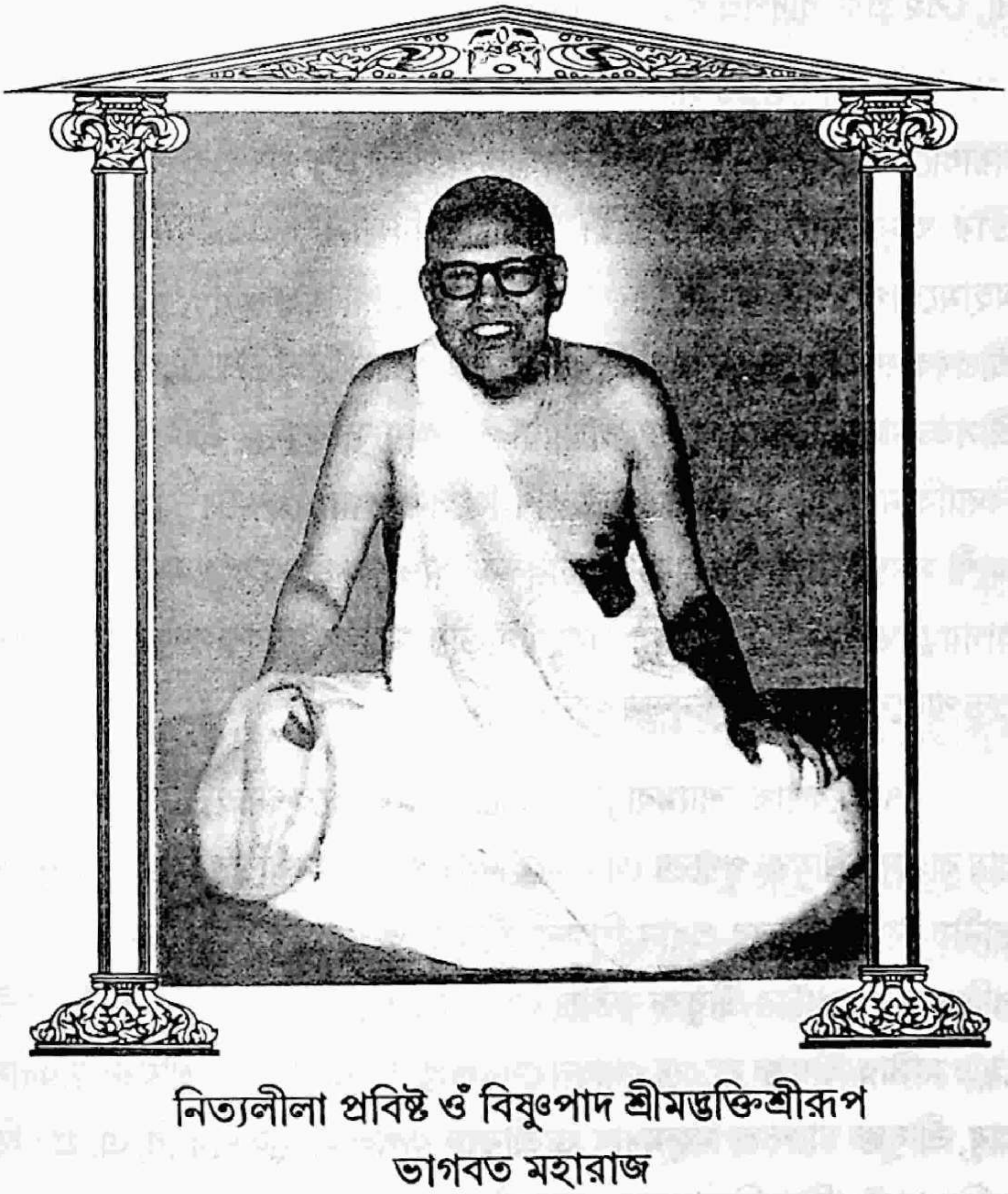
তিনি ছিলেন ধীর, গম্ভীর, বিনয়, নম্র, অমানী, পরোপকারী ও মৎসর আদি দোষ শূন্য।

তিনি শৈশবে ডুমারিয়া থানান্তর্গত পাঁজিয়া গ্রামের হাইস্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করেন, অনন্তর দৌলতপুর কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি সহস্তে রন্ধন করে ভোজন করতেন। গীতাশাস্ত্র ছিল তাঁর চির সঙ্গী।

রুদাঘরা গ্রামে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ২৭শে মার্চ (ইং ১৯৩৫ সনে) শুভ বিজয় করেন, এ বিষয়ে গৌড়ীয় ১৩ খণ্ডে ৩৫ সংখ্যায় লিখিত আছে "শ্রীল প্রভুপাদ রুদাঘরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শুভবিজয় করেন। রুদাঘরা নিবাসী ভক্তবৃন্দের পক্ষ হতে স্থানীয় ইউ পি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় আচার্য্যের শুভ বিজয় উপলক্ষ্যে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিবার পর প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস গভস্তনেমি, শ্রীমদ্ভক্তি ভূদেব শ্রৌতী ও শ্রীমদ্ভক্তি ভারতী মহারাজ যথাক্রমে "বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব ও সর্বপূজ্যত্ব বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ রাসবিহারী দাসাধিকারীর গৃহে এক রাত্র বাসপূর্ব্বক গৌড়ীয় মঠাভিমুখে যাত্রা করেন। তার শ্রীমুখ বিগলিত হরিকথামৃত পান করে গ্রামবাসীগণ পরম ধন্যাতি ধন্য হয়েছিলেন।

যখন প্রভুপাদ রুদাঘরা গ্রামে বিজয় করেন তখন আচার্য্যপাদ কোন কার্য্যান্তরে অন্যত্র গিয়েছিলেন। তথাপি শ্রীল প্রভুপাদ অলক্ষ্যে স্বীয় পদধূলি

তাঁর শিরে বর্ষণ করেছিলেন। তিনি যখন কয়েক দিবস পরে গ্রামে ফিরে এলেন, তখন তার এক ভাই বলেছিলেন, তুমি ছিলে না সাক্ষাৎ শ্রীশুকদেব গোস্বামী এসেছিলেন। এখানে তিনি অমৃত বর্ষণ করেছিলেন। এ দিন হতে আচার্য্যপাদ তাঁর দর্শন হল না বলে খুব বিষাদিত হয়ে খেদ করে বলেছিলেন



নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ
ভাগবত মহারাজ

এ অধমের ভাগ্যে দর্শন হল না। দর্শন উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

আচার্য্যপাদ কার্য্যোপলক্ষ্যে গয়াধামে কোন বিশেষ আত্মীয় গৃহে এলেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করে ব্যক্তিগত কিছু ছাত্রগণকে পড়াতে লাগলেন। তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণ ভজনের প্রবল ইচ্ছা জাগছে। গুরু পদাশ্রয় ছাড়া ভজন হয় না, সেই গুরু পাদপদ্ম কবে কৃপা করবেন সে দিনের প্রতীক্ষায় আছেন।

বাংলা ১৩৪২ সালে ৬ই বৈশাখ ইং ১৯শে এপ্রিল ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে গয়াধামে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শুভ বিজয় করেন। তাঁর অনুসন্ধানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তনেমি মহারাজ, মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহোপদেশক শ্রীপ্রণবানন্দ রত্ন বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কারু কোবিদ, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, ও গৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন। গয়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌছলে কাশী সনাতন গৌড়ীয় মঠের প্রচারক উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী রাগরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় গয়া গৌড়ীয় মঠের সেবকগণসহ স্টেশনে প্রভুপাদকে বিপুল অভিনন্দন জানান।

৭ই বৈশাখ "শ্যামবাবুর" কুটীরে এক অধিবেশন হয়। সভাপতি হন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহোদয়। সভায় সমুপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্থানীয় টাউন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অশ্রুরঞ্জন মিত্র, অমৃত বাজার পত্রিকার রিপোর্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র লাল দাস, গয়া জেলাস্কুলের অ্যাসিষ্টেন্ট হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, অ্যাজভোকেট শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত রূপলাল হালদার বি, এ, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই রূপলাল হালদার হলেন আমাদের বর্ত্তমান গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্যপাদ। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আজানুলম্বিত ভুজ সমন্বিত পরমোজ্জ্বল দীর্ঘ তনু দর্শন করে স্তম্ভিত হলেন এবং তাঁর শ্রীমুখে কয়েক ঘন্টাকাল শ্রীচরণের বারি ধারার ন্যায় অবিরাম কৃষ্ণ কথা কীর্ত্তন শ্রবণে পরম তৃপ্ত হলেন। তিনি জীবনে যা আকাঙ্খা করেছিলেন তা যেন পেয়ে গেলেন। সভা শেষ হলে প্রভুপাদ নিজ বাসস্থানে ফিরে এলেন। প্রভুপাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আচার্য্যপাদ ও আর কয়েকজন সজ্জন সেখানে এলেন, প্রভুপাদ উপস্থিত ব্যক্তিদিগের কাছে হরিকথা বলতে লাগলেন। প্রভুপাদ কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে সকরুণ দৃষ্টিতে আচার্য্যপাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে ছিলেন। কথার শেষে আচার্যপাদের একটু পরিচয় নিলেন এবং বললেন কাল আসবেন।

অতঃপর কয়েকদিন ধরে আচার্য্যপাদ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করলেন। প্রভুপাদের সঙ্গে সমস্ত ভক্তগণ এসেছিলেন তাঁরাও আচার্য্যপাদকে বহু হরিকথা বললেন।

প্রভুপাদ কয়েক দিন গয়া ধামে প্রচার করবার পর দিল্লী অভিমুখে চললেন।

আচার্য্যপাদ গৌড়ীয় মঠে ও গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের প্রতি খুব নিষ্ঠা যুক্ত হলেন। (গৌড়ীয় ১৩ খণ্ড ৩৭ সং)

শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ ১১ই নভেম্বর ইং ১৯৩৫ সনে গয়া ধামে শুভ বিজয় করলেন। এই সময় ১৩ই নভেম্বর শ্রীবিগ্রহ প্রকট মহামহোৎসব করলেন। এ দিবস শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে শ্রীআচার্য্যপাদের হরিনাম ও দীক্ষা হল। দীক্ষার নাম হল, শ্রীরূপবিলাস দাস ব্রহ্মচারী। পূর্ব্বে গয়ার মঠ চার্চ্চিল রোডে ছিল। ১৯৩৫ খৃঃ রমনা রোডে মঠ স্থানান্তরিত হল। প্রভুপাদ স্বয়ং গয়া গৌড়ীয় মঠের সেবাভার আচার্য্যপাদের হাতে দিয়ে যান।

ইং ১৯৩৫ ডিসেম্বর প্রয়াগ ধামে অর্ধকুম্ভযোগে শ্রীল প্রভুপাদ শুভবিজয় করেন। রামবাগ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বাহিরানা নামক স্থানে অবস্থান করতেন। ইং ১৯৩৬ সনে ৭ই জানুয়ারীতে শ্রীরূপ শিক্ষা প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করেন শ্রীল প্রভুপাদ। প্রভুপাদ ৯ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রয়াগে থাকেন। এ সময়ও শ্রীআচার্য্যপাদকে, প্রভুপাদ প্রয়াগ ধামে ডাকেন এবং বেশ কয়েকদিন হরিকথা শুনান।

ইং ১৯৩৬ সনে ১৩ই আগষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ যখন পুরুষোত্তম ব্রত পালনের জন্য মথুরা ধামে শুভবিজয় করেন, ড্যাম্পিয়ার পার্ক "শিবালয়" নামক ভবনে, তখন সেখানে প্রভুপাদ, আচার্য্যপাদকে ডেকে নিয়েছিলেন। ১৩ই আগষ্ট থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রভুপাদের শ্রীমুখে তিনি হরিকথা শ্রবণ করেন।

পুনঃ শ্রীল প্রভুপাদ ২৫শে অক্টোবর হ'তে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পুরীধামে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ও প্রভুপাদ আচার্য্যপাদকে ডেকে নিয়ে পুরীতে বসে অনেক কথা শুনিয়ে ছিলেন।

এ সময় হতে আচার্যপাদ খুব নিয়ম নিষ্ঠার সহিত শ্রীনাম ভজন ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করতে থাকেন।

৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৬ সনে প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথদেবের থেকে বিদায় নিয়ে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন।

ইংরাজী ১৯৩৬ সনে ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। অনন্তর ইং ১৯৩৭ সনে ২৬শে মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী বাসরে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীগণের এবং ব্রহ্মচারী গৃহস্থগণের সমর্থনে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী গৌড়ীয় মিশনের

আচার্য্যপদে নির্ব্বাচিত হলেন। তখন হতে শ্রীপুরী গোস্বামী আচার্য্যের কার্য্য করতে লাগলেন।

শ্রীআচার্য্যপাদ শ্রীল পুরী গোস্বামীর একান্ত অন্তরঙ্গজন ছিলেন। তাঁকে সর্ব্বক্ষণ কাছে রেখে ষট্ সন্দর্ভের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সকল এবং ভাগবত সিদ্ধান্ত সকল শুনাতেন। পরস্পর এরূপ আলোচনায় ভাবযুক্ত হতেন।

ইং ১৯৩৮ সনে মার্চ্চ মাসে, ফাল্গুন পূর্ণিমা দিবসে শ্রীগৌর জন্মোৎসব বাসরে গৌড়ীয় মিশনের তদানীন্তন আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অধ্যক্ষতায় বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সে সভার সভাপতি হন মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅতুলচন্দ্র দেব শর্ম্মা (ভক্তি সারঙ্গ) মহোদয়। তিনি আচার্য্যপাদকে শ্রীগৌর আশীর্ব্বাদ পত্র প্রদান করেন।

ব্রহ্মচারী বরেণ শ্রীরূপ বিলাস-সংজ্ঞিনে।
বি, এ, ইত্যুপনাম্নে চ বিদ্বদ্বরায় বাগ্মিনে।।
গুরুসেবৈক নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাশাবিবর্জিনে।
দুঃসংগত্যাগ-দক্ষায় বৈষ্ণব প্রীতি ভাগিনে।।
সৎসিদ্ধান্তেষ্বভিজ্ঞায় মাৎসর্য্য রহিতায় চ।
দাক্ষাদাঢ্যসমাসেন গয়াস্থ মঠরক্ষিনে।।
বিদ্যার্ণব ইতি খ্যাতি— 'রুপদেশক' সংজ্ঞয়া।
প্রদীয়তে সভাসদ্ভিধাম সেবাপ্রচারকৈঃ।।
গ্রহেষু বসু চন্দ্রাব্দে মায়াপুরে শুভোদয়ে।
ফাল্গুন পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।।

স্বাঃ— শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (ভক্তিসারঙ্গ)
সভাপতি

আচার্য্যপাদ কিছুদিন গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সভ্য পদে নির্ব্বাচিত হন। তদানীন্তন মিশনের সেক্রেটারী ছিলেন শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, তিনি ইংরাজী ১৯৫৪ সনে ৪ঠা সেপ্টেম্বরে অবসর গ্রহণ করেন। তখন সেক্রেটারী পদে ব্রতী হন শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ। সে সময় গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি বা আচার্য্য পদে কিছুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ। অনন্তর আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত হলেন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ।

সেকালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত বহু মঠ, মন্দিরাদি ভাড়া বাড়ীতে ছিল। শ্রীগুরু মহারাজের ইচ্ছানুসারে; সেক্রেটারী শ্রীআচার্য্যপাদ, জমি খরিদাদি পূর্ব্বক নবমন্দির প্রভৃতির নির্মাণ কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন। গয়া, কুরুক্ষেত্র, এলাহাবাদ, পাটনা, লক্ষ্ণৌ ও আসাম প্রভৃতি স্থানে সুরম্য মন্দির, নাট্য মন্দির ও ভক্তনিবাসাদি নির্মিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীল গুরুমহারাজের নির্দ্দেশমত, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, দিল্লী, বোম্বে ও পাঞ্জাবাদি প্রদেশস্থিত মঠসমূহ পরিদর্শন কার্য্যে রত থাকতেন। তিনি যেমন সরল তেমনি কঠোর। তাঁর শুদ্ধভক্তি আচার বিচারে সকলেই সম্ভ্রমের সহিত আনুগত্যে চলতেন।

আচার্য্যপাদ কখনও সত্যের বিরুদ্ধ অসিদ্ধান্ত কার্য্যের অনুমোদন করেন নি।

আচার পরায়ণ ব্যক্তি আচার্য্যপাদ বাচ্য। তিনি স্বতঃসিদ্ধ আচার্য্য, আচার্য্যপাদ ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে শ্রীগৌরজয়ন্তী বাসরে শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের নিকট থেকে ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নাম হল

শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ। তাঁর বিশেষ প্রচেষ্টায় আসাম প্রদেশে কাছাড় লালা শহরে শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হয়। উড়িষ্যা রেমুণাস্থিত শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠের মন্দির, নাট্যমন্দির, শ্রীগুরু মহারাজের ভজন কুটির নির্মিত হয়।

তিনি মিশনের উন্নতি সাধন কল্পে আপ্রাণ চেষ্টা পরায়ণ।

৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৮২ সন, শ্রীগোদ্রুম ধামে একাদশী তিথির নিশীথে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔডুলোমি মহারাজ অপ্রকট হন।

অতঃপর গৌড়ীয় মিশনের শিষ্য ও ভক্তগণের অনুরোধে শ্রীল আচার্য্যপাদ গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি ও আচার্য্যপাদ স্বীকার করেন। তিনি শ্রীগুরু মহারাজের সমাধি মন্দির ও শ্রীগুরু মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং গোদ্রুম ধামের বহু সেবায় ঔজ্জ্বল্য বিধান করেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ ধারায় তিনি বাস্তব জীবন যাপন করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের গৌরবাণী প্রচারে যে অদম্য উৎসাহ ছিল, তিনি তাঁর অনুসরণে শ্রান্তি ক্লান্তি বিরহিত হয়ে সর্ব্বত্রই গৌরবাণী প্রচার করেছেন। প্রতি বৎসর বহু ভক্ত সঙ্গে দিল্লী, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, এলাহাবাদ, গয়া, কাশী, পুরী, কটক, বৃন্দাবন, রেমুণা ও আসাম প্রভৃতি স্থানে গৌরবাণী প্রচার করেছেন।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পাঁচশত বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে, গৌরকথা প্রচার উপলক্ষ্যে শতাধিক ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের তীর্থসমূহ দর্শন করতে বহির্গত হন। ইং ১২।৪।৮৪ তারিখ হতে আরম্ভ হয়ে ইং ৮।৫।৮৪ তারিখে পরিক্রমা শেষ হয়।

ভ্রমণের প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহের নাম জিওড়নৃসিংহ ক্ষেত্র (ওয়ালটিয়ারে) পানানৃসিংহদেবের দর্শন (বিজওয়াড়ায়)।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও পার্থ সারথি দর্শন (মাদ্রাজ), শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ দর্শন (ত্রিবান্দ্রাম), কন্যাকুমারী দর্শন, মাদুরাই দর্শন, ইং ২১।৪।৮৪ রামেশ্বর দর্শন, শ্রীবৃহদেশ্বর শিব দর্শন (তাঞ্জোরে), সারঙ্গপাণি মহাবিষ্ণু ও আদি কুম্ভেশ্বর শিবদর্শন (কুম্ভকোনম), নটরাজ শিব দর্শন (চিদাম্বরম), পণ্ডিচেরীতে সমুদ্র ও অরবিন্দাশ্রম দর্শন, বেদ গিরীশ্বর শিব ও পক্ষীতীর্থ। তথা মহাবলি পুরম দর্শন, শিব কাঞ্চি ও বিষ্ণু কাঞ্চি দর্শন, তিরুপতি ব্যেঙ্কটেশ্বর দর্শন। ইংরাজী ৪।৫।৮৪ রাজ মাহেন্দ্রী ও গোদাবরী স্থান ও মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের মিলনস্থলী দর্শনের পর ইং ৮।৫।৮৪ তারিখে ভক্তবৃন্দসহ শ্রীল আচার্য্যপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বহু বর্ষ পূর্বে ভক্তগণসহ গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাঁচশত বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে বহু ভক্তগণ সঙ্গে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করেন।

গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হয় ইংরাজী ১২ এপ্রিল ১৯৮৪ এবং ইং ১৯শে এপ্রিল ১৯৮৪তে সমাপ্ত হয়।

গৌড়মণ্ডলের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের নাম—

সাগর দ্বীপ কপিল মুনির আশ্রম, আটিসারা, ছত্রভোগ শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত ৪৪৭ চৈতন্যাব্দে চৈতন্য পাদপীঠ। ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ শিব দর্শন। বরাহ নগর শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাঠ দর্শন। পানিহাটিতে গঙ্গার উপকূলে বটবৃক্ষ তলায় দধি চিড়া মহোৎসব স্থান দর্শন, শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীসমাধিপীঠ দর্শন। কুমার হট্ট (হালিশহর) শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের জন্মভিটা দর্শন। চাকদহ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাঠ দর্শন। স্বানন্দ-

সুখদকুঞ্জে গোদ্রুমধামে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি দর্শন। উলাগ্রাম (নদীয়া) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থলী নিম্ব বৃক্ষ দর্শন। অদ্বৈত ভবন, শ্রীবাস অঙ্গন ও শ্রীচৈতন্য মঠ দর্শন। বহরমপুর সৈয়াদাবাদ—শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য রামকৃষ্ণাচার্য্যের সেবিত শ্রীমোহন রায়, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বৈঠক ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য শ্রীহরি রামাচার্য্যের সেবিতশ্রীকৃষ্ণ রায় দর্শন। গাম্ভীলা (জিয়াগঞ্জ) শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ দর্শন। রামকেলি (গৌড়নগর) (মালদহ) শ্রীরূপ সনাতনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন দর্শন, কানাই নাটশালায় শ্রীকানাইয়ের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।

একচক্রাগ্রাম—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্ম ভিটা দর্শন। বক্রেশ্বর—শিব দর্শন। জয়দেব—শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাঠ দর্শন, শ্রীখণ্ড—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ দর্শন। যাজীগ্রাম—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীপাট দর্শন। মামগাছি—(বর্ধমান) শ্রীসারঙ্গ মুরারির গোপীনাথ ও শ্রীবাসুদেব দত্তের শ্রীরাধা মদন গোপাল দর্শন।

শ্রীল আচার্য্যপাদ উর্জ্জাব্রতকালে পূর্ব্ব গুর্ব্বানুগত্যে ভক্তগণ সহ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ইংরাজী ১৯৮৬ সন ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার হতে ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত করেন।

বৃন্দাবন পরিক্রমার পর ইং ২৭শে অক্টোবর ১৯৮৬ সন জয়পুর, পুষ্কর ও শ্রীনাথদ্বার প্রভৃতি দর্শন করে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠেফিরে আসেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাঁচ শত বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীগোদ্রুম ধামে বহু অর্থ ব্যয় করে শ্রীভক্তিকেবল গৌরাঙ্গ লীলামন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের এবং গুরুবর্গের বিশেষ প্রীতিপ্রদ কার্য্য সম্পাদন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চ শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব উপলক্ষ্যে শ্রীল আচার্য্যপাদের প্রয়াগ ধামে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপন একটি বিশেষ কীর্ত্তি। এতদ্ উপলক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার পর ইং ২২।৪।৮৬ তারিখ ভক্তগণসহ তিনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রয়াগস্থ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। ২৪।৪।৮৬ তারিখ নগর কীর্ত্তন সংযোগে শ্রীবেণীমাধবজীর মন্দির দর্শনান্তে শ্রীরূপ শিক্ষাস্থলীতে শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ স্থাপন করেন এবং ধূপ-দীপ-মাল্য ইত্যাদি প্রদানকরতঃ পাদপীঠে ভোগ নিবেদন করেন।

গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য দেশে গৌরবাণী তথা ভাগবত বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতে ইং ৮ই আগষ্ট ১৯৮৭ তারিখে কতিপয় প্রচারকসহ যাত্রা করিয়া লণ্ডনস্থিত শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। ইতঃপূর্বে মিশনের আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কাহাকেও পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচার করিতে দেখা যায় নাই। তৎ অঞ্চলে তিনি কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক আয়োজিত কয়েকটি শ্রীভাগবত ধর্মসভায় মনোমগ্ধকর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁর শ্রীহরিকথা শ্রবণে আকৃষ্ট হয়ে বিশিষ্ট তথাকার সম্ভ্রান্ত সজ্জন এবং হল্যাণ্ডবাসী তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীহরি ভজনে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীকাশী ধামে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ইং ১৯৩২ সালে ভাড়া বাড়ীতে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাবিনোদ জীউর বিগ্রহ সমূহের সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন। তৎপরে ইং ১৯৬৪ সালে তথায় জমি সংগ্রহ হইলেও কোন কারণবশতঃ মন্দির নির্ম্মাণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্ত্তীকালে শ্রীল আচার্য্যপাদের শুভেচ্ছায় ইং ১৯৮৭ সালে উক্ত জমিতে মন্দির ও সুরম্য নাট্যমন্দিরাদি নির্মিত হইলে তাঁর

শ্রীকরকমলে ইং ১৯৮৭ সালে ৩রা ডিসেম্বর শ্রীগীতা জয়ন্তীর দিন নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহত্রয়ের প্রবেশ উৎসব সুসম্পন্ন হয়।

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদ পরিব্রাজকরূপে আসমুদ্র হিমাচল শ্রীগৌরবাণী তথা শ্রীভাগবত বাণী যেমন প্রতিবৎসর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীসহ ভারতের বিভিন্ন শাখা মঠগুলিতে প্রচারে থাকেন, তদ্রূপ শাখা মঠগুলি ছাড়া অন্যান্য স্থানে যথা বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, নদীয়া, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও আগরতলার বিভিন্ন স্থানে বিপুল উৎসাহে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিতে থাকেন।

মোগলসরাইতে শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ স্থাপন একটি তাঁর বিশেষ কীর্ত্তি। মোগলসরাইতে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদের বিশেষ ইচ্ছায় নিজস্ব সংগৃহীত ভূ-খণ্ডে মঠ নির্মিত হয়। ইং ১৯৮৫ সাল ৯ই মে শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করেন। পরবর্ত্তীকালে তথায় সুরম্য মন্দির, নাট্যমন্দির ও সেবক খণ্ড নির্মিত হইয়া ২১শে এপ্রিল ১৮৮৮ সালে নব-নির্মিত শ্রীমন্দিরে বিগ্রহগণকে শ্রীল আচার্য্যপাদের করকমলে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বোম্বে শহরে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৯৩৪ সালে ভাড়া বাড়ীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন। দীর্ঘকালযাবৎ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মন্দিরোপযোগী নিজস্ব ভূখণ্ড সংগৃহীত না হওয়ায় তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ (বিনোদ বৈভবানন্দ) বহু অসুবিধার মধ্যে সেবিত হইতেছিল। শ্রীল প্রভুপাদের প্রেরণায় শ্রীল আচার্য্যপাদের শুভ ইচ্ছায় বোম্বে শহরে নতুন মন্দির স্থাপনের জন্য মহারাষ্ট্র গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ৪ঠা মে ১৯৮৯ তাং-এ সংগৃহীত হয় এবং উক্ত স্থানে তিনি শ্রীমন্দির নির্মাণার্থে ভিত্তি স্থাপন সংকীর্ত্তন সহকারে উৎসব করেন।

মেদিনীপুর জেলায় হলদিয়া বন্দরে প্রচার কেন্দ্র স্থাপনার্থে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদের শুভেচ্ছায় ভূখণ্ড সংগৃহীত হইলে তিনি ২৯।৩।৯১ তাং প্রচারকগণসহ তথায় শুভাগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বাসন্তরাস পূর্ণিমা দিবস মঠ নির্মাণকল্পে ভিত্তি স্থাপন করেন।

আসাম অঞ্চলে গুরু গৌরাঙ্গের বাণী প্রচারকল্পে করিমগঞ্জে মঠাদি নির্মাণের জন্য শ্রীল আচার্য্যপাদ অভিলাষ করিলে তত্রস্থ চরবাজারে মঠোপযোগী ভূখণ্ড সংগৃহীত হয় এবং ২১।১১।৯১ তাং তথায় শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যপাদের নাম অনুযায়ী উক্ত মঠের নাম করা হয় শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ।

বোম্বেতে বান্দ্রা অঞ্চলে নূতন মন্দির, নাট্যমন্দির সেবক খণ্ডাদি নির্মাণ কার্য্য দ্রুত চলিতে থাকে। শ্রীল আচার্য্যপাদের হৃদয়ের অন্তিম বাসনা যে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগণকে তথাকার নব-নির্মিত শ্রীমন্দিরে প্রবেশোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক বিগ্রহগণের সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধান করা। তিনি ১৯৯১-৯২ সালে কিছুকাল অসুস্থ লীলা অভিনয় করেন। তিনি তাঁর প্রাপ্ত প্রণামী অর্থ হইতে নির্মাণ কার্য্যের জন্য বোম্বে মঠে পাঠিয়ে দিয়ে মন্দির নির্মাণের কার্য্য যাতে দ্রুত গতিতে চলে সেভাবে নির্দেশ দিতেন। ১৯৯২ সালের ১০ই নভেম্বর শ্রীকৃষ্ণের রাস পূর্ণিমা তিথিতে আগষ্টক্রান্তি মার্গস্থিত ভাড়া বাড়ীতে সেবিত বিগ্রহগণ বান্দ্রাস্থিত নব-নির্মিত মন্দিরে তাঁর করকমলে প্রতিষ্ঠিত হন। এতদ্ উপলক্ষ্যে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা এবং ভাগবদ্ধর্ম সভার ও গুরু পূজার আয়োজন হয়। উৎসবান্তে তিনি কিছুদিন তথায় অবস্থানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১১।২।৯৩ তাং পর্য্যন্ত তথায় তাঁর শ্রীঅঙ্গ একপ্রকার সুস্থই ছিল।১২।২।৯৩ তাং প্রত্যূষে মিশনের সমস্ত শিষ্য-শিষ্যাবর্গকে শোকসমুদ্রে নিমজ্জিত রেখে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্ত লীলায় প্রবেশ করেন।

তাঁর দিব্য দেহকে বিমানযোগে কলিকাতায় আনয়ন পূর্ব্বক ১৪।২।৯৩ তাং বেলা ১টায় শ্রীগোদ্রুমে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে তাঁর ভজন কুটীরে সমাধিস্থ করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যপাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্য্যন্ত যেমন বিপুল উদ্যম উৎসাহের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক দিনের পর দিন হরিকথা, ভাগবত কথা কীর্তনে ব্রতী ছিলেন, অনুরূপে বৃহদ্ মৃদঙ্গের (শ্রীভাগবত প্রেসের) উন্নতি বিধানপূর্বক উক্ত মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা তাঁর প্রচেষ্টায় দ্বাদশ স্কন্ধ সমন্বিত শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থ সম্পূর্ণ, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, জৈবধর্ম, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব, শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ, গৌরপার্ষদচরিতাবলী, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এছাড়া তাঁর সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতাবলী সমূহ বাংলা ও হিন্দিতে ৪টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ও ইংরেজিতে Beacon Light of Transcendence নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

আচার্য্যপাদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুর্ব্বানুগত্যে অতিশয় প্রেমার্দ্র হৃদয়ে তুলসী সেবা, ভগবদ্ মন্দির পরিক্রমা, তুলসী মন্দির পরিক্রমা, শ্রীবিগ্রহ সেবা ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন সহ প্রেমারতি প্রভৃতি তাঁর জীবনের দৈনন্দিন আদর্শ। তিনি প্রতিদিন ভক্তগণসহ ইষ্টগোষ্ঠি এবং শিষ্যগণের ভক্তিসন্দর্ভ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গ্রন্থাদি স্বাধ্যায় করাতেন। শিষ্যগণের প্রতি করুণাবশ হয়ে নিত্য ভজন বিষয়ে শিক্ষাদান করা তাঁর জীবনের এক ব্রত ছিল। জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ কি জয়।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ

ভগবানের মঙ্গলময় অনেক অবতার। তার মধ্যে গুরু বৈষ্ণবগণও ভগবানের অবতার বিশেষ। ইঁহাদের কৃপাবতার বা ছন্নাবতার বলা হয়। শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ ভুরি ভুরি আছে।

"গুরু কৃষ্ণ রূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।।

* * *

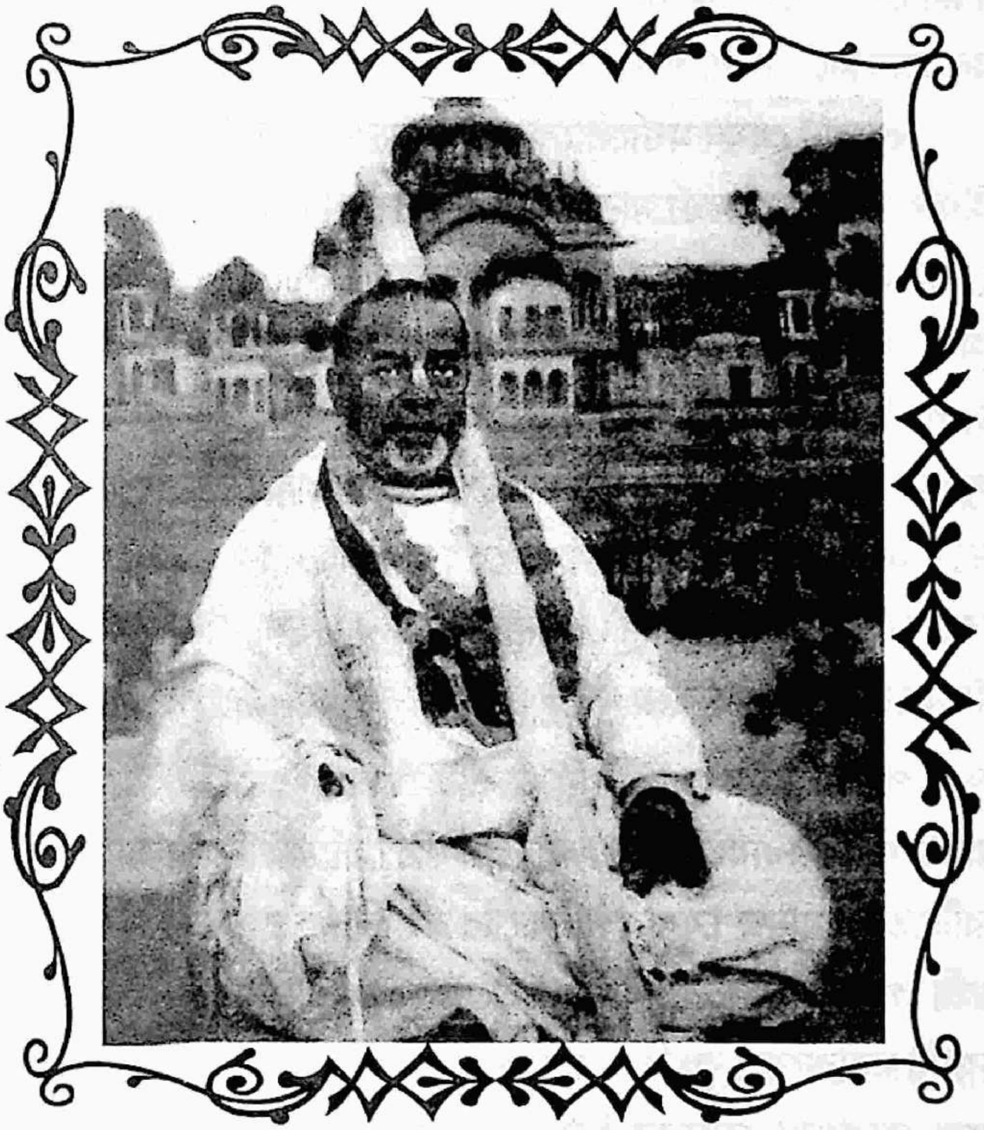
ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্ত-হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।।

* * *

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দঢ়।।"

তথাদি—আদি পুরাণ বচনঃ—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ-নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহং।
ভগবদ্ ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা।।



ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ

ভগবানের ভক্ত রূপটিই প্রচ্ছন্ন রূপ বলছেন,— সেব্য ভগবান এবং সেবক ভগবান। সেবক মানে ভক্ত, দুই ঈশ্বর হলেও সেব্য যখন সেবা শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা করেন তখন ভক্তরূপ ধরেন। ভক্তরূপটি ভগবানের প্রিয় স্বরূপ, ভগবান সেব্যরূপে সকলের সেবা পূজা গ্রহণ করেন। আর যখন সেবক রূপ ধরেন তখন নিজে সেবা ক'রে পুনঃ অন্যকে সেবা শিক্ষা দেন।

ভগবান যেমন মর্ত্ত্যলোকে মর্ত্ত্য মানবের ন্যায় লীলা বিলাস করেন। সেইরূপ ভক্তগণও মর্ত্ত্য মানবরূপে সেবা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ভগবানের এই ছন্নাবতার বা ভক্তাবতার যেকোন কুলেই হতে পারে, — যেমন পশুকুলে হনুমান, পক্ষীকুলে গরুড় ও যবনকুলে হরিদাস ঠাকুর। অতএব তাঁদের যদি পশু, পক্ষী, যবন বলা হয় তাহলে ভয়ানক অপরাধ হয়! ভক্ত যেকোন কুলেই আসুন না কেন, তিনি নিত্য, শুদ্ধ, চিন্ময় ও অপ্রাকৃত স্বরূপ, তাঁকে মর্ত্ত্য বুদ্ধিতে অসূয়া—মাৎসর্য্য হিংসা ও দ্বেষ করলেই নরক গতি হবে। অতএব ভক্তের মহিমা অনন্ত অপার। এমনকি ভক্তের মহিমা কীর্ত্তনের দ্বারা আত্মা নির্মল হয়ে ভক্তি লাভ হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় "খাগদা" গ্রাম। এই গ্রামটিতে বহু মধ্যবিত্ত পরিবার এবং বিশেষ ধনাঢ্য শিক্ষিত লোকের নিবাস আছে এবং এই নগরটিতে শ্যামানন্দ বৈষ্ণব পরিবারের বহু বৈষ্ণব বসতি করেন। নবদ্বীপে বাবাজী গোস্বামীদের তথা গৌড়ীয় মঠের প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বহু শিষ্য গ্রামটিতে বসবাস করেন। এই গ্রামে বহু সাধু বৈষ্ণব সেবাপ্রাণ লোকের নিবাস আছে। অধিকন্তু এই গ্রামে অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ, কৃষ্ণ লীলা যাত্রা প্রভৃতি প্রায় সময়ই হয়ে থাকে। এক কথায় গ্রামটি একটি ধর্মনগরী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ঐ নগরী হতে প্রায় দেড় মাইল দূরে চিরুলিয়ায় শ্রীভাগবত জনানন্দ

মঠ অবস্থিত। বাংলা গত ১৩৩২ সালে ১৯শে চৈত্র ইংরাজী ১৯২৬ সন ২রা এপ্রিল ভাগবত জনানন্দ প্রভুর (ভবানী চরণ পাহাড়ী মহাশয়ের) দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ উৎসবে জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠে শুভ বিজয় করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনুগামী ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিহৃদয় "বন" মহারাজ, শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, (শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী), গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয়, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ), শ্রীপাদ মহাজন দাসাধিকারী এম, এ, শ্রীপাদকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ প্রাণ দাসাধিকারী প্রভৃতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, তথাকার জমিদার শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন পাহাড়ী তথা শ্রীযুত রমণীকান্ত মাইতি তত্তদ্ স্থানীয় অন্যান্য গ্রামের সজ্জনগণসহ প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা জানান।

"খাগদা" গ্রামে পরম ভাগবত শ্রীপাদ আশ্রয়বিগ্রহ দাসাধিকারী (পঞ্চরাত্র ব্রাহ্মণ) নিবাস করতেন। তিনি একটি বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ছিলেন, তিনি পরম ধার্মিক নীতি-পরায়ণ প্রভাবশালী ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম হৈমবতী দেবী। তিনিও পরম ভক্তিমতী—অতিথি-বৈষ্ণব-সেবা পরায়ণা ছিলেন।

প্রতি বৎসর এই খাগদা গ্রামটিতে প্রভুপাদের প্রিয়জন— শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তীনেমী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি বিচার যাযাবর মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ প্রভৃতি মহাভাগবতগণের সমাগম হোত। সেইকালে শ্রীপাদ আশ্রয়বিগ্রহ দাসাধিকারী মহোদয় অতি যত্ন সহকারে তাঁদের ভোজনাদি সেবায় তৃপ্ত করতেন। দাসাধিকারী মহোদয়ের সঙ্গে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ

পুরী গোস্বামী মহারাজের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ স্বয়ং তাঁর গৃহে শুভ পদার্পণ করেছিলেন।

দাসাধিকারী মহোদয় এই সকল মহাভাগবতগণের সেবা তৃপ্তি দানে প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হ'ন। যেন সেই কৃপা আশীর্ব্বাদের ফলস্বরূপ তাঁর গৃহে "শ্রীল গোস্বামিপাদ" আবির্ভূত হ'ন।

শ্রীপাদ আশ্রয়বিগ্রহ দাসাধিকারী এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীহৈমবতী দেবী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজের শ্রীহরি নামাশ্রিত এবং দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন।

অতঃপরে ইংরাজী ১৯৪৭সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণত্রয়োদশী তিথি মঙ্গলবারে শ্রবণী নক্ষত্রে বৃশ্চিক লগ্নে মকর রাশিতে দেবগণে শুভক্ষণে বৈকালে হরিপ্রেষ্ঠ শ্রীল গোস্বামীপাদ জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে গৃহস্থিত বধূগণ আনন্দ ভরে শুভ উলুধ্বনিতে গৃহখানি মুখরিত করেছিলেন। শ্রীহৈমবতী দেবী ও দাসাধিকারী মহোদয় প্রথম পুত্রের মুখ দর্শনে অতিশয় হর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। পুত্র জন্মেরাশৌচান্তে দাসাধিকারী মহোদয় প্রথমে তাঁদের গ্রামের বৈষ্ণবী দেবী শ্রীবাসুলী দেবীর কাছে পূজা দেন এবং ভাগবত জনানন্দ মঠের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরাধা গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহগণের সেবার জন্য ও বৈষ্ণব সেবার উদ্দেশ্যে সিধা প্রদান করেন।

ছয় মাস পরে অন্নপ্রাশন হবে, দাসাধিকারী মহোদয় সামাজিক অনুষ্ঠান পরিহার করে ভাগবত জনানন্দ মঠেই এই উৎসবের আয়োজন করেন। শ্রীবিগ্রহগণের ভোগ, রাগ অন্তে শ্রীরাধাগোবিন্দের ও শ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ শ্রীপাদ পরমার্থী মহারাজ শিশুর মুখে প্রদান করেন। তখন জয় জয় ধ্বনি, শঙ্খ ধ্বনি ও নারীগণের উলুধ্বনিতে চতুর্দিক নিনাদিত হয়ে উঠল।

তারপর রুচি পরীক্ষায় শিশুটি যখন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের উপর কোমল করাঙ্গুলী স্থাপন করেন তখন সকলে করতালি ও জয় জয় ধ্বনি করে বলেছিলেন—এই শিশু কালে ভাগবত পণ্ডিত হবে। সেই সময়ই নামকরণ অনুষ্ঠানে নামরাখা হলো শ্রীকৃষ্ণপদ দাস।

তারপর চার বৎসর বয়সে ভাগবত জনানন্দ মঠে তাঁর হাতে খড়ি হয়। শ্রীপাদ জনার্দ্দন মহারাজ বালকের হাতে খড়ি দিলেন। তৎকালে বালকের বিদ্যাভ্যাসের একাগ্রতা দর্শনে সকলে বুঝতে পেরেছিলেন, —বালক ভবিষ্যতে বিদ্বান হবে। বাল্যাবস্থায় ভাগবত জনানন্দ মঠে বার বার আসতে চাইতেন এবং প্রসাদ পাবার জন্য বড় লালায়িত ছিলেন। পিতা-মাতার সঙ্গ ছাড়াও গ্রামবাসী বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে প্রসাদ পাবার জন্য মঠে চলে আসতেন। খেলা ধুলায় বিশেষ মন ছিল না কিন্তু পড়াশুনায় খুব মন লাগাতেন। পিতা-মাতাকে ভজন করতে দেখলে তিনি নিজেও বসে যেতেন স্থিরভাবে ভজন করতে।

শ্রীল গোস্বামিপাদ খাগদা গ্রামের প্রাইমারী স্কুল হতে পাশ করার পর কালিন্দী হাইস্কুলের ৮ম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষায় তিনটী বিষয়ে লেটার পেয়েছিলেন। তজ্জন্য এবং তাঁর মেধার ফলস্বরূপ সম্মান পুরঃসর হোষ্টেল খরচ মাপ ছিল এবং পরবর্ত্তী উচ্চ অধ্যয়ন সুযোগ লাভের জন্য প্রতি মাসে ৪৫ টাকা করে স্কলারশিপ্ পেতে থাকেন। তারপর কালান্তে কলিকাতা সূর্য্যসেন ষ্ট্রীটে অবস্থিত সি, টি, কলেজ হতে বি, কম, পাশ করেন। তিনি সেই সময় প্রাইভেট টিউসনি করে নিজের ব্যয় ভার গ্রহণ করতেন।

শ্রীল গোস্বামিপাদ দীন দুঃখীদের প্রতি বিশেষ যত্নবান ও অপ্রিয় সত্যবাদী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় গোস্বামিপাদ গ্রামের বিভিন্ন উন্নতিমূলক কার্য্যে যোগদান করতেন। একসময় বন্যায় পীড়িত গ্রামবাসীদিগের জন্য কলিকাতা হতে চাঁদা তুলে এনে সহায়তা করেছিলেন। তিনি খাগদা গ্রামে "খাগদা পল্লীশ্রী

হাইস্কুল" (পল্লীশ্রী) নাম দিয়ে একটি বিদ্যাপীঠ স্থাপনে সহায়তা করেন। অদ্যাপিও সেই স্কুল সম্মানের সহিত চলিতেছে।

ইংরেজী ১৯৬৯ সালে তিনি নবদ্বীপে গোদ্রুম ধামে আগমন করেন এবং শ্রী ল গুরু মহারাজের শ্রীমুখ হতে কয়েকদিন যাবৎ "শ্রীহরিকথা" শ্রবণ করে বড়ই উল্লসিত হন। অতঃপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট উৎসব বাসরে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন। ঠিক কয়েকমাস পরেই শ্রীগৌরজয়ন্তী বাসরে শ্রীগৌড়ীয় মঠেদীক্ষা প্রাপ্ত হ'ন। তখন তাঁর নাম হ'ল "কমলাক্ষ দাস ব্রহ্মচারী"। দীক্ষা লাভের পরেই তিনি বৈষ্ণব পিতা-মাতার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় সুদৃঢ় ব্রতী হইয়া মঠবাস করেন।

তিনি অনলস ভাবে মঠের বিভিন্ন সেবা কার্য্যাদি করতেন। এরপর হইতেই শ্রীল গুরু মহারাজের নির্দ্দেশ মত তিনি পুরী, কটক, এলাহাবাদ, বোম্বে ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে প্রাণ দিয়ে বিবিধ সেবা কার্য্য করেন। অতঃপর আলালনাথ ব্রহ্মগিরি গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক রূপে নিযুক্ত হ'ন। সেখানে পরম উৎসাহ সহকারে কিছুদিন সেবা কার্য্য করেছিলেন। তথা হতে তাঁকে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের সেবায় নিযুক্ত করা হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির সংস্কার হয়নি। তজ্জন্য শ্রীল আচার্য্যপাদ ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ খুব চিন্তিত ছিলেন। শ্রীপাদ কমলাক্ষ দাস প্রভু তৎকালে কলিকাতার কয়েকজন ধনাঢ্যজনের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা ভিক্ষা করে এনে ভাগবত মহারাজের হাতে দিলেন। আচার্য্যপাদ সেই টাকা দিয়ে গৌড়ীয় মঠের সংস্কার করেছিলেন। তিনি গুরুবৈষ্ণবগণের সেবার জন্য অনেক বড় বড় ধনী মানী লোকদের শ্রীহরিসেবায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। শ্রীগুরু মাহারাজ চার বৎসর কাল কাছে রেখে ভজনের অনেক লীলা রহস্য তাঁকে শ্রবণের সুযোগ প্রদান করেন।

১৯৮০ সনে পাশ্চাত্য দেশে লণ্ডন মঠের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্তা বিনোদবাণী দাসী অপ্রকট হইলে উক্ত মঠ বাড়ীটি ঐ দেশের সরকারের হাতে চলে যায়, তখন শ্রীকমলাক্ষ দাস ব্রহ্মচারীকে মিশনের সকল কাগজ-পত্র দিয়া লণ্ডন মঠে পাঠান হয়েছিল। তিনি সেই মঠের মঠরক্ষক হয়ে লণ্ডন বাসুদেব গৌড়ীয় মঠকে মিশনের অন্তবর্ত্তী অন্যতম শাখারূপে লণ্ডন হাইকোর্ট থেকে নির্ণয় করিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি প্রায় দশ বৎসর কাল তথাকার দায়িত্বে থেকে বহু সেবা সম্পাদন করেন। কিছুদিন পরে তিনি ভারতে ফিরে এলেন।

অতঃপর ১৯৮২ সালের ৬ই জানুয়ারী বুধবার রাত্রে শ্রীহরিবাসর তিথিতে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু মহারাজ গোদ্রুম ধামে নিজ ভজন কুটীরে নিকুঞ্জ লীলায় প্রবেশ করবার পর ১৯৮২ সালের ৯ই জানুয়ারী গোদ্রুম ধামে শ্রীল গুরু মহারাজের বিরহ সভায় গৌড়ীয় মঠের উপস্থিত শিষ্যবর্গ শ্রীল আচার্য্যপাদকে উপযুক্ত কর্ণধাররূপে মনোনীত করেন। তারপর ১৯৮২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজকে আচার্য্যরূপে বরণ করা হয়।

অতঃপর শ্রীল আচার্য্যপাদ ১৯৮৩ সালে শ্রীগৌরজয়ন্তী দিবসে কতিপয় বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণকে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করেন। তার মধ্যে শ্রীপাদ কমলাক্ষ দাস ব্রহ্মচারী ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ নাম প্রদান করেন। অনন্তর তাঁকে লণ্ডনে পাঠানো হয়। বোম্বে নূতন মন্দির নির্মাণ কালে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। তৎকালে শ্রীল আচার্য্যপাদ কিছু অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কাছে একখানি পত্র সহিত একজন সেবককে প্রেরণ করেন। ভগবৎ কৃপায় পরিব্রাজক মহারাজ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই লণ্ডন হইতে কয়েক লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া ঐ লোক মারফতে আচার্য্যপাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ সেই অর্থ দিয়া বোম্বে মঠের জন্য জমি ক্রয় করেছিলেন। তদ্‌পশ্চাৎ বোম্বে মঠ তৈরী

ও মন্দির নির্ম্মাণ কালেও শ্রীল গোস্বামিপাদ বহু অর্থ ভিক্ষা করে পাঠিয়েছিলেন। বোম্বেতে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ সেবায় ইঁহার অবদান অত্যধিক ছিল।

শ্রীল গোস্বামিপাদ গুরুবর্গের মনোভীষ্ট কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ তৎপর ছিলেন। একসময় তিনি শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজকে কতিপয় তদ্ শিষ্যসহ আহ্বান করে নিয়ে গেলেন লণ্ডন মঠে। শ্রীল আচার্যপাদ সেখানে কয়েকদিবস ব্যাপি শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করে তথাকার বহু সজ্জনকে মনাকৃষ্ট করেন।

শ্রীল আচার্য্যপাদ তাঁকে কাছে রেখে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তসমূহ বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ অপ্রকট হওয়ার পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্যপদ কে গ্রহণ করবেন? হয়ত তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ হবে। সেইজন্য তিনি স্বয়ং নিজ হস্তে এক পত্র লিখে গেলেন। যথাঃ— "আমার অপ্রকটের পর গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হবে—শ্রীভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ। (I do hereby nominate this day–Bhakti Suhrid Paribrajak Maharaj) dt. 23-07-1989.

শ্রীল আচার্য্যপাদ ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ বোম্বে নব-নির্ম্মিত গৌড়ীয় মঠের দ্বারোদঘাটন এবং মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ উৎসব উপলক্ষ্যে শুভাগমন করেন। ইং ১৯৯৩ সনের ১০ই নভেম্বর তারিখে মহাসমারোহে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ভারতবর্ষের প্রায় সকল গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষগণ আগমন করেন। উৎসব দিবসে বিপুল জনসমাগমে আচার্য্যপাদের নির্দ্দেশানুসারে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ ভাষণ দেন। তৎপশ্চাৎ শ্রীল গোস্বামিপাদ ইংরেজী ভাষায় এক মনোমুগ্ধকর ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যপাদ হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এই উৎসবের পর শীঘ্রই শ্রীল গোস্বামিপাদ লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ইং ১২।২।৯৩ তারিখ শনিবারে শ্রীল আচার্য্যপাদ অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করেন। তৎ শ্রবণে শ্রীল গোস্বামিপাদ শীঘ্রই অতিশয় বিরহ-ব্যাকুল হৃদয়ে ভারতে আগমন করেন এবং গোদ্রুম ধামে শ্রীল আচার্য্যপাদের সমাধি পীঠে দণ্ডবত প্রণাম করে আর্ত্ত ক্রন্দন করেন এবং তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করতে থাকেন। সমাধি পীঠে কয়েকদিন ধরে তাঁর গুণাবলী কীর্ত্তিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যপাদের হস্তলিপি অনুসারে ইং ১৯৯৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পূজ্যপাদ শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিং বডির আইন অনুসারে এবং যাবতীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অনুমোদনে আচার্য্য আসন স্বীকার করেন। সেইদিন থেকে তিনি "শ্রীল গোস্বামিপাদ" এই নামে সম্বোধিত হ'ন।

শ্রীভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ সর্ব্বাগ্রে সমস্ত গুরুবর্গের আলেখ্যকে প্রণাম ও দণ্ডবৎ করেন। অনন্তর সমবেত সকল বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে "গুরু আসন" স্বীকার করেন। তদানীন্তন সেক্রেটারী শ্রীপাদ গোস্বামী মহারাজ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাইয়া কণ্ঠে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন;মাল্য প্রদানের পর তিনি জয়ধবনি প্রদান করেন। "জয় বর্ত্তমান গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ কি জয়",— তৎকালে জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিকে সকলেই আনন্দ, উল্লাস ও জয়ধ্বনিতে মুখরিত করে তোলেন।

"কলিযুগে যুগধর্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা তাহা নহে প্রবর্ত্তন।।"

শ্রীল গোস্বামিপাদ আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হবার পর ৫।৬ জন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী সঙ্গে লয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে গৌর নাম প্রচার করতে বের

হ'ন। তথা হইতে আসাম অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখান থেকে উড়িষ্যার দিকে প্রচার করতে যান। উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার করবার পর তিনি বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মঠগুলিতে পরিভ্রমণ ক'রে বোম্বের দিকে যাত্রা করেন। কয়েকদিন যাবৎ বিপুলভাবে বোম্বে প্রদেশে প্রচার কার্য্য পরিচালনা করে পুনঃ লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন।

শ্রীল গোস্বামিপাদ "স্বরূপ রূপানুগ" ধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুদৃঢ় অচল অটল ভাবে শ্রীগুরু পাদপদ্ম ও শ্রীগোবিন্দ চরণ স্মরণ করে সরল প্রাণে গৌরবাণী প্রচারে রত আছেন। তাঁর গৌরবাণী প্রচার ফলে ভারত তথা পাশ্চাত্য দেশে বহু শ্রদ্ধালু সজ্জন আকৃষ্ট হয়ে হরিভজনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। জয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা গিরিধারী কি জয়! জয় শ্রীশ্রীল গোস্বামিপাদ কি জয়। জয় শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদবৃন্দ কি জয়।।

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ চরিতাবলী

শ্রীবলদেবের আবির্ভাব কথা

শ্রীশুক উবাচ—

একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে।
হতেষু ষট্‌সু বালেষু দেবক্যা উগ্রসেনিনা।।
সপ্তমো বৈষ্ণবং ধামযমনন্তং প্রচক্ষ্যতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোক বিবর্দ্ধনঃ।।

—(ভাগবত ১০।২।৪-৫)

অনুবাদ ঃ—শ্রীবসুদেবের পত্নী সকল ও স্বজন বর্গগণ কংসাসুরের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে কুরু পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্বা ও বিদর্ভ দেশাদিতে গমন করলেন। কিছু স্বজন কংসাসুরের মন যোগায়ে কংসাসুরের কাছে নিবাস করতে লাগলেন। এ দিকে দেবকী দেবীর গর্ভজাত ছয়টি পুত্রকে কংসাসুর এককালীন হত্যা করল। এরপর দেবকী দেবীর সপ্তম গর্ভ প্রকট হল, এই সপ্তম গর্ভে বৈষ্ণব ধাম স্বয়ং অনন্তদেব আবির্ভূত হলেন।

দেবকী দেবীর যখন সপ্তম গর্ভ প্রকট হল তখনই বসুদেবের দ্বিতীয় পত্নী রোহিণী দেবীর গর্ভও প্রকট হল। বসুদেব রোহিণীদেবীর গর্ভ দশা দেখে শীঘ্রই তাঁকে শ্রীনন্দ গোকুলে প্রেরণ করলেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে শ্রীভগবান যোগমায়াদেবীকে আহ্বান করে বলছেন — হে দেবী! হে ভদ্রে! শীঘ্র নন্দ গোকুলে গমন কর। সেখানে বসুদেবের দ্বিতীয়

পত্নী রোহিণী দেবী আছে " দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।" দেবকী দেবীর গর্ভে মদংশভূত বলদেব, যাঁর এক অংশ অনন্তদেব, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণকে শিরে ধারণ করেছেন এবং অনন্ত বদনে নিরন্তর কৃষ্ণগুণ গান করেছেন।

রোহিণী দেবীর নিত্য পুত্র শ্রীবলরাম হলেও ভগবদ্ ইচ্ছায় প্রথমে দেবকী গর্ভে প্রবেশ করলেন। কারণ বলরাম সর্বকাল শয্যা, আসন, ব্যজন, চামর, সখা, পাদুকা ও উপাধানাদি দশ দেহে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন। দেবকী দেবীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আসবেন তজ্জন্য কৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলরাম ঐ গর্ভকে শোধন, নিবাসযোগ্য আসন ও শয্যাদি রচনা পূর্বক পুনঃ যোগমায়া দ্বারা বাহিত হয়ে গোকুলে রোহিণী দেবীর গর্ভে প্রবেশ করলেন, গোকুল যাবার সময় রোহিণীর তিন মাসের গর্ভ ছিল। যোগমায়া সে গর্ভটি অপসারিত করে বলরামকে স্থাপন করলেন। রোহিণী দেবী এসব স্বপ্নের ন্যায় অনুভব করেছিলেন। — (ভাঃ ১০।২।৮)

এখন প্রশ্ন শ্রীদেবকীর শুদ্ধ সত্ত্বময় গর্ভে কি করে প্রাকৃত জড়ীয় ছয়টি গর্ভ (ছয় পুত্র) কংসাসুর যাদের হত্যা করল তারা প্রবিষ্ট হয়েছিল?

উত্তর— যেমন ভগবদ্ গর্ভে মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির সহিত সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবগণ প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। বাস্তবতঃ তাদের ভগবদ অঙ্গ সঙ্গ হয় না। গীতায় ভগবান বলেছেন—আমাতে সর্ব্বভূতগণ আছে, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নহি। অর্থাৎ আমি নিত্য বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। আমি ঐ জীবগণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখি না। সেইরূপ দেবকীর গর্ভে প্রাকৃত ছয়টি গর্ভ থাকলেও সাক্ষাৎ কোন স্পর্শ বা সম্বন্ধ হয় নি। ইহা ভগবানের যোগৈশ্বর্য্য বলে সব কিছু হয়েছে।

এস্থলে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত—ভক্ত জনের ভক্তি পরিপাটি প্রদর্শনার্থ ভগবানের এসব লীলা বুঝতে হবে। যেমন ভক্তের শ্রবণ কীর্ত্তন আদি ভক্তি লক্ষণ হৃদয়ে থাকলেও আনুসঙ্গিকরূপে ষড় বিষয় ভোগ অবস্থান করে। যখন ভক্তি সাধকের তা হতে ভয় হয় অর্থাৎ এ বিষয় সকল হায়! হায়! আমাকে সংসার অন্ধকূপে নিমজ্জিত করবে। এরূপ ভয় প্রকট হতে কালে ঐ বিষয় নিবৃত্তি হয়ে থাকে। তখন ভগবদ যশঃ শ্রবণ কীর্ত্তন পরিচর্য্যাদিময়ী ভক্তি রতি প্রবৃদ্ধ হ'তে থাকে। যতই রতি বাড়তে থাকে ততই ভাগবানের রূপ-গুণ-মহাসমুদ্র প্রাদুর্ভাব হতে থাকে। ভক্তের শুদ্ধ সত্ত্বে ভগবদ্ আবির্ভাব হন "ভক্তিঃ এব-এনং-দর্শয়তীতি শ্রুতিঃ"।

দেবকী মাতার গর্ভে যে ছয়টি পুত্র হয়েছিল, এরা পূর্বে মরীচি মুনির পুত্র ছিল। অভিশাপ কারণে মর্ত্তে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। কংসাসুর বধ করলে ইহারা দৈত্যরাজ বলির গৃহে গিয়ে অবস্থান করে। পরবর্ত্তিকালে দেবকী মাতা যখন রামকৃষ্ণের কাছে, তোমাদের পূর্বজ ছয়টি ভ্রাতাকে আমাকে দর্শন করাও এরূপ প্রার্থনা করেন তখন রামকৃষ্ণ দুইভাই তৎক্ষণাৎ সুতলে বলিরাজপুরে যান এবং তথা হ'তে ছয়টি ভাইকে নিয়ে মাতা দেবকী দেবীকে অর্পণ করেন। তারপর দেবকী মাতা স্নেহ ভরে সর্বকনিষ্ঠ কৃষ্ণকে স্তন্য দুগ্ধ পান করান। অনন্তর ঐ ছয় ভ্রাতা কৃষ্ণভুক্ত স্তন্য ক্ষীর পান মাত্রই দেবলোক প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মার মন থেকে মরীচি মুনির জন্ম। মরীচি থেকে ছয় পুত্র। মানুষের মনেই ছয়টি রিপু নিবাস করে অথবা ষড়বিধ বিষয় মনের কাছে থাকে। ষড় বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ মনেই ভোগ করে বলে এ পাঁচের সঙ্গে মন যোগ করলে ষড় বিষয় হয়।

দেবকীতে ভগবান আবির্ভাব হেতু দেবকী মাতা ভক্তাবতার। "ভয়াৎ

কংস" কংস নিরন্তর কৃষ্ণকে কালরূপে ভয় ভাবনা করত যখনই কৃষ্ণনাম শুনত তখনই ভয় হত। তজ্জন্য কংস ভয়াবতার।

অতঃ ভক্তি গর্ভগত ষড় বিষয় ধীরে ধীরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সংসার আসক্তি আদি ধীরে ধীরে চলে যায়। তদ্রূপ দেবকীর ষড় গর্ভ কাল-কংস এসে হত্যা করে যেন ষড় বিষয় নিবৃত্ত করল, সাধকের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করতে করতে অন্তর্গত ষড় বিষয় কালে চলে যায়। তখন শুদ্ধ ভক্তি গর্ভে ভগবদ্ যশঃ পরিচর্য্যাদিময়ী প্রেমভক্তির উদয় হয়। তথৈব দেবকীর ষড় গর্ভ নিবৃত্তিনন্তর সপ্তম গর্ভে ভগবদ্ যশ নিবাস শয্যা আসন আচ্ছাদনাদি রূপ, অনন্ত বৈষ্ণব ধাম সেবা মূর্ত্তি শ্রীবলদেব আবির্ভূত হলেন। সপ্তম গর্ভে ভগবদ যশ আদি, অষ্টম গর্ভে ভগবদ্ সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণাবির্ভাব।

দেবকী দেবীর সপ্তম গর্ভ প্রকট হলে, রোহিণী দেবীকে বসুদেব গুপ্তভাবে নন্দগোকুলে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যাকালে অশ্বারোহণে রোহিণীদেবী নন্দ ভবনে এলেন। রোহিণী দেবীর আগমনে শ্রীনন্দ মহারাজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত বড়ই আনন্দিত তথা যশোদার সহিত সমস্ত গোপীগণ পরম তুষ্ট হলেন। দুইজনের যশোদা ও রোহিণীর পরস্পরের প্রতি এত প্রণয় ভালবাসা যেন গঙ্গা ও যমুনা। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ তিন মাসের গর্ভাবস্থায় রোহিণী দেবী নন্দ গোকুলে আগমন করলেন। (গোঃ চম্পূঃ পূর্ব্ব চম্পূঃ ৬৭ শ্লোক)

অতঃপর মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া সহ শ্রীযশোদার গর্ভসিন্ধুতে প্রকট হলেন। এ সময় যোগমায়া দেবী রোহিণী দেবীর সাতমাসের গর্ভটিকে নষ্ট করে দেবকী দেবীর সাতমাসের গর্ভটি আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীতে স্থাপন করলেন। রোহিণীর গর্ভটি নষ্ট হয়েছিল যে সময়, সেই সময় রোহিণীদেবী ঘোরনিদ্রায় নিদ্রিত কেবল স্বপ্নের মত বোধ হল। রোহিণীদেবীতে ভগবান অনন্ত ধাম অবস্থিত হবার পর তাঁর অনেক সুমঙ্গল দর্শন হতে লাগল। শ্রীনন্দ ভবন যেন সর্ব্বক্ষণ আনন্দ উৎসবে পূর্ণ হল।

সমস্ত গোপগোপীগণের চিত্তে এক অব্যক্ত আনন্দ হিল্লোল প্রবাহিত হতে লাগলো।

"ততশ্চ লব্ধ-সর্ব্ব সময় সম্পদ্দৃশো চতুর্দশো মাসে শ্রাবণতঃ প্রাক শ্রবণর্ক্ষে সমস্ত সুখরোহিণী রোহিণী গুণ-গণয়া সুষমং সিতসুষমংসুতং সুসাব। সান্দ্র শুভ্রতাবিভ্রাজমানতয়া পৌর্ণমাসী চন্দ্রমসমিব।"

(গোঃ চঃ পূঃ —৩-৭৭)

তারপর সর্ব্ব মঙ্গল সূচক চৌদ্দমাসে শ্রাবণের পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রবণ নক্ষত্রযুক্ত সকল সুখ প্রাদুর্ভাবকারিণী শ্রীরোহিণী দেবী হতে নিবিড় শুভ্রতা-গুণেতে বিরাজিত পৌর্ণমাসী তিথিতে গোকুল মহাবনে শ্রীনন্দ ভবনে শ্রীবলরাম আবির্ভূত হলেন।

শিশুর কান্তি শুভ্রচন্দ্রের ন্যায় ধবলিম, ভুজযুগল আজানুবিলম্বি নয়ন যুগল প্রস্ফুটিত কমল দলের তুল্য ও উন্নত নাসিকা। মহাপুরুষের যাবতীয় চিহ্ন সমূহ সুন্দর শোভা পাচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ গগনমণ্ডলে দেব মুনিগণ মহা জয়জয় ধ্বনি ও দুন্দুভি ধ্বনি মুখরিত করছিল। আনন্দে দেববধূগণ পুষ্প বৃষ্টি করছিলেন। গোকুল আনন্দময় হল। সম্পদ সুখে গোপগোপীগণ পূর্ণ হলেন, তারপর জাত কর্মাদি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হল। শ্রীবাসুদেব এ সমস্ত কর্ম ব্রাহ্মণাদি প্রেরণ করে সম্পাদন করলেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলরাম তত্ত্বাদি এরূপ বর্ণনা করছেন—

সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম।।
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণ লীলার সহায়।।
সেই কৃষ্ণ-নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য।
সেই বলরাম-সঙ্গে নিত্যানন্দ।।

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি, করেন কৃষ্ণের সেবন।।
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায়।।
সৃষ্ট্যাদিক সেবা—তাঁর আজ্ঞার পালন।
'শেষ' রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ-সেবন।।
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই বলরাম-গৌর সঙ্গে নিত্যানন্দ।।

* * *

অংশের অংশ যেই 'কলা' তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম।।
তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন।।
যাঁহাকে ত' কলা কহি তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী তেঁহো সর্ব্ব জিষ্ণু।।
গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে 'পুরুষ' নাম।
সেই দুই যাঁর অংশ - বিষ্ণু বিশ্বধাম।।
যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের 'কলা' করি।
মৎস্য কূর্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী।।
(চৈতন্য চরিতামৃত আদি ৫ম পরিচ্ছেদ ৭৩-৭৮)

শ্রীবলরাম পঞ্চ রূপ ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায় করছেন। শ্রীবলরাম স্বয়ং মূলসঙ্কর্ষণ রূপে সর্বক্ষণ মথুরায় ও দ্বারকায় কৃষ্ণের সেবা করছেন, শেষ বা অনন্তদেব রূপে আর এক মূর্ত্তিতে নিরন্তর অনন্ত বদনে কৃষ্ণগুণ গান করছেন এবং ব্রহ্মাণ্ড সকলকে শিরে ধারণ করে আছেন।

তিন মূর্ত্তিতে পুরুষত্রয় রূপে বিশ্বের সৃজন পালন ও সংহারাদি করছেন। প্রথম পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু প্রকৃতির অন্তর্য্যামী পুরুষ। দ্বিতীয় গর্ভোদকশায়ী পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী, তৃতীয়-ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষ সমস্ত ভূতের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা পুরুষ। এ পুরুষত্রয় প্রকৃতি সহ বিলাস করেন। ইহারা হলেন পরমাত্মা পুরুষ, যোগীগণের ধ্যেয়, এ পরমাত্মা স্বরূপগণ ভগবানের ত্রিবিধ প্রকাশের মধ্য আংশিক প্রকাশ। যদি পুরুষত্রয়ের প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ "তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শগন্ধ।" মহাসঙ্কর্ষণই সমস্ত জীব শক্তির আশ্রয়।

"জীব নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ-সব জীবের আশ্রয়।।
(চৈঃ চঃ আদি ৫।৪৫)

শ্রীজীব গোস্বামী সন্দর্ভ গ্রন্থে তটস্থাখ্য জীব শক্তিকে পরমাত্মার বৈভব বলেছেন।

বলরাম যেমন সৃষ্টি কার্য্যে মহাপুরুষ-এর অবতার সম্পাদন করছেন, তেমনি আদি চতুর্ব্যূহ দ্বারকা ও মথুরায় মহা সঙ্কর্ষণ স্বরূপে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ। পরব্যোম বৈকুণ্ঠে ইনি সঙ্কর্ষণ রূপে শ্রীকৃষ্ণ লীলার সহায় করছেন। নিত্যগোকুল বৃন্দাবনে স্বয়ং বলরামরূপে গোপ বেশে শ্রীনন্দনন্দনের সেবা করছেন। তিনি যখন মথুরা ও দ্বারকায় তখন ক্ষত্রিয় বেশ।

অতঃপর বলরামের নাম করণের জন্য মথুরা হতে গর্গঋষি এলেন। শ্রীবসুদেব তাঁকে ব্রজে পাঠিয়েছেন। তিনি গুপ্তভাবে গোকুলে এসেছেন। শ্রীগর্গমুনি নামকরণ করতে লাগলেন এ বালকের এক নাম "রাম", সুহৃদ্‌গণকে এ সুখী করবে। আর এক নাম সঙ্কর্ষণ, গর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক জন্ম বলে। অন্য আর একটি নাম বলভদ্র—সর্বাধিক বলবান হবে বলে। (ভাঃ১০।৮।১২)

কৃষ্ণের বয়সের অধিক একবর্ষ বড় বলরাম। তিনি শিশুলীলা সহায় করতে লাগলেন। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ সন্নিধানে অবস্থান করেন এবং উভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গোকুল অঙ্গনে বিবিধ শৈশব লীলা করতে লাগলেন। উভয়ে সর্ব্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বিশিষ্ট হলেও অসর্ব্বজ্ঞ অজ্ঞানী শিশুর ন্যায় অঙ্গন মধ্যে শায়িত গাভী ও বৃষের সিং ধারণ করতেন। তাঁদের করকমল স্পর্শে, গাভীগণ অসাড়ে দুগ্ধ ধারা বর্ষণ করতেন। গাভীর স্খরিত দুগ্ধ ও গোমুত্র সঙ্গে অঙ্গনের ধূলী মিলিত হয়ে কর্দ্দম রূপ ধারণ করলে, রামকৃষ্ণ সেই ব্রজ কর্দ্দম সানন্দে স্বহস্তে অঙ্গে ধারণ করতেন। শুভ্রবর্ণ সেই ব্রজ কর্দ্দম যেন রাম কৃষ্ণের অঙ্গে অঙ্গরাগ সদৃশ শোভা পেত। মুগ্ধ শিশুর ন্যায় নিজের কটির কিঙ্কিনী শব্দে বিস্মিত হয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। গোপীগণকে স্ব মাতৃজ্ঞানে জড়িয়ে ধরতেন।

শ্রীরোহিণী দেবীর ও শ্রীযশোদা মাতার অসাধারণ মাতৃবৎসলতা হেতু নিরন্তর স্খরিত দুগ্ধধারে বক্ষের কাঁচলি সিক্ত হত। কর্দ্দম লিপ্ত অবস্থায় পুত্রদ্বয়কে, রোহিণী ও যশোদা কোলে নিয়ে অঞ্চলে মুখখানি মুছিয়ে স্তন্য পান করাতেন। বালকদ্বয়ের নবোদিত কুন্দ কুসুমের ন্যায় শুভ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত দর্শনে আনন্দে বিভোর হতেন। জননীদ্বয় যখন কার্য্যান্তরে থাকতেন তখন বালকদ্বয় অঙ্গনে শায়িত বৎসের পুচ্ছ ধরতেন। বৎসগুলি ভয়ে দ্রুত পলায়ন করত তখন তারা ক্রন্দন করতেন।

রাম ও কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে চলতে অঙ্গনে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নিজের প্রতিবিম্বে চকিত ও স্তম্ভিত হতেন। ক্রমে গৃহের ভিত্তি ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলে কখন কখন পদস্খলিত হয়ে ভূতলে পড়ে যেতেন, তখন বসে ক্রন্দন করতেন, আবার ভিত্তি ধরে চলতে ভিত্তিতে নিজ প্রতিবিম্ব দেখে সেই প্রতিবিম্বের মুখে মুখ দিয়ে চুম্বন করবার চেষ্টা করতেন। এরূপ মনোহর শৈশব লীলাতে সমস্ত স্বজনগণকে মুগ্ধ করেছিলেন।

বলরাম শ্রীকৃষ্ণের মাখন হরণলীলাতেও সহায় করেছেন। কৃষ্ণ উচ্চ শিকেতে হাত দিতে না পারলে বলরাম উচ্চ করে ধরতেন, তখন কৃষ্ণ অনায়াসে মাখন হরণ করতেন। বলরাম খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। কৃষ্ণকে মাখন হরণ বুদ্ধি শিখাতেন। গোপ-গোপীদিগের গৃহে গৃহে গোপশিশু সঙ্গে দুই ভাই মাখন হরণ লীলা করে ভ্রমণ করতেন।

যে দিবস মা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করেছিলেন, সে দিবস বলরাম স্বীয় জননী রোহিণী দেবীর সঙ্গে কোন গোপ গৃহে আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। অপরাহ্নে এসে যখন কৃষ্ণের বিষণ্ণ বদন দেখলেন, বলরাম বললেন ভাই কানু! তোর বদনখানি বিষণ্ণ দেখছি কেন? কৃষ্ণ বললেন দাদা! তুই ছিলিনা মা আজ আমাকে বেঁধেছিলেন। বলরাম বললেন আমি থাকলে তোকে কিছুতেই বন্ধন করতে দিতাম না।

পদকল্পতরুতে বৈষ্ণব দাস একটি সুন্দর পদকীর্ত্তনে রাম-কৃষ্ণের শৈশবলীলার বর্ণনা করেছেন—

নাচরে নাচরে মোর রাম দামোদর।
যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর।।
আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আর বার।
গলায় গাঁথিয়া দিব মণিময় হার।।
তা তা থৈয়া থৈয়া বলে নন্দরানী।
করে তালি দিয়া নাচে রাম যদুমণি।।
রাম কানু ওরে মোর ওরে রাম কানু।
মণিময় ঝুরি মাঝে ঝলমল তনু।।

শ্রীনন্দরাজ বংশ-বর্ণন

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ।।
শ্রীনন্দ বংশের কথা ভাগবত পুরাণে।
যেনমতে, সেই মতে করিব বর্ণনে।।
চন্দ্রবংশে জনমিল দেবমীঢ় রাজা।
স্বধর্ম আচরি তেঁহ পালিলেন প্রজা।।
ছিল তাঁর দুই পত্নী সাধ্বী শিরোমণি।
এক ক্ষত্র কন্যা অন্য বৈশ্যের নন্দিনী।।
পরম সুখেতে রাজা পত্নীসনে রয়।
নিত্য নানা যাগে তেঁহ শ্রীহরি পূজয়।।
শ্রীহরি কৃপায় দুই তনয় হইল।
পুত্র দরশনে রাজা বড় সুখী ভেল।।
ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে "শূর" জনমিল।
বৈশ্য রাজ কন্যা গর্ভে পর্জ্জণ্য হইল।।
দেবমীঢ় রাজাসন শূরেরে অর্পিল।
পর্জ্জণ্যেরে মাতামহ গোপরাজ নিল।।
বৈশ্যরাজ পর্জ্জণ্যেরে রাজ্য পদ দিয়া।
গোত্রান্তর করিলেন বৈশ্য বলিয়া।।

শূর রাজা "শূরসেন" নগর স্থাপিল।
মথুরা বলিয়া পরে তার খ্যাতি হইল।।
বসুদেব, দেবভাগ, আদি পুত্রগণ।
ইহা সবাকার শূর গৃহেতে জনম।।
শ্রীপর্জ্জণ্য নন্দীশ্বরে কৈল বাসস্থান।
"নন্দীশ্বর" মহিমার না হয় বর্ণন।।
যেইস্থানে লক্ষ্মী সদা করিছে বিহার।
যেই স্থানে সিদ্ধিগণ ফিরে সদা আর।।
যেস্থানে সুরভী কুল রয় নিরাকুলে।
যেস্থানে কুরঙ্গগণ দিবানিশি বুলে।।
যেস্থানে আনন্দে বৈসে গোপগোপীগণ।
যেস্থানের ধূলীকণা মাগে দেবগণ।।
এহেন নগরী মধ্যে পর্জ্জণ্য ভবন।
শোভা সম্পদধনের না হয় বর্ণন।।
পত্নী 'বরীয়সী' গোপী সাধ্বী শিরোমণি।
যাঁর পদধূলী নিল শ্রীহরি আপনি।।
গোপরাজ বহুদিন অপুত্রক ছিল।
পুত্রের লাগিয়া বহু যাগযজ্ঞ কৈল।।
একদিন শ্রীনারদ গোপপুরে এল।
বহু যত্নে গোপরাজ তাঁর পূজা কৈল।।
অন্তর্য্যামী মুনিবর অন্তর জানিয়া।
গোপরাজ প্রতি কয় হাসিয়া হাসিয়া।।
হরি আরাধনে শীঘ্র তনয় সুন্দর।
কতিপয় হইবেক চিন্তা পরিহর।।

হেন আশীর্ব্বাদ মুনি গোপরাজে দিয়া।
বীণা ধরি নাম গাহি চলে হর্ষ হৈয়া।।
কালে পাঁচ পুত্র জন্ম পর্জ্জণ্যের হৈল।
দুটী কন্যা রত্ন আর পরেতে জন্মিল।।
উপানন্দ অভিনন্দ আর নন্দ নাম।
সুনন্দ নন্দন পাঁচ পুত্র অভিধান।।
পাঁচ পুত্র হ'ল সব গুণের সাগর।
ধরাতে তুলনা দিতে নাহিক তাহার।।
তাঁর মধ্যে নন্দ নামে মধ্যম সন্তান।
সর্ব্বাধিক হন তিনি গুণের নিধান।।
যুবরাজ করিলেন পর্জ্জণ্য তাঁহার।
নন্দের গুণেতে তুষ্ট চিত্ত সবাকার।।
নন্দ যেন স্বয়ং হন আনন্দ মুরতি।
দর্শনে স্পর্শনে বিশ্ব আনন্দিত অতি।।
নন্দের বিবাহ লাগি পর্জ্জণ্য চিন্তয়।
মনে মনে সুপাত্রী সর্ব্বত্র খুঁজয়।।
সুমুখ নামক ছিল এক গোপরাজ।
অতীব রূপসী কন্যা হইল তাঁহার।।
গণকে গণিয়া নাম "যশোদা" রাখিল।
সাক্ষাৎ মুরুতি ধরি 'যশ' জনমিল।।
সুমুখে কহিল ডাকি সেই দ্বিজগণ।
এ কন্যা পালিহ তুমি করিয়া যতন।।
এ কন্যার সম নারী আর না হইবে।
মহা মহা সাধ্বীগণ এঁর পদধূলী নিবে।।

বিশ্বপতি আসিবেন ইহার গর্ভতে।
বিশ্বভার হরিবেন দেখিবা সাক্ষাতে।।
শুনহ সুমুখ এই নন্দিনী তোমার।
ইহার প্রসাদে যশ হইবে অপার।।
এ বোল বলিয়া দ্বিজ গৃহে চলি গেল।
দিন দিন কন্যা রত্ন বাড়িতে লাগিল।।
অল্পকালেতে তাঁর যৌবন উদয়।
দেখিয়া সুমুখ চিত্তে চিন্তে অতিশয়।।
বর অন্বেষণ করি করয় ভ্রমণ।
দৈববশে নন্দসনে হইল ঘটন।।
শুভকালে শুভলগ্নে নন্দ যশোদারে।
বিবাহ করিয়া তারে লইলেন ঘরে।।
নববধূ দেখি সব গোপ গোপীগণ।
আনন্দে দিলেন দান বহু রত্ন ধন।।
নিত্য সিদ্ধ এই দুই জনক জননী।
যুগে যুগে অবতরে শ্রীহরি আপনি।।
এই দুই প্রভাবেতে পর্জ্জণ্যের কুলে।
হইল অনন্ত সুখ গোপের মণ্ডলে।।
ধন ধান্য গোধনাদি প্রচুর হইল।
দুঁহা কার যশোরাশি পৃথিবী পুরিল।।
গুরু পুরী পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
হরিজন সমাপিল বংশের বর্ণন।।

শ্রীনন্দ নন্দন আবির্ভাব কথা

শ্রীকৃষ্ণ-জনম কথা শুন সাধুজন।
গোপাল চম্পুর মতে করিব বর্ণন।।
স্নিগ্ধকণ্ঠ মধুকণ্ঠ নামে কবিদ্বয়।
নন্দরাজ দরবারে নিতি গীত গায়।।
নারদের শিষ্য সুত-পুত্র কবি বড়।
ভক্তি-প্রেম বুঝাইতে হয় বড় দড়।।
একদিন সভামধ্যে গীত আরম্ভিল।
নন্দরাজ যেন মতে তনয় পাইল।।
বহু যাগযজ্ঞ নন্দ পুত্র লাগি করে।
তবু পুত্র নাহি হল আপনার ঘরে।।
সব ব্রজবাসী আর বন্ধুজন যত।
নন্দের সন্তান লাগি ব্রত কৈল কত।।
তবু যদি যশোদার পুত্র নাহি হল।
দুঃখ শোকে যশোমতী ভোজন ছাড়িল।।
অধো মুখে ধরাতলে বসি' নন্দরানী।
নিরবধি অশ্রু ফেলি' কাঁদয় আপনি।।
দেখি গোপরাজ বড় দুঃখ পায় মনে।
প্রবোধ করায়ে নন্দ বিবিধ বচনে।।
বিধাতার ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে।
যে পুত্র মাগিয়ে আমি যজ্ঞে না ফলিবে।।

তবে যশোমতী বলে শুন প্রাণেশ্বর।
আমার হৃদয় কথা কহিব তোমার।।
সব-ব্রত-যাগ-যজ্ঞ আমি সমাপিলুঁ।
দ্বাদশী পরমব্রত নাহি আচরিলু।।
এহেন বচন নন্দ করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে উৎফুল্লা হই কহিল তখন।।
ওহে প্রিয়ে ভাল কথা শুনাইলে তুমি।
সত্য সত্য এই ব্রত নাহি কৈলু আমি।।
তুমি সুধা মুখী সাধ্বী কহিলে মধুর।
পুরিবে অবশ্য বাঞ্ছা দুঃখ হবে দূর।।
তবে নিজ পুরোহিতে ডাকিয়া আনিল।
দ্বাদশী ব্রতের বিধি বুঝিয়া লইল।।
স্নিগ্ধকণ্ঠ বলে ভাই পরে কিবা হল।
এই দরবারে সব কথা খুলে বল।।
মধুকণ্ঠ বললেন—নন্দ যশোমতী ব্রত বৎসরেক কৈল।
ব্রত শেষে একবড় সুস্বপ্ন হইল।।
স্বয়ং (শ্রী) হরি যেন বলে প্রসন্ন হইয়া।
অচিরে ফলিবে আশা শুন মন দিয়া।।
প্রতি কল্পে হই আমি তোমার সন্তান।
এ কল্প সেমত হব সত্য বলি জান।।
তোমাদের গৃহে শিশুরূপে করিব বিহার।
নিতি দরশনে আশা পুরিবে তোমার।।
এহেন মধুর স্বপ্ন দেখে-নন্দ রায়।
অকস্মাৎ নিদ্রা ভঙ্গে বড় দুঃখ পায়।।
প্রভাত হইল দেখে ডাকে পক্ষিগণ।
রাণীসহ যমুনাতে যাইতে মনন।।

নন্দ যশোমতী তবে যমুনা আইলা।
দান দিতে বহুধন সঙ্গে করি নিলা।।
দেব-মুনিগণ সব এসব জানিয়া।
ভিক্ষুকের বেশে সবে বসিলা আসিয়া।।
যথাবিধি স্নান করি রাণীর সহিতে।
দান দিতে আরম্ভিল আপন হাতেতে।।
পাইয়া নন্দের দান সবে পূর্ণ হৈল।
নন্দ যশোদার জয় উচ্চ করি বৈল।।
গৃহেতে আসিয়া নন্দ শ্রীবিষ্ণু পূজিল।
নিত্য কর্ম বিধি যত সব সমাপিল।।
অতি শীঘ্র দরবারে দোঁহে প্রবেশিল।
গুরু দ্বিজ পূজ্য জনে বন্দনা করিল।।
হাসি বলে স্নিগ্ধকণ্ঠ পরে কিবা হল।
মধু কণ্ঠ তবে কথা আরম্ভ করিল।।
রাজ দরবারে নন্দ যখন বসিল।
দ্বারী কহে রাজ দ্বারে তাপসী আইল।।
সঙ্গে ব্রহ্মচারী হয় সুন্দর দর্শন।
ব্রহ্মচারিণী সঙ্গে অতি মনোরম।।
দ্বারীর বচনে নন্দ গাত্রোত্থান কৈল।
স্বাগত করিয়া শীঘ্র তাপসী লইল।।
তিনজন দীব্যাসনে বিরাজ হইলা।
পাদধৌত আদি করি মহাপূজা কৈলা।।
যশোদা যোগিনী পদে কাঁদিয়া পড়িল।
যোগিনী আপন কোলে যশোদারে নিল।।
দুঃখ নাহি কর রাণী দুঃখ পরিহর।
ভবিষ্যতে হইবেক সন্তান সুন্দর।।

শিরে হাত দিয়া করে শুভ আশীর্বাদ।
শুনি গোপগোপী করে জয় জয় নাদ।।
উপানন্দ হাসি বলে এ গোকুল বন।
মহাতীর্থ রূপে তবে হইবে গণন।।
নন্দের ভবিষ্যবাণী শুনি সর্বজনে।
যোগিনীর পাদদ্বন্দ্ব বন্দে জনে জনে।।
শীঘ্র তবে করি দিল কুটির নির্মাণ।
তাহাতে যোগিনী দেবী কৈল অবস্থান।।
এদিনে সবার মনে হইল সুখোদয়।
অবশ্য নন্দের হবে সন্তান উদয়।।
স্নিগ্ধকণ্ঠ বলে ভাই পাছে কিবা হল।
যশোদার গর্ভে কৃষ্ণ কেমতে আইল।।
মধুকণ্ঠ মনে মনে করিল বিচার।
সব গোপ্য কথা আজি করিব বিস্তার।।
তবে নন্দ যশোমতী বৎসরেক ধরি।
দ্বাদশী পালন কৈল অতি যত্ন করি।।
তবে মাঘী কৃষ্ণ প্রতিপদের রাত্রেতে।
এক শুভ স্বপ্ন নন্দ দেখে আচম্বিতে।।
নীলবর্ণ এক শিশু গগনে বেড়ায়।
স্বর্ণবর্ণ কন্যা এক তারে ঘেরি রয়।।
কিছুক্ষণ পরে দোঁহে নন্দ হৃদি মাঝে।
পরম সুখেতে তঁহি আনন্দে বিরাজে।
নন্দ হৃদি হতে পুনঃ যশোদা গর্ভতে।
স্থিরভাবে বিরাজিত দেখে গোপপতে।।
সেই হতে যশোদার গর্ভের প্রকাশ।
দেখি গোপগোপী মনে বাড়িল উল্লাস।।

সব গোপগোপী করে আনন্দ উতরোল।
নিত্য মহা মহোৎসব আনন্দ মঙ্গল।।
বহু দান ব্রাহ্মণেরে দেয় গোপরাজ।
নিত্য দরশনে এল দেবীর সমাজ।।
নিশি দিন নন্দগৃহে কেবা আসে যায়।
তাহার নির্ণয় কেহ করিতে নারয়।।
ক্রমে ক্রমে বাড়ি গর্ভ আট মাস হৈল।
এ মাসে সন্তান হবে জ্যোতিষী কহিল।।
ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী দিন সমাগত হল।
আজি শিশু হবে বলি ধাত্রী সব কৈল।।
শীঘ্র সুতী গৃহ এক নির্মাণ করিল।
পুষ্প মাল্য আদি দেই শয্যাদি রচিল।।
ফুলের তোরণ কৈল সব ফুল সাজে।
উত্তম উত্তম ধাত্রী তাহাতে বিরাজে।।
এথা দেবগণ সব আনন্দে মাতিয়া।
মৃদু মন্দ বারিবর্ষে হরষিত হইয়া।।
সে দিবস কিবা সুখ গোকুলে হইল।
সুখের সমুদ্রে যেন সকলে ডুবিল।।
কিছু নিশি সব গোপী জাগিয়া রহিল।
কৃষ্ণের মায়ায় পরে নিদ্রাগত হল।।
হেন কালে বড় সুখে যশোদাসুন্দরী।
প্রসবিল পুত্র রত্ন কেহ নাহি হেরি।।
সেই কালে মথুরাতে দেবকী গর্ভেতে।
দেবরূপে জন্মে হরি ঈশ্বর মূর্ত্তিতে।।
সুন্দর কিরিটী শোভে শিরেতে তাহার।
চারিভূজে শঙ্খ চক্র গদামনোহর।।

কনক কুণ্ডল কানে করে ঝলমল।
রূপের ছটায় দিক্ হয়ত উজ্জ্বল।।
অদ্ভুত বালক দেখি দেবকী সুন্দরী।
করজোড়ে স্তুতি করে ভূমি তলে পড়ি।।
বসুদেব শীঘ্র করি মানসে স্নান কৈল।
মনে মনে জন্মোৎসবে গাভী দান দিল।।
করিল স্তবন বহু দেব নারায়ণে।
তবে নারায়ণ তার কহিল সাক্ষাতে।।
মোরে লই এবে চল গোকুল নগরে।
যশোদার কোলে রাখ পরম আদরে।।
শুনিয়া হরির বাক্য বসুদেব ধীর।
পুত্র লই শীঘ্র করি হইল বাহির।।
যেই কালে কংসপুরী হতে বাহিরিল।
যশোদার পুনঃ এক কন্যারত্ন হল।।
ভরা যমুনায় দেখি বসুদেব গণে।
কেমনে যমুনা পারে করিব গমনে।।
হেনকালে মহামায়া শৃগালির বেশে।
যমুনা হাটিয়া পার হয়ত হরিষে।।
তার পিছে পিছে যায় বসুদেব ধীর।
হেনরূপে আইলেন নন্দের মন্দির।।
যশোদার কোলে দিল আপন তনয়।
যশেদানন্দিনী নিয়ে চলে বসু রায়।।
স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে ভাই এই কিবা কথা।
নন্দের পুত্রটী তবে আছিল বা কোথা।।
মধু কণ্ঠ বলে ভাই কর অবধান।
বড়ই দুর্গম লীলা এইসব জান।।

যশোদার কন্যা সাক্ষাৎ যোগমায়া।
নন্দ পুত্র রাখে তেঁহ রূপে আচ্ছাদিয়া।।
সব বিষ্ণুতত্ত্বে অংশী নন্দ পুত্র হয়।
বসুদেবে অংশ বাসুদেব নামে কয়।।
নদীগণ যেনমতে সাগরে মিলয়ে।
সেই মত অংশ যত অংশীতে মিশায়।।
যোগমায়া শক্তে বসু ইহা নাহি জানে।
অজ্ঞাত রহিল তার এসব আখ্যানে।।
হরি বংশেতে আছে ইহার প্রমাণ।
এককালে দুই স্থানে জন্মের আখ্যান।।
তথাহি হরি বংশে—

গর্ভকালেত্বসংপূর্ণে অষ্টমে মাসি তেস্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা।।

অনুবাদ—গর্ভকালের অসম্পূর্ণ অষ্টম মাসে শ্রীযশোদা ও দেবকীদেবী একই কালে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করলেন। যশোদার পরে যোগমায়া নাম্নী কন্যা হলে, তার সঙ্গে মহামায়াও জন্ম গ্রহণ করে। বসুদেব মহামায়াকে নিয়ে কংসের হাতে দিয়েছিলেন। যোগমায়া ব্রজেই রইলেন।

যশোদার গর্ভে হরি স্বয়ংরূপ সাক্ষাৎ নরাকৃতি নরবৎ তার জন্ম লীলা, ইনি সকলের অংশী, সাক্ষাৎ ভগবান্। দেবকীর গর্ভে জাত কৃষ্ণ অংশ প্রাভব প্রকাশ চতুর্ভূজ জন্ম দেববৎ।

স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলে ভাই নন্দোৎসব কথা।
উত্তম রূপেতে হেথা বলিবে সর্বথা।।
মধু কণ্ঠ বলে তবে কর অবধান।
কৃষ্ণ প্রসবের কথা নহিল সন্ধান।।

সবে নিদ্রা সুখে সারা নিশি গোয়াইল।
প্রভাত কালক্রমে আসি দেখা দিল।।
তবে লীলা করি হরি কাঁদে উচ্চ স্বরে।
জাগে শীঘ্র যশোমতী মোদিত অন্তরে।।

দেখিয়া তনয় যশোমতী মাই
সুখের পাথারে ভাসে।
কি করি কি করি বুঝিতে যে নারি
বড় সুখ মনে বাসে।।
নয়নেতে লোর ঝরিছে অঝোর
স্তন হতে ঝরে ক্ষীর।
নব শিশু কোলে করি যশোমতী
বসিছে হইয়া স্থির।।

প্রেমে গদ গদ মাতা বচন না স্ফুরে।
আনন্দে বিবশ তনু স্নেহে নেত্র ঝরে।।
এতদিন অন্য পুত্রে কৈল নিরীক্ষণ।
আজি আপনার শিশু হল দরশন।।
নেত্রনীরে স্তন ক্ষীরে বস্ত্র ভিজি যায়।
আনন্দে পুত্রের মুখ যশোদা দেখয়।।
হেত্রা ধাত্রীগণ আর গোপনারীগণ।
সে ক্রন্দনে জাগিয়া উঠিল সর্বজন।।
এটি কন্যা নয় পুত্র বলি উতরোল।
তখনি গোকুলে বহে আনন্দ হিল্লোল।।
যশোদার নবজাত শিশু দেখিবারে।
ধাইয়া আইসে গোপী নন্দরাজ পুরে।।

"স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন।।
দেবনারী করে সুখে পুষ্প বরিষণ।
মহানন্দে নাচে আর গোপনারীগণ।।
হেথা সব গোপগণ আনন্দ সাগরে।
ভাসি' যেন পরস্পর আলিঙ্গন করে।।
শীঘ্র নন্দ স্নান করি বেদের বিধানে।
পুত্রের জাত কর্ম্মাদি করে সাবধানে।।
পুরোহিত দ্বিজগণ স্বস্তি বাক্য বলে।
আসিতে লাগিল বাদ্যকার দলে দলে।।
আনন্দে সকলে করে বিবিধ বাজন।
ত্রিভুবনের বাদ্য যত বাজিল তখন।।
মহা মহানন্দে পূর্ণ হল ত্রিভুবন।
সাধু দ্বিজ পৃথিবীর দুঃখ হল বিমোচন।।

তথাহি গীত নন্দোৎসব বর্ণন (ধান শশী)

কোথা গেল নন্দ ঘোষ হের দেখ আসি।
তব গৃহে উদয় হৈয়াছে কত শশী।।
এতেক দিবসে জন্ম হইল সফল।
মনের আনন্দে দেখ বদন কমল।।
যশোদার পুত্র হৈল পড়ি গেল সাড়া।
মহানন্দে ধাইয়া আইল যত গোয়াল পাড়া।।
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে লড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া।।
সবে বলে নন্দ ঘোষ বড় ভাগ্য তোর।
তব গৃহে নাহি আজি আনন্দের ওর।।

নাচয়ে হরিষে নন্দ পুত্র মুখ চাইয়া।
চৌদিকে গোয়ালা নাচে করতালী দিয়া।।
স্বর্গে নাচে, দেবগণ পাতালে নাচে ফণী।
অন্তঃপুরে রাণী নাচে, পাইয়া নীলমনি।।
শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।।
দধি হরিদ্রা আনে আর গোরচনা।
দু-বাহু পসারি আসে আহিরী অঙ্গনা।।
যদুনাথ দাস বলে শুন নন্দরাণী।
কত পুণ্য ফলে তুমি পাইলা নীলমণি।।

— — —

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন।।
ব্রহ্মা নাচে, শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।।
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে লড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া।।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল।।

শ্রীরাধার জন্মকথা

গুরবে গৌর চন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ।।
শ্রীরাধার জন্ম কথা শুন সাধুজন।
ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ বিধানে বর্ণন।।

তথাহি-ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বচন—

পুরা বৃন্দাবনে রম্যে গোলোকে রাসমণ্ডলে।
শতশৃঙ্গৈকদেশে চ মল্লিকা মাধবী বনে।।
রত্ন-সিংহাসনে রম্যে তস্থৌ তত্র জগৎপতিঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্ বভূব রমণোৎসুকঃ।।
এতস্মিংন্তরে দুর্গে (পুরে) দ্বিধা রূপো বভূব সঃ।
দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণো বামার্দ্ধাঙ্গা চ রাধিকা।।
বভূব রমণী রম্যা রাসেশী রমণোৎসুকা।
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণভা রাজিতা চ স্বতেজসা।।
সস্মিতা সুদতীশুদ্ধা শরৎপদ্মনিভাননা।।

(শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড)

— — —

চিদানন্দ ময় ধাম বৃন্দাবন মাঝে।
মাধবী তলাতে রত্ন আসন বিরাজে।।

তদোপরি কৃষ্ণচন্দ্র বসিয়া একলে।
বিহার করিতে বাঞ্ছা জাগে চিত্তস্থলে।।
ইচ্ছামাত্র বাম অংশে রাধিকা জন্মিল।
আদি শক্তি বলি তাঁরে জগতে ঘুষিল।।
তপ্তস্বর্ণ সম প্রভা অঙ্গের বরণ।
নানা রত্ন অলঙ্কার অঙ্গের ভূষণ।।
সুন্দর কবরী মাঝে শোভে ফুল মালা।
স্তনোপরি মুক্তমালা কটিতে মেখলা।।
কনক কুণ্ডল কালে শোভা মনোহর।
চরণে নূপুর ধ্বনি মরাল ঝঙ্কার।।
মাধব মোহিনী রাধা মাধবে মোহিল।
কতনা বিহার রাসে মাধবে তুষিল।।
আরও অধিকভাবে মাধব তুষিতে।
ইচ্ছা করিলেন সতী আপন হিয়াতে।।
তখনি আপনা অঙ্গ হৈতে গোপী গণ।
অসংখ্যা হইল সবে রাধার সমান।।
অতএব রাধা কৃষ্ণ একই স্বরূপ।
বিলাসের হেতু মাত্র ধরে দুটি রূপ।।
এবে ত কহিব দোঁহার অবতার লীলা।
পদ্ম পুরাণেতে শিব যেমন কহিলা।।

তথাহি—পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে —

বৃষভানু পুরীরাজা বৃষভানু মহাশয়ঃ।
মহাকুল প্রসূতোঽসৌ সর্বশাস্ত্র বিশারদঃ।।

তস্য ভার্য্যা মহাভাগা শ্রীমৎ শ্রীকীর্ত্তিদাহ্বয়া।
রূপযৌবন সম্পনা মহারাজকুলোদ্ভবা।।
তস্যাং শ্রীরাধিকা জাতা শ্রীমদ্ বৃন্দবনেশ্বরী।
ভাদ্রে মাসি সিতাষ্টস্যাং মধ্যাহ্নে শুভদায়িনী।।

— ঃঃ০ঃঃ —

বৃষভানু নামে রাজা ভকত প্রধান।
অষ্টনিধি তাঁর ঘরে সদা বিদ্যমান।।
তাঁর পত্নী কীর্ত্তিদা নামে মহাপতিব্রতা।
তাঁর গর্ভে জনমিলা রাধা জগন্মাতা।।
ভাদ্র শুক্লাষ্টমী দিনে মধ্যাহ্ন কালেতে।
জন্মিলেন ব্রজেশ্বরী হরির ইচ্ছাতে।।
পরানন্দময় হৈল গোপ পরিবার।
সকল গোকুল ভরি আনন্দ অপার।।
সবার বাসনা পূর্ণ সুখের প্রকাশ।
কন্যারত্ন দরশনে সবার উল্লাস।।
তবে ভানু কন্যা জন্মে দিল বহু দান।
দেব দ্বিজ আদি করি করিলা সম্মান।।
নাট-ভাট আদি করি যত দীন জনে।
দান দিল ভানু রাজা বড় সুখী মনে।।
হেনমতে ব্রজেশ্বরী জন্মিল গোকুলে।
না বুঝিতে পারে কেহ তান মায়াবলে।।
ইতি মধ্যে এক কথা শুন ভক্তগণ।
যেমতে নারদ পায় রাধিকা দর্শন।।

একদিন মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ তপোধন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এল ভানুর ভবন।।
কুশল বারতা মুনি ভানুরে পুছিল।
ভানুরাজ নম্রচিত্তে কহিতে লাগিল।।
তোমার প্রসাদে সব কুশল আমার।
পৃথিবী পবিত্র হয় পরশে তোমার।।
সর্ব পাপ তাপ যায় তোমা দরশনে।
সর্ব্ব শুভোদয় হয় তোমা আগমনে।
তোমার চরণ রেণু সর্বতীর্থময়।
তোমা পরশিলে চিত্তে হরি ভক্তি হয়।।
এতেকে বলিয়া ভানু কন্যা দিল কোলে।
রাধার পরশে মুনি আনন্দ বিহ্বলে।।
প্রেমেতে পুরিল দেহ নেত্রে অশ্রু ঝরে।
সর্বাঙ্গ পুলকাবলি সাত্ত্বিক বিকারে।।
অন্তরে অন্তরে মুনি রাধার চরণ।
হৃদয়ে ধরিয়া প্রেমে করিছে স্তবন।।
তুমি হরিপ্রিয়া দেবী মহাভাব-রূপা।
গোবিন্দ মোহিনী তুমি আনন্দ স্বরূপা।।
তুমি ভক্তি তুমি তপ তুমি সর্ব্ব রূপা।
তোমার চরণ ধ্যান করে সব দেবা।।
তোমার অংশেতে মহালক্ষ্মী জনমিল।
গোপী মহিষী আদি সকল হইল।।
তুমি আদ্যাশক্তি হও কৃষ্ণের মোহিনী।
তুমি কৃষ্ণ প্রাণ রূপা সবার জননী।।

মুনির এতেক বাণী শুনি রাধা রাণী।
দেখাইলা নিজরূপ কৃপায় আপনি।।
দিব্য কল্পতরু তলে দিব্য রত্নাসনে।
বসিয়াছেন ব্রজেশ্বরী সখীগণ সনে।।
চামর ব্যজন করে কোন সখী জন।
দিব্য শ্বেত ছত্র ধরে পরম শোভন।।
রাধা অঙ্গে দিব্য বাস অলঙ্কার শোভা।
প্রতি অঙ্গ ঝলমল হরি মন লোভা।
সুন্দর সিন্দুর বিন্দু ললাটে শোভন।
কটিতটে কাঞ্চি দাম অপূর্ব দর্শন।।
রত্নহারাবলি শোভে স্তন মনি পরে।
চরণে নূপুর দাম হরি চিত্ত হরে।।
অঙ্গের ছটায় দিক্‌হয় আলোকিত।
রূপ হেরি মুনিবর পরম বিস্মিত।।
নয়নে প্রেমের ধারা গদ গদ বাণী।
পুলকে পুরল তনু কিছু নাহি জানি।।
এসব চরিত কেহ নারে লখিবারে।
রাধার কৃপায় মাত্র নারদ নিহারে।।
পুনঃ শিশু রূপে রাধা মুনির কোলেতে।
শুইয়া রহিল কেহ নারিল বুঝিতে।।
তবে মুনিবর কন্যা ভানু কোলে দিল।
ভানু কীর্ত্তিদারে ডাকি কহিতে লাগিল।।
মহা ভাগ্যবান দোঁহে জগত মাঝারে।
হেন অপরূপ কন্যা হয় যার ঘরে।।

কমলা পার্বতী আর অরুন্ধতী সতী।
শচী, সত্যভামা, আর যতেক যুবতী।।
সবার অংশিনী রাধা জান ভালমতে।
তার সম হরিপ্রিয়া না আছে জগতে।।
এ কন্যা প্রভাবে সব গোকুল মণ্ডল।
সকল সম্পদ পাবে লভিবে মঙ্গল।।
কন্যা বলি মনে কিছু দুঃখ নাহি কর।
ইহা হ'তে বহু যশ হইবে তোমার।।
তবে ভানুরাজ বলে জুড়ি দুটি কর।
কিবা গতি হবে ভাবি কহ মুনিবর।।
মুনি বলে হবে মহাপুরুষের নারী।
হইবে নয়ন কালে ছাড় দুঃখ ভারী।।
বড় ভাগ্যবান দোঁহে জগৎ মাঝারে।
এতেকে বলিয়া মুনি চলিল সত্বরে।।
পদ্ম পুরাণের শিব দুর্গার বারতা।
আশ্রয়ে কহিল কিছু রাধা জন্ম কথা।।
এতে অপরাধ সাধু কিছু না লইও।
এ অধমের শিরে নিত্য পদ ধূলি দিও।।

— ঃ০ঃ —

পার্বতী জিজ্ঞাসে পুনঃ শঙ্কর চরণে।
নেত্র খুলি রাধা কেন না করে দরশনে।।
শঙ্কর বলেন দেবি! কর অবধান।
কহিব সে সব কিছু অপূর্ব্ব আখ্যান।।

যবে হরি অবতার মনে ইচ্ছা কৈল।
রাধারে ডাকিয়া কিছু বলিতে লাগিল।।
মোর সনে মর্ত্ত্যলোকে তুমি জনমিবে।
তথায় বিচিত্র লীলা তোমা সনে হবে।।
তবে রাধা কহে শুন কমল নয়ন।
মর্ত্ত্যে জন্মে হবে পর পুরুষ দর্শন।।
তব রূপ বিনা মুই আন নাহি হেরি।
তথায় জন্মিলে মোর দুঃখ হবে ভারী।।
কৃষ্ণ বলে শুন দেবি! কোন দুঃখ নাই।
তথায় আমার রূপ দেখিবে সদাই।।
এতেক বলিয়া হরি নন্দগোপ ঘরে।
জনম লভিল শীঘ্র সাধু রক্ষা তরে।।
রাধাও কীর্ত্তিদা গর্ভে জনম লভিল।
উভয়ের জন্মে বিশ্ব সুখময় হৈল।।
না খুলিল নেত্র দুটী রাধিকা সুন্দরী।
দেখিয়া কীর্ত্তিদা মনে দুঃখ পায় ভারী।।
কহিল পার্ব্বতী পুনঃ শিবের চরণে।
কিরূপে পাইল রাধা আপন নয়নে।।
শিব বলে শুন দেবি সেকথা কহিব।
যাহার শ্রবণে চিত্তে আনন্দ পাইব।।
কন্যা জন্মোৎসবে ভানু সবারে ডাকিল।
বিশেষে নন্দের ঘরে আমন্ত্রণ দিল।।
ভানু-আমন্ত্রণে নন্দ পুত্র পত্নী সনে।
শকটে চড়িয়া এল ভানুর ভবনে।।

ভানুরাজ অগ্রসরি নন্দেরে আনিল।
যশোদারে কীর্ত্তিদা আলিঙ্গন কৈল।।
ভানু নন্দ কোলাকুলি করিতে লাগিল।
কীর্ত্তিদা যশোদায় অন্তঃপুরে আলিঙ্গিল।।
বিবিধ বাজনা বাজে আনন্দ কোলাহল।
রাধা জন্মোৎসবে গোপ করিছে মঙ্গল।।
অন্তঃপুরে পালঙ্কেতে রাধা নিদ্রা যায়।
অন্তর্য্যামী হরি তাহা জানিল হিয়ায়।।
অলক্ষ্যে আইল কৃষ্ণ রাধা সন্নিধানে।
দেখিয়া প্রিয়ার মুখ হাসে মনে মনে।।
করপদ্ম দিলা শীঘ্র প্রিয়ার নয়নে।
কৃষ্ণ করস্পর্শে রাধা চাহে কৃষ্ণ পানে।।
নয়নে নয়নে দোঁহার হইল মিলন।
আনন্দে মগন ভেল দুঁহাকার মন।।
হেথা ভানু জায়া শীঘ্র এল কন্যাপাশ।
দেখিল কন্যার হৈল নয়ন প্রকাশ।।
আনন্দে দোঁহারে কোলে লৈল ততক্ষণ।
বলেন রাধার নেত্র কৃষ্ণ কৈল দান।।
এ শিশু হইবে রাধার পরাণ সমান।
শুনিয়া যশোদা দেবী বড় সুখ পান।।
আনন্দ হইল বড় কীর্ত্তিদা ভবনে।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা কে করে বর্ণনে।।
পুরাণ বিধানে কথা হল সমাপন।
হরিগুরু পাদপদ্ম করিয় স্মরণ।।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চতিামৃতে— আদি লীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাস রস আস্বাদন করি।।

* * *

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার।।
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণের আনন্দ আস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারে করে ভক্তের পোষণ।।

* * *

হ্লাদিনী সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম-মহাভাব।।
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ খনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।।
কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়।।

তথাহি —পদকল্পতরু (সারঙ্গ—তেওট)

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি, বিশাখা নক্ষত্র তথি,
শ্রীমতী জনম সেইকালে।
মধ্য দিন গত রবি, দেখিয়া বালিকা ছবি,
জয় জয় দেই কুতূহলে।।
বৃষভানু পুরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে।
কন্যার চাঁদমুখ দেখি, রাজা হইল মহাসুখী,
দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে।।

নানা দ্রব্য হস্তে করি, নগরের যত নারী,
সবে আইল কীর্ত্তিদা মন্দিরে।
অনেক পুণ্যের ফলে, দৈব হৈব অনুকূলে,
এ হেন বালিকা মিলে তোরে।।
মোদের মনে হেন লয়, এহো ত মনুষ্য নয়,
কোন ছলে কেবা জনমিলা।
ঘনশ্যাম দাসে কয়, না করহ সংশয়,
কৃষ্ণ প্রিয়া সদয় হৈলা।।

— ঃ০ঃ —

(শ্রীরাগ—দুঠুকী)

বৃষভানু পুরে আনন্দ কলরব।
ঊর্দ্ধ মুখে ধেয়ে আইল ব্রজবাসী সব।।
ধাইয়া আইলা সব ব্রজের রূপসী।
দেখে বৃষভানু সুতা জিনি কত শশী।।
দেখিয়া গোপীকা সব আনন্দে ভরিল।
নাহিক নয়ন দুটী কীর্ত্তিদা দেখিল।।
পাইয়া ছিলাম সাধ পুরাব রতনের নিধি।
গোবিন্দ দাস কহে নিদারুণ বিধি।।

(ধানশী— যোতসম তাল)

কান্দয়ে কীর্ত্তিদা রাণী, দুনয়নে বহে পানি,
ধূলি পড়ি গড়াগড়ি যায়।
এমনি সুন্দরী কন্যা, এ রূপ জগতে ধন্যা,
বিধি চক্ষু নাহি দিল তায়।।

হায় বিধি কি দশা করিলা।
দিয়ে গো রতন নিধি, হাত নাহি দিলা বিধি,
ধন আবরণ না হইলা।।
কান্দি বৃষভানু নারী, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
তেজিল অঙ্গের অলঙ্কার।
কেশপাশ নাহি বান্ধে, ভূমে গড়াগড়ি কান্দে,
দুনয়নে বহে পানি ধার।।
আসি যত সহচরী, উঠাইল হাতে ধরি,
বসাইল আপনার কোলে।
কহয়ে মধুর বাণী, আর না কান্দিও রাণী,
ভাল মন্দ কপালের ফলে।।
কন্যা কোলে কর দেবি, ঐ হোক চিরজীবি,
বাহু মেলি কন্যা লহ কোলে।
বাঁচিয়া থাকিলে এই, শতেক কোঙর সই,
আশীষ করহ কুতূহলে।।
শোক দুঃখ পরিহরি, কন্যা নিল কোলে করি,
ছাড়ে রাণী দীর্ঘ নিঃশ্বাস।
দাসিগণ সারি সারি, সেচই বাসিত বারি,
মর্ম জানে গোবিন্দ দাস।।

— ঃ০ঃ —

বালা ধানশী— এক তালা

যত ব্রজাবাসী আইলা দেখিবারে রাই।
কৃষ্ণ কোলে করি আইলা যশোমতী মাই।।
কোল হইতে গোপালে রাখিয়া ভূমিতলে।
যশোদায় কীর্ত্তিদা দুঃখ কাঁদি কাঁদি বলে।।

হামাগুড়ি ধীরে ধীরে যাইয়া মুরারি।
এলাম আমি নয়ন কোণে হেরহে কিশোরী।।
রাই হিয়ায় হাত দিয়া রহিলেন হরি।
রাধিকা চাহিয়া দেখে ওরূপ মাধুরী।।
হেনকালে দেখিয়া যশোদা নন্দরাণী।
আয় আয় বলে কোলে নিল নীলমণি।।
নিরমল আঁখি দেখি কীর্ত্তিদা বিহ্বলা।
গোপালে আদরে দিল কাঞ্চনের মালা।।
পুরাইল গোপাল তোমার আমার বাসনা।
এ শশীশেখর দিল নগর ঘোষণা।।

এ তোর বালিকা চাঁদের কণিকা
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয় সদাই হৃদয়
পশরা করিয়া রাখি।।
শুন বৃষভানু প্রিয়ে।
কি হেন করিয়া কোলেতে রেখেছ
এ হেন সোনার ঝিয়ে।।ধ্রু।।
তড়িত জিনিয়া বদন সুন্দর
মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম সে নাম রাখুক
আমরা রাখিলাম রাধা।।
স্বরূপ লক্ষণ অতি বিলক্ষণ
তুলনা দিব বা কিয়ে।

মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে
সোঙরিবা যদি জীয়ে।।
দুহিতা বলিয়া দুঃখ না ভাবিহ
ইহোঁ উদ্ধারিব বংশ।
জ্ঞানদাসে কহে শুনেছি কমলা
ইহাঁর অংশের অংশ।।

— ঃ০ঃ —

(তুড়ী মিশ্র ভাটিয়ালী—ধামলী)

আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া।
নববাস ভূষ পরি ধায়ত গোপনারী
রহিতে নারয়ে ধৃতি ধরিয়া।।ধ্রু।।
কিবা অপরূপ সাজে প্রবেশে ভবন মাঝে
গোপগণ কান্দে ভার করিয়া।
বৃষভানু নৃপমণি আপনা মানয়ে ধনি
বালিকা বদন বিধু হেরিয়া।।
সুভানু সুচন্দ্রভানু ধরিতে নারয়ে তনু
নাচে সব গোপ তায় ঘেরিয়া।
বাজে বাদ্য নানা জাতি গীত গায় প্রেমে মাতি
বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া।।
ঘৃত দধি দুগ্ধ সহ হরিদ্রা সলিল কেহ
ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া।
মুখরার সাধ কত করয়ে মঙ্গল যত
কৌতুক দেখয়ে নরহরিয়া।।

— ঃ০ঃ —

(আশোয়ারী— তেওট)

জয়রে জয়রে জয় বৃষভানু তনি।
অবনি উয়ল থির বিজুরী জিনি।।
অরুণ অধরমুখ চন্দ্র জিনি।
উগারে অমিয়া তাহে ঈষদ হসনি।।
নয়ন যুগল শ্রুতি অতি মনোলোভা।
কর পদতল এই অষ্ট পদ্মশোভা।।
মুখ ইন্দু গণ্ডযুগ ভালে অর্দ্ধ চান্দে।
কর পদনখে কত বিধু পড়ি কান্দে।।
কনক মৃণাল ভূজ নাভি সরোবর।
এ দাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর।।

— ঃ০ঃ —

ভাটিয়ারী—ধামালী

বৃষভানু পুরে আজি আনন্দ বাধাই।
রত্নভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই।।
দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি।।
গোপগোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি।
মুখরা নাচয়ে বুড়ি হাতে লৈয়া নড়ি।।
বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর উল্লাসে।
আনন্দ বড়াই গীত গায় চারি পাশে।।
লক্ষ লক্ষ গাভী বৎস অলংকৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি।।

গায়ক নর্ত্তক ভাট করে উতরোল।
দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এই বোল।।
কন্যার বদন দেখি কীর্ত্তিদা জননী।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি।।
কত কত পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উদয়।
এ দাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয়।।

— ঃ০ঃ —

রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
শ্রীকৃষ্ণ ভজন তব অকারণ গেলা।।
আতপ রহিত সুরয নাহি জানি।
রাধা বিরহিত মাধব নাহি মানি।।
কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী।।
কবঁহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস রঙ্গ।।
রাধিকা দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুলকান।।
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা পদরজ পূজয়ে মানি।।
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা অবতার সবে আম্নায় বাণী।।
হেন রাধা পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ।।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড উৎপত্তি

অরিষ্ট অসুর আইলা বৃষরূপ ধরি।
পরম কৌতুকে তারে বধিলা শ্রীহরি।।
কৌতুকে শ্রীরাধা অঙ্গ স্পর্শিতে কৃষ্ণ চায়।
হাসিয়া রাধিকা কহে ইহা না যুয়ায়।।
যদ্যপি অসুর সে ধরয় বৃষাকৃতি।
তারে বধ কৈলা, হৈলা অপবিত্র অতি।।
যদি সর্ব্বতীর্থে স্নান পার করিবারে।
তবে সে ঘুচিবে দোষ কহিল তোমারে।।
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ সুমধুর বাণী।
এথাই করিব স্নান সর্ব্বতীর্থ আনি।।
এত কহি পদাঘাত কৈল মহীতলে।
পরিপূর্ণ হৈল কুণ্ড সর্ব্বতীর্থ জলে।।
নিজ নিজ পরিচয় দিয়া তীর্থগণ।
সাক্ষাৎ হইয়া কৃষ্ণে করিল স্তবন।।
শ্রীরাধিকাসহ সখীগণে দেখাইয়া।
স্নান কৈল কৃষ্ণ তীর্থগণে সম্বোধিয়া।।
অর্দ্ধরাত্র হইতেই হৈল সমাধান।
অদ্যাপিহ লোকে তৈছে কুণ্ডে করে স্নান।।
শ্রীরাধিকা শুনি কৃষ্ণে প্রগলভ্য বচন।
সখীসহ শীঘ্র কুণ্ড করিলা খনন।।

হইল অপূর্ব রাধিকা সরোবর।
দেখিয়া অতি আনন্দ অন্তর।।
সর্ব্বতীর্থময়ী শ্রীমানসী গঙ্গাজলে।
করিবেন কুণ্ডপূর্ণ অতি কুতূহলে।
এই ইচ্ছা জানি কৃষ্ণ তীর্থে নির্দেশিতে।
প্রবেশে রাধিকাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ড হৈতে।।
তীর্থগণ করি বহু স্তুতি রাধিকার।
মানায়ে সৌভাগ্য, মহাহর্ষ অনিবার।।
দুই কুণ্ড পরিপূর্ণ হৈল তীর্থজলে।
সখীসহ দোহে শোভা দেখে কুতূহলে।।
নানা বৃক্ষতলায় বেষ্টিত কুণ্ডদ্বয়।
দোঁহার আশ্চর্য্য কেলি স্থান এই হয়।।
—(ভঃ রঃ ৫।৪৭৮-৪৯৩)

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩৬ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোক থেকে ২০ শ্লোক রচনা করেছেন। সেই শ্লোক সমূহের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ নিম্নে দেওয়া হল।

অরিষ্টাসুর বধের পরে ভগবান্ শ্রীশ্যামসুন্দর যখন গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে মিলিত হলেন তখন তাঁরা রহস্যপূর্ব্বক বললেন তোমার সঙ্গে আজ আমরা মিলিতে ইচ্ছা করি না।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে গোপাঙ্গনাগণ। কেন ইচ্ছা কর না?

শ্রীরাধা ঠাকুরাণী বললেন—হে দামোদর। হে পূতনা ঘাতন। বৃষাসুর বধহেতু।

কৃষ্ণ—সে ত মহাসুর।

রাধা—অসুর হলেও বৃষের আকৃতি, তজ্জন্য তোমার গো-হত্যা পাপ

হয়েছে। যেমন বৃত্রাসুর অসুর হলেও তার বধে ইন্দ্রের ব্রাহ্মণ হত্যা পাপ হয়েছিল।

কৃষ্ণ—এখন পাপ থেকে উদ্ধারের উপায় কি করব?

রাধা—ত্রিভুবনের সর্বতীর্থে স্নান করলে পাপ যাবে।

কৃষ্ণ—তাহলে আমি তীর্থ স্নান করতে চললাম।

রাধা—আমাদের সামনে স্নান করতে হবে।

কৃষ্ণ তখন দক্ষিণ চরণের পার্ষ্ণি আঘাত করে এক কুণ্ড খনন করলেন এবং সমস্ত তীর্থগণকে তথায় আহ্বান করলেন, প্রভুর স্মরণ মাত্র সমস্ত তীর্থ আগমন করলেন। তথা স্ব স্ব নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ কুণ্ডে প্রবেশ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তখন গোপাঙ্গনাগণকে তা সাক্ষাদ্ভাবে দেখালেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই কুণ্ডজলে স্নান করবার পর গোপাঙ্গনাগণকে বললেন—হে ব্রজদেবীগণ! তোমরাও এ পবিত্র তীর্থ জলে স্নান কর। শ্রীকৃষ্ণের এরূপ নর্মালাপ শুনে গোপীগণ বললেন—তোমার দেহস্থিত গো হত্যা পাপ উহাতে প্রবেশ করেছে অতএব ঐ জল আমরা স্পর্শ করব না। আমরা স্বয়ং কুণ্ড খনন করে তাতে স্নান করব।

অতঃপর শ্রীরাসেশ্বরী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী সখীগণ সঙ্গে বিবিধ মন্ত্রণা করবার পর স্বয়ং শ্রীচরণ আঘাতে এক কুণ্ড নির্মাণ করলেন এবং ঐ কুণ্ড স্বর্গ গঙ্গা মন্দাকিনীর জল দ্বারা পূর্ণ করতে মনস্থ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মনোভাব বুঝে বললেন—হে ব্রজদেবীগণ! আমার কুণ্ডের পবিত্র জলে ঐ কুণ্ড পূর্ণ কর। গোপীগণ বললেন— না-না-না তোমার কুণ্ডের জল আমরা স্পর্শ করব না। উহাতে গোহত্যা পাপ রয়েছে। শ্রীরাধা ঠাকুরাণী বলেন—আমার ত শতকোটি গোপী আছে, স্বর্গ-গঙ্গা থেকে এক এক কলসী জল এনে এ কুণ্ড পূর্ণ করব, তথাপি তোমার কুণ্ডজল স্পর্শ করব না। এতে আমাদের যশ

পৃথিবীতে ঘোষিত হবে।

শ্রীরাসেশ্বরীর এ উক্তি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে তীর্থগণকে ইঙ্গিত করলেন। প্রভুর সে ইঙ্গিতে তীর্থগণ আপন আপন দেবী মূর্ত্তি প্রকট করলেন এবং সকলেই বিনীতভাবে করজোড়ে শ্রীরাসেশ্বরীর স্তব করতে লাগলেন—

হে কৃষ্ণপ্রেয়সী মুখ্যা! হে শ্রীরাস রাসেশ্বরী! তোমার মহামহিমা ব্রহ্মা, শিব ও নারদাদি বুঝতে পারে না। হে দেবি! তোমার শ্রীচরণ ধূলি আমাদের শিরোভূষণ হউক। আমাদের প্রার্থনা নিত্যকাল তোমার শ্রীচরণতলে স্থান পাই। হে শ্রীরাধে! তোমার শ্রীচরণ আঘাতে নির্ম্মিত পবিত্র কুণ্ডে আমরা স্থান লাভ করিতে পারি;এ আশারূপী তরু পল্লবীত হউক।

তীর্থগণের এরূপ কাতর প্রার্থনায়, শ্রীরাধা ঠাকুরাণী তাদের সে বাসনা পূর্ণ করলেন, তৎক্ষণাৎ তীর্থগণ শ্যামকুণ্ডের তীরভূমি ভেদ করে রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করলেন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাসেশ্বরী! আমার কুণ্ড হতে তোমার কুণ্ডের মহিমা অধিক। তুমি যেমন আমার প্রিয় তেমনি তোমার কুণ্ডও আমার পরম প্রিয়। আমি তোমা হতে তোমার কুণ্ডকে ভেদ দর্শন করি না। তোমার নামে এ কুণ্ড 'শ্রীরাধাকুণ্ড' নামে চিরকাল খ্যাতি লাভ করবে।

ভগবান নিত্য শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মনোহতটভূমিতে বিহার করে থাকেন।

কুণ্ড মাহাত্ম্য— আদি বারাহেঃ—
অরিষ্টরাধাকুণ্ডাভ্যাং স্নানাৎ ফলমবাপ্যতে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।
—(ভঃ রঃ ৫।৫০১)

আদি বরাহ পুরাণে কথিত হয়েছে—রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি মহা মহাযজ্ঞ সকল অনুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া যায়, তদপেক্ষা শতগুণ ফল অরিষ্টকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড স্নানে লাভ হয়ে থাকে। ইহাতে সন্দেহ করবার নাই।

তথাহি পাদ্মে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে ঃ—

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ।।
নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্র তৎস্থিতস্য প্রতোষণম্।।
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।।
তৎকুণ্ডে কার্ত্তিকেঽষ্টম্যাং স্নাত্বা পূজ্যো জনার্দ্দনঃ।
প্রবোধন্যাং যতা প্রীতিস্তথা প্রীতস্ততো ভবেৎ।।
—(ভ- রঃ ৫।৫০৪-৫০৬)

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে—শ্রীহরির প্রিয় রাধাকুণ্ড, রমণীয় শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মধ্যে বিরাজিত। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করলে, লোক রাধাকুণ্ড বিহারী শ্রীহরির প্রিয় ভক্ত হতে পারে। কারণ তাহাতে শ্রীহরির অত্যন্ত তোষণ হয়। রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, শ্রীরাধা কুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়। কেননা সকল গোপীগণ মধ্যে একা রাধাই শ্রীহরির অতিপ্রিয়। কার্ত্তিক মাসে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করে জনার্দ্দনকে পূজা করা কর্ত্তব্য। জনার্দ্দন উত্থান একাদশীতে পূজিত হ'লে যেরূপ প্রীত হন, এ দিনের পূজাতেও সেরূপ প্রীত হন।

শ্রীভাগবত প্রেস, কোলকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস, কোলকাতা